বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহের সাধারণ মানুষের ভূমিকা

শহীদ কাদের চৌধুরী

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

আগস্ট, ২০১৮

‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহের সাধারণ মানুষের ভূমিকা’ অভিসন্দর্ভটি

ডক্টর অব ফিলোসফি (Ph.D) ডিগ্রি অর্জনের জন্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে উপস্থাপন করা হল।

শহীদ কাদের চৌধুরী

পিএইচডি গবেষক

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নং: ১৪২/২০১৪-২০১৫

যোগদানের তারিখ: ০৩ জানুয়ারি ২০১৬

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুন

বঙ্গবন্ধু অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অঙ্গীকারনামা

এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহের সাধারণ মানুষের ভূমিকা’ শীর্ষক পিএইচডি অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক গবেষণা কর্ম। এই অভিসন্দর্ভটি তথ্যসূত্রে উল্লিখিত তথ্য, উদ্ধৃত আলোচ্য ও উপাত্ত ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থের অনুকরণে রচনা করা হয়নি। অভিসন্দর্ভটি পূর্বে প্রকাশিত হয়নি বা ডিগ্রি অর্জনের জন্য কোথাও উপস্থাপন করা হয়নি।

শহীদ কাদের চৌধুরী

সহকারি অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, শহীদ কাদের চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে আমার তত্ত্বাবধানে 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহের সাধারণ মানুষের ভূমিকা' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছেন। আমার বিবেচনায় এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমি পাঠ করেছি এবং পিএইচডি ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলের জন্য সুপারিশ করছি।

(মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুন)

বঙ্গবন্ধু অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুখবন্ধ

অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন লিখেছেন, "ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কটা অনেকটা নদীর জোয়ার ভাটার মতো। কখনো আবেগের জোয়ারে সব ভেসে যাচ্ছে, কখনও ভাটার টানে শত্রুতা না হোক বৈরিতা বিরাজ করে।" এই সম্পর্কের টানাপোড়নের মূল কারণ সম্পর্কের ভিত্তি সম্পর্কে ধারণা না থাকা, কিংবা সেই ভিত্তিকে অস্বীকার করার প্রবণতা। আমাদের বৃহৎ প্রতিবেশি ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্কের ভিত্তি প্রধানত একাত্তর। ভিত্তি যখন একাত্তর হয়, সম্পর্কে তখন নদীর জোয়ার বিরাজ করে। কিন্তু সম্পর্কের ভিত্তিমূল হিসেবে যখন সাতচল্লিশকে আমরা দাঁড় করাই, তখনি ভাটার টানে বৈরিতা বিরাজ করে। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের নানামুখী চরিত্র বিশ্লেষণ, মুক্তিযুদ্ধে ভারতের বহুমাত্রিক সহায়তা, ভারতের জনগণের সম্পৃক্ততা, সম্পৃক্ততার স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াসে আমার অভিসন্দর্ভের কাজ শুরু। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের নানামুখী অবদানের কথা আমরা জানি। ইতিহাসের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে নানা ধরনের ন্যারেটিভ। একাডেমিক গবেষণাও হয়েছে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে ভারতের জনগণের ভূমিকা অবহেলিত থেকে গেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহের সাধারণ জনমানুষের সম্পৃক্ততা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা উপেক্ষিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের অধীনে 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহের সাধারণ মানুষের ভূমিকা' শীর্ষক পিএইচডি গবেষণা যাঁর সুষ্ঠ দিকনির্দেশনা ও অনুপ্রেরণায় এগিয়েছে তিনি আমার তত্ত্বধায়ক অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন। বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে আমার গবেষণার নানা পর্যায়ে অধ্যাপক মামুন সুচিন্তিত মতামত ও সহযোগিতা আমার গবেষণাকে সহজতর করেছে। যখন

প্রয়োজন মনে করেছেন ছুটে গিয়েছেন আমার সাথে মাঠ পর্যায়ের গবেষণায়। মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় তিনি আমাকে ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন। যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন একাত্তরের সম্পৃক্ত মানুষজনের সাথে। সীমান্তবর্তী না হওয়া সত্ত্বেও অধ্যাপক মামুন আমাকে মনিপুর রাজ্যে নিয়ে গিয়েছেন, একাত্তরের তথ্যানুসন্ধানে। তাঁর মতো একজন বড় মাপের গবেষকের সহচার্য, সহযোগিতা আমার জন্য এক অনন্য পাওয়া। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় [মুনতাসীর মামুন সংগ্রহ] একাত্তরের বিপুল সংখ্যক দলিলপত্র, সেই সময় প্রকাশিত বই, পুস্তিকা আমার কাজে সহায়ক হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় ত্রিপুরা, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়ের যেখানেই গিয়েছি, যখনি কেউ শুনেছেন আমি অধ্যাপক মামুনের সাথে কাজ করছি, তখনই তিনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

ত্রিপুরায় প্রথমে আমি মাঠ পর্যায়ের গবেষণার কাজ শুরু করি। আমাকে ত্রিপুরা চিনিয়েছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন। স্যারের সঙ্গী হয়ে বহুবার ত্রিপুরা ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছি। ত্রিপুরার বইয়ের দোকান, লাইব্রেরী, আর্ট গ্যালারি, সিভিল সোসাইটি এই সবকিছুই চিনেছি স্যারের হাত ধরে। স্যারকে অশেষ ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জানাই খ্যাতিমান শিল্পী হাশেম খানকে । কবি তারিক সুজাত, কবি আসাদ মান্নান, সুকান্ত গুপ্ত অলক, ভাস্কর শ্যামল চৌধুরী, আলোকচিত্রী এম.এ তাহের, ফাতেমা মামুন, নাজনীন হক মিমিকেও ধন্যবাদ জানাই। এরা বিভিন্ন সময়ে আমার ত্রিপুরা ভ্রমণের সঙ্গী হয়েছিলেন। ত্রিপুরার সিপিআইএমের মুখপত্র ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গৌতম দাস মাঠ পর্যায়ের গবেষণার পুরো রূপরেখা তৈরী করে দেন। যখন যেখানে গিয়েছি তিনি ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আগরতলার বন্ধুবর শিল্পী পুস্পল দেব ও কবি আকবর আহমেদের সহযোগিতা এ রাজ্যে ভালো কাজ দিয়েছে। বিশেষ করে আমি যে প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে ঘুরে বেড়িয়েছি তার মূল কৃতিত্ব পুস্পলের। তিনি এবং তাঁর বাইক না হলে অনেক কিছুই সম্ভব হত না। আমার গবেষণার কাজে বেশ কয়েকবার ত্রিপুরা গিয়েছি। আমি চেষ্টা করেছি আমাদের মুক্তিসংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত লোকজনকে খুঁজে বের করার। শুধু আগরতলা নয়, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি হাতড়াতে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলে। সেই সোনামুড়া থেকে বিলোনিয়া, ধর্মনগর থেকে সাব্রুমের গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি। কিছুটা হলেও অনুভব করেছি একাত্তরের সেই সব দিনগুলি। মেলাঘরে সহযোগিতা পেয়েছি মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, বিধায়ক শুভল রুদ্রের, বিলোনিয়ায় সহযোগিতা করেছেন বিধায়ক বাসুদেব মজুমদার, রামনগরে সহায়তা করেছেন বিধায়ক সুধন দাস, পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান রত্না দাস। উদয়পুর, বিশালগড়, সাব্রুম ও ধর্মনগরের স্থানীয় লোকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই অকৃত্রিম সহযোগিতার জন্য। আগরতলার সদ্যপ্রয়াত আলোকচিত্র শিল্পী রবীন সেনগুপ্ত,

সাবেক শিক্ষামন্ত্রী অনিল সরকার, সাবেক মন্ত্রী খগেন দাস, ডাক্তার মৃণাল কান্তি ভৌমিক ও নীলমনি দেববমর্ণ এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, আমাদের অকৃত্রিম এসব বন্ধুরা আজ বেঁচে নেই, কিন্তু যে অকৃত্রিম সহায়তা তারা আমাকে করেছে, সেই স্মৃতি কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করছি।

আসামে কাজ করার অভিজ্ঞতা বেশ আনন্দদায়ক। স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার পরিচালক অনন্ত কালিটার সহযোগিতায় গুয়াহাটি ও সংলগ্ন এলাকায় গবেষণা করেছি। তার বদন্যতায় বিনা খরচে স্টেট ব্যাংকের গেস্ট হাউসে থাকা, আহার আমাকে দীর্ঘদিন মাঠে থেকে গবেষণায় সহায়তা করেছে। গুয়াহাটিতে যার সহযোগিতা, পরামর্শ ও সহায়তা সবচেয়ে বেশি পেয়েছি তিনি হচ্ছেন রবীন্দ্র গবেষক অধ্যাপক উষারঞ্জন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন মিশ্র (পরিচালক, হিমালয় গবেষণা কেন্দ্র, নর্থবেঙ্গল বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ) ও অধ্যাপক অমলেন্দু দে, অধ্যাপক কামালুদ্দীন আহমেদ (সদ্য প্রয়াত)। সহযোগিতা করেছেন কটন কলেজের বাংলার অধ্যাপক প্রসূণ বর্মন। বরাক উপত্যকায় আমাকে সার্বক্ষণিক সহচার্য দিয়েছেন পার্থপ্রতীম, মুজিব স্বদেশী, ইমাদ উদ্দীন বুলবুল, নীলোৎপল চৌধুরী, সুবীর কর ও মিলন লস্করসহ আরো অনেকেই, তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষ করে কাছাড় জেলা রেকর্ডরুম ব্যবহারে জেলার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যেভাবে সহায়তা করেছে ভোলার নয়। হাইলাকান্দির মমতাজ আপার সহায়তার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি জেলার নানাজনের সহায়তায় আমার দীর্ঘ তিন বছর ধরে মাঠ পর্যায়ের গবেষণা সম্ভব হয়েছে। একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবিরের প্রতি কৃতজ্ঞ, প্রাথমিকভাবে পশ্চিমবঙ্গে কাদের সাক্ষাৎকার নিতে হবে, তাদের তালিকা তিনি তৈরী করে দিয়েছেন। অধ্যাপক জয়ন্ত কুমার রায় (জাতীয় অধ্যাপক, ভারত), অধ্যাপক স্বপন বসু (প্রাক্তন অধ্যাপক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক কৌশিক বন্দোপাধ্যায় (অধ্যাপক, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি), সাংবাদিক দিলীপ চক্রবর্তী (সম্পাদক, *সপ্তাহ*), শিল্পী সমালোচক প্রণব রঞ্জন রায়, ভাস্কর বিষ্ণু দে, রেডক্রসের সাবেক কর্মকর্তা উৎপলা মিশ্র, অধ্যাপক তানভীর নাসরিন (অধ্যাপক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়), সাংবাদিক সুমন চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যুৎ দেবনাথ, সাংবাদিক মানস ঘোষ ও কবি তরুণ স্যানালের (সদ্য প্রয়াত) প্রতি কৃতজ্ঞ। তাদের নানাবিধ সহযোগিতা, পরামর্শে পশ্চিমবঙ্গে আমার কাজ সহজতর হয়েছে। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে ভারতের সীমান্তবর্তী চারটি রাজ্যে আমি কাজ করেছি। ঘুরে বেরিয়েছি পথে-প্রান্তরে, যখন যেখানে গিয়েছি স্থানীয় মানুষদের আতিথেয়তা, সহযোগিতা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

গবেষণার প্রয়োজনে বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার, আর্কাইভ, রেকর্ড রুম, পত্রিকা অফিস ও রাজনৈতিক দলের কার্যালয় থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর এর আর্কাইভ ও লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমি লাইব্রেরী, কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার, রাজশাহীর হেরিটেজ আর্কাইভ, মুনতাসীর মামুন সংগ্রহ উল্লেখযোগ্য। ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোর জেলায় জেলায় ঘুরেছি মাঠ পর্যায়ের গবেষণায়। সীমান্তবর্তী প্রত্যেকটি জেলার পাবলিক লাইব্রেরী, ডিস্টিক্ট রেকর্ড রুম ব্যবহার করেছি। এই কাজে অনেকের সহায়তা নিয়েছি। সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে কৃতজ্ঞতা জানাই কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান ষ্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, ভুপেশ দত্ত গ্রন্থাগার, ত্রিপুরা স্টেট লাইব্রেরী, মেঘালয় স্টেট লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষকে। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গের *আনন্দবাজার, সপ্তাহ, বসুমতি, গণশক্তি, কালান্তর,* আসামের *যুগশঙ্খ, গতি, সাময়িক প্রসঙ্গ,* ত্রিপুরার *সংবাদ, দেশের কথা*, মেঘালয়ের *শিলং টাইমস* কতৃপক্ষকে, তাদের পত্রিকা আর্কাইভ ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্য।

আমার গবেষণার নানা পর্যায়ে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহকর্মীবৃন্দ, বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনীর সুহৃদবৃন্দ। বিশেষ করে সহকর্মী মুর্শিদা বিনতে রহমান, তপন পালিত, আহম্মেদ শরীফ, মনিরুজ্জামান শাহীন, মিঠুন কুমার সাহা, আজরিন আফরিন, সুস্মিতা দাস, রেহানা পারভীন, কাজল আবদুল্লাহ সবসময় খোঁজ খবর নিয়ে গবেষণার কাজে সাহস যুগিয়েছেন। সহকর্মী মামুন সিদ্দীকী প্রুফ দেখাসহ অভিসন্দর্ভের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন, যার প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা। অভিসন্দর্ভের কিছু অধ্যায় কম্পোজ করে সহায়তা করেছেন আমার ছাত্র মাহফুজ ও সাব্বির। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এই গবেষণায় পিএইচডি বৃত্তি প্রদান করায় কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু আমার দুই অগ্রজ খোরশেদ কাদের চৌধুরী ও মোরশেদ কাদের চৌধুরী। যাঁরা প্রতিনিয়ত আমাকে উৎসাহ ও সাহস দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা আমার সহযাত্রী তাসিফ তানহা চৌধুরীকে। অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, অধ্যাপক মাহবুবর রহমান নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন।

সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

শহীদ কাদের চৌধুরী

সহকারি অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

সারণি তালিকা

১২

মানচিত্র তালিকা

১৩

শব্দ সংক্ষেপ

১৪

সার-সংক্ষেপ

১৫

প্রথম অধ্যায় : উপক্রমণিকা

১. প্রাককথন

২৩

২. গবেষণার বিভিন্ন দিক

২৫

২.১. কেন এই গবেষণা

২৫

২.২. গবেষণার পরিধি

৪৩

২.৩. গবেষণার সীমাবদ্ধতা

৪৪

৩. সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহের ভৌগোলিক পরিচয়

৪৭

৩.১ পশ্চিমবঙ্গ

৫১

৩.২ আসাম

৫৬

৩.৩ ত্রিপুরা

৬৬

৩.৪ মেঘালয়

৭০

৩.৫ মিজোরাম

৭৩

৪. সাধারণ মানুষের সংজ্ঞা

৭৬

৫. উপসংহার

৭৯

তথ্য নির্দেশিকা

৮১

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা

৯২

মুজিবনগর সরকার বা স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনে সহায়তা

৯৪

শরণার্থীদের আশ্রয় ও সহায়তা

১০২

আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টির প্রয়াস

১১১

বঙ্গবন্ধুর মুক্তি

১১৬

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহ

১২০

উপসংহার

১২৬

তথ্য নির্দেশিকা

১২৭

তৃতীয় অধ্যায় : মুক্তিযুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ

১৩৪

পশ্চিমবঙ্গের সাথে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সম্পর্ক

১৩৬

সাধারণের অসাধারণ ভূমিকা

১৩৯

ক. শরণার্থীদের আশ্রয় ও সহায়তা

১৩৯

খ. রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ

১৫৬

গ. আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টির প্রয়াস

১৭৮

ঘ. বঙ্গবন্ধুর মুক্তি

১৮৬

ঙ. মনোবল বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ

১৮৯

চ. মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা ও ত্রাণ

১৯৮

ছ. স্বাস্থ্যসেবা

২০২

মূল্যায়ন

২২৪

তথ্য নির্দেশিকা

২৩২

চতুর্থ অধ্যায় : মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ

২৭৪

ত্রিপুরার সাথে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সম্পর্ক

২৭৪

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ত্রিপুরা

২৭৭

সাধারণের অসাধারণ ভূমিকা

২৮০

শরণার্থীদের আশ্রয় ও সহায়তা

২৮০

রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ

২৯০

আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টির প্রয়াস

২৯৮

মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা ও ত্রাণ

৩০২

স্বাস্থ্যসেবা

৩০৫

মনোবল বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ

৩২৩

মূল্যায়ন

৩২৫

উপসংহার

৩৩৩

তথ্য নির্দেশিকা

৩৩৪

পঞ্চম অধ্যায় : মুক্তিযুদ্ধে আসামের সাধারণ মানুষ

৩৪৯

সাধারণের সম্পৃক্ততা

৩৫০

ক. শরণার্থীদের আশ্রয় ও সহায়তা

৩৫৫

খ. রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ

৩৬১

গ. আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টির প্রয়াস

৩৬৭

ঘ. মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা ও প্রশিক্ষণ

৩৬৯

ঙ. মনোবল বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ

৩৭২

চ. বঙ্গবন্ধুর মুক্তি

৩৮১

ছ. স্বাস্থ্যসেবা

৩৮২

মূল্যায়ন

৩৯১

তথ্য নির্দেশিকা

৪০৩

ষষ্ঠ অধ্যায় : মুক্তিযুদ্ধে মেঘালয়ের সাধারণ মানুষ

৪১০

তথ্য নির্দেশিকা

৪৩২

সপ্তম অধ্যায় : পরিশেষ

৪৩৫

তথ্য নির্দেশিকা

৪৪১

গ্রন্থপঞ্জি

৪৪২

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-এক

৪৭৫

আসামের বরাক উপত্যকার সাধারণ মানুষের সহায়তার একটি তালিকা

পরিশিষ্ট-দুই

৪৮১

মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা প্রাপ্ত ভারতীয়দের তালিকা

পরিশিষ্ট-তিন

৪৮৭

শরণার্থী ও শরণার্থী শিবির সম্পর্কিত কিছু তথ্য

সারণি

সারণি ১: বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে ভারতের সীমান্ত

সারণি ২: সীমান্তবর্তী রাজ্য সমূহের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত

সারণি ৩: সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে একাত্তরে শরণার্থী আশ্রয়

সারণি ৪: রাজ্যভিত্তিক জনসংখ্যা ও আয়তন

সারণি ৫: প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে পাঁচটি বিভাগ ও ২৩টি জেলায় বিভক্ত করা হয়েছে

সারণি ৬: পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জনসংখ্যা ও জনসংখার ঘনত্ব

সারণি ৭: আসামের ২৭টি জেলার জনসংখ্যা ও জনসংখার ঘনত্ব

সারণি ৮: ত্রিপুরার জেলাওয়ারি জনসংখ্যা ও জনসংখার ঘনত্ব, আয়তন

সারণি ৯: মেঘালয়ের জেলাসমূহ

সারণি ১০: মিজোরামের জেলাওয়ারি জনসংখ্যা ও জনসংখার ঘনত্ব, আয়তন

সারণি ১১ : ১৯৭১ সালের ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শরণার্থী শিবিরের সংখ্যা, তাতে আশ্রয় লাভকারী শরণার্থীর সংখ্যা এবং শরণার্থী শিবিরের বাইরে শরণার্থী সংখ্যার চিত্র

সারণি ১২ : এক নজরে ত্রিপুরার শরণার্থী সংখ্যা (৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ইং পর্যন্ত)

সারণি ১৩ : শরণার্থীদের সেবায় ত্রিপুরা রাজ্য সরকার, রেডক্রস, ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন এর সমন্বয়ে যে চিকিৎসা কর্মীরা কর্মরত ছিল তাদের পরিসংখ্যান

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র

মানচিত্র ১: মানচিত্রে ভারতের রাজ্য ও রাজধানী

মানচিত্র ২: পশ্চিমবঙ্গ

মানচিত্র ৩: আসাম

মানচিত্র ৪: ত্রিপুরা

মানচিত্র ৫: মেঘালয়

মানচিত্র ৬: মিজোরাম

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ

MLA: Member of Legislative Assembly

IMA: Indian Medical Association

WHO: World Health Organization

SFI: Students' Federation of India

UNICEF: United Nations Children's Fund

WFP: World Food Programme

IFA: Indian Football Association

DSA: District Sports Association

MCI: Medical Council of India

ABTA: All Bengal Teachers Association

WBCUTA: West Bengal College & University Teachers Association

IRC: International Red Cross

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহের সাধারণ মানুষের ভূমিকা

(পিএইচডি থিসিস: সারমর্ম)

শহীদ কাদের চৌধুরী

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আগস্ট, ২০১৮

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহের সাধারণ মানুষের ভূমিকা

(পিএইচডি থিসিস: সারমর্ম)

'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহের সাধারণ মানুষের ভূমিকা' শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভটি মোট সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোর সম্পৃক্ততায় মুক্তিযুদ্ধ কীভাবে একটি জনযুদ্ধে পরিণত হয়েছিল। রণাঙ্গন কিংবা অবরুদ্ধ বাংলাদেশের বাইরে প্রতিবেশি একটি রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী চারটি রাজ্যে (আসাম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ ও মেঘালয়) মুক্তিযুদ্ধের অভিঘাত এতে উঠে এসেছে। দেশভাগ ও দাঙ্গার তিক্ত স্মৃতির ওপর দাঁড়িয়ে এসব জনপদে বাংলা ও বাঙালির জন্য যে ভালোবাসা, সহমর্মিতার জন্ম হয়েছিল সেই প্রেক্ষাপট দিয়ে অভিসন্দর্ভের শুরু।

প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার উৎস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বিশেষ করে একাত্তরের সাথে নানাভাবে সম্পৃক্ত লোকজনের ভাষ্য, সেই সময় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা, লিফলেট, পোস্টার, সহায়ক সমিতি ও দেশি-বিদেশি সাহায্য সংস্থাগুলোর দলিল-দস্তাবেজের উপর ভিত্তি করে আমার অভিসন্দর্ভ রচনা। সেই উৎস সমূহের বিস্তারিত বর্ণনা, মূল্যায়ন, গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য গবেষণা ও প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মূল্যায়ন প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। ভারতের সাথে বাংলাদেশের পাঁচটি সীমান্তরাজ্য (আসাম,

Dhaka University Institutional Repository

ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, মিজোরাম ও মেঘালয়) রয়েছে। একাত্তরে মিজোরাম ব্যাতীত বাকী চারটি রাজ্য সরাসরি সম্পৃক্ত হয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে। প্রথম অধ্যায়ে সীমান্তবর্তী রাজ্যেগুলোর ভৌগলিক বিবরণ, জনসংখ্যা ও অন্যান্য বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছি 'সাধারণ মানুষ' বলতে গবেষণায় কোন শ্রেনী, পেশার মানুষের ইতিহাস উঠে এসেছে সেটিও। গবেষণার সীমাবদ্ধতা, প্রতিবন্ধকতা আলোচিত হয়েছে সংক্ষিপ্ত আকারে।

প্রান্তিক কণ্ঠস্বরকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের মূলস্রোতে তুলে আনার চেষ্টা করেছি গবেষণায়। যা নিচের দিক থেকে ইতিহাসকে দেখবার ইঙ্গিত বহন করে, ওপরের দিক থেকে নয়। বলা যায় অনেকটা সাব-অলটার্ন ইতিহাস চর্চা। সাধারণের ইতিহাস উপেক্ষিত মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক ইতিহাস চর্চায়। বাচনিক ইতিহাসের অবলম্বন করে সাধারণের সম্পৃক্ততার উপেক্ষিত সেই ইতিহাস লেখার উদ্যেগ এটি। তুলে ধরা হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সিভিল সোসাইটির ভূমিকা।

একাত্তরে শুধুমাত্র প্রতিবেশি হিসেবে নয়, ভারত অন্যতম সহযাত্রী হয়ে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। এক কোটি বিপন্ন মানুষকে আশ্রয় প্রদান খুব সহজ কোন বিষয় ছিল না। একাত্তরে সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশের পক্ষে যে বিশাল আন্তর্জাতিক জনমত তার ক্ষেত্রও ভারত তৈরি করেছিল। রণাঙ্গনে যুদ্ধ পরিচালনা, রণকৌশল প্রণয়ন, গেরিলা যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ সবাকছু মিলিয়ে মুক্তিসংগ্রামের সামরিক দায়িত্বটা পালন করেছিল ভারত। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন, ইন্দিরা গান্ধীর কূটনৈতিক লড়াই একাত্তরে আমাদের স্বাধীনতার পথ সুগম করেছিল। দক্ষ হাতে সামাল দিয়েছিল শরণার্থী সমস্যা।

বাংলাদেশের নির্বাসিত সরকার এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যেমন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, মুক্তিবাহিনী ইত্যাদি গড়ে তুলতে ভারত ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছিল। আওয়ামী লীগের নেতাদের নিয়ে বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রবাসী সরকার গঠন করা হয়। ভারত বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে। বঙ্গবন্ধুর মুক্তিতে পালন করে মূল প্রভাবকের ভূমিকা। শেষ পর্যন্ত সরাসরি সম্পৃক্ত হয় রণাঙ্গনে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধে ভারতের এই সামগ্রিক ভূমিকার একটি চিত্র তুলে ধরেছি। ভারতের বহুমাত্রিক সে ভূমিকাগুলো পাঁচটি ভাগে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ক. মুজিব নগর সরকার বা স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনে সহায়তা

খ. শরণার্থীদের আশ্রয় ও সহায়তা

গ. আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টির প্রয়াস

ঘ. শেখ মুজিবের মুক্তি

ঙ. মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহ

তৃতীয় অধ্যায় থেকে মূলত রাজ্যভিত্তিক সাধারণ মানুষের অবদান আলোচনা করেছি। তৃতীয় অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের ভূমিকা। একাত্তরে ইতিহাসের সেই অগ্নিপরিক্ষায় ভারতের সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গের সম্পৃক্ততা ছিল সবচেয়ে বেশি। পুরো পশ্চিমবঙ্গ একাত্তরে উত্তাল হয়েছিল পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনীর নারকীয় গণহত্যায়। পূর্ববঙ্গ তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাথে ভারতের সীমান্তরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের রয়েছে ঐতিহাসিক সম্পর্ক ও হৃদ্যতা। একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল জনসাধারণ সেই হৃদ্যতা আর ভালোবাসার এক অনন্য বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল। নদীয়া, ২৪ পরগনা, পশ্চিম দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদা, জলপাইগুড়ির মতো সীমান্ত জেলাগুলো একাত্তরে বিপুল শরণার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিল তাদের দ্বার। একাত্তরে পূর্ববঙ্গের সেই উত্তাল সময়ের ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছিল সহোদর পশ্চিমবঙ্গে। সেই ঢেউয়ে উদ্বেলিত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের নানা শ্রেণী পেশার মানুষ। শ্রমিক থেকে বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক রাজনীতিবিদ। একাত্ম হয়েছিল পূর্ববঙ্গের সমর্থনে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ রাস্তায় নেমে আসল ভিন্ন এক দেশে গণহত্যার প্রতিবাদে, ভিন্ন এক দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমর্থনে।

বাংলাদেশের সাথে পশ্চিমবঙ্গ ভৌগলিকভাবে সম্পৃক্ত। পশ্চিমবঙ্গের সাথে বাংলাদেশের ২২১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত। সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোসহ পুরো পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মুখের ভাষা বাংলা। পূর্ববঙ্গের সাথে রয়েছে শেকড়ের টান, দীর্ঘদিন একই সাথে থাকার স্মৃতি। সবকিছু মিলিয়ে একাত্তরে পূর্ববঙ্গের মানুষের কাছে পশ্চিমবঙ্গই ছিল বড় ভরসা।

একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গে সরকারিভাবে স্থাপিত ৪৯২টি ক্যাম্পে ৪৮,৪৯,৭৮৬ জন তালিকাভূক্ত শরণার্থীর পাশাপাশি প্রায় ২৩,৮৬,১৩০ জন শরণার্থী বিভিন্ন মানুষজনের গৃহে আশ্রয় নেন। শুরুর দিকে হরতাল, ধর্মঘট, মিছিল ও মিটিংয়ে বিপুল এই শরণার্থীর আশ্রয়ের ক্ষেত্রটি তৈরী করেছিল পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল জনতা। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে বাধ্য করেছিল পূর্ববঙ্গের পাশে দাড়াঁনোর জন্য। 'এপার বাংলা ওপার জয় বাংলা, জয় বাংলা' ধ্বনিতে মুখরিত হয়েছিল বনগাঁ থেকে কলকাতা, কৃষ্ণনগর, মুর্শিদাবাদের অলিগলি। মিছিল, সমাবেশ, বনধ আর অনশনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ও ভারতের ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার একাত্ম হয়েছিল বাংলাদেশের সহায়তায়। বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্ন, মুজিবের মুক্তি, আন্তর্জাতিক জনমত তৈরীর পাশাপাশি রণাঙ্গনে পাকিস্তানকে প্রতিরোধ, অস্ত্র ও সামরিক

Dhaka University Institutional Repository

সহায়তা পুরো প্রক্রিয়াটির সাথে জড়িয়ে পড়েছিল পশ্চিমবঙ্গ। আরো স্পষ্ট করে বললে, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ। একাত্তরে দুই বাংলার সীমারেখা বিলীন হয়েছিল সহায়তা ও মানবিকতার স্পর্শে।

সাধারণ মানুষদের এই সহায়তা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এই অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে সেই ভূমিকার আদ্যপান্ত। সাতটি আলাদা ভাগে আলোচনা করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূলের ভূমিকা।

ক. শরণার্থীদের আশ্রয় ও সহায়তা

খ. রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ

গ. আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টির প্রয়াস

ঘ. বঙ্গবন্ধুর মুক্তি

ঙ. মনোবল বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ

চ. মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা

ছ. স্বাস্থ্যসেবা

চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে আরেক প্রতিবেশি ত্রিপুরার সাধারণের ভূমিকার বিবরণ। একাত্তরে ত্রিপুরা ভারতের সবচেয়ে অনুন্নত রাজ্যগুলোর একটি। ভারতের একদম প্রান্তসীমায় অবস্থান ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে ত্রিপুরা অনেকটা বিচ্ছিন্ন মূল ভারত থেকে। তবে এই বিচ্ছিন্ন ত্রিপুরায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল বাঙালিরা, যাদের অধিকাংশই দেশভাগের আগে-পরে ত্রিপুরায় স্থায়ী হয়েছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সবচেয়ে বেশি অভিঘাত হেনেছে এই সীমান্তবর্তী ত্রিপুরার ওপর। ১৯৭১ সালে ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যা ছিল ১৫,৫৬,৮৮২ জন। আর এই রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিল তার প্রায় সমান সংখ্যক শরণার্থী। ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর *দৈনিক সংবাদে* প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীর সংখ্যা ১৪,১৫,৬১১ জন।

মুজিবনগরে শপথ নেওয়া বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পণা, রূপরেখা সবকিছুর সাথেই জড়িত ছিল আগরতলা। জড়িত ছিল একাত্তরের অধিকাংশ রণ পরিকল্পণার সাথে। পদ্মা, গোমতী, তিতাস ও ব্রক্ষ্মপুত্র নামে চারটি মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে ওঠেছিল ত্রিপুরার হাপানিয়ায়। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের চারটি সেক্টর ও ছোট বড় অনেকগুলো ক্যাম্প গড়ে ওঠেছিল ত্রিপুরায়। বলা যেতে পারে আগরতলা আমাদের মুক্তিসংগ্রামের সামরিক রাজধানী। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পাশাপাশি সাধারণ জনগণও একাত্তরে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে। শরণার্থী সেবা, আশ্রয় প্রদান, চাঁদা সংগ্রহ, প্রতিবাদ সমাবেশ,

Dhaka University Institutional Repository

বনধ, সহায়ক সমিতি গঠন, মুক্তিফৌজের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি নানাধিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে ত্রিপুরার সাধারণ জনগণ সম্পৃক্ত হয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে। পশ্চিমবঙ্গের মতো চতুর্থ অধ্যায়ে ত্রিপুরার সাধারণের ভূমিকাকেও সাতটি ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

এছাড়া এই অধ্যায়ের সূচনায় ত্রিপুরার সাথে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সম্পর্ক, একাত্তরে সেই সম্পর্কের প্রভাবিত আলোচিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরাবাসী এগিয়ে এসেছিল বিপুলভাবে। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ভূমিকা ছিল বহুমুখী। ত্রিপুরার জাতি-উপজাতি-সংখ্যালঘু নির্বিশেষে মুক্তিসংগ্রামীদের পাশে সকল অংশের মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হেঁটেছেন একাত্তরের অস্থির টালমাটাল দিনগুলিতে। কে ভূমিপুত্র, কে বহিরাগত, এসব বিতর্ক মনেই আসেনি সে সময়। সাধারণ মানুষ, বুদ্ধিজীবি, শিল্পী-সাহিত্যিক একাত্তরে রাস্তায় নেমেছিল বাংলাদেশের পক্ষে।

পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে আসামের সাধারণের ভূমিকা। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী আসামের করিমগঞ্জ হয়ে একাত্তরে তিন লক্ষ উদ্বাস্তু আশ্রয় খুঁজে নিয়েছিল বরাক উপত্যকায়। সবচেয়ে বেশি শরণার্থী আশ্রয় পেয়েছিল সীমান্তবর্তী করিমগঞ্জে। জনসংখ্যার বেশি শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে করিমগঞ্জসহ সমগ্র বরাক উপত্যাকা একাত্তরে মানবিকতা ও সহমর্মিতার এক অনবদ্য ইতিহাসের জন্ম দিয়েছিল। বিপুল শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়ার পাশাপাশি রণাঙ্গনের গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্টিং বেস হিসেবে কাজ করেছিল ভারতের এই প্রান্তিক জনপদটি। রাতের পর রাত গুলির শব্দ, মর্টার শেলের আওয়াজ, ব্ল্যাক আউট, ট্রেঞ্চবাস-প্রকৃতঅর্থে বরাকের মানুষ সেদিন জ্বালামুখীর ওপরেই বসে ছিলেন। কিন্তু তারা এই শহর ছেড়ে পালিয়ে যাননি। বরঞ্চ বিভিন্নভাবে অকুতোভয় বরাকবাসীরা এই মুক্তিসংগ্রামে যুক্ত হয়েছিলেন। অজানা, অচেনা অসংখ্য সাধারণ মানুষ সেদিন একাত্ম হয়েছিলেন জয় বাংলার টানে।

বরাক উপত্যকার পাশাপাশি আন্দোলিত হয়েছিল আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাও। ভারতের সীমান্তবর্তী এই জনপদে একাত্তর আঘাত হেনেছিল ভিন্ন এক আবেগে। পরিণত হয়েছিল জনযুদ্ধের অন্যতম এক রণাঙ্গনে। সেই জনযুদ্ধে প্রত্যেকেই শরিক হয়েছিল যার যার অবাস্থান থেকে। ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকেল স্টাফ, মেডিকেল- নার্সিং কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা স্বাস্থ্যসেবায়, তরুণ সম্প্রদায় মিছিল মিটিং ও ত্রাণে, রাজনৈতিক কর্মীরা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে, প্রশাসন, রাজনৈতিক, সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনগুলোসহ সমগ্র আসাম একাত্ব হয়েছিল জয় বাংলার স্বাধীনতার সংগ্রামে। মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও বরাক উপত্যকার সিভিল সোসাইটির অন্যতম প্রতিনিধি

অতীন দাশ বলেছিলেন, "এই এক অন্য রকম টান, বরাকের ইতিহাসে এই একাত্ম, এই জোয়ার আর কখনো দেখা যায়নি।"

তবে শরণার্থী প্রবাহের প্রায় পুরোটাই হয়েছে বরাক উপত্যকা হয়ে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার খুব বেশি ভূমিকা কিংবা সম্পৃক্ততা ছিল না। তাই এই অধ্যায়ে বরাকের (শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি) তৃণমূলের সহযোগিতা-সহমর্মিতা স্থান পেয়েছে। সাধারণের মানুষদের ভূমিকা ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের মতো সাতটি ভাগে এ অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে।

একাত্তরে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিশস্ত ও অকৃত্রিম বন্ধুতে পরিণত হয়েছিল মেঘালয়। একদিকে আশ্রয় দিয়েছে বিপুল শরণার্থীকে, অন্যদিকে একাত্তরের মেঘালয় পরিণত হয়েছিল মুক্তিফৌজের প্রশিক্ষণের অন্যতম কেন্দ্রে। সীমান্তবর্তী এই মনোরম রাজ্যটি বহুমুখী সম্পৃক্ততায় একাত্তরে বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। সীমান্তবর্তী অন্য রাজ্যগুলোর মতো মেঘালয়ের সাধারণ নাগরিকরাও সম্পৃক্ত হয়েছিল এই প্রক্রিয়ায়। একাত্তরে বৃহত্তর সিলেট ও ময়মনসিংহের উত্তর দিকের মানুষ জীবন বাঁচাতে আশ্রয় নেন মেঘালয়ের পাহাড়গুলোতে। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে গড়ে ওঠে শরণার্থী ক্যাম্প। বাংলাদেশকে ঘিরে রাখা ভারতের অন্য প্রদেশ গুলো থেকে কিছুটা ভিন্ন মেঘালয়। এটা খাসিয়াদের রাজ্য, যার সঙ্গে বাঙালিদের ভাষা ও আচরণগত ফারাক অনেক। এরপরও উদ্বাস্তু শরণার্থীদের জন্য সহমর্মিতার হাত বাড়িয়েছিল স্থানীয় খাসিয়ারা। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা কিংবা আসামের বরাক উপত্যকায় নাগরিক সহায়তার প্রকৃতি বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাঙালি হওয়ার কারণে শরণার্থীরা সাধারণের সহমর্মিতা পাচ্ছে। মুখের ভাষা ও পূর্ববঙ্গের স্মৃতিতে মানুষ উদ্বেলিত হচ্ছে, কিন্তু মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় আমার সেই সাধারণীকরণের সরল সমীকরণে বাধা হয়ে দাঁড়ায় মেঘালয়। মেঘালয়ের বাঙালিরা, যারা মূলত সাতচল্লিশের দেশভাগের পর সিলেট থেকে মেঘালয়ে এসেছে তারা যেমন শরণার্থীদের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে, অনুরুপভাবে স্থানীয় বিপুল সংখ্যক আবাঙালিরাও হাত বাড়িয়ে ছিল সহমর্মিতার।

মেঘালয়ের বালাট ও ডাউকি একাত্তরে পরিণত হয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একটি অন্যতম কেন্দ্রে। এই দুটি সীমান্ত দিয়ে হাজার হাজার শরণার্থী প্রবেশ করেছিল এপ্রিলের শুরু থেকে। একাত্তরে বাংলাদেশের সমর্থনে মিছিল, মিটিংয়ে মুখর ছিল মেঘালয়। বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবিতে, শরণার্থীদের সহায়তায় শিলং, ডাউকি, বালাটে পালন করা হয়েছে বনধ, অবরোধ, অনশন। মেঘালয়ের সাধারণ মানুষদের মুক্তিযুদ্ধে বহুমূখী ভূমিকার আদ্যপান্ত বর্ণিত হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়ে অভিসন্দর্ভের সমাপ্তি টানা হয়েছে। এ অধ্যায়ে চেষ্টা করেছি একটি তাত্ত্বিক ফ্রেমওয়ার্ক তৈরির। সাধারণের ভূমিকার কারণ অনুসন্ধানের।

একাত্তরে ভারতের সহায়তার দুটি বড় ধারা লক্ষণীয়। একটি হচ্ছে এলিট ইতিহাসের ধারা। অপরটি হচ্ছে নন-এলিট ইতিহাসের ধারা। স্পষ্টভাবে বলা যায়, এলিট ইতিহাসের ধারাটি নিয়ন্ত্রণ করেছে রাষ্ট্র। আর নন-এলিট ইতিহাসকে অগ্রসরমান করেছে সাধারণ মানুষ।

একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম প্রতিবেশি ভারতের ৪ টি সীমান্ত রাজ্যে (পশ্চিবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও মেঘালয়) একটি বহুত্ববাদী চরিত্র ধারণ করেছিল। এই বহুত্ববাদী চরিত্রের কারণে অবরুদ্ধ বাংলাদেশের ন্যায় সীমান্তবর্তী এই রাজ্যেগুলোতেও মুক্তিযুদ্ধ জনযুদ্ধের রূপ নিয়েছিল। কিন্তু জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের আধিপত্যের দাপটে একাত্তরে ভারতের সহায়তা উচ্চকোটির সম্পদে পরিণত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদানের কথা বলতে গেলে রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল, প্রশাসন, শাসক কিংবা সমষ্টিগতভাবে শাসকগোষ্ঠীর অবদানের মধ্যে আমরা সীমাবদ্ধ করে ফেলি। প্রান্তজনের স্বর, প্রান্তজনের চেতনা মুক্তিযুদ্ধের এই ইতিহাসিক বয়ানে একবারেই অনুপস্থিত। অথচ সীমান্তরাজ্যেগুলোর পথে-প্রান্তরে ঘুরে, প্রচলিত ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে, সমসাময়িক দলিল-পত্রের নিরিখে আমার অভিসন্দর্ভে তুলে ধরেছি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে সাধারণ মানুষের ভালোবাসায় পূর্ণতা পেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ এসব রাজ্যগুলোর জনগণের ইতিহাস। কিন্তু বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের চাপে জনগণের এই ইতিহাস, প্রান্তজনের এই চেতনা, প্রান্তজনের অংশীদারিত্ব অনালোচিত থেকেছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে।

মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় মুর্শিদাবাদের লালগোলা, জলাঙ্গী, কাহাঁড়পাড়া, বনগাঁ, নদীয়া থেকে শুরু করে কাঁটাতার ধরে ইতিহাসকে খুঁজে বের করা চেষ্টা করেছি। সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়ের সীমান্তবর্তী এলাকা, একাত্তরের শরণার্থী উপদ্রুত এলাকাগুলো ঘুরে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। খুঁজে পেয়েছি নন-এলিট ইতিহাসের সূত্র। একাত্তর সীমান্তরাজ্যেগুলোর সাধারণ মানুষের অসাধারণ সহমর্মিতা আর সহযোগিতা আখ্যান।

চারটি রাজ্যের সাড়ে ছয়কোটি তৃণমূলের চাপ সামলানোর সক্ষমতা তখন ক্ষমতাসীন ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের ছিল না। ক্ষমতাসীন ইন্দিরা গান্ধী ও কংগ্রেস সেই সময়টাকে ধরতে পেরেছিলেন। তৃণমূলের চাপে বাধ্য হয়ে বাংলদেশের পক্ষে চালাতে শুরু করলেন আন্তর্জাতিক প্রচারণা। বর্হিবিশ্বে তুলে ধরণের নিজের চাপের কথা। অন্তিমে জনগণের দাবির প্রতি একাত্মতা জানিয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ করলেন বাংলাদেশের রণাঙ্গনে, বাংলাদেশকে দিলেন স্বীকৃতি। অভিসন্দর্ভে মাঠ পযার্য়ের

গবেষণায়, প্রাপ্ত প্রাথমিক উৎসগুলোর ভিত্তিতে স্পষ্ট করতে চেয়েছি একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ও মেঘালয়ের সাধারণ জনগণ ভারত সরকারকে বাংলাদেশ ইস্যুতে হস্তক্ষেপে বাধ্য করেছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে ভারত যে নানা ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের ভূমিকার বিষয়টি আবর্তিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত শরণার্থী সমস্যা, আন্তর্জাতিক জনমত, মুজিবের বিচার, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান কিংবা রণাঙ্গনে সহায়তা এই সব ক্ষেত্রেই ভারত সরকারের অবস্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিচুতলার একটি চাপ ছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিচুতলার স্তরে যে ঐক্যের মনোভাব গড়ে উঠেছিল তা বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারত সরকারের অবস্থান গ্রহণের ক্ষেত্রে একটা নির্ণায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল।

রাষ্ট্রের ইতিহাস এবং জনগণের ইতিহাস একাত্তরে ভিন্ন ছিল। একটি বৃহৎ প্রতিবেশি রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের বহুবিধ সমীকরণ একাত্তরে কাজ করেছিল। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে সম্পৃক্ত হওয়ার পেছনে ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস, নানাবিধ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়, স্নায়ুদ্ধকালীন বৈশ্বিক রাজনীতি বিবিধ বিষয় নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, হচ্ছে কিংবা ভবিষ্যৎ সময় নির্ধারিত হবে ইতিহাসের সেই গতিপথ। আমার অভিসন্দর্ভ সেই বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন ভারতের বাংলাদেশ সীমান্তের চারটি রাজ্যের নাগরিকদের ইতিহাস, জনমানুষের ইতিহাস। একাত্তর এসব রাজ্যের ভিন্ন এক আবেগ, অপ্রতিরোধ্য ভালোবাসার এক মানবিক ইতিহাস। যে মানবিক ইতিহাস একাত্তরে প্রায় এক কোটি উদ্বাস্তু আশ্রয় পেয়েছিল আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও পশ্চিমবঙ্গে। অন্যদিকে এরাই আবার ত্রাণ সরবরাহ করেছে অবরুদ্ধ বাংলাদেশের রণাঙ্গনের যোদ্ধাদের জন্য, মিছিল, মিটিং, বনধ, অনশন আর প্রতিবাদের উচ্চকিত সুরে এসব রাজ্যের রাজ্য সরকার ও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়েছে শরণার্থীদের সহায়তায়, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে। একাত্তরে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের সমর্থনে যে বিপুল আন্তর্জাতিক জনমত সেটার ক্ষেত্র তৈরী করেছিল এই চারটি রাজ্যের সাধারণ জনগণ। সবকিছু মিলিয়ে সীমান্ত রাজ্যগুলোর সাধারণ জনগণ একাত্ব হয়ে বাঙালাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছিল। এই পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রটি সুস্পষ্ট ভাবে তৈরী করেছিল মানবিকতা। পাশাপাশি বাঙালিত্বের টান, মুখের ভাষা, দীর্ঘ দিন একসাথে থাকার স্মৃতি, দেশভাগ, ধর্মসহ নানাবিধ উপাদান মিলে মিশে একাকার হয়েছিল এসব জনপদে। ভিন্ন দেশের এক মুক্তিযুদ্ধে এসব জনপদের সাড়ে ছয়কোটি তৃণমূল জনগণ আশ্রয়, ভালোবাসা আর সহায়তার এক অনন্য মানবিকতায় স্বপ্ন সারথি হয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে।

প্রথম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

উপক্রমণিকা

১. প্রাককথন

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস কেবল বুলেটে আর বারুদে লেখা হয় নি, একাত্তর কেবল রক্ত আর অশ্রুর গল্প নয়। মুক্তিযুদ্ধ মানবিকতা, সহমর্মিতা আর ভালোবাসার কারুকাজে এক জনযুদ্ধ। সেই যুদ্ধ ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহের (পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয়) নানাবিধ সম্পৃক্ততায় সিক্ত। মুক্তিযুদ্ধে সীমান্তবর্তী এই চারটি রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিল প্রায় এক কোটি শরণার্থী। সেই এক অন্যরকম সময়। একদিকে অবরুদ্ধ বাংলাদেশে যুদ্ধ, হত্যা, নির্যাতন, সীমান্তজুড়ে শরণার্থীর ঢল। অন্যদিকে সীমান্তপাড়ের রাজ্যগুলোর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পাশাপাশি রাজ্যের সাধারণ জনগণের আবেগ আর সহমর্মিতা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভারতের সীমান্তরাজ্যগুলোর সাধারণের কাছে পরিণত হয়েছিল একটি জনযুদ্ধে। শরণার্থী সেবা, আশ্রয় প্রদান, চাঁদা সংগ্রহ, প্রতিবাদ সমাবেশ, বন্‌ধ, সহায়ক সমিতি গঠন, মুক্তিফৌজের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি নানাধিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে সাধারণ জনগণ পরিণত হয়েছিল সেই জনযুদ্ধের একজন যোদ্ধায়।

সাধারণের সম্পৃক্ততায় বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম সীমান্তবর্তী এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এসে পেয়েছিল ভিন্ন মাত্রা। এসব রাজ্যের অষ্টপ্রহর কোলাহল মুখর ছিল বাঙালির অধিকার আদায়ের দাবিতে। 'এপার বাংলা ওপার বাংলা, জয় বাংলা জয় বাংলা' কিংবা 'হিন্দু মুসলিম জানি না, বাঙালি ছাড়া মানি না' এই ধরনের হাজারো স্লোগানে উত্তাল হয়েছিল সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলো। এই এক অন্য ধরনের আবেগ, অন্য ধরনের টান। একজন সাংবাদিক লিখেছেন, এখানে একাত্তরে ফেলে আসা দেশের টানে ঝড় ওঠেছিল।[১]

এসব রাজ্যের অধিকাংশ লোকের শেকড় পূর্ববঙ্গে। ভাষা, চেহারা ও জাতিগত সাদৃশ্য কিংবা নিরেট মানবিকতা অভিঘাত হেনেছিল সাধারণ মানুষের আবেগে। নিজের সর্বোচ্চটুকু নিয়েই পাশে দাঁড়িয়েছিল শরণার্থী সেবায়। এমন কোন পরিবার এসব রাজ্যে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, একাত্তরে যার বাড়িতে কেউ আশ্রয় নেয়নি। অসীম মমতা দিয়ে সেই চরম দুর্দিনে স্নেহ-ভালবাসার এক অকৃত্রিম বন্ধন গড়ে তুলেছিল তৃণমূল জনতা। ভৌগোলিক দুর্গমতা, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, পরিকাঠামোগত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস এক হয়ে কাজ করেছেন বাংলা ও বাঙালির জন্য।[২]

দেশভাগ, পূর্ববঙ্গ ছেড়ে যাওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা, দাঙ্গার রক্তের দাগ তখনো শুকায়নি। কিন্তু জন্মভূমির প্রতি একটি অকৃত্রিম টান অধিকাংশ বাঙালিকে আকুল করেছিল। কিন্তু কেন? একাত্তরে ভিন্ন দেশের

সাধারণ এসব নাগরিকদের সহমর্মিতা, ভালোবাসার কারণ অনুসন্ধানে প্রায় পাঁচ বছর ধরে সেই সব এলাকাগুলোতে অবস্থান করে, তাদের সাথে মিশে আমি অনুধাবনের চেষ্টা করেছি সেই কেন প্রশ্নের উত্তর।[৩] মৈত্রেয়ী দেবী অকপটে স্বীকার করেছেন সেই কেন এর উত্তর। ‘সীমান্তে কেন যেতাম? কোন অদৃশ্য শক্তি যেন আমাকে টানত’।[৪]

এই অদৃশ্য শক্তির স্বরুপ অনুসন্ধানে পশ্চিমবঙ্গের বালুরঘাট থেকে বসিরহাট, বনগাঁ, নদীয়া, জলপাইগুড়ি, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, ত্রিপুরার সাব্রুম থেকে ধর্মনগর, আসামের বরাক উপত্যাকা, বক্ষপুত্র উপত্যাকা, মেঘালয়ের শিলং, তুরা, বালাট ঘুরে প্রায় পাঁচশতাধিক সাধারণ মানুষের সাক্ষাৎকার আমি গ্রহণ করি।[৫]

স্মৃতির উপর ভর করে, সামনে এগুতো চেয়েছি। স্মৃতি নির্ভর সাক্ষাৎকারগুলো থেকে ইতিহাস বিনির্মাণের চেষ্টা করেছি। সেই স্মৃতিতে এক তীব্র আবেগপূর্ণ ভালোবাসায় একাত্তরে সীমান্তরাজ্যগুলোতে প্রায় এক কোটি শরণার্থীর আশ্রয় উঠে এসেছে। কলেরার মতো মহামারিতে শত শত শরণার্থী আক্রান্ত হচ্ছে। লাশের পর লাশ। জয় বাংলায় (চোখ ওঠা রোগ) পুরো পশ্চিমবঙ্গ বিপর্যস্ত। এতো বেশি লাশ, সাংবাদিক জন সার লিখেছেন, “ঝাঁকে ঝাঁকে শকুন নেমে এসেছে। তীক্ষ্ণ ঠোঁট দিয়ে ছিড়ে খুড়ে খাচ্ছে মরা মানুষের দেহ। তাদের চোখ চক চক করছে। কিন্তু মৃত মানুষের সংখ্যা এত বেশি যে শকুন খেয়ে শেষ করতে পারছে না। শকুনদেরও খাওয়ায় অরুচি এসে গেছে।”[৬]

কিন্তু এসব এলাকার সাধারণ মানুষের অরুচি ধরেনি। মহামারি জানার পরেও শরণার্থীদের সেবা প্রদানের জন্য, কলেরার টিকা দিতে ক্যাম্প থেকে ক্যাম্পে ঘুরে বেরিয়েছে শত শত স্বাস্থ্যকর্মী, স্বেচ্ছাসেবক। জয় বাংলা রোগে বিপর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গের জনজীবন। কিন্তু সেটাকে উপেক্ষা করে সন্ধ্যায় ধর্মতলায় ছাত্র-জনতার ‘জয় বাংলা’, ‘জয় মুজিবর’ স্লোগানে উদ্দীপিত হয়েছিল একাত্তরের পশ্চিমবঙ্গ। নিজ জনসংখ্যার সমান উদ্বাস্তুকে আশ্রয় দিয়েছে ত্রিপুরা। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় প্রায় ১৩ লক্ষ শরণার্থী এসেছে। জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল সাড়ে ১৮ লক্ষ। চব্বিশ পরগণার বসিরহাট শহরে যেখানে মোট জনসংখ্যা ৬৩ হাজার, সেখানে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার শরণার্থী এসেছেন, বনগাঁ শহরে যেখানে জনসংখ্যা ৫১ হাজার সেখানে ২ লক্ষ ৭৪ হাজার শরণার্থী এসেছেন। নদীয়া জেলায় প্রায় তিন লক্ষ শরণার্থী এসেছেন। কোচবিহার জেলায় প্রায় ২ লক্ষ ২০ হাজার শরণার্থী আশ্রয় পেয়েছেন সাধারণের ভালোবাসায়।[৭]

আসামের বরাকে উপত্যাকার সীমান্তবর্তী করিমঞ্জে আশ্রয় নিয়েছিলেন লক্ষাধিক শরণার্থী। মেঘালয়ের বালাট ও তুরা পরিণত হয়েছিল শরণার্থীদের শহরে। আশ্রয় দিতে গিয়ে একসময় বিপন্ন হয়েছে এসব অঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা, স্বাভাবিক জীবন যাপন। সাধারণ মানুষ সেই বিপন্নতার মধ্যে থেকেও সর্বোচ্চ

সহায়তা নিয়ে পাশে ছিল শরণার্থীদের। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ জুতা সেলাইয়ের মুচিরা পর্যন্ত একাত্তরে একদিনের উপার্জিত অর্থ শরণার্থীদের জন্য দান করেন।[৮] নদীয়ার স্কুল ছাত্ররা টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে শরণার্থী শিশুদের জন্য গুড়োঁ দুধ কিনে দেয়।

একাত্তর, সীমান্ত এলাকার সাধারণ মানুষের এই ধরনের হাজারো অভিজ্ঞতার সমষ্টি।[৯] একটি মানবিক ভারতের ইতিহাস। মুচি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পুরানো কাপড়, নগদ অর্থ, ঔষধ, শীতের কম্বল, টর্চলাইট নিত্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যাদি নিয়ে হাজির হয়েছিল শরণার্থীদের পাশে, মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে। সেই আবেগের অভিঘাত কম বেশি সবাইকে আক্রান্ত করেছিল। এসব অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জনমতও আন্দোলিত হয়েছিল একাত্তরে। শরণার্থীদের সহায়তায় শিল্পী, সাহিত্যিক, নাট্যকর্মী থেকে শুরু করে পুরো সাংস্কৃতিক অঙ্গন, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক থেকে শুরু করে গৃহস্থ বধু নেমেছিলেন রাজপথে। আশ্রয়, সেবা, সহায়তা আর মানবিকতায় এক অপ্রতিরোধ্য ইতিহাসের জন্ম দিয়েছিল উত্তর-পূর্ব ভারতের তৃণমূল জনতা।

সীমান্তপাড়ের একজন প্রান্তিক মানুষ কীভাবে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে 'মিথস্ক্রিয়ায়' পরিণত হয়ে ওঠেন, তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এই অভিসন্দর্ভে। প্রান্তিক ও সাধারণের হৃদয়ের কথামালার ভাষ্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। গবেষণার ধরাবাঁধা ছকে সাধারণের সংগ্রামের সেইসব সময়কে আমি বন্দি করিনি। ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের তত্ত্বকথার বাইরে সাধারণের এই অসাধারণ সহমর্মিতার ইতিহাসকে অনেকটা গল্পের আদলে তুলে ধরতে চেয়েছি। কাঠামোবদ্ধ কোন উপপাদ্যকে দাঁড় করিয়ে, তা প্রমাণের চেষ্টায় তথ্য সংগ্রহ না করে সংগৃহীত প্রান্তিক জনজীবনের সেই তথ্য থেকে একটি নতুন উপপাদ্য নির্মাণ করতে চেয়েছি।

যে উপপাদ্য দেখা যায় পূর্ববঙ্গে ছেড়ে আসা ভিটে, অতীত স্মৃতির ছায়াপথ ধরে একাত্তর এক স্বপ্ন-কল্পনার সারথী হয়েছিল। আশ্রয়হীন আর আশ্রয়দাতাদের মুখের ভাষা রচনা করেছিল মিলনের নতুন ইতিহাস। ধর্ম, মানবিকতা, ভূগোল আর ইতিহাস মিলে একাকার করেছিল 'জয় বাংলার সংগ্রাম'।

২. গবেষণার বিভিন্ন দিক

২.১ কেন এই গবেষণা-

সাধারণ দৃষ্টিতে গবেষণার বিষয়বস্তু দেখলে মনে হয়, মুক্তিসংগ্রামে ভারতের বহুমাত্রিক অবদানকে ইতিহাসের আলোয় আনা অভিসন্দর্ভের মূল লক্ষ্য। লক্ষ্য ভারতের ভূমিকার মূল্যায়ন, ইতিহাসের ঋণ

স্বীকার। তবে মোটা দাগে গবেষণায় ভারতের সীমান্ত অঞ্চলগুলোর একাত্তরের ভূমিকা উঠে এসেছে ঠিকই, তবে গবেষণার মূল উদ্দেশ্য সেটি নয়। প্রথমত, আমরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে একটি জনযুদ্ধ বলি। এটি সশস্ত্র যুদ্ধ ছিল, তবে শুধুমাত্র সশস্ত্র বাহিনী এতে অংশ নেয়নি। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, নৌকার মাঝি থেকে শুরু করে গৃহস্থ বধূ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রটি কিংবা পাড়ার মোড়ের বখে যাওয়া যুবক, একাত্তরে ভিন্ন এক শপথে একাত্ম হয়েছিল। সেই একাত্মতায় আমাদের স্বাধীনতা।

মুক্তিযুদ্ধের নানা সমীকরণে ভারত আমাদের সহযাত্রী ছিল। ইতিহাসে সেই সহযাত্রী হওয়ার নানা বয়ান রয়েছে। অনেক গবেষক তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন ভারত একাত্তরে কেন বাংলাদেশকে সহায়তা করেছিল। আমি সেই ইতিহাস নয়, সীমান্ত অঞ্চলের কিছু সাধারণ ঘটনা তুলে ধরে, সেগুলোর মূল্যায়নের ভিত্তিতে একটি কাঠামো তৈরির চেষ্টা করেছি। অনেকটা স্মৃতির হাত ধরেই ইতিহাসে প্রবেশ। ভারতে পাঁচটি সীমান্তবর্তী রাজ্যে একাত্তরে ভিন্ন এক আবেগ, অভিঘাতকে আমি খুঁজে পেয়েছি। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বনগাঁ, বালুরঘাট থেকে করিমগঞ্জ, ধর্মনগর, মেলাঘাটে চায়ের দোকানে বসে বসে একাত্তরের সমসাময়িক লোকদের সাথে আড্ডা, গল্প, স্মৃতি কিংবা অভিজ্ঞতা। কারো বা নিজের স্মৃতিচারণ, বাবা, মা, ঠাকুরদার কাছে শোনা অভিজ্ঞতা। একটি স্মৃতির আর্কাইভ।[১০] সেই সব স্মৃতি, সেই সব অভিজ্ঞতা সাজিয়ে ইতিহাসে প্রবেশ করেছি। স্মৃতি আর অভিজ্ঞতায় উঠে এসেছে ভিন্ন এক একাত্তর। এরা রাজনৈতিক সমীকরণ বোঝে না। বোঝে মানবিকতা, সীমান্ত পাড়ের একাত্তরের সেই মানবিক ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়াস থেকে অভিসন্দর্ভটি তৈরি করেছি।

প্রশ্ন হতে পারে, সেই মানবিক ইতিহাসের ভিত্তিটা কী? স্পষ্টত একাত্তরে সীমান্ত রাজ্যগুলোর সাধারণ মানুষ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে একটা জনযুদ্ধ হিসেবেই নিয়েছিলেন। এবং জনযুদ্ধের একজন যোদ্ধা হিসেবে সীমান্ত রাজ্যগুলোর সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছিল। এটি একটি নিম্নবর্গের ইতিহাস। পাশাপাশি ক্ষমতার সাথে সম্পর্কহীন সমাজের মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চবিত্তের সম্পৃক্ততাও উঠে এসেছে নানাভাবে। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান ছিল, কথাটাতে ভারতের সম্পৃক্ততাকে খাটো করা হয়। বরং বলা প্রয়োজন, একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামে ভারত একটি বড় অংশ ছিল। মুক্তিযুদ্ধের প্রায় পাঁচ দশক অতিক্রান্ত। নতুন মানচিত্র পাওয়ার পর অনেক পথ পেরিয়ে বাংলাদেশ আজ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আশ্চর্য, মুক্তিসংগ্রামের সেই বৃহৎ অংশ ভারতের মূল্যায়নে অপার স্তব্ধতা। ইতিহাস, সাহিত্য, কাব্য, শিল্পকলা যে দিকেই তাকানো যায়, একই স্তব্ধতায় বাস্তব। কিছু স্মৃতি শুধু, ইতিউতি, বিক্ষিপ্ত।

অধ্যাপক রেহমান সোবহানের *আনট্রাঙ্কুইল রিকালেকশনস- দ্য ইয়ারস অব ফুলফিলমেন্ট* গ্রন্থের প্রকাশনা উপলক্ষে সিপিডি একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে 'দ্য স্ট্রাগল ফর বাংলাদেশ' শিরোনামে।[১১] অনুষ্ঠানে অধ্যাপক রেহমান বলছিলেন, "বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি হয়ে গেছে। এখনও আমরা একেক জনের গল্প নিয়ে বই পাচ্ছি, যারা ওই সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন। বাংলাদেশের ডেফিনিটিভ ইতিহাস নিয়ে একটি বই পাচ্ছি না। যেটি তরুণ প্রজন্মের কাছে তুলে দিতে পারি, যাতে তারা বুঝতে পারে আমরা কোথা থেকে এসেছি। এটা আমাদের ব্যর্থতা।"[১২]

বাংলাদেশের ইতিহাসের ওপর গবেষণাধর্মী এবং সুনির্দিষ্ট কোনো কাজ না হওয়া সবার জন্য খুবই বেদনার বিষয়। স্বাধীনতার পরবর্তী বিগত প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে ইতিহাসবিদরা বাংলাদেশের ডেফিনিটিভ ইতিহাস রচনায় হাত না দেয়ার ফলে ইতিহাস এখন রাজনীতির ডামাডোলে পড়ে নতুন প্রজন্মের জন্য বিভ্রান্তির উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ আসছে। যদি 'ডেফিনিটিভ' কোনো ইতিহাস না থাকে, তাহলে কি বিকৃতি করা হল? রাজনৈতিক নেতারা দলীয় অবস্থান থেকে ইতিহাস সম্পর্কে মনের মাধুরী মিশিয়ে অনেক কথাই বলতে পারেন এবং এসব কথায় কথা বাড়তে পারে। উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু তা আর যাই হোক ইতিহাস নয়। বাংলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার নিয়ে অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন যা যথার্থ। কিন্তু ইতিহাসের রাজনৈতিক ব্যবহার নিয়ে বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাশীল মানুষের পক্ষ থেকে তেমন কোনো আপত্তি না ওঠার ব্যাপারটি হতাশাজনক। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বেশ কয়েকজন বেশ কটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এগুলোর বেশিরভাগই স্মৃতি নির্ভর। "এখনও আমরা একেক জনের গল্প নিয়ে বই পাচ্ছি, যারা ওই সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন।"[১৩]

মানুষের স্মৃতি হচ্ছে জীবন্ত ইতিহাস। জীবনের স্মৃতিগুলোকে মানুষ গল্পে রূপান্তর করে। বাচনিক ইতিহাস এই গল্পগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে এবং যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে তার মধ্য থেকে ইতিহাসের উপাত্ত খুঁজে নেয়। বাচনিক ইতিহাস হল বেঁচে থাকা মানুষের নিজস্ব অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যসমূহের একটি সুসংবদ্ধ সংগ্রহ। স্মৃতিকথাগুলো নিঃসন্দেহে মূল্যবান। তবে সমস্যা হলো, স্মৃতি আমাদের অনেক সময় বিভ্রান্ত করে। অনেকদিন পর অতীতের কথা লিখতে বসে দিন, তারিখ এবং প্রেক্ষাপট ঝাপসা হয়ে আসে। ফলে বিভ্রান্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়। যদি কোনো লেখক ডায়েরি লিখতে অভ্যস্ত থাকেন, তাহলে তার স্মৃতিকথা মামুলি স্মৃতিকথার চেয়েও মূল্যবান বিবেচিত হতে পারে। বাংলাদেশ সংগ্রামের নেতাদের মধ্যে একমাত্র তাজউদ্দীন আহমদই ডায়েরি লিখতেন।[১৪] নিঃসন্দেহে তাঁর ডায়েরি জাতীয় ইতিহাসের মূল্যবান

উপাদান। যারা স্মৃতিকথা লিখেছেন তাদের কাজগুলোকে কোনোক্রমেই মূল্যহীন বলা যায় না। তবে সমস্যা হলো, এ ধরনের স্মৃতিকথায় লেখকের নিজের ভূমিকা অনেক সময় বাড়াবাড়ি রকমের বেশি করে দেখানোর প্রয়াস থাকে। ফলে ইতিহাসের সত্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পেশাদার ইতিহাসবিদরা স্মৃতিকথাগুলোকে ব্যবহার করতে পারেন ঘটনাবলীর প্রামাণ্যকরণের জন্য। বাংলাদেশে এ কাজটি হয়নি বললেই চলে। সত্যিকারের ইতিহাস আইডিয়োলজির দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে না। আবার এ কথাও সত্য, সম্পূর্ণভাবে আইডিয়োলজিমুক্ত হয়ে ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। ইতিহাস রচনার জন্য হিস্টোরিওগ্রাফি বা ইতিহাসবিদ্যাকে ভালো করে রপ্ত করতে হয়। ইতিহাস রচনায় ব্যবহৃত হিস্টোরিওগ্রাফি একটি নয়, একাধিক। সুতরাং অনুসৃত হিস্টোরিওগ্রাফির কারণে ইতিহাসের মেজাজ ভিন্ন হয়ে যায়। বাংলাদেশের ইতিহাস রচনার কাজটি হবে মূলত সমসাময়িক ইতিহাস রচনার কাজ। সমসাময়িক ইতিহাস দাহ্য একটি বিষয়। কারণ সমসাময়িক ইতিহাসের বহু কুশীলব জীবিত থাকেন, অথবা তাদের অতি সন্নিকটবর্তী প্রজন্ম জীবিত থাকেন। স্বাভাবিকভাবেই এদের মধ্যে প্রচন্ড আবেগ কাজ করে। কিন্তু আবেগে আচ্ছন্ন অবস্থায় নির্মোহ ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। এ কারণেই বাংলাদেশে আমরা আবেগ আপ্লুত হয়ে অনেককেই ইতিহাসের নামে বিতর্কে লিপ্ত হতে দেখি। যার ভিত্তিতে কোনো ডেফিনিটিভ ইতিহাস নেই।

বাংলাদেশের ইতিহাসের উপাদানস্বরূপ তিনটি দলিল সংকলন আমরা দেখতে পাই। এর একটি হল বাংলাদেশ সরকার প্রকাশিত পনেরো খণ্ডে *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*।[১৫] দ্বিতীয়টি হল ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রকাশিত *বাংলাদেশ ডকুমেন্টস*[১৬], তৃতীয়টি মুক্তিযুদ্ধের অনালোচিত কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুনতাসীর মামুনের সম্পাদনায় ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*[১৭]। এর বাইরে দলিলপত্রের সন্ধান করতে হলে আমাদের বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশসহ গুরুত্বপূর্ণ আর্কাইভগুলো অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। দেখতে হবে বিভিন্ন দেশের অবমুক্তকৃত দলিল-দস্তাবেজ এবং যেসব দলিল এখনও অবমুক্ত হয়নি সেগুলোর জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

একাত্তর পূর্ববর্তী সময়ে যারা স্বাধীন পূর্ব বাংলা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেছেন বা কাজ করেছেন তাদের তথ্যগুলোও আমাদের ইতিহাস রচনার অন্যতম উপাদান। এগুলো বাদ দিয়ে প্রকৃত ইতিহাস রচিত হতে পারে না। ইতিহাসকে রাজনীতির ফুটবলে পরিণত করার প্রয়াস খুবই দুঃখজনক এবং তা জাতির জন্য কোনোক্রমেই মঙ্গলজনক নয়। এখন যা ঘটছে সেটি হল সমসাময়িক ইতিহাস নিয়ে আবেগ উত্তেজনার ধোঁয়াশা। ধোঁয়াশায় মানুষের দৃষ্টিশক্তি সংকুচিত হয়ে যায়। সমসাময়িক ইতিহাসের বিপদ সম্পর্কে *রজনি*

পাম দত্ত তার মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণ *প্রবলেমস অব কনটেম্পোরারি হিস্ট্রি* গ্রন্থে অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরেছেন।[১৮] এ মুহূর্তে যারা বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করছেন তাদের জন্য এ গ্রন্থটি দিকনির্দেশিকা হিসেবে কাজ করতে পারে।

স্মৃতিকথা হোক বা অন্য যা কিছু হোক, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বাংলাদেশে যেমন বই প্রকাশিত হয়েছে ঠিক তেমনি অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে ভারত ও পাকিস্তানে। তবে সেসব বইয়ের মূল লক্ষ্য হল একাত্তরের যুদ্ধটিকে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হিসেবে দেখানো।

মুক্তিযুদ্ধে ভারত কেন সম্পৃক্ত হয়েছিল? মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সাড়ে চার দশকে এই নিয়ে নানাবিধ গবেষণা, আলোচনা, সমালোচনা তৈরি হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে। এই বিতর্কিত করার প্রয়াসটি শুরু হয়েছিল যুদ্ধকালীন সময় থেকে। নিরোদ চন্দ্র চৌধুরী ১৯৭১-এ *হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড* এ লিখেন, "এই বিরাট শোকাবহ ঘটনার (অর্থাৎ গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের) প্রতি ভারত সরকারের মনোভাব ছিল সুবিধাবাদী রাজনীতির বাকচাতুর্যপূর্ণহীন কসরত।"[১৯]

আর. পি. কাপুর তাঁর 'বাংলাদেশ কেন' প্রবন্ধে লিখেছেন, "এই বিভাজন Sub Consious Hate Complex এর ফলে সৃষ্ট, সত্যি কথা বলতে গেলে মুজিবর রহমানের পক্ষ সমর্থন পাকিস্তানের প্রতি আমাদের অবচেতন বিদ্বেষ মন্যতা প্রসূত।"[২০]

মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সম্পৃক্ততা নিয়ে মোটা দাগে যে অভিযোগ, সেটি হচ্ছে ভারত দ্বি-জাতি তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করার জন্য বাংলাদেশকে সহায়তা করেছিল। নিজেদের নিরাপত্তায় পাকিস্তানের মতো একটি বৃহৎ প্রতিবেশিকে ভেঙ্গে দিয়েছিল। নানাবিধ সমালোচনায় ভারতকে বিদ্ধ করতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মূল ধারাকেও অনেকাংশে সংকুচিত ও বিকৃত করে ফেলা হয়। গত সাড়ে চার দশক ধরে, ইতিহাসে সেটারই পুনরাবৃত্তি হয়েছে। মহিউদ্দিন আহমদ মুক্তিযুদ্ধে ইন্দিরার অবদানের কথা বলতে গিয়ে তাকে 'মুক্তিযুদ্ধের ধাত্রী' বলে অবহিত করেছেন।[২১] সেটাকে আক্রমণ করে পরের দিন বদরুদ্দীন উমর লিখেন, "শুধু ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নয়, ভারতের সেনাবাহিনীকেও মুক্তিযুদ্ধের ধাত্রী বললে তা অতিরঞ্জিত হয় না।"[২২] তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, "ভারত সরকার বাংলাদেশের জনগণের প্রতি সহানুভূতি ও ভালোবাসার কারণে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিল এটা ঠিক নয়। তাদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সেই পরিস্থিতিতে ছিল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নির্যাতিত কোন জনগণের জন্য, বিশেষত বিদেশি জনগণের স্বাধীনতার জন্য নির্ধারক ভূমিকা বা কোনো ধরনের ভূমিকা পালনের মতো চরিত্র ভারতীয় রাষ্ট্রের নেই।"[২৩]

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আশীষ কুমার দাস, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারত' নিয়ে গবেষণা করেছেন। সেখানে তিনি পরিসমাপ্তিতে লিখেছেন, "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষ এবং সুনির্দিষ্ট।"[২৪]

ইন্দিরা গান্ধীর জীবনীকার ইন্দর মালহোত্রা লিখেছেন, "Humanitration feelings were the main motivating force behind the outcry. But many Indians also saw in the heart-rending situation an opportunity to cut Pakistan down to size."[২৫]

ভারতের বামধারার বিশ্লেষক ও রাজনীতিবিদরা মনে করেন, ইন্দিরা গান্ধী ক্রমবর্ধমান নকশাল আন্দোলনকে দমন করার জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।[২৬] আক্ষেপ করেই শাহরিয়ার কবির লিখেছেন, "দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদানের কথা সর্বত্র দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনুল্লেখিত থেকেছে"।[২৭]

অধ্যাপক মোহাম্মদ সেলিম, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভারতের রাজনৈতিক দলের ভূমিকা' নিয়ে এম. ফিল ও 'বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক(১৯৭১-৮১)' নিয়ে পিএইচডি অভিসন্দর্ভ রচনা করেছেন। দুটি গবেষণাতেই তিনি ভারতের ভূমিকার সঠিক এবং যুক্তিযুক্ত মূল্যায়ণ তার অভিসন্দর্ভে তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, "ভারতের ডানপন্থী দলগুলো ১৯৪৭ সালের দেশভাগ কখনো মেনে নিতে পারেনি। এটা তাদের কাছে চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয় কোন ঘটনা নয়। তাদের বিশ্বাস, ভারত হল অবিভাজ্য। তাই পুন:একত্রিকরণের আশা ত্যাগ করেনি এবং এই আলোকেই তারা মুক্তিযুদ্ধকে বিবেচনা করেছে। মোটকথা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহকে তারা গ্রহণ করেছে পুন:একত্রিকরণের পক্ষে আন্দোলন হিসেবে। পুন:একত্রিকরণ যদি নাও হয়, পাকিস্তানের ভাঙ্গন সেটিও কম পাওয়া নয়।"[২৮]

উদার ও বামপন্থী দলগুলোর কাছে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের আদর্শিক চেতনার আবেদন ছিল বেশি। ভারতের সাধারণ জনগণ কোন স্বার্থ চিন্তায় নয় বরং নিপীড়িত বাঙালি জাতির পাশে মানবতাবোধে তাড়িত হয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

ড্যানিয়েল সি পার্ক *The Journal of Contemporary Asian studies* এর ভলিউম ১ ইস্যু ৩ সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লিখেন। যার শিরোনাম, 'India's Intermission in East Pakistan: A Humanization Intermission or an Act of National Interest?' সেখানে তিনি উল্লেখ করেন "This paper argues that India intervened in the war to cease the influx of Bengali refugees from entering its own borders. And, more importantly to

expand and pursue its geopolitical interests in South Asia, which included (a) weakening and dismembering its rival state Pakistan, and (b) rising as a regional hegemony in the northern South Asia region.'[২৯]

জগলুল হায়দার মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান নিয়ে *Journal of Asian and African studies* -এ একটি নিবন্ধ লিখেন। শিরোনাম 'A Revisit to the Indian Role in the Bangladesh Liberation War'। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ভারতীয় নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টিকোণ থেকে পাকিস্তানকে বিভক্ত করার উপযুক্ত সময় হিসেবে দেখিয়েছেন। জগলুল হায়দার ভারতের সম্পৃক্ততার ছয়টি সুস্পষ্ট কারণ তার প্রবন্ধের সারমর্মে ইঙ্গিত করেছেন।[৩০]

> (a) the political enemy on both its borders would be replaced by a far weaker enemy on one side and a friend on the other; (b) secularism would be regarded as a dominant ideology for the developing countries; (c) India would emerge as an Asian superpower; (d) India would establish a subservient government in Bangladesh; (e) Bangladesh would be an extension of the Indian market; (f) India would materialize the Nehruvian vision of the Greater Indian Union.

নবীন মুর্শিদ তাঁর গবেষণা প্রবন্ধ 'India's role in Bangladesh's war of independence: humanitarianism or self- Interest?' এ মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সম্পৃক্ততাকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করেছেন।[৩১]

It explores the various arguments - shared ethnicity, irredentist tendencies, lack of international involvement, and the need to tip the balance of power against Pakistan-to understand the motivations behind India's apparent aggressive behaviour, as deemed by the international community at the time. By analysing the speeches of the key actors and reactions of ordinary men and women, it is argued that the lack of international interest and the heavy burden that India faced due to the 10 million refugees it hosted explain the

timing of and impetus for military intervention, an action with repercussions that are experienced even today.

শ্রীনাথ রাঘবন *1971: A Global History of the Creation of Bangladesh* শিরোনামে ২০১৩ সালে একটি গ্রন্থ লেখেন। গ্রন্থে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বিরাজমান ইতিহাসতত্ত্ব নিয়ে সমালোচনা মুখর ছিলেন। তিনি ভূমিকায় লিখেছেন, বাংলাদেশের বেশির ভাগ ইতিহাসবিদ ১৯৭১ সালের যুদ্ধকে দেখতে চেষ্টা করেছেন স্মৃতি, সংঘর্ষ এবং আইডেনটিটি বা পরিচয়ের দিক থেকে।[৩২] গ্রন্থটির তৃতীয় অধ্যায়ে লেখক মুক্তিযুদ্ধে নিকটতম প্রতিবেশি ভারতের অবস্থান ও ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তুলে ধরেছেন বেশ কিছু নতুন যুক্তি ও এসব যুক্তির পেছনে প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র। লেখক তুলে ধরেছেন যুদ্ধ শুরুর আগের দিকে মুজিবের সাথে ভারতের দূরত্বের কথা। তিনি তুলে ধরেছেন, কমিউনিস্ট ভীতি থেকে ভারত তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ করতে আগ্রহী ছিল। এছাড়া ভারতের ভেতরে নানা ধরনের অভ্যন্তরীণ সমস্যা, নকশাল আন্দোলনে ভারত বাংলাদেশকে সহায়তায় ভীতি ছিল। ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টির অংশ হিসেবে মুজিবের যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আলোচনার কিছু তথ্য লেখক তুলে ধরেন।[৩৩]

মুক্তিযুদ্ধে ভারতের নাগরিক পর্যায়ের সম্পৃক্ততা এবং সেই সম্পৃক্ততা যে ভারতের নীতিতে প্রভাব ফেলেছে রাঘবন সেটা স্বীকার করেছেন। তবে গ্রন্থটিতে মুক্তিযুদ্ধের বৈশ্বিক প্রভাবকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে সামগ্রিক ইতিহাসকে সংকুচিত করেছেন।

Richard Sisson এবং Leo E. Rose *War and Secession (Pakistan, India and the Creation of Bangladesh)* নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যে গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সম্পৃক্ততার নানামুখী বিশ্লেষণ যেমন রয়েছে, তেমনি শরণার্থী সমস্যা মোকাবেলায় বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের লোকজনের সহায়তার কথা, সহায়তার কারণ লেখক তুলে ধরেছেন।[৩৪] বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা মেজর মোহাম্মদ কামরুল হাসান "India's Decisive intermission: Effectiveness of its Assistance during the Liberation war of Bangladesh 1971' শিরোনামে US Army Staff College-এর অধীনে গবেষণা করেছেন। ইন্টারনেটে সেই গবেষণাপত্রটি উন্মুক্ত করা হয়েছে।[৩৫] ৯৬ পৃষ্ঠার সেই গবেষণাপত্রে লেখক ভারতের সম্পৃক্ত হওয়ার কারণ, ধরণ উল্লেখ করেছেন।

"India was also intricately involved right from the beginning. India helped Bangladesh forces, logistic supply and above all, sheltered approximately 10 million refugees for 9 months." প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের

অধ্যাপক গ্যারি জে ব্যাস তাঁর গ্রন্থে *The Blood Telegram: India's Secret War in East Pakistan* গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অংশগ্রহণের নানাবিধ কারণ ও সেসময়ের আন্তর্জাতিক রাজনীতির মেরুকরণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভারতের বিরোধ তুলে ধরেছেন।[৩৬] এছাড়া তার আরেকটি গ্রন্থ যেটি পুলিৎজার পুরস্কারের ফাইনালিস্ট হিসেবে মনোনীত হয়েছিল *The Blood Telegram Nixon, Kissinger and a Forgotten Genocide* যেটিতে প্রথমবারের মতো কোন পশ্চিমা গবেষক বাংলাদেশের গণহত্যার স্বপক্ষে দালিলিক প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। এই গ্রন্থেও শরণার্থীদের ভারত গমন ও সেখানকার সীমান্তে এলাকার সাধারণ লোকজনের সহায়তার কথা উঠে এসেছে।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু খুব কি বেশি লেখা হয়েছে? এ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা বেশিরভাগ গ্রন্থই ইতিহাসের পদ্ধতিগত দিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ। অনেকগুলো গ্রন্থ লিখেছেন সামরিক কর্মকর্তারা, যেখানে মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ জনগণের কথা উপেক্ষিত। আবার অনেকে লিখেছেন বিদেশি এজেন্সির ফরমায়েসে পদ্ধতিগত ত্রুটিপূর্ণ গ্রন্থ। এর উদাহরণ শর্মিলা বসুর *দ্য ডেড রেকনিং*।[৩৭] আবু মো. দেলোয়ার হোসেন এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে *মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপঞ্জি*।[৩৮] সেখানে তিনি ৪৫৬৪টি বইয়ের নাম উল্লেখ করেছেন। এর বাইরেও নিশ্চয় বই আছে। পঞ্জিটি প্রকাশের পর গত চার বছরে আরো বই প্রকাশিত হয়েছে। ধরে নিতে পারি এ সম্পর্কিত বইয়ের সংখ্যা (দেশের বাইরে প্রকাশিত বই ধরে) প্রায় পাঁচ হাজার। সংখ্যাটি একেবারে কম নয়। অধ্যাপক দেলোয়ারের গ্রন্থপঞ্জির মধ্যে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত নয় এমন গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৭০০। সৃজনশীল বই যেমন গল্প উপন্যাস কবিতার সংখ্যা প্রায় ৫৫০। বাকী গ্রন্থগুলোয় অভিজ্ঞতায়, স্মৃতিকথায় আর পুনরাবৃত্তিতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচিত হয়েছে।[৩৯]

এসব গ্রন্থে সাধারণভাবে যে বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, তা হলো-

১. অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন একাত্তরের সাথে সম্পৃক্ত সেনা কর্মকর্তা ও মুক্তিযোদ্ধারা, যেগুলোতে সামরিক ইতিহাস, রণাঙ্গনের কথা উঠে এসেছে।

২. স্মৃতিকথাগুলোও যুদ্ধের বিবরণ, শরণার্থী জীবন, নিজের বীরত্বের মহিমায় উদ্ভাসিত।

৩. সবগুলো গ্রন্থে ১১টি সেক্টরের ইতিহাস, মনে হয় মুক্তিযুদ্ধ ১১টি সেক্টরের সামরিক বিজয়, জনযুদ্ধ উপেক্ষিত।

৪. দেশের বাইরে রচিত অধিকাংশ গ্রন্থে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে দেখানো হয়েছে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধকে বাংলাদেশের মানুষের একটি জনযুদ্ধ হিসেবে না দেখিয়ে

দেখানো হয়েছে ভারতের বিজয়গাঁথা হিসেবে। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করলেও দেখানো হয়েছে পাকিস্তান কেবল ভারতের কাছেই পরাজিত হয়েছে।

৫. বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণকে অস্বীকার করে এটাকে কেবল সামরিক যুদ্ধ হিসেবেই দেখানো হয়েছে।

৬. একাত্তরকে একটি স্বাধিকার আন্দোলন হিসেবে না দেখিয়ে কিছুক্ষেত্রে দেখানো হয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশের আরেকটি পার্টিশন হিসেবে। কিন্তু একাত্তর ছিল শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এটি কোন রক্তপাতহীন দেশভাগ নয়।

রচিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা, শরণার্থী, ইন্দিরা গান্ধী, রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা নিয়ে একাধিক গ্রন্থ। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের রাজ্যভিত্তিক ইতিহাস রচনার একটি প্রবণতাও লক্ষণীয়। যেমন–মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরার বহুমুখী ভূমিকা নিয়ে হারুন হাবীব, সুকুমার বিশ্বাস ও আমি গ্রন্থ রচনা করেছি। ফজলুল বারী লিখেছেন *একাত্তরে আগরতলা, একাত্তরে কলকাতা* নামক দুটি বই। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা নিয়ে লিখেছেন সালাম আজাদসহ আরো অনেকেই। তবে অধিকাংশই বিক্ষিপ্ত। এসব গ্রন্থে তৃণমূলের সম্পৃক্ততার বিষয়টি পুরোপুরি উপেক্ষিত। শুরুতেই আমি তুলে ধরতে চাই, বিদ্যমান দলিল-দস্তাবেজ ও গ্রন্থাবলিতে ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোর সাধারণের ভূমিকা কতটা উঠে এসেছে কিংবা কতটা উপেক্ষিত সেই বিষয়টি।

মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে প্রামাণ্য দলিল সংকলন বলা হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র কে। দলিলপত্র নির্মোহ ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার অন্যতম উপাদান। ইতিহাসের উপাদান হিসেবে দলিল বলতে আমরা বুঝি সরকারি-বেসরকারি চিঠিপত্র, অফিস আদেশ, পত্রপত্রিকা, স্মরণিকা, ছবি, মানচিত্র, স্মারক, চুক্তিপত্র, সাক্ষাৎকার, দিনপঞ্জি, রেকর্ডেড অডিও ভিজ্যুয়াল তথ্য, রেজিস্টার, হিসাব খাতা ইত্যাদি। ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পৃথিবীজুড়ে অজস্র দলিল বা উপকরণের সৃষ্টি হয়েছিল। সেসব দলিল-দস্তাবেজ নিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর পনের খণ্ডে রচিত একটি দালিলিক প্রকাশনা, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*।

এ দলিলপত্রাদি ইতিহাসবিদ অধ্যাপক মফিজুল্লাহ কবীর ও সাংবাদিক হাসান হাফিজুর রহমানের যৌথ নেতৃত্বে একটি প্রামাণ্যকরণ কমিটি কর্তৃক প্রণীত। প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠাব্যাপী বিপুলায়তন ও সংগৃহীত উপাত্ত থেকে নির্বাচন করে প্রামাণ্যকরণ কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পর কালপঞ্জি অনুসারে

বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারের উদ্যোগে ১৯৭৩ সালে বাংলা একাডেমির মাধ্যমে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের তথ্য সংগ্রহের প্রকল্প শুরু হয়। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাসনামলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বাধীনতার ইতিহাস সংক্রান্ত একটি প্রকল্প প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর কাজ শুরু হয় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি থেকে। এই প্রকল্পের সদস্য সচিব হাসান হাফিজুর রহমান বাংলা একাডেমি কর্তৃক ইতোপূর্বে সংগৃহীত দলিলপত্রসমূহ স্ব-উদ্যোগে গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি এরশাদ সরকারের শাসনামলে ১৯৮২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে খণ্ডগুলির প্রকাশ শুরু হয়।

দলিল এবং তথ্য প্রামাণ্যকরণের জন্য সরকার নয় সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন। এর গঠনকাঠামো ছিল নিম্নরূপঃ চেয়ারম্যান প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীর, সদস্য সচিব হাসান হাফিজুর রহমান, সদস্যবৃন্দঃ প্রফেসর সালাহউদ্দীন আহমদ, প্রফেসর আনিসুজ্জামান, ড. সফর আলী আকন্দ, ড. এনামুল হক, ড. কে.এম করিম, ড. কে.এম মোহসীন ও ড. শামসুল হুদা হারুন। ইতিহাস রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলে এই কমিটি শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু দলিলপত্র সংগ্রহের সীমা স্বাধীনতা যুদ্ধকেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও, মুক্তিযুদ্ধের পশ্চাতে বিশাল পটভূমিরও রয়েছে সমান গুরুত্ব। মুক্তিযুদ্ধকে এই পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এই পটভূমির ঘটনাবলী যাকে মুক্তি সংগ্রাম বলা যায় তার অনিবার্য পরিণতি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। অর্থাৎ মুক্তিসংগ্রামের স্বরূপ জানা ছাড়া মুক্তিযুদ্ধকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। এই কারণে দুখণ্ডে পটভূমি সংক্রান্ত দলিলপত্র প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রধানত বিশেষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ এবং বিষয়ভিত্তিক (themetic) ভাবে খণ্ডগুলি পৃথক করা হয়েছে। যেমন, প্রথমখণ্ডঃ পটভূমি (১৯০৫-১৯৫৮); দ্বিতীয় খণ্ডঃ পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১); তৃতীয় খণ্ডঃ মুজিবনগরঃ প্রশাসন; চতুর্থ খণ্ডঃ মুজিবনগরঃ প্রবাসী বাঙালিদের তৎপরতা; পঞ্চম খণ্ডঃ মুজিবনগরঃ বেতার মাধ্যম; ষষ্ঠ খণ্ডঃ মুজিবনগরঃ গণমাধ্যম; সপ্তম খণ্ডঃ পাকিস্তানি দলিলপত্র (সরকারি ও বেসরকারি); অষ্টম খণ্ডঃ গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাথমিক ঘটনা; নবম খণ্ডঃ সশস্ত্র সংগ্রাম (১); দশম খণ্ডঃ সশস্ত্র সংগ্রাম (২); একাদশ খণ্ডঃ সশস্ত্র সংগ্রাম (৩); দ্বাদশ খণ্ডঃ বিদেশি প্রতিক্রিয়া, ভারত; ত্রয়োদশ খণ্ডঃ বিদেশি প্রতিক্রিয়াঃ জাতিসংঘ ও বিদেশি রাষ্ট্র; চতুর্দশ খণ্ডঃ বিশ্ব জনমত; পঞ্চদশ খণ্ডঃ সাক্ষাৎকার; এবং ষোড়শ খণ্ডঃ কালপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘণ্ট। তবে পরিকল্পনায় থাকলেও ষোড়শ খণ্ডটি প্রকাশিত হয় নি এবং সর্বশেষে পঞ্চদশ খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে। তবে কিছু ক্ষেত্রে খণ্ড পরিকল্পনায় পৃষ্ঠা

সংখ্যার সুবিধাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের জনগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন, প্রবাসেও বাংলাদেশ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়েছিলেন ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাঙালি এবং বিখ্যাত বিদেশি নাগরিকগণ। প্রকল্পের আওতায় মার্কিন কংগ্রেস, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জাতিসংঘ, কমলওয়েলথ, বিশ্বব্যাংক, বিভিন্ন বেসরকারি আন্তর্জাতিক সংস্থার বহু সংখ্যক দলিল প্রামাণ্য কমিটি কর্তৃক প্রাসঙ্গিকতা ও মূল্য বিচারের পর প্রকাশিত হয়েছে। মুজিবনগর সরকার ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মূল্যবান দলিলসমূহ মোট চারটি খণ্ডে প্রকাশ করা হয়েছে।

দলিলপত্র ও তথ্যাদির বেলায় সংগ্রহের ধরন বিস্তৃততর হয়েছে। কারণ এই যুদ্ধের সাথে বাংলাদেশের মানুষ ও সমগ্র বিশ্ব জড়িত হয়ে পড়েছিল। ফলে কেবল বাংলাদেশ নয়, সমগ্র বিশ্বের বিষয়াদির প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র সংগ্রহ করে প্রকাশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত ডায়েরি, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা, সরকারি নথিপত্র, রণকৌশল ও যুদ্ধসংক্রান্ত লিখিত তথ্যাদি, মুক্তাঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর এবং মুজিবনগর সরকারের তৎপরতা, জনসাধারণের অংশগ্রহণ, কমিটি গঠন, বিবৃতি, বিশ্বজনমত, বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী, জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার দলিলপত্র প্রকাশ করা হয়েছে। যেহেতু চরিত্রগত দিক থেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ, যেহেতু সম্পাদকমন্ডলীর উদ্দেশ্য ছিল সর্বসাধারণের মনোভাবের প্রতিফলন করানো এবং এ জন্যে গণসহযোগিতার প্রতি স্তরের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রতিটি খণ্ডে প্রধানত মূল দলিল সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে যেসব দলিল ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করেছে এবং যেগুলি বাদ দিলে ঘটনার ধারাবাহিকতা থাকে না, সেগুলি প্রকাশিত সূত্র থেকেও গ্রহণ করা হয়েছে। তারপরও সম্পাদকমন্ডলী স্বীকার করেছেন যে, বহু দলিল ও তথ্য তাদের সংগ্রহের বাইরে থেকে গেছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি মানুষ কোনো না কোনোভাবে মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িয়ে ছিলেন। গ্রামে গ্রামে, শহরে বন্দরে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বহু ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, বহু বীরত্বগাঁথা, সীমাহীন ত্যাগ, বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচার, নিপীড়নের কাহিনী স্তরে স্তরে গড়ে উঠেছে। এর পরিমাণ অনুধাবন করা কঠিন। সারা বিশ্বজুড়েও ছিল এ সম্পর্কে সমর্থন ও প্রতিক্রিয়া এবং প্রবাসী বাঙালিদের তৎপরতা। মফিজুল্লাহ কবীর ও হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এই বিশাল ঘটনাপ্রবাহের সমগ্রতা ধারণ করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিক্রিয়া ও ভূমিকা সন্নিবেশিত হয়েছে দলিলপত্রের ১২ তম খণ্ডে।[৪০] বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতের সরকারি প্রতিক্রিয়া, বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও বিধানসভাসমূহ, বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতের বেসরকারি প্রতিক্রিয়া, ভারতীয় রাজ্যসভায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গ এবং ভারতীয় লোকসভায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গ- এই ৫ টি শিরোনামে দলিলসমূহকে বিন্যাস করা হয়েছে। এতে মোট ২৩৩ টি দলিল সংযুক্ত করা হয়েছে যার মধ্যে ৯৮-১৯১ সূচিতে মোট ৯৪ টি দলিলে মুক্তিযুদ্ধে ভারতের বেসরকারি প্রতিক্রিয়া উঠে এসেছে। মূলত এই দলিলগুলোতে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সাধারণের ভূমিকার কিছু তথ্য পাওয়া যায়। যদিও এসব দলিলের বড় একটি অংশ সেসময়ের সংবাদপত্রের প্রতিবেদন। সেসময় পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরাসহ সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে বাংলাদেশের সমর্থনে অনেক পোস্টার, লিফলেট প্রকাশিত হয়েছে। যেগুলো এই দলিলে পাওয়া যায় না। মূলত সহজলভ্য যে সব তথ্য তারা পেয়েছে সেগুলোই সন্নিবেশিত করা হয়েছে এখানে। যেমন–*দৈনিক যুগান্তর*, *দৈনিক আনন্দবাজারের* কিছু সংবাদ, সম্পাদকীয় এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

একাত্তরে *যুগান্তর* কিংবা *আনন্দবাজারের* বড় একটি অংশ জুড়ে বাংলাদেশ বিষয়টি প্রাধান্য পেত, আর সম্পাদকীয় ছাপা হয়েছে প্রতিদিন। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের সম্পাদনায় *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে* তিন খণ্ডে *আনন্দবাজার*, তিন খণ্ডে *কালান্তর* ও শুধুমাত্র যুগান্তরে সম্পাদকীয়গুলো নিয়ে আলাদা দুটি খণ্ডে সেসব দলিল সন্নিবেশিত হয়েছে।[৪১] বিক্ষিপ্ত কয়েকটি পত্রিকা এই প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের হাতে ছিল। সেগুলোই তারা ছাপিয়ে দিয়েছেন। পাশাপাশি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতি প্রতিবেদন, তাদের প্রকাশিত ২টি গ্রন্থের কনটেন্ট এখানে তুলে ধরা হয়েছে। একাত্তরে ভারত বেসরকারি প্রতিক্রিয়ার খুব সামান্য তথ্যই এই দলিলে উঠে এসেছে। স্পষ্ট করে বলা যায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রে ভারতের সাধারণ মানুষের ভূমিকা পুরোপুরি উপেক্ষিত। ৮ম খণ্ডে খুবই সীমিত পরিসরে শরণার্থীদের বিষয়টি উঠে এসেছে।

মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সাধারণের সম্পৃক্ততা সবচেয়ে বেশি উঠে এসেছে সমসাময়িক ভারতীয় গণমাধ্যমে। বিশেষ করে সেই সময়ের পশ্চিমবঙ্গের প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছিল, পত্রিকাগুলোতে এতো বেশি পূর্ববঙ্গ নিয়ে সংবাদ পরিবেশন করত মনে হত এগুলো স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মুখপত্র। বিশেষ করে সীমান্ত অঞ্চলের সাধারণের সম্পৃক্ততা বুঝতে, শরণার্থীদের আগমন, আশ্রয়, ত্রাণ ও সেসময়কে অনুধাবনে একাত্তরে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর বিকল্প

নেই। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* সিরিজের ২৫টি খণ্ডে সেসব পত্রিকার অধিকাংশ সংবাদ সন্নিবেশিত হয়েছে। এটি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের একটি অন্যতম দলিল।

যুদ্ধ সংগঠিত করতে, মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে, জনগণের মনে প্রত্যাশা তৈরি ও জনমত গঠনে এসব পত্রিকাগুলো ভূমিকা রেখেছে। আমার গবেষণার যে বিষয়বস্তু তার জন্য এই সিরিজটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে কাজ করেছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত *আনন্দবাজার, যুগান্তর, কালান্তর, হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড*, *অমৃতবাজার*, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত *দৈনিক সংবাদ*, শিলং থেকে প্রকাশিত *শিলং টাইমস*, আসাম থেকে প্রকাশিত *অরুণোদয়*। *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন লিখেছেন , "এপর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে তার একটি বড় অংশ পুনরাবৃত্তি লক্ষণীয়। এর কারণ, তথ্যের অভাব। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ চর্চা একটি উদ্যেগ গ্রহণ করেছে তা হলো, মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত দলিলপত্র যা অপ্রকাশিত তা প্রকাশ করা। এই উদ্যেগের ফল গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ।'[৪২]

এই গ্রন্থমালা সিরিজে এ পর্যন্ত ২৫টি গ্রন্থ বের হয়েছে। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম খণ্ডে বের হওয়া *দৈনিক আনন্দবাজার* দ্বাদশ খণ্ডে সংকলিত *হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড* ত্রয়োদশ খণ্ড থেকে অষ্টাদশ খণ্ডে সংকলিত *দৈনিক কালান্তর* উনবিংশ ও বিংশ খণ্ডে সংকলিত *পরিচয়, দেশ* ও অন্যান্য সাময়িক পত্রের সংকলন একবিংশ খণ্ডে সংকলিত *সাপ্তাহিক দর্পণ*, দ্বাবিংশ খণ্ডে ত্রিপুরা থেকে বের হওয়া *সাপ্তাহিক দেশের ডাক, জাগরণ* এর সংকলন। ত্রয়োবিংশ খণ্ডে *সাপ্তাহিক সপ্তাহ*, চতুবিংশ ও পঞ্চবিংশ খণ্ডে সংকলিত *দৈনিক যুগান্তরের* সম্পাদকীয়। যেগুলোতে মুক্তিযুদ্ধে সীমান্তবর্তী রাজ্যের সাধারণ মানুষের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের বিবরণ পাওয়া যায়। বিশেষ করে তারা যে বিপুলভাবে শরণার্থী ত্রাণে অংশ নিয়েছিলেন কিংবা স্বীকৃতির দাবিতে মিছিল-মিটিংয়ে যোগ দিয়েছিলেন সে সংক্রান্ত সংবাদের বড় প্রাথমিক উৎস গণমাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রন্থমালা সিরিজ।

বাচনিক ইতিহাসের ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধে ভারতের রাজ্যভিত্তিক সাধারণের সহায়তার যে চিত্র আমি তুলে ধরেছি, এই গ্রন্থমালা সিরিজের দলিলসমূহ সাধারণের সহায়তার মানবিক ইতিহাসকে প্রতিষ্ঠার শক্ত ভিত্তি দিয়েছে।

ফজলুল বারী রচিত *একাত্তরের কলকাতা* বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধে কলকাতার সম্পৃক্ততার প্রথম গ্রন্থ।[৪৩] আলোকচিত্রসহ মাত্র ৬৪ পাতার এই গ্রন্থটি মূলত একাত্তরে কলকাতায় স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের নানাবিধ কর্মকাণ্ড, দূরত্ব, ভুল-বোঝাবুঝি, আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, তাজউদ্দীনের

ভূমিকার একটি দিনলিপি। সাধারণ কলকাতাবাসী কিংবা ভারত সরকারের ভূমিকা, কলকাতার অবদান এতে উল্লেখ করা হয়নি। ভূমিকায় লেখক উল্লেখ করেছেন, "একাত্তরের মার্চে যুদ্ধ প্রস্তুতির সময়েও এখানকার বেশিরভাগ নেতা কর্মীদের ধারণাই ছিল না, দুঃসময়ে কলকাতা কত বড় আশ্রয়স্থল হয়ে উঠতে পারে।"[৪৪]

গ্রন্থটিতে বড় ধরনের বেশ কিছু তথ্য বিভ্রাট আছে। কোন সূত্র উল্লেখ ছাড়া অনেকগুলি ঘটনার মনগড়া বর্ণনা আছে, যা সমসাময়িক ইতিহাসের সূত্রগুলো সমর্থন করে না। উল্টো একাত্তরের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী সন্তোষ রায়ের জবানিতে, মুজিবের গ্রেপ্তার হওয়া নিয়ে একটি বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দিয়েছেন।[৪৫] তবে একাত্তরে যে কলকাতা আলোড়িত হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের জন্য, সে কলকাতা কীভাবে আমাদের থেকে বিস্মৃত হয়েছে সেই নির্মম সত্যের সূচনাটা তুলে ধরেছেন, "তাজউদ্দীন মন্ত্রীসভার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর বাংলাদেশ প্রশ্নে কলকাতার গুরুত্ব শুধু শরণার্থী ইস্যুতে সীমিত হয়ে যায়। সেই সীমিত সম্পর্ক ক্রমাগত সংকোচনের মধ্য দিয়ে আমরা বিস্মৃত হয়েছি মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সহোদর পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকা।" লেখক ২৫ বছর আগে ইতিহাসের সেই সব উপাদান, স্মৃতি হারিয়ে যাওয়ার কথা তুলে ধরেছেন। "কলকাতার সেই সহযোগী মানুষ, সংগঠন প্রতিষ্ঠানের কোথাও স্মৃতি সংরক্ষণের সংগঠিত উদ্যোগ নেই। বাংলাদেশেই যখন এ বিষয়ক উদ্যোগ দূর্বল, উদ্দেশ্য ব্যক্তি রাজনীতির স্বার্থে বাঁধা, কলকাতার কাছে তার ষোলআনা চাইবারইবা অবকাশ কোথায়? সব হারিয়ে যাচ্ছে, সব হারিয়ে যায় আমাদের অবহেলায়, অদেখায়, এভাবেই।" গত ২৫ বছরে আরো অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে মুক্তিযুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের সহযোগিতা, সহমর্মিতার ইতিহাস।

ভারতের বাংলাভাষী লোকজনের কাছে মৈত্রেয়ী দেবীর পরিচয় বাঙালি কবি, লেখক ও ঔপন্যাসিক। আর আমাদের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে মৈত্রেয়ী দেবীর নামটি লেখা থাকবে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম বন্ধু হিসেবে। একাত্তরে একজন সংগঠক হিসেব মৈত্রেয়ী দেবী ঘুরে বেড়িয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের নানা সীমান্তে। কখনো মেডিকেল ক্যাম্প নিয়ে, কখনো শরণার্থীদের জন্য ত্রাণ নিয়ে আবার কখনো বা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সহায়তা নিয়ে।

একাত্তরের সেই সব স্মৃতি নিয়ে ১৯৮৩ সালে তিনি লিখেছেন *এতো রক্ত কেন?*[৪৬] একটি স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ। যেটাতে স্পষ্ট হয়েছে একাত্তরে সাধারণ মানুষের ভূমিকা। ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণে সময়ের একটি চিত্র আমরা পাই। আমি যে বিষয়টি নিয়ে কাজ করছি, তার একটি অন্যতম প্রাথমিক উৎস এই গ্রন্থটি। একাত্তরে সাধারণ ভারতবাসীর বহুমাত্রিক সহযোগিতার এক অনন্য দলিল এই গ্রন্থটি। লেখিকা ভূমিকায়

সে কথায় লিখেছেন, “বইটাতে তখনকার একটা মোটামুটি ইতিহাস রয়ে গেল, পরবর্তী বংশধরেরা পড়ে অন্ততঃ কিছুটা জানতে পারবে যে, ভারত সরকার ও ব্যক্তিগতভাবে ভারতীয়েরা বাংলাদেশের বেদনাকে, যন্ত্রণাকে কতখানি নিজের করে নিয়েছিল।”

মৈত্রেয়ী দেবী সাতচল্লিশের পর দুই বাংলার দূরত্ব, দাঙ্গা-রক্ত, আর সেসবের প্রেক্ষিত তুলে ধরেছেন। লিখেছেন, এসময় কলকাতা পরিণত হয়েছিল গুজব আর দাঙ্গার শহরে। স্বীকার করেছেন পূর্ববঙ্গ নিয়ে পশ্চিমবাংলায় এই সময় যে অসন্তোষ আর অনাগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল তার কথা। একাত্তর সাধারণ পশ্চিমবঙ্গবাসীর মনোজগতে নতুনভাবে অভিঘাত হানে। ভুলতে বসা পূর্ববঙ্গের স্মৃতিতে, জন্মভূমির টানে উদ্বেলিত হয়। সেই উদ্বেলিত ঢেউ ছুঁয়ে গিয়েছিল সব ধরণের মানুষকে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর যশোরে যাওয়া, মেডিক্যাল ক্যাম্প করা, মুক্তিবাহিনীকে সহায়তা করা, ত্রাণ সরবরাহ করা, আশ্রয় প্রদান একাত্তরে সাধারণের সহযোগিতার এক অনন্য দলিল। সাধারণের সহায়তায় নানা বর্ণনা অসাধারণভাবে তুলে ধরেছেন লেখিকা, “তখন অনেক বাড়িতেই চিড়ে মুড়ির মোয়া, নিমকি, খাজা ইত্যাদির প্যাকেট তৈরি হচ্ছিল। আর শার্ট কম্বল ইত্যাদি যোগাড় হচ্ছিল নানা স্থান থেকে।”[৪৭]

মুর্শিদাবাদের লালগোলা ক্যাম্পের স্মৃতি, শরণার্থী শিশুদের বেদনা, পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশে আগমন সবকিছু মিলিয়ে এই স্মৃতিকথা মুক্তিযুদ্ধের এক অনবদ্য কাহিনি।

ঢাকার *দৈনিক সংবাদের* কলকাতা প্রতিনিধি অমর সাহা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের রজত জয়ন্তীতে *কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।[৪৮] একাত্তরের সাথে সম্পৃক্ত ৫৮ জন সাধারণ পশ্চিমবঙ্গবাসীর এই স্মৃতিচারণে উঠে এসেছে একাত্তরে তাদের ভূমিকা, মুক্তিসংগ্রামের নানা দিক। লেখক একাত্তরের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত পশ্চিমবঙ্গের প্রায় অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন। যাদের মধ্যে অনেকেই এখন প্রয়াত। অন্নদাশঙ্কর রায়, বিজয় সিংহ নাহার, দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়, গোবিন্দ হালদার, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ইলা মিত্র, অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী, তরুণ স্যানাল, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, অংশু শূর, পিসি সরকার (জুনিয়র) সহ একাত্তরের পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ সংগঠক, সহযোগিদের স্মৃতিচারণে উঠে এসেছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারত শিরোনামে পশ্চিমবঙ্গের রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগি অধ্যাপক আশীষ কুমার দাস উচ্চতর গবেষণা(পিএইচডি) করেছেন।[৪৯] তাঁর গবেষণা ২০১৬ সালে কলকাতার লাকী পাবলিশার্স থেকে গ্রন্থাকারে বের হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের ভূমিকা বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের কিছু কর্মকান্ডের বর্ণনা এই গবেষণায় উঠে এসেছে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি

প্রদান, মুজিবের মুক্তি, আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টিতে বেসরকারি ভূমিকা, নাগরিক পর্যায়ে বিভিন্ন সেবার সহযোগিতার কথা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। তবে সেটা খুবই অপ্রতুল ও বিক্ষিপ্ত। লেখকের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সামগ্রিক গবেষণায় প্রভাব বিস্তার করেছে। ফলে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের নানা তৎপরতাকে কৌশলে পরিহার করে সিপিআইএমকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়াও অধিকাংশ তথ্যই পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রিক সংবাদপত্র নির্ভর।

মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় আসামের শিলচরের বড়ভাইল গ্রামে যাই। শিলচর থেকে প্রকাশিত *সাপ্তাহিক আজাদ* পত্রিকার খোঁজে। পত্রিকাটি একাত্তরে আসাম থেকে প্রকাশিত একমাত্র মুসলিম সম্পাদিত পত্রিকা। আসাম থেকে স্থানীয় অনেকগুলি পত্রিকা সংগ্রহ করলেও এই পত্রিকাটির প্রতি আমার বিশেষ একটি আগ্রহ ছিল। আগ্রহের কারণ, বরাক ভ্যালিতে অধিকাংশ সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে মুক্তিযুদ্ধে স্থানীয় মুসলমানদের অসহযোগিতার কথা। পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেছে অনেকদিন আগে। নানা তথ্য নিয়ে পত্রিকার সম্পাদক হুরমত আলী বড় লস্করের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হই। ঘুণে ধরা পুরানো ফাইল খুঁজতে গিয়ে খুঁজে পাই দুস্পাপ্য একটি গ্রন্থ *অশ্রু হল বারুদ*।[৫০] দেবব্রত ভট্টাচার্য, বাসব দাসগুপ্ত, বিকাশ সরকার সম্পাদিত এই গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির সম্পৃক্ততা উঠে এসেছে। এটি বাংলাদেশ প্রসঙ্গে একটি মার্কসবাদী মূল্যায়ন। বইটির ভূমিকা লিখেছেন প্রমোদ দাশগুপ্ত। গ্রন্থটিতে একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় মার্কসপন্থীদের বাংলাদেশের স্বপক্ষে নানা কার্যক্রম। তাদের বিভিন্ন জেলা কমিটির তৎপরতা স্থান পেয়েছে। একাত্তরে *গণশক্তি* ও *দেশহিতৈষী* পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু সংবাদ সম্পাদকীয় এতে সংকলন করা হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একটি বামপন্থী রাজনৈতিক দলিল এটি, যেটি প্রকাশ করা হয়েছে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে।

একাত্তরে ভারতের ভূমিকা নিয়ে সালাম আজাদ লিখেছেন *Contribution of India in the war of Liberation of Bangladesh* গ্রন্থটি।[৫১] বের করেছেন বুকওয়েল পাবলিকেশন্স নয়াদিল্লী থেকে ও বাংলাদেশ থেকে অঙ্কুর। আশিস কুমার চক্রবর্তী গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করেছেন। অনুদিত বইটি ২০১০ সালে বের করে ভারতের ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট (NBT)। এটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান না বলে ভারতের সেনাবাহিনীর অবদানের সামগ্রিক গ্রন্থ বললে অধিক যুক্তিযুক্ত হবে।

যদিও লেখক ভূমিকাতে ভিন্ন কথায় বলেছেন, "অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কতটা ঝুঁকি নিয়েছিল তা আমরা জানি। তা ছাড়া ত্রিপুরা পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়ের সাধারণ মানুষ কীভাবে শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছিল সে ব্যাপারে আমরা কোনো তথ্য রাখিনি। আমরা ঐ দিনগুলোর কথা স্মরণ রাখি না

যখন নিজেদের দারিদ্র্য ও দুঃখ দুর্দশা ভুলে গিয়ে এই, মানুষগুলো বাংলাদেশের অসহায় মানুষদের সঙ্গে খাবার ভাগ করে নিয়েছিল।" দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদানকে লিপিবদ্ধ করা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস তুলে আনার জন্য তাঁর চেষ্টার কথা লেখক তুলে ধরেছেন, "১৯৯৪ সাল থেকে খুব পরিকল্পনামাফিক না হলেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে কাজ করে চলেছি। যে সামরিক ও অসামরিক আধিকারিকরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং ঐ সময় বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে পারিনি, কারণ তা ছিল অসম্ভব। তাছাড়া তাঁদের অনেকেই আজ জীবিত নেই। তবে আমি দিল্লি, কলকাতা, আগরতলা ও ভারতের বহু স্থানে দু-শো জন ভারতীয় নাগরিকের সাক্ষাৎকার নিতে পেরেছি। তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর সদস্য, রাজনীতিবিদ, ভারতের পররাষ্ট্র বিভাগের সদস্য, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী, লেখক, বুদ্ধিজীবী, সঙ্গীতশিল্পী, চিকিৎসক, রেডক্রসকর্মী, বেসরকারি সংস্থার কর্মী, সাধারণ মানুষ এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আহত সৈনিক।"[৫২]

বইটির ১৪০ পৃষ্ঠা জুড়ে নিহত ভারতীয় সেনাদের তালিকা, বড় একটি অংশ জুড়ে দেশ ভাগ, প্রাক-স্বাধীনতা আন্দোলন, স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের সহায়তার বর্ণনা। পঞ্চম অধ্যায়ে খুব সীমিত আকারে সাধারণ মানুষের সহযোগিতার কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে ভারতের বহুমাত্রিক ভূমিকা, কর্মকাণ্ডের তেমন কোন নতুন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

২০১৬ সালের ডিসেম্বর *সিনার্জি বুকস* বের করে সালাম আজাদের *Contribution of Assam in the Liberation War of Bangladesh* গ্রন্থটি।[৫৩] এতে একাত্তরে আসাম ও মেঘালয়ের (একাত্তরে দুটি মিলে এক রাজ্য ছিল) ভূমিকা, মুক্তিযুদ্ধের এই অঞ্চলের নানা তৎপরতা, শরণার্থী ও যুদ্ধের বর্ণনা এতে উঠে এসেছে। সাধারণের ভূমিকা যথারীতি এই গ্রন্থেও উপেক্ষিত।

মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরার ভূমিকা নিয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি কাজ হয়েছে। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ে একটি পিএইচডি গবেষণা হয়েছে। স্থানীয় রামঠাকুর কলেজের শিক্ষক মুজাহিদুল ইসলামের সেই অভিসন্দর্ভটি গ্রন্থকারে বের হয়েছে। মূলত স্থানীয় *দৈনিক সংবাদের* উপর ভিত্তি করে কাজটি করা। ত্রিপুরার নাগরিকদের ভূমিকা, সাধারণের বহুবিধ কার্যাবলী লেখক এড়িয়ে গেছেন। উৎস ব্যবহারেও লেখকের অনীহা লক্ষণীয়। রাজনৈতিক ইতিহাসটা উঠে আসলেও রাজ্যের নানা প্রান্তের সাধারণের ভূমিকা এই অভিসন্দর্ভে পাওয়া যায় না। হারুন হাবীবের *ডেটলাইন আগরতলা* ত্রিপুরার অবদানের সবচেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ।[৫৪] পুরো রাজ্যভিত্তিক না হলেও আগরতলাভিত্তিক একটি ভালো বর্ণনা এতে পাওয়া যায়। আবুল

আজাদের *মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরার সংবাদপত্রের ভূমিকা*, বিকচ চৌধুরীর *লক্ষ মুঠিতে ঝড়ের ঠিকানা*[৫৫] কিংবা আমার গ্রন্থ *মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরা: শরণার্থী, সংবাদপত্র মানুষ*[৫৬] এ সাধারণের ভূমিকার কিছু তথ্যসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। একাত্তরে ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত *দৈনিক সংবাদ ও সাপ্তাহিক জাগরণের* সংকলন করেছেন সুকুমার বিশ্বাস *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে আগরতলা ত্রিপুরা দলিলপত্র*[৫৭] শিরোনামে। কল্যানব্রত চক্রবর্তী একাত্তরের পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত নিবন্ধগুলোর সংকলন বের করেছিলেন *ওপারে একাত্তর*[৫৮]। যেগুলো ত্রিপুরার উপর কাজ করার প্রাথমিক সূত্র। ফজলুল বারী লিখেছেন *একাত্তরে আগরতলা*[৫৯], সালাম আজাদের *Contribution of Tripura in Liberation War of Bangladesh*[৬০] এর কথা স্মরণ করা যেতে পারে, যেগুলোতে দ্বৈতয়িক কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

আমার গবেষণার অন্তিম পর্যায়ে ২০১৮ অমর একুশে গ্রন্থমেলায় গবেষক হারুণ হাবীবের তিনখণ্ডে *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত তথ্য ও দলিল পশ্চিমবঙ্গ*[৬১], *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত তথ্য ও দলিল ত্রিপুরা*[৬২], *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত তথ্য ও দলিল আসাম মেঘালয়*[৬৩] প্রকাশিত হয়েছে। সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলো নিয়ে এই ধরণের সামগ্রিক প্রচেষ্টা প্রথম। কিন্তু গ্রন্থগুলোতে সেই অর্থে কোন নতুন তথ্য কিংবা দলিল পাওয়া যায় না। তিনখণ্ডের প্রত্যেকটিতেই প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠা জুড়ে একই তথ্য ও দলিল ব্যবহার করা হয়েছে। যেখানে সীমান্ত রাজ্যগুলোর রাজ্য সভার কিছু বাংলাদেশ বিষয়ক প্রসিডিংস, সংবাদপত্রের বিক্ষিপ্ত তথ্য ও দলিল ও সাক্ষাৎকার রয়েছে। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয় কিংবা ত্রিপুরার কোন ধরনের সম্পৃক্ততা উঠে আসেনি।

কিছু স্মৃতিকথা, আত্মজীবনীমূলক বই বের হয়েছে। যেগুলো প্রাথমিক উৎস হিসেবে আমার গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে। মেঘালয়ের অঞ্জলি লাহিড়ীর *স্মৃতি ও কথা ১৯৭১*[৬৪] তার অন্যতম। এছাড়া সুখেন্দু সেনের *শরণার্থী ১৯৭১*[৬৫] ইদরিস আলমের *আমরা তখন যুদ্ধে*[৬৬] গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধে আসাম ও মেঘালয়ের শরণার্থী ক্যাম্পের জীবন ও সাধারণের সম্পৃক্ততার বর্ণনা পাওয়া যায়। আনিসুজ্জামান, এ. আর. মল্লিক, বুলবুল মহালনবীশ, ধীরাজ কুমার নাথের একাত্তরের স্মৃতিকথায় পশ্চিমবঙ্গের অনেক তথ্য পাওয়া যায়।[৬৭] মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ও মেঘালয়ে কাজ করার সময় বেশ কয়েকটি লিফলেট, পোস্টার, শরণার্থীদের সহায়তায় আয়োজিত বিচিত্রানুষ্ঠানের টিকেট, যাত্রার টিকেট, বাংলাদেশ তহবিলে ত্রাণ প্রদানের রশিদ সংগ্রহ সম্ভব হয়েছে।[৬৮] খুঁজে পেয়েছি বাংলাদেশের সহায়তায় গড়ে উঠা বিভিন্ন সহায়ক সমিতির নানা কাগজপত্র। তাদের পোস্টার, লিফলেট। একাত্তরে বাংলাদেশের শরণার্থী ও

মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেছিল এমন অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের সেই বছরের বার্ষিক কার্যবিবরণী দেখার সুযোগ হয়েছে।[৬৯] ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, আগরতলার জিবি হাসপাতাল, বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাত্তরের দলিলপত্র দেখার সুযোগ আমার গবেষণার ভিত্তিকে শক্ত কাঠামো দান করেছে বলে আমার বিশ্বাস। রেডক্রস ও রোটারি ক্লাবের কাছ থেকে একাত্তরের তাদের কার্যক্রমের সব তথ্য পেয়েছি। যেগুলোতে সেই সময় যারা এসব প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছেন কিংবা অনুদান দিয়েছেন তাদের তালিকা রয়েছে। সাধারণের সম্পৃক্ততা বুঝতে যেগুলো সহায়ক হয়েছে। আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরায় বেশ কয়েকাট জেলা ভিত্তিক প্রান্তিক সংবাদপত্র, সাময়িকী সংগ্রহ সম্ভব হয়েছে। যেগুলোতে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলো থেকে সংগৃহীত প্রায় ৩০০ আলোকচিত্র (যেগুলো আগে কোথাও প্রকাশিত হয়নি) প্রাথমিক উৎস হিসেবে আমার অভিসন্দর্ভ রচনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।[৭০]

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধে ভারতের প্রান্তিক জনগণের যে ভূমিকা সেটার যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি। সে বিষয়টি উঠে আসেনি। আমি গত কয়েক বছর ধরে সংবাদপত্র, ব্লগ, অনলাইনে লিখে মুক্তিযুদ্ধের আপাত বিচ্ছিন্ন সে ন্যারেটিভগুলো তুলে আনার চেষ্টা করছি।[৭১] চেষ্টা করেছি প্রায় বিছিন্ন এসব ন্যারেটিভ গুলোর মধ্য দিয়ে বিভিন্নভাবে তৃণমূলের সম্পৃক্ততা তুলে আনার।

পেশাদার এবং অপেশাদার ইতিহাসবিদসহ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে ইতিমধ্যে বেশ কিছু বই লেখা হয়েছে। কিন্তু বেশির ভাগ ইতিহাসবিদই নিজেদের যুক্ত করেছেন আবেগের সঙ্গে। সেই জায়গা থেকে বের হয়ে তৃণমূলের ইতিহাস রচনার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে জনযুদ্ধে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ও ভারতের চারটি সীমান্ত রাজ্যের সাধারণের সম্পৃক্ততা তুলে আনার প্রচেষ্টা এই অভিসন্দর্ভ।

২.২ গবেষণার পরিধি

এই গবেষণার পরিধি একাত্তরের ২৬ মার্চ থেকে শুরু করে ডিসেম্বর পর্যন্ত। ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের পরও শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের সময় সাধারণ মানুষের সহায়তা ছিল। যদিও সীমান্তবর্তী এলাকায় শরণার্থীদের গ্রহণ করার যে ক্ষেত্র সেটি দিনে দিনে তৈরি হয়নি। একটি সুদীর্ঘ প্রেক্ষাপট, ইতিহাস এই ক্ষেত্রটি তৈরি করেছে। তাই স্বভাবতই ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ মুক্তিসংগ্রামের ঘটনাপঞ্জিকে আমি একটি টাইমলাইনে বিবেচনা করলেও এর প্রেক্ষিত ঘটনাপ্রবাহের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। সীমান্তবর্তী রাজ্যের সাধারণ মানুষের ভূমিকা মূল্যায়নে নয় মাসে তাদের সহযোগিতা, সহমর্মিতার

ঘটনাপ্রবাহ বর্ণনা করা যাবে। কিন্তু এই মানবিকতা-সহমর্মিতার যে তত্ত্বকথা, সেটির পরিধি অনেক গভীরে। এই সীমান্তরাজ্যগুলোর ইতিহাস, নৃতত্ত্ব ও ভূগোল যেমন এটাকে সুদীর্ঘ সময় ধরে নিয়ন্ত্রণ করেছে, ঠিক তেমনি রাজনৈতিক নানা ঘটনাপঞ্জি এই অঞ্চলগুলোর মানসে প্রভাব ফেলেছে।

একাত্তরে এই জনপদে যে যুদ্ধ সেটির গভীরতা ও পরিধি অনেক বিস্তৃত। বিস্তৃত এর শাখা-প্রশাখা। মূলত একাত্তরের যে জনযুদ্ধ, সেটি পাকিস্তান আর বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। নানাভাবে বৈশ্বিক শক্তিগুলো এতে জড়িয়ে পড়েছিল। অনুরূপভাবে প্রতিবেশি ভারত ও নিজেকে পুরোপুরি সম্পৃক্ত করেছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে, পরিণত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম একটি পক্ষে। অভিসন্দর্ভে ভারতের সম্পৃক্ততার সেই রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে নজর দিইনি। জনমানুষের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণকে প্রাধান্য দিয়ে জনযুদ্ধের প্রেক্ষিত দেখাতে চেয়েছি। গবেষণার তত্ত্বকথায় স্পষ্ট করতে চেয়েছি সীমান্তবর্তী এলাকায় এক মানবিক ভারতকে। সীমান্তবর্তী চারটি রাজ্যের প্রায় সাড়ে ছয় কোটি সাধারণ মানুষের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে। যাদের মানবিক স্পর্শে প্রায় এককোটি শরণার্থী পেয়েছিল আশ্রয় আর সহায়তা। রণাঙ্গণের অকুতোভয় যোদ্ধা পেয়েছিল সংগ্রামের প্রেরণা, গেরিলা যোদ্ধাটা পেয়েছিল আত্মরক্ষার কবচ।

আমার গবেষণার পরিধি সীমাবদ্ধ একাত্তরে, সীমাবদ্ধ সীমান্তের চার রাজ্যে। সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোর মধ্যে একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা সরাসরি সম্পৃক্ত হয়েছিল মুক্তিসংগ্রামে। ভোগোলিক অবস্থান ও নৃতাত্ত্বিক কারণে সীমান্তবর্তী হওয়া সত্ত্বেও মিজোরামে শরণার্থী আগমন ছিল সীমাবদ্ধ। সেজন্য গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে এই রাজ্যকে বাইরে রেখে অবশিষ্ট চারটি সীমান্তরাজ্যে সমীক্ষা চালানো হয়েছে।

চারচি রাজ্যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভিন্ন এক আবেগ দেখা গিয়েছে। যেটার ক্ষেত্র মূলত তৈরি করে দিয়েছিল দেশভাগ। কিংবা দুই বঙ্গের সুদীর্ঘকাল একসাথে থাকার স্মৃতি। তাই স্বভাবতই সেই ইতিহাসের ধারাপাত মাথায় রেখে স্মৃতি নির্ভর বাচনিক ইতিহাস আমার অভিসন্দর্ভ। ইতিহাসে সবসময় উপেক্ষিত সাধারণ জনতা। আমি তৃণমূলের সেই ইতিহাস তুলে আনার চেষ্টা করেছি। মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় গৃহবধূ, ছাত্র, শিক্ষক, চায়ের দোকানদার, দিনমজুর, শ্রমিক থেকে শুরু করে সমাজের নানা স্তরের সম্পৃক্ততা একাত্তরের স্মৃতি, সম্পৃক্ততা, অভিজ্ঞতা জানার চেষ্টা করেছি। স্থানীয় পত্রপত্রিকা, ম্যাগাজিন ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের সাক্ষাৎকার নিয়ে সেসব বাচনিক ইতিহাসের বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ণয় করেছি। একসময়ের আশ্রিত শরণার্থীদের আবার খুঁজে সেই অতীতকে জাগানোর চেষ্টা করেছি।

২.৩ **গবেষণার** সীমাবদ্ধতা

সাধারণ প্রবণতার বাইরে এসে মুক্তিযুদ্ধকে অন্য আলোয় দেখার চেষ্টা থেকে আমার গবেষণার শুরু। মূল উৎস হচ্ছে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা, যেগুলো প্রকাশ হয়েছে আবার সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে। যেগুলোতে সাধারণের নানাধরনের সম্পৃক্ততা, সহায়তা, উদ্যেগ উঠে এসেছে। সংবাদপত্রগুলোর মূল সমস্যা হচ্ছে এদের মধ্যে অনেকগুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের, গোষ্ঠীর মতাদর্শ লালন করত। ফলে অনেকক্ষেত্রে নির্মোহভাবে সবার সম্পৃক্ততা উঠে আসেনি। যেমন- পশ্চিমবঙ্গে একাত্তরে যেসব পত্রিকা বের হতো তার মধ্যে মূল দুটি পত্রিকা ছিল ক্ষমতাসীন কংগ্রেস প্রভাবিত *আনন্দবাজার ও যুগান্তর*। *গণশক্তি* ছিল সিপিএম প্রভাবিত, *কালান্তর ও সপ্তাহ* ছিল সিপিআই এর মুখপাত্র। অন্যদিকে ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত *সংবাদ* ছিল কংগ্রেসের, *দেশের ডাক* সিপিএমের। রাজনৈতিক দলের বাইরে আবার পত্র-পত্রিকাগুলোর সাথে ভারতীয় সেনাবাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থার সম্পৃক্ততার তথ্য উঠে এসেছে। যেমন– আগরতলা থেকে প্রকাশিত *দৈনিক সংবাদের* সার্কুলেশন একাত্তরে প্রায় ২০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৭২] হেলিকাপ্টারে করে গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তায় এই পত্রিকাটি অবরুদ্ধ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় ফেলা হতো এমন তথ্যের সত্যতা পাওয়া গেছে।[৭৩] অন্যদিকে আসামের শিলচর থেকে প্রকাশ হতো *আজাদ*। সেটিতে মূলত বরাক অঞ্চলের মুসলমানদের সম্পৃক্ততার কথা উঠে এসেছে। কারণ– সেসময় স্থানীয় অন্যান্য পত্র-পত্রিকাগুলো মুসলমানদের সম্পৃক্ততাকে নেতিবাচকভাবে তুলে ধরছিল। তাই স্বভাবতই দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক এসব গণমাধ্যমের তথ্যগুলো গ্রহণ-বর্জনে যথেষ্ট সতর্কতা প্রয়োজন।

আমি মূলত স্মৃতি নির্ভর কথ্য ইতিহাসের ভিত্তিতে গবেষণার কাঠামো তৈরি করেছি। আমার সেই স্মৃতি নির্ভর কথ্য ইতিহাস, স্মৃতির আশ্রয়ে পথ চল, বেশ দুরুহ ছিল। যদিও চেষ্টা করেছি সেসব স্মৃতি ক্রস চেক করার। স্মৃতি নির্ভর ইতিহাসের প্রথম প্রয়াস এসব অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পৃক্তদের স্মৃতিকথা। যেগুলোর কয়েকটিতে আবার অতিরিক্ত স্মৃতিশক্তি উঠে এসেছে। অনাবশ্যক এসব স্মৃতি পাঠক, গবেষককে ক্লান্ত করে দেয়। এসব স্মৃতিকথায় লেখক নিজেকে মহিমান্বিত করার চেষ্টা করেছেন অনেকাংশে। তবে নির্মোহ বেশ কয়েকটি স্মৃতিকথা, ডায়েরি প্রাথমিক উৎস হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আমি সাক্ষাৎকারকে গুরুত্ব দিয়েছি। সীমান্ত এলাকার চায়ের দোকান, হাট-বাজার ঘুরে প্রান্তিক মানুষের স্মৃতিতে একাত্তর কে বোঝার চেষ্টা করেছি। ভিন দেশের প্রত্যন্ত এলাকার প্রান্তিক মানুষগুলোর তথ্য গুলো অনেকক্ষেত্রে বাস্তবতার সাথে খাপ খায়নি। আমি ঘটনাপ্রবাহের সাড়ে চার দশক পর স্মৃতির

শরণাপন্ন হয়েছি, ইতিহাসের কালসীমায় সময়টা নিতান্তই ছোট হলেও এই কালরেখায় সংশ্লিষ্ট লোকগুলোর মনোজগতে অনেক বিষয় অভিঘাত হেনেছে, যা স্বাভাবিকভাবেই তাদের স্মৃতিতে প্রভাব ফেলেছে। সাক্ষাৎকারগুলোর আরেকটি সমস্যা সেসময় তাদের আশ্রয়ের থাকা উদ্বাস্তুদের সাক্ষাৎকার নিয়ে বিষয়টি ক্রসচেকের। সেটা করেছি, তবে আমার মনে হয়েছে সেটা আরো বৃহৎ পরিসরে করার সুযোগ ছিল।

সাক্ষ্য আইনে বলা হয়, সবচেয়ে ভালো সাক্ষ্য হলো-প্রত্যক্ষ সাক্ষীর সাক্ষ্য। অর্থাৎ ঘটনার পাত্র-পাত্রীর জবানবন্দি বা প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান।[৭৪] কিন্তু স্বাধীনতার সাড়ে চার দশক পর সেই প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকেই চলে গেছেন। আবার অনেকের সাক্ষ্য আমি নিয়েছি। কিন্তু ইতোমধ্যে প্রয়াত হয়েছেন, যেমন-ত্রিপুরার রবীন সেন গুপ্ত, খগেন দাস, বি. কে. চ্যাটার্জি, নীলমনি দাস গুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গের তরুণ স্যানাল, বরাকের কামাল উদ্দীন আহমেদ।

তবে কথ্য ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে ইতিহাস রচনায় সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত 'মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা'।[৭৫] মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালনকারী বিদেশি বন্ধুদের দেওয়া এই সম্মাননা আমার গবেষণার নানা পর্যায়ে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরছি। যেগুলোতে আমার প্রতিবন্ধকতার ধরণ স্পষ্ট হবে। আগরতলার ক্যাপ্টেন বি. আর চ্যাটার্জি একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। আগরতলার অনেককেই মৈত্রী সম্মাননা দেওয়া হয়েছে, এটা নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় না থাকা সত্ত্বেও অনেকেই সম্মানিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি সম্মানটি পাননি, শয্যাশায়ী অবস্থায় যখন তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে গেলাম, তিনি অভিমানে কথাই বলছেন না। সেই অভিমান বুকে নিয়েই বিদায় নিলেন মুক্তিযুদ্ধের এই অকৃত্রিম বন্ধু। আসামের শিলচরের অতীন দাস, যার কবিতা 'সুরমার স্মৃতি' একাত্তরে দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়ের কণ্ঠে আকাশবাণীতে ঝড় তুলেছিল।

"সুরমার কূলে কূলে ফুলে ফুলে ভরা যেই মাঠ
আমি তার একদা সম্রাট
কত মমতার স্মৃতি কত স্বপ্নের– হায় তবু ফেলে আসি
সুরমার তীরে আমি, ভীরু এক জীবন বিলাসী।"[৭৬]

যাকে নিয়ে একাত্তরে কবি দিলওয়ার লিখেছিলেন 'অতীন তোমাকে'।

বরাকের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম এই সংগঠকের কণ্ঠেও অভিমান আর ক্ষোভ। সেই ক্ষোভ আর অভিমান ক্রমাগত বেড়েছে বরাক থেকে নদীয়া, পশ্চিম দিনাজপুর। যেটি মাঠ পর্যায়ের তথ্যসংগ্রহে একটি প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করেছে। বরাকে ব্যারিস্টার মুজাম্মিল আলী লস্করকে সম্মাননা দেওয়ায় ক্ষুদ্ধ হয়েছে স্থানীয় মুক্তিযুদ্ধের সুহৃদরা।[৭৭] তারা কাছাড়ে মুক্তিযুদ্ধে অবদানকারীদের ভূমিকা নিয়ে বের করেছে পুস্তিকা। আবার অনেকেই আমাকে মনে করেছে সম্মাননার জন্য তথ্যসংগ্রহ করতে গিয়েছি। ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাকে তথ্য-দলিল দিয়ে সাহায্য করেছে। আবার অনেকে সম্মাননার আশায় বাড়তি কিছু তথ্যও যোগ করেছেন।

অভিসন্দর্ভটি মূলত ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলো নিয়ে আমার অভিজ্ঞতার একটি বিবরণ। তবে এই বিবরণ ইতিহাসের নিয়ম মেনেই তৈরি করেছে। একাত্তর পরবর্তী প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে জাতীয়তাবাদী আবেগে মোহবিষ্ট ছিলাম তা অস্বীকার করছি না। কিন্তু নির্মোহভাবে চেষ্টা করেছি সীমান্তরাজ্যগুলোতে প্রাপ্ত প্রাথমিক ও দ্বৈতয়িক তথ্যগুলোর সমন্বয়ে জন ইতিহাসটাকে তুলে আনার।

ঐতিহাসিককে ইতিহাস রচনার জন্য নির্মোহ, পক্ষপাতশূন্য ও আবেগবর্জিত হতে হবে, তা নাহলে তিনি বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনা করতে পারবেন না। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, আমি কি তা হতে পেরেছি? আমার পক্ষে কি বস্তুনিষ্ঠ বা নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাস রচনা করা সম্ভব? ইতিহাস কি বস্তুনিষ্ঠ হতে পারে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর এককথায় দিতে হলে বলব- না, ইতিহাস সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ হতে পারে না; আর আমার পক্ষেও সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক হওয়াটা যেন সাধ্যাতীত কার্যসম, আর হবেনই বা কি করে আমিও তো একজন মানুষ। তাই আমার মধ্যে আবেগ, ক্ষোভ, পক্ষপাতিত্ব করার মানসিকতা ইত্যাদি তো থাকাই স্বাভাবিক। সবসময় একই দৃষ্টিতে আমি ইতিহাসকে খুজেঁ এনেছি এমনটা ভাবা নিতান্তই অমূলক, কারণ ইতিহাস রচনায় আমি সমসাময়িক সময় দ্বারা কিছুটা হলেও প্রভাবিত হয়েছি। যুগের সাথে সাথে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন হয়। আর তাই গোলাপের যুদ্ধকে বর্ণনা করতে হলে আধুনিক যুদ্ধের প্রতিচ্ছবিটা ঐতিহাসিকের মাথায় আসতেই পারে। একজন ঐতিহাসিকের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ তার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও তাকে অবশ্যই প্রভাবিত করে। তাই ঐতিহাসিক E. H. Carr বলেছেন, “Before you study the history study the historian. Before you study the historian study his historical and social environment.”[৭৮] তাই তথ্যকে অনুধাবন করার আগে আমাদের উচিৎ ঐতিহাসিককে অনুধাবন করা।

৩. সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহের ভৌগোলিক পরিচয়

ভৌগোলিক আয়তনের বিচারে ভারত দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম এবং বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম রাষ্ট্র। অন্যদিকে জনসংখ্যার বিচারে এটি বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বাধিক জনবহুল রাষ্ট্র। ভারতের পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তান, উত্তর-পূর্বে চীন, নেপাল ও ভূটান এবং পূর্বে বাংলাদেশ, মায়ানমার ও মালয়েশিয়া অবস্থিত। এছাড়া মহাসাগরে অবস্থিত শ্রীলঙ্কা মালদ্বীপ ও ইন্দোনেশিয়া ভারতের নিকটবর্তী কয়েকটি দ্বীপ রাষ্ট্র।[৭৯] সীমান্তবর্তী এসব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় স্থল সীমান্ত বাংলাদেশের সাথে।

সারণি ১: বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে ভারতের সীমান্ত[৮০]

বাংলাদেশ	৪০৯৬.৭ কিলোমিটার
চীন	৩৪৮৮ কিলোমিটার
পাকিস্তান	৩৩২৩ কিলোমিটার
নেপাল	১৭৫১ কিলোমিটার
মায়ানমার	১৬৪৩ কিলোমিটার
ভূটান	৬৯৯ কিলোমিটার
আফগানিস্তান	১০৬ কিলোমিটার
মোট	১৫১০৬.৭ কিলোমিটার

ভারত-বাংলাদেশের যে সুদীর্ঘ স্থল সীমান্ত, সেটি বিশ্বের পঞ্চম দীর্ঘ স্থল সীমান্ত। এই সীমান্ত ঘেঁষে ভারতের পাঁচটি রাজ্য রয়েছে, যেগুলোকে সীমান্তবর্তী রাজ্য হিসেবে অভিহিত করেছি।

সারণি ২: সীমান্তবর্তী রাজ্য সমূহের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত[৮১]

পশ্চিমবঙ্গ	২২১৭ কিলোমিটার

আসাম	২৬২ কিলোমিটার
ত্রিপুরা	৪৫৬ কিলোমিটার
মিজোরাম	৩১৮ কিলোমিটার
মেঘালয়	৪৪৩ কিলোমিটার
মোট	৪০৯৬ কিলোমিটার

এই সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ সীমান্ত পশ্চিমবঙ্গের সাথে। আর আত্মিক সম্পর্কটিও সবচেয়ে বেশি এই রাজ্যের সাথে। এই পশ্চিমবঙ্গের বড় একটি অংশ একসময় পূর্ববঙ্গের সাথেই সংযুক্ত ছিল। অভিন্ন সেই বাংলাদেশের বর্ণনা পাওয়া যায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের *বঙ্গ পরিচয়* গ্রন্থের ১ম খণ্ডে। এখানে তিনি বাংলাদেশের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখছেন, "ভারত সাম্রজ্যের অন্তগর্ত প্রধান দশটি প্রদেশের অন্যতম হইতেছে বঙ্গদেশ। মানচিত্রে বঙ্গদেশের যে ছবি আমরা আজ দেখিতেছি, বরাবর তাহার সে রুপ ছিল না। প্রাচীনকালে বঙ্গ বলিতে বুঝাইত পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গের নাম বরেন্দ্রভূমি বা বারীন্দ্র– গৌড় নামেও পরিচিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গের নাম ছিল রাঢ়, মধ্যবঙ্গকে বলিত বাগড়ী, এই নামগুলিও যে সর্বদা প্রচলিত ছিল, তাহাও নহে... ।"[৮২] বঙ্গ বা বাংলা নামের সঠিক উৎস অজ্ঞাত। এই নামের উৎস সম্পর্কে একাধিক মতবাদ প্রচলিত। তবে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারতের বাংলা প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল স্বাধীন ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ নামকরণ করা হয়। পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে পাকিস্তানের অংশ হয়।[৮৩] বঙ্গবিভক্তির ফলে দুই বঙ্গের বিপুল সংখ্যক লোক অভিবাসী হয়।

সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোর মধ্যে একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা সরাসরি সম্পৃক্ত হয়েছিল মুক্তিসংগ্রামে। মিজোরামের সাথে যদিও বাংলাদেশের ৩১৮ কিলোমিটারের সীমান্ত, কিন্তু এই পাহাড়ী সীমান্তে শরণার্থী প্রবেশ ছিল খুবই সীমিত। জাতিতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক বৈসাদৃশ্যের কারণে শরণার্থীরা সীমান্তবর্তী এই রাজ্যে আশ্রয় নেয়ার খুব একটা চেষ্টা করেনি। তবে চট্টগ্রামের বান্দরবানের রুমা বাজার হয়ে চট্টগ্রামের কয়েক হাজার শরণার্থীর মিজোরামে শরণার্থী হওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়।[৮৪]

সারণি ৩: সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে একাত্তরে শরণার্থী আশ্রয়[৮৫]

পশ্চিমবঙ্গ	৭ ২,৩৫, ৯১৬ জন
আসাম	৩, ৪৭, ৫৫৫ জন
ত্রিপুরা	১৩, ৮১, ৬৪৯ জন
মেঘালয়	৬, ৬৭, ৯৮৬ জন
মোট	৯৬, ৩৩, ১০৬ জন

মোট আশ্রয়কারী শরণার্থীদের প্রায় ৭৩% আশ্রয় নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। আর লোকসংখ্যার অনুপাতে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত ছিল ত্রিপুরা।

সারণি ৪: রাজ্যভিত্তিক জনসংখ্যা ও আয়তন[৮৬]

রাজ্য	১৯৭১ এর আদমশুমারী	২০১১ এর আদমশুমারী	আয়তন(কিমি)
পশ্চিমবঙ্গ	৪, ৪৩, ১২, ০০০	৯, ১২, ৭৬, ১১৫	৮৮৭১২
ত্রিপুরা	১৫, ৫৬, ০০০	৩৬, ৭৩, ৯১৭	১০৪৮৬
আসাম	১, ৪৬, ২৫, ০০০	৩, ১২, ০৫,৫৭৬	৭৮৪৩৮
মেঘালয়	১০, ১২, ০০০	২৯, ৬৬, ৮৮৯	২২৪২৯

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাথে সীমান্তবর্তী ভারতের পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ও মেঘালয়ে একাত্তরে শরণার্থীরা আশ্রয় নিয়েছিলেন। মূলত সে চারটি রাজ্যের সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততা অভিসন্দর্ভের মূল বিষয়।

মানচিত্র ১: মানচিত্রে ভারতের রাজ্য ও রাজধানী

৩.১ পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গ ভারতের উত্তরপূর্ব দিকে অবস্থিত সীমান্তরাজ্য। উত্তরদিকে ভূটান এবং সিকিম রাজ্য দ্বারা, পূর্বদিকে বাংলাদেশ, উত্তরপূর্ব দিকে আসাম রাজ্য, দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে ওড়িশা রাজ্য, উত্তরপশ্চিমে নেপাল এবং পশ্চিমে বিহার রাজ্য দ্বারা বেষ্টিত। দক্ষিণ দিকের পাললিক সমভূমি বিখ্যাত হুগলী নদী এবং তার উপনদীগুলি ময়ূরাক্ষী, দামোদর, কংসাবতী এবং রূপনারায়ণ দ্বারা জলপূর্ণ। উত্তরীয় হিমালয়ে অবস্থিত দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলা খরস্রোতা নদী তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা এবং রঞ্জিৎ নদী দ্বারা জলপূর্ণ। উচ্চতার প্রকারভেদের জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃতি ও জলবায়ুর মধ্যে তারতম্য প্রকাশ পায়।[৮৭] হিমালয়ের পাদদেশের উত্তর পার্বত্য অঞ্চল থেকে সুন্দরবনের ক্রান্তীয় বনাঞ্চল পর্যন্ত, পশ্চিমবঙ্গ হল অপার সৌন্দর্যের এক ভূমি, যার প্রতিটি অঞ্চল একে অপরের থেকে ভিন্ন। আয়তনের দিক দিয়ে, পশ্চিমবঙ্গকে দেশের এক ক্ষুদ্রতম রাজ্য হিসাবে এবং জনসংখ্যার দিক দিয়ে এক বৃহত্তম রাজ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম মহানগরী কলকাতা হল এখানকার রাজধানী; অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহর ও নগরগুলি হল হাওড়া, আসানসোল, দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, খড়গপুর এবং হলদিয়া। পশ্চিমবঙ্গে ২৯৫টি আসন যুক্ত একক-কক্ষ বিশিষ্ট বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্র রয়েছে। রাজ্য থেকে ৫৮ জন সদস্যকে ভারতীয় সংসদে পাঠানো হয়, ১৬ জন সদস্যকে রাজ্যসভায় (উচ্চতর কক্ষে) এবং ৪২ জন সদস্যকে লোকসভায় (নিম্নতর কক্ষে)। স্থানীয় সরকার ২০টি প্রশাসনিক জেলার উপর ভিত্তি করে গঠিত।[৮৮]

ব্যাপকতর অর্থে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসকে কোনভাবেই ভারতের মতো সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি ছোট অঙ্গরাজ্যের ইতিহাস বলা যায় না। এটি বিশ্ব ইতিহাসের একটি উল্লেখনীয় অংশ।

প্রাচীন যুগে এই অঞ্চলটিকে (বর্তমান বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ) বলা হত গঙ্গারিডাই। গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিসের *ইন্ডিকা* গ্রন্থে এই গঙ্গারিডাই রাজত্বের বিবরণ পাওয়া যায়। গঙ্গারিডাই শব্দের অর্থ গঙ্গার সম্পদ। সংস্কৃত ভাষায় একে বলা হয় গঙ্গারাষ্ট্র যার অর্থ হল গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চল। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকে এই রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।[৮৯]

কোনও কোনও গ্রীক ও লাতিন ঐতিহাসিকের মতে গঙ্গারিডাই ও প্রাচী অর্থাৎ প্রাচ্য (নন্দ) সাম্রাজ্যের প্রবল যৌথ প্রতিরোধের আশঙ্কায় মহামতি আলেকজান্ডার ভারত থেকে তাঁর সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। অনেক ঐতিহাসিকের মতে ওডিশার গঙ্গা সাম্রাজ্য ও কর্ণাটকের গঙ্গা সাম্রাজ্য উভয়ই

গঙ্গারিডাই জনগোষ্ঠীর বংশোদ্ভুত যারা দক্ষিণবঙ্গের তমলুক (মেদিনীপুর) থেকে দক্ষিণ ভারতে অভিবাসিত হয়েছিলেন।

মানচিত্র ২: পশ্চিমবঙ্গ

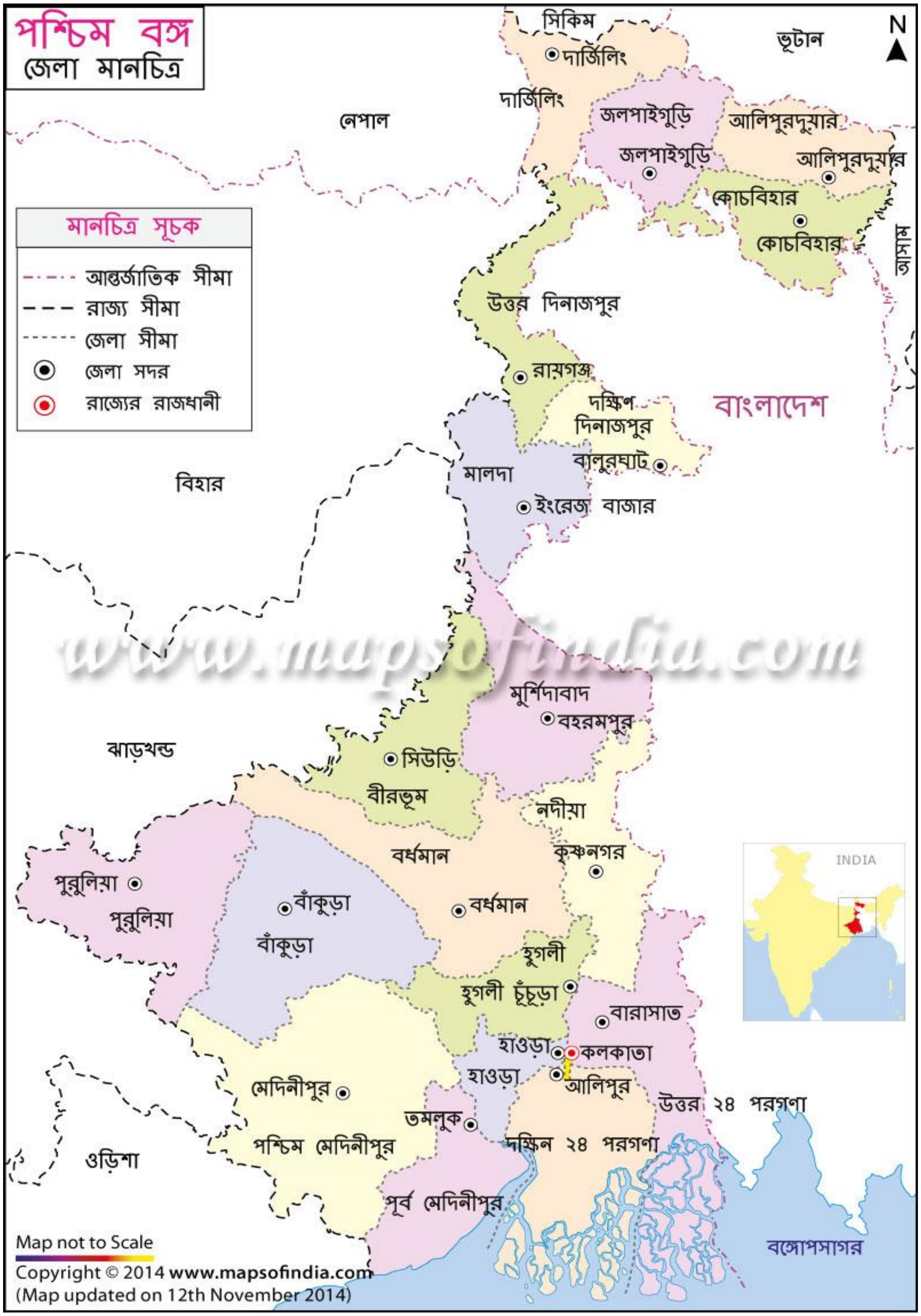

গঙ্গা নগরীর অবস্থান সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যায়নি। চন্দ্রকেতুগড়ে খননকার্যের ফলে পাওয়া প্রমাণাদি থেকে এই অঞ্চল গঙ্গা নগরীর জোরালো দাবিদার হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে। সম্ভবত গঙ্গা নগরী ছিল চন্দ্রকেতুগড়ের বন্দর শহর।[৯০]

সুতরাং স্পষ্ট করে বলা যায়, আলেকজান্ডারের আক্রমণের সময় বাংলার উপর গঙ্গারিদাই নামক এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের শাসন ছিল। অভ্যুত্থানকারী গুপ্ত ও মৌর্যরা কিছুটা হলেও বাংলার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারপর শশাঙ্ক এই বাংলার রাজা হয়ে ওঠেন এবং সপ্তম শতাব্দীর সূচনার মধ্যকালে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন বলে মনে করা হয়। তিনি পাল রাজবংশের প্রদর্শক গোপাল দ্বারা অনুসৃত হন যারা অনেক শতক ধরে এখানে শাসন করেন এবং এখানে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পালদের পরে সেন সাম্রাজ্য আসে দিল্লীর মুসলিম শাসক দ্বারা যাদের শাসনের অবসান হয়। ষোড়শ শতাব্দীর মোঘল আমল পর্যন্ত বাংলা বিভিন্ন মুসলিম শাসক ও রাজাদের দ্বারা শাসিত হয়।[৯১]

কৃষি এই রাজ্যের আয়ের এক মুখ্য ভূমিকা পালন করে এবং রাজ্যের প্রায় চারজনের মধ্যে তিনজন মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির সাথে জড়িত। দেশের পাট উৎপাদনের অধিকাংশ এই রাজ্য থেকে আসে। সেই সঙ্গে এটি চায়েরও একটি প্রধান উৎপাদক। রাজ্যের উৎপাদিত গুরুত্বপূর্ণ ফসলগুলির মধ্যে রয়েছে আলু, তৈলবীজ, পান, তামাক, গম, বার্লি এবং ভুট্টা। এই রাজ্যটি ভারতের মুখ্য ধান উৎপাদিত রাজ্যগুলির মধ্যে এক অন্যতম।[৯২] ডলোমাইট, চুনাপাথর এবং চীনামাটি সহ রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ-পদার্থ উৎপন্ন হয়। এখানে ইস্পাত কারখানা, অটোমোবাইল-উৎপাদন কারখানা এবং বিভিন্ন রাসায়নিক, যন্ত্র-নির্মাণ এবং সূক্ষ-ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থানে ভিন্নতা রয়েছে। রাজ্যটি ভারতের পূর্ব অংশে অবস্থিত; এর পূর্বদিকে বাংলাদেশ অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরদিকে রয়েছে সিকিম ও ভুটান। আসাম রাজ্যটি পশ্চিমবঙ্গের উত্তরপূর্ব দিকে অবস্থান করে আছে। রাজ্যের পশ্চিমদিকে বিহার এবং ঝাড়খণ্ড অবস্থিত। রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান হল ২৩ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। পশ্চিমবঙ্গের মোট আয়তন হল ৮৮,৭৫২ বর্গ কিলোমিটার। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, রাজ্যের জনসংখ্যা হল প্রায় ৯,১২,৭৬,১১৫ জন। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ঘনত্বে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১০২৯ জন।[৯৩] পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার অধিকাংশই বাঙালি। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলি থেকে আগত অধিবাসীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ জনসংখ্যার বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ রয়েছে।

মোট জনসংখ্যার প্রায় তিন চতুর্থাংশ গ্রামে বসবাস করে। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে, তাদের জাতির উৎপত্তির ভিন্নতা ও আদিবাসীসহ, হিন্দু, মোট জনসংখ্যার প্রায় তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি। বাকিদের অধিকাংশই মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। পশ্চিমবঙ্গে ৪০টি স্বীকৃত উপজাতি সম্প্রদায় রয়েছে-তাদের মধ্যে সুপরিচিত হল সাঁওতালী, ওরাওঁ, মূনা, লেপকা এবং ভূটিয়া-যারা মোট জনসংখ্যার দশ ভাগের মধ্যে প্রায়

এক ভাগ নিয়ে রয়েছে। অধিকাংশ মানুষেরই ভাষা হল বাংলা, এর সঙ্গে সংখ্যালঘু ভাষা হিসাবে রয়েছে হিন্দি, উর্দু, নেপালি এবং ইংরেজি।

প্রতিটি জেলার শাসনভার একজন জেলাশাসক বা জেলা কালেক্টরের হাতে ন্যস্ত থাকে। প্রতিটি জেলা মহকুমায় বিভক্ত। মহকুমার শাসনভার মহকুমা-শাসকের হাতে ন্যস্ত থাকে। মহকুমাগুলি আবার ব্লকে বিভক্ত। ব্লকগুলি গঠিত হয়েছে পঞ্চায়েত ও পুরসভা নিয়ে। কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী তথা বৃহত্তম শহর। কলকাতা ভারতের তৃতীয় বৃহৎ মহানগর। এবং বৃহত্তর কলকাতা দেশের তৃতীয় বৃহত্তম নগরাঞ্চল।[৯৪]

সারণি ৫: প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে পাঁচটি বিভাগ ও ২৩টি জেলায় বিভক্ত করা হয়েছে।[৯৫]

বর্ধমান বিভাগ	মালদা বিভাগ	জলপাইগুড়ি বিভাগ	প্রেসিডেন্সি বিভাগ	মেদিনীপুর বিভাগ
পূর্ব বর্ধমান পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম হুগলি	উত্তর দিনাজপুর মালদা মুর্শিদাবাদ দক্ষিণ দিনাজপুর	আলিপুরদুয়ার কালিম্পং কোচবিহার জলপাইগুড়ি দার্জিলিং	উত্তর ২৪ পরগণা কলকাতা দক্ষিণ ২৪ পরগণা নদিয়া হাওড়া	পশ্চিম মেদিনীপুর পুরুলিয়া পূর্ব মেদিনীপুর বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম

উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি রাজ্যের অপর এক অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন মহানগর। শিলিগুড়ি করিডোরে অবস্থিত এই শহর উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে অবশিষ্ট দেশের সংযোগ রক্ষা করছে। আসানসোল ও দুর্গাপুর রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের শিল্পতালুকে অবস্থিত অপর দুটি মহানগর। রাজ্যের অন্যান্য শহরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হাওড়া, রাণীগঞ্জ, হলদিয়া, জলপাইগুড়ি, খড়গপুর, বর্ধমান, দার্জিলিং, মেদিনীপুর, তমলুক, ইংরেজ বাজার ও কোচবিহার।[৯৬]

সারণি ৬: পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জনসংখ্যা ও জনসংখার ঘনত্ব

জেলার নাম	সর্বশেষ আদমশুমারী অনুযায়ী জনসংখ্যা[৯৭]	প্রতিবর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব[৯৮]
বাঁকুড়া	৩,৫৯৬২৯২	৫২৩
বর্ধমান	৭,৭২৩,৬৬৩	১১০০
বীরভূম	৩,৫০২,৩৮৭	৭৭১
দঃ দিনাজপুর	১,৬৭০.৯৩১	৭৫৩
দার্জিলিং	১,৮৪২,০৩৪	৫৮৫
হাওড়া	৪,৮৪১,৬৩৮	৩৩০০
হুগলী	৫,৫২০,৩৮৯	১৭৫৩
জলপাইগুড়ি	৩,৮৬৯,৬৭৫	৬২১
কোচবিহার	২,৮২২,৭৮০	৮৩৩
কলকাতা	৪,৪৮৬,৬৭৯	২৪২৫২
মালদা	৩,৯৯৭,৯৭০	১০৭১
মুর্শিদাবাদ	৭,১০২,৪৩০	১৩৩৪
নদীয়া	৫,১৬৮,৪৮৮	১৩১৬
উঃ২৪ পরগণা	১০,০৮২,৮৫২	২৪৬৩
পঃ মেদিনীপুর	৫,৯৪৩,৩০০	৬৩৬
পূঃ মেদিনীপুর	৫,০৯৪,২৩৮	১০৭৬
পুরুলিয়া	২,৯২৭,৯৬৫	৪৬৮
দঃ ২৪ পরগণা	৮,১৫৩,১৭৬	৮১৯
উঃ দিনাজপুর	৩,০০০,৮৪৯	৯৫৬

আলিপুরদুয়ার		

৩.২ আসাম

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের বিভাগীয় শহর সিলেটের পূর্ব সীমান্তের ২৬২ কিলোমিটার কোলঘেঁষা প্রতিবেশী ভারতের রাজ্যটির নাম আসাম। এটি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। পশ্চিমে সংকোশ নদী থেকে পূর্বে সাদিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরে হিমালয় পর্বতমালার পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণে আসাম অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদের দান, এবং দক্ষিণমুখী স্রোতে পলি পড়ে যে বিশাল সমতল ভূমি সৃষ্টি হয়েছে তাই এখন আসাম নামে পরিচিত। এর অভ্যন্তরে রয়েছে ব্রহ্মপুত্র নদ, বরাক উপত্যকা এবং উত্তর কাছাড় পর্বতমালা। উত্তর পূর্ব ভারতের আরও ছয়টি রাজ্য, যথা অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা এবং মেঘালয় দ্বারা আসাম বেষ্টিত এবং আসামসহ প্রতিটি রাজ্যই উত্তরবঙ্গের একটি সংকীর্ণ অংশ দ্বারা ভারতের মূল ভূখণ্ডের সাথে সংযুক্ত।[৯৯] এছাড়াও আসামের আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভূটান এবং বাংলাদেশের সঙ্গে।

এ ভূখণ্ডকে মহাকাব্যে প্রাগজোতিষ এবং পুরাণে কামরূপ বলা হয়েছে। মুসলিম ঐতিহাসিকরাও একে কামরূপ বলেছেন। অহমীয়রা এ ভূখণ্ডের কর্তৃত্ব গ্রহণ করার কিছুকাল পর এটি আসাম নামে পরিচিতি লাভ করে।[১০০] সবদিক দিয়েই আসামে প্রবেশ করা সহজ। এ কারণে এ ভূখণ্ড সকল যুগে পার্শ্ববর্তী এলাকার ক্ষুধিত মানুষ ও দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের জন্য ছিল একটি আকর্ষণীয় এলাকা। ফলে এখানে অস্ট্রিক, মঙ্গোলীয়, দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত ও আর্যদের বেশ কয়েক ধরনের উপজাতি সৃষ্টি হয়েছে। আসামের আধুনিক জনগণ ভারতের অন্যান্য অংশের মতোই সংমিশ্রিত এবং কথা বলে নানা ধরনের ভাষা ও উপ-ভাষায়। এদের মধ্যে কেবল অহমীয় ও বাঙালিদেরই রয়েছে নিজস্ব লিখন পদ্ধতি ও সাহিত্য। অন্যান্য ভাষাভাষীরা রোমান হরফে লিখে থাকেন এবং তাদের নিজস্ব কোনো সাহিত্য নেই।[১০১]

আসামের ইতিহাসকে মোটামুটি চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়, যথা পৌরাণিক আমল, প্রাথমিক আমল, অহমীয় আমল এবং আধুনিক আমল। পৌরাণিক আমলে আসাম ছিল অনার্য জাতি দানব ও অসুরদের নিয়ন্ত্রণে। পরে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আর্যরা এসে এ ভূখণ্ড দখল করে নেয়। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে শুরু হয় প্রাথমিক যুগ। গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের (আনু ৩৩০-৩৮০ খ্রি) এলাহাবাদ

লিপিতেই প্রথম আসামের (কামরূপ) উল্লেখ পাওয়া যায়। পূর্বদিক থেকে অহমীয়দের এবং পশ্চিমদিক থেকে তেরো শতকে মুসলমানদের আসাম দখল করার পূর্ব পর্যন্ত প্রারম্ভিক আমল অব্যাহত ছিল। অহমীয়রা আসাম জয় করে প্রায় ছয়শ বছর দেশটি শাসন করে।[১০২]

মানচিত্র ৩ : আসাম

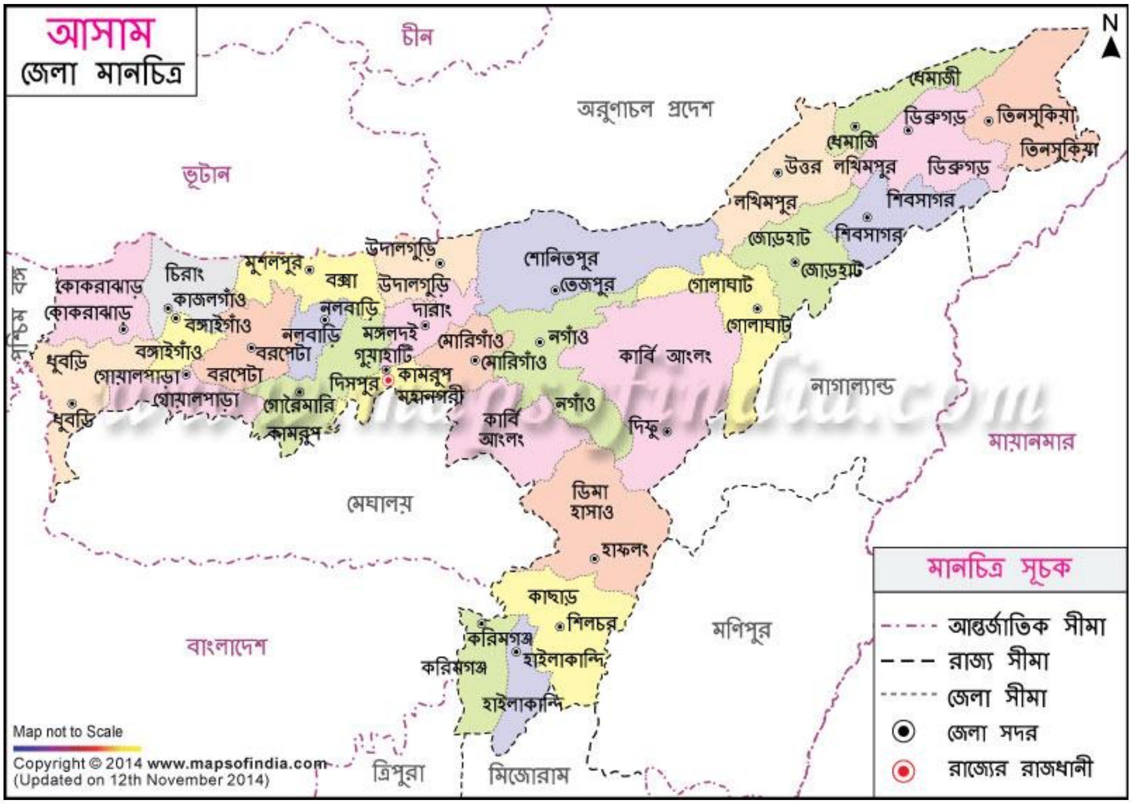

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং সহযোগী কোম্পানীর স্থানীয় মিত্ররা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজৌদ্দলাকে পরাজিত করে। কালক্রমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই অঞ্চলের প্রশাসনিক পূর্ণ অধিকার লাভে সক্ষম হয়। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম নিয়ে একটি প্রশাসনিক এলাকায় তৈরি করা হয়। এর নাম ছিল বাংলা প্রেসিডেন্সি। উল্লেখ্য এই সমগ্র এলাকার আয়তন ছিল ১,৮৯,০০০ বর্গমাইল।[১০৩]

১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম বার্মিজ যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, আসাম ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে এই রাজ্যের কাছাড় নামক অঞ্চলকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি খাচি, গারো এবং জয়ন্তীয়া অঞ্চলকে আসামের সাথে যুক্ত করে। ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে আসামকে বাংলার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে চরম প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। ফলে 'বাংলা প্রেসিডেন্সি' থেকে আসামকে পৃথক করে একটি পৃথক প্রেসিডেন্সি তৈরি করা হয়। এই সময় শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া ইত্যাদি বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলও বাংলা প্রেসেডেন্সির অংশে পরিণত হয়।[১০৪]

এটাই ছিল প্রথম বঙ্গভঙ্গ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বিভাজন কার্যকরী হয়নি। ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত আসাম শাসিত হয় বাংলা প্রদেশের একটি অংশরূপে। এসময় এর প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে আসামকে বাংলা প্রদেশ থেকে পৃথক করে একজন চীফ কমিশনারের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। একই সময়ে সিলেট, কাছাড়, গোয়ালপাড়া জেলা ও গারো হিলস জেলার উত্তর অংশকে আসাম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং বাংলা ভাষাভাষী বিপুলসংখ্যক লোককে আসামের নাগরিক করা হয়।
ইতঃপূর্বে কামরূপ, দারাং, নওগং, শিবসাগর ও লখিমপুর জেলা সমন্বয়ে গঠিত যে আসাম রাজ্য অহমদের দ্বারা শাসিত হতো এসময়ে তার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। পার্বত্য জেলা খাসী ও জৈন্তিয়া, সিলেট ও কাছাড় জেলার সমম্বয়ে গঠিত সুরমা উপত্যকা এবং বাংলার গারো পাহাড় ও গোয়ালপাড়া জেলা সমন্বয়ে সাদিয়া থেকে গোয়ালপাড়া পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল এ সময় আসাম নামে পরিচিতি লাভ করে। এ অবস্থায় আসামের মিশ্র জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক হারে নতুন করে সংমিশ্রণ ঘটে।[১০৫] এ সংমিশ্রণে যোগ হয় তুলনামূলকভাবে পশ্চাৎপদ পাহাড়ি এবং বিপুল সংখ্যক বাংলা ভাষাভাষী উন্নততর জনগণের। এতে করে সৃষ্টি হয় ভাষা ও সংস্কৃতিগত প্রকট সমস্যার যা সাম্প্রতিক কালে আসামে অস্থিরতার সৃষ্টি করছে।
১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে আসামকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে সেখানে একটা পৃথক চিফ কমিশনারের অধীনে শাসন চালানো শুরু হয়। ১৯০৫ সালে আসামকে বাংলা প্রদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগের সঙ্গে যুক্ত করে পূর্ববাংলা এবং আসাম নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়। নবগঠিত এ প্রদেশকে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। ছয় বছর পর এ গঠন প্রক্রিয়া পরিবর্তন করা হয়। বঙ্গভঙ্গ রদ করে পূর্ব বাংলাকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পুনরায় যুক্ত করা হয় এবং

আসামকে আবার ন্যস্ত করা হয় একজন চিফ কমিশনারের অধীনে। শুধু পার্বত্য জেলা খাসী ও জৈন্তিয়াই নয়, সিলেট, কাছাড়, গারো হিলস ও গোয়ালপাড়া জেলাও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৯১২ সালে আসামকে গভর্নরের প্রদেশ করা হয় এবং সেখানে একটি নির্বাহি পরিষদ ও একটি আইনসভা গঠিত হয়।[১০৬] স্বাধীনতা লাভের পরও গভর্নরের প্রদেশ হিসেবে আসামের মর্যাদা অক্ষুন্ন ছিল। তবে দেশ বিভাগের (১৯৪৭) ফলে করিমগঞ্জ মহকুমার একাংশ ব্যতীত সমগ্র সিলেট জেলা আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ইয়ারুবু চুক্তির মাধ্যমে আসাম প্রথম ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই রাজ্য মূলত চা, রেশম, পেট্রোলিয়াম এবং জীববৈচিত্র্যের জন্য বিখ্যাত।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই আসামসহ পুরো উত্তর-পূর্ব ভারতে অর্থনৈতিক সমস্যা প্রকট হতে শুরু করে। যার ফলে ওই অঞ্চলে সার্বভৌমত্ব দাবি করে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই আসামে অধুনা বাংলাদেশ (তখনকার পূর্ব পাকিস্তান) থেকে শরণার্থীরা আসতে শুরু করে। ১৯৬১ সালে মুখ্যমন্ত্রী বিমলাপ্রসাদ চালিহার নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস পরিচালিত আসাম সরকার বিধানসভায় একটি বিল পাশ করে, যার মাধ্যমে পুরো রাজ্যে একমাত্র সরকারি ভাষা হিসাবে অসমীয়াকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর প্রতিবাদে দক্ষিণ আসামের কাছাড় জেলার বাঙালিরা ভাষা আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৬১ সালের ১৯ মে তারিখে এই ভাষা আন্দোলন চলাকালীন আধা-সামরিক বাহিনীর গুলিতে এগারোজন আন্দোলনকারীর মৃত্যু হয়।[১০৭] এর পরে চাপের মুখে ভাষা বিলটি প্রত্যাহার হয়।

১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে বোড়ো জাতিসত্তার মানুষ আসাম থেকে একাংশ ভেঙে ‘উদয়াচল’ নামে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দাবি করে। অবশ্য সেই দাবি পূরণ হয় নি। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২ এপ্রিল, আসামের মেঘালয়কে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হয়। এই সময় ৩৭টি সংসদীয় আসনসহ মেঘালয়ের বিধানসভা গঠিত হয়। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে ভারতীয় সংসদে North-Eastern Areas (Reorganization) Act, ১৯৭১ পাশ হয়।[১০৮] সেই মোতাবেক ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ২১ শে জানুয়ারি খাচি, গারো আর জয়ন্তিয়া জেলা নিয়ে নতুন মেঘালয় রাজ্য গঠিত হয়। ওই একই সময়ে মিজো পাহাড়ের জেলাগুলোকে নিয়ে মিজোরাম নামক আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলও ঘোষিত হয়। সেই মিজোরামও এখন একটা আলাদা রাজ্য।

আসাম রাজ্যে ২৭টি প্রশাসনিক জেলা রয়েছে, তাদেরকে আরও ৪৯টি উপ বিভাগীয় বিভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেগুলিকে অসমিয়াতে মহকুমা বলা হয়। জেলাগুলি তাদের নিজ নিজ সদর দপ্তর দ্বারা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা পঞ্চায়েত দপ্তর, জেলা প্রশাসক এবং জেলা আদালত কর্তৃক শাসিত ও পরিচালিত হয়। পাহাড়, নদী এবং অরণ্য দ্বারা রাজ্যের জেলাগুলির সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। জেলা পঞ্চায়েত দ্বারা এখানকার জেলার স্থানীয় সরকার এবং গ্রাম্য এলাকার দায়িত্ব নেওয়া হয়। তবে, শহর এবং নগরগুলি স্থানীয় শহুরে সংস্থা দ্বারা দেখাশোনা করা হয়। বর্তমানে এই রাজ্যের মধ্যে প্রায় ২৬,২৪৭টি গ্রাম রয়েছে। স্থানীয় শহুরে সংস্থাগুলি হল নগর-সমিতি (টাউন-কমিটি), পৌরসভা (মিউনিসিপ্যাল বোর্ড) এবং পৌর নিগম (মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন)। আসামের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি শহর হল গুয়াহাটি, নগাঁও, ডিব্রুগড়, জোড়হাট এবং শিলচর। এই রাজ্যের রাজস্বের হিসাব রাখার জন্য ২৭টি জেলাকে তাদের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বিভিন্ন এলাকায় বিভক্ত করা হয়েছে।[১০৯]

আসাম, ভারতের সবচেয়ে সুন্দর রাজ্যগুলির মধ্যে একটি এবং দেশের উত্তর পূর্বাংশের আকর্ষণীয় প্রবেশদ্বার। সৌম্য ব্রহ্মপুত্র নদ, বিশাল পর্বত, এবং তার প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলসহ এই রাজ্য পর্যটকদের কাছে এক স্বর্গউদ্যান। স্পন্দনশীল জীবন শৈলী, সমস্ত হাসিখুশি লোকজন, বিভিন্ন উপজাতি ও ভিন্ন সংস্কৃতির উপস্থিতি বিস্ময়কর আসাম সমাজের প্রধান কেন্দ্র। আসামের ইতিহাস, আর্যদের সময়কে ফিরিয়ে আনে এবং মহাকাব্য,তান্ত্রিক, বৈদিক, বৌদ্ধ সাহিত্যে এর উল্লেখ পাওয়া গেছে। এই রাজ্য বিভিন্ন মহান রাজবংশ দ্বারা শাসিত হয়েছে। এই রাজ্যের মানুষেরা খুবই বন্ধুবৎসল এবং তারা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, আসামের জনসংখ্যা ছিল ৩১,১৬৯,২৭২ জন। রাজ্যে গত দশ বছরে ১৬.৯৩ শতাংশ জনসংখ্যার বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে। আগামী ২০২১ এবং ২০২৬ সালে এই রাজ্যের জনসংখ্যা যথাক্রমে ৩৪.১৮ কোটি এবং ৩৫.৬০ কোটিতে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০১১ সালে এই রাজ্যের সাক্ষরতার হার ছিল ৭৩.১৮ শতাংশ এবং নগরায়নের হার ছিল ১২.৯ শতাংশ।[১১০]

ভারতের জনপ্রকল্প অনুসারে এই রাজ্যে প্রায় ১১৫টি জাতিগত সমষ্টি রয়েছে। এইসব সমষ্টি ছাড়াও প্রায় ৬৯ শতাংশ মানুষ তাদের নিজেদেরকে আঞ্চলিক, ১৯ শতাংশ স্থানীয় এবং ৩ শতাংশ জাতীয় সম্প্রদায় হিসাবে নিজেদেরকে চিহ্নিত করেছে। আসামের জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশ তফসিলী

উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত আছে। বর্তমানে এই রাজ্যে ২৩টি নির্দেশিত উপজাতি রয়েছে। তাদের মধ্যে বরো উপজাতি, মোট উপজাতি জনসংখ্যার ৪০.৯ শতাংশ এবং মোট রাজ্যের জনসংখ্যার ১৩ শতাংশ জুড়ে রয়েছে।

আসামের সংস্কৃতি, অহম বংশ এবং কোচ বংশ তাদের রাজত্বের শিকড় প্রতিষ্ঠিত করার পর ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। এখানকার সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রধান অবদান হল শ্রীমন্ত শঙ্করাদেবের (শঙ্করদেউর) বৈষ্ণব আন্দোলন। এই আন্দোলন আসামের সংস্কৃতিকে চারুকলা, শিল্পকলা, ভাষা ও সাহিত্য ইত্যাদির উন্নতির ক্ষেত্রে চরমভাবে সাহায্য করেছে। আসামের ভাষার সাথে ব্রজবলী ভাষার মিল আছে, যা ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার শব্দ মিশ্রণ করে তৈরি করা হয়েছিল। ব্রিটিশ এবং ব্রিটিশ পরবর্তী যুগ, আসামের আধুনিক সংস্কৃতিকে চরমভাবে প্রভাবিত করেছে। রাজ্যের শিল্পকলা এবং সাহিত্যে উত্তর ভারত এবং পশ্চিমের একটা মিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। কিছু বিখ্যাত নৃত্য এবং নাট্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অঙ্কিয়া নাট, বিহু নাচ, কুষাণ নৃত্য, বাগুরুম্বা, বরদোইশিখলা, সাত্রিয়া, বানজার কেকন, মিসিং বিহু ইত্যাদি। বোরগীত ইত্যাদির মতো লোকসঙ্গীত এই রাজ্যের সঙ্গীতের এক ঐতিহ্য। এই রাজ্যের সরকারি ভাষা হল অসমিয়া এবং বরো । এছাড়াও বাংলা ভাষা সেখানে সরকারি মর্যাদা পায় এবং এটিও সেখানের কথ্য ভাষা। আসামের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে এবং এই রাজ্যে প্রায় ৪৫টি কথ্য ভাষা রয়েছে।[১১১] প্রাচীন বরো ভাষা আগে ভীষণভাবে অবহেলিত হত কিন্তু এখন ধীরে ধীরে কিছুটা স্বীকৃতি পেয়েছে। এখানে বিশেষভাবে ব্যবহৃত উপজাতীয় ভাষা হল সাঁওতালি। পশ্চিম আসামের লোকেরা রাজবংশী ভাষায় কথা বলে যা গোয়ালপারিয়া বা কামতাপুরী নামে পরিচিত। বরাক উপত্যকার কিছু সংখ্যালঘু মানুষেরা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষাতেও কথা বলে। আসামের কিছু অংশে কিছু মানুষকে নেপালি ভাষায় কথা বলতেও শোনা যায়।

আসাম প্রদেশ মোট ২৭টি জেলা নিয়ে গঠিত।[১১২]

সারণি ৭: আসামের ২৭টি জেলার জনসংখ্যা ও জনসংখার ঘনত্ব

জেলার নাম	সর্বশেষ আদমশুমারী অনুযায়ী জনসংখ্যা	আয়তন (বর্গকিমি)	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গকিমি)

বরপেটা	১,৬৯৩,১৯০	৩,২৪৫	৫০৬
বঙাইগাঁও	২,০৬০,৫৫০	১,৭২৪	৪২৫
কাছাড়	১,৭৩৬,৩১৯	৩,৭৮৬	৩৮১
দরং	৯০৮,০৯	৩,৪৮১	৪৩২
ধেমাজি	৬৮৮,০৭৭	৩,২৩৭	১৭৬
ধুবড়ী	১,৯৪৮,৬৩২	২,৮৩৮	৫৭৬
ডিব্রুগড়	১,৩২৭,৭৪৮	৩,৩৮১	৩৪৭
গোয়ালপাড়া	১,০০৮,৯৫৯	১,৮২৪	৪৫১
গোলাঘাট	১,০৫৮,৬৭৪	৩,৫০২	২৭০
হাইলাকান্দি	৬৫৯,২৬০	১,৩২৭	৪০৯
যোরহাট	১,০৯১,২৯৫	২,৮৫১	৩৫৪
কার্বি আংলং	৯৬৫,২৮০	১০,৪৩৪	৭৮
করিমগঞ্জ	১,২১৭,০০২	১,৮০৯	৫৫৫
কোকড়াঝাড়	৯৩০,৪০৪	৩,১২৯	২৯৭
লখিমপুর	১,০৪০,৬৪৪	২,২৭৭	৩৯১
মরিগাঁও	৯৫৭,৮৫৩	১,৭০৪	৪৫৫
নগাঁও	২,৮২৬,০০৬	৩,৮৩১	৬০৪
নলবাড়ি	৭৬৯,৯১৯	২,২৫৭	৫০৪
ডিমা হাছাও	২১৩,৫২৯	৪,৮৮৮	৩৮
শিবসাগর	১,১৫০,২৫৩	২,৬৬৮	৩৯৫
শোণিতপুর	১,৯২৫,৯৭৫	৫,৩২৪	৩১৫
তিনসুকিয়া	১,৩১৬,৯৪৮	৩,৭৯০	৩০৩
কামরূপ	১,৫১৭,২০২		
কামরূপ মহানগর	১,২৬০,৪১৯		
বাক্সা	৯৫৩,৭৭৩	২,৪০০	৩৯৮

ওদালগুরি	৮৩২,৭৬৯	১,৬৭৬	৪৯৭
চিরাং	৪৮১,৮১৮	১,৪৬৮	৩২৮

আসামের বরাক উপত্যকা হয়েই মূলত শুরু হয়েছিল একাত্তরের শরণার্থী প্রবাহ। মুক্তিযুদ্ধের সাথেও অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত এই উপত্যকা। তাই বরাকের ভৌগোলিক পরিচয়টাও আলাদা করে তুলে ধরা হল।

বরাক উপত্যকা একটি প্রাচীন জনপদ। প্রাক স্বাধীনতা যুগের 'সুরমা উপত্যকা'র খণ্ডিত পূর্বাংশ অর্থাৎ বর্তমান দক্ষিণ আসামের তিনটি জেলা (কাছাড়, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ)-এর সাধারণ অভিধা 'বরাক উপত্যকা'। প্রাচীন ও মধ্যযুগে যেটি কাছাড় জেলা নামে পরিচিত ছিল।[১১৩] রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আজকের বরাক উপত্যকা যদিও বঙ্গ বহির্ভূত কিন্তু ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই বরাক-সুরমা-কুশিয়ারা বিধৌত স্বাধীনতা পূর্ব অবিভক্ত বাংলার বিস্তীর্ণ শ্রীহট্ট-কাছাড় এলাকা সুরমা উপত্যকা নামে পরিচিত ছিল। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর শ্রীহট্ট জেলার সিংহভাগ আসে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে, সাড়ে তিন থানা নিয়ে সামান্য খণ্ডাংশ রয়ে গেল স্বাধীন ভারতের তদানীন্তন কাছাড় জেলায়। এ তিনটি জেলা নিয়ে প্রায় ৪২ লক্ষ জনঅধ্যুষিত এলাকাকে বলা হয় বরাক উপত্যকা। সাতচল্লিশের পর সাবেক কাছাড় জেলা স্বতন্ত্র একটি জেলা হিসেবে পরিগণিত হয়। বাংলাভাষীবহুল শ্রীহট্ট-কাছাড় যেটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক সর্বক্ষেত্রে বরাক উপত্যকা নামে সর্বত্র সুপরিচিত। এক কালের অবিভক্ত বাংলার সুরমা উপত্যকা রাজনৈতিক কারণে খণ্ডিত হয়ে পৃথক রাষ্টে পরিণত হয়েছে। যার পশ্চিমাংশ বাংলাদেশের সুরমা উপত্যকা, আর পূর্বাংশ ভারতের আসাম রাজ্যের বর্তমান কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলা বরাক উপত্যকা নামে পরিচিতি পেয়েছে। দেশভাগের পর থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত কাছাড় জেলা নামে এই অঞ্চলটি পরিচিত ছিল। ১৯৮৩ সালে করিমগঞ্জ মহকুমা জেলা রূপে উন্নীত হয়। তারপর কাছাড় ও করিমগঞ্জ জেলার ভূখণ্ডে প্রবাহিত প্রধান নদী 'বরাক'-এর নামানুসারে 'বরাক উপত্যকা' নামে অঞ্চলটি ভৌগোলিক পরিচয় লাভ করে। ১৯৮৯ সালে হাইলাকান্দি মহকুমা জেলা স্তরে উন্নীত হওয়ার ফলেই 'বরাক উপত্যকা' এই নামকরণটি ভৌগোলিক বিচারে ও পরিচিতিতে আরও অনেকটা দৃঢ় হয়।

ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে বর্তমানের আসাম রাজ্যেকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় সেগুলো হল, ব্রহ্মপুত্র নদ (প্রাচীন নাম লৌহিত্য) বিধৌত অঞ্চল 'ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা', পাহাড় পর্বতে ঘেরা অরণ্যময় অঞ্চল 'পার্বত্য আসাম' ও বরাক নদী (প্রাচীন নাম বরবক্র) বিধৌত অঞ্চল 'বরাক উপত্যকা'। উত্তর

কাছাড় এবং খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পাহাড় দ্বারা বরাক ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ভৌগোলিকভাবে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

স্বাধীনোত্তর কালে কাছাড় জেলার ভৌগোলিক সীমা বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে। বরাক নদী মণিপুরের আঙ্গামী নাগা পাহাড় থেকে বের হয়ে পূর্ব-পশ্চিমে এঁকে বেঁকে কাছাড়, হাইলাকান্দি জেলার সমভূমি দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আঙ্গামী নাগা, বড়াইল ও লুসাই পাহাড়ের জলরাশি নিয়ে করিমগঞ্জের ভাঙ্গা বাজারের উজানে সুরমা ও কুশিয়ারা নামে দুই শাখায় বিভক্ত হয়েছে। সুরমা নদী মনুষ্য সৃষ্ট কাটা গাঙ। খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে রাজা ক্ষেত্রপাল বরাক নদী থেকে একটি খাল কাটিয়ে লোভা ও অন্যান্য নদীর সংযোগে সুরমা নদীর সৃষ্টি করেন। ক্ষেত্রপালের পাটরানী সুরম্যার নামে খালটির নাম সুরমা রাখা হয়। সুরমা শাখা উত্তর-পশ্চিমে এগিয়ে খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে লোভামুখ হয়ে বাংলাদেশের সিলেটে প্রবেশ করেছে। বরাকের মূল শাখা কুশিয়ারা নাম ধারণ করে করিমগঞ্জ শহর ও লক্ষ্মীবাজারের পাশ দিয়ে পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হয়ে সিলেটে প্রবেশ করেছে। সুরমা ও কুশিয়ারা বিচ্ছিন্নভাবে সিলেটের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে দিরাইর কাছে পুনরায় মিলিত হয়ে বরাক নামে ময়মনসিংহ জেলায় প্রবেশ করেছে। বরাক কিছুদূর এগিয়ে ভৈরব বাজারে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মেঘনায় মিলিত হয়। মেঘনা পরবর্তীতে যমুনার সাথে মিলিত হয়ে পদ্মা নাম দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। বরাক-সুরমা উপত্যকার প্রায় ৫০০ মাইল স্রোতে বরাক নদীতে খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পাহাড়, বড়াইল পাহাড়, মিজো পাহাড় ও ত্রিপুরার অসংখ্য উপনদীর জল মিলিত হয়েছে।[১১৪]

'বরাক' নামটি 'ব্রা' ও 'ক্রো' শব্দ দুটি থেকে এসেছে। ব্রা অর্থ বিভক্ত হওয়া এবং ক্রো অর্থ উপরের অংশ বা শাখা। বরাক নদীটি করিমগঞ্জ জেলার হরিতিকরের কাছে সুরমা নদী এবং কুশিয়ারা নদীতে বিভক্ত হয়েছে। এই বিভাজিত নদীটির শাখা স্রোতকে স্থানীয় মানুষেরা 'ব্রাক্রো' নামে উচ্চারণ করত। বহু বছর ধরে উচ্চরণ বিকৃতির ফলে ব্রাক্রো নামটি বরাকে পরিণত হয়েছে।[১১৫]

উপত্যকার ভৌগোলিক আয়তন ৬,৯২২ বর্গ কিলোমিটার। কাছাড় জেলা ৩৭৮৬ বর্গ কিলোমিটার, করিমগঞ্জ জেলা ১৮০৯ বর্গ কিলোমিটার ও হাইলাকান্দি জেলা ১৩২৭ বর্গ কিলোমিটার। বরাক উপত্যকা আসাম রাজ্যের মূল ভূখণ্ডের শতকরা ৮.৮২ ভাগ। বরাক উপত্যকা ৯০.১৫ থেকে ৯৩.১৫ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে এবং ২৪.৮ থেকে ২৫.৮ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। রাজনৈতিক প্রশাসনিক স্বার্থে গত এক শতাব্দীর বেশি সময় থেকে বরাক উপত্যকা বৃহৎবঙ্গ বিচ্ছিন্ন হলেও ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীহট্ট একই উপত্যকা এবং ভারতীয় উপমহাদেশের একটি প্রাচীন ভূখণ্ড।[১১৬]

এ প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায় বলেন, "চট্টগ্রামের পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার পার্বত্য ত্রিপুরা অঞ্চল, কাছাড় জেলার উত্তরাংশ ও দক্ষিণাংশে (হালিয়াকান্দি) অঞ্চল এবং শ্রীহট্টের পূর্বাঞ্চলকে মোটামুটি পরাভূমির অন্তর্গত বলিতে হয়। .... এই সব ভূখণ্ড পুরাতন গঠন এবং ইহাদের অবলম্বন করিয়াই প্রাচীন বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতি পূর্বাঞ্চলে বিস্তার লাভ করিয়াছিল।"[১১৭] বর্তমান উপত্যকা প্রাচীন বৃহৎবঙ্গের একটি অঙ্গ ও সমাজ সংস্কৃতি যে বঙ্গদেশের সঙ্গে একই সূত্রে গাঁথা তার সত্যতা আরও পুষ্ট হয় নীহাররঞ্জন রায়ের এই বক্তব্যের মাধ্যমে,- "বরাক ও সুরমা উপত্যকা তো মেঘনা উপত্যকার (মৈমনসিং- ত্রিপুরা- ঢাকা) উত্তরাংশ মাত্র। এই দুই উপত্যকার মধ্যে প্রাকৃতিক সীমা কিছু নাই বলিলেই চলে এবং এই কারণেই প্রাচীন ও মধ্যযুগে পূর্ব বাংলার এই কয়েকটি জেলার সংস্কার ও সংস্কৃতি এত সহজে শ্রীহট্ট কাছাড়ে বিস্তার লাভ করিতে পারিয়াছিল। এখনও শ্রীহট্ট কাছাড়ের হিন্দু ও মুসলমানের সমাজ ও সংস্কৃতি বাংলার পূর্বতন জেলাগুলোর সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা।"[১১৮] তাছাড়া *আইন -ই-আকবারি, রিয়াজ-উস সালাতিন* এর মতো *ভক্তি রত্নাকর* গ্রন্থে বলা হয়েছে যে বঙ্গদেশ বলতে এককালে পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলকেই বুঝানো হত।[১১৯] ইতিহাসবিদদের এমন বক্তব্যগুলো থেকে একথা স্পষ্ট যে, বর্তমান বিভাজিত বরাক উপত্যকা রাজনৈতিক ও ব্যক্তিস্বার্থজনিত কারণে সময়ের রায় মেনে নানা রাজ্য ও শাসন কর্তার অধীনে বিভিন্ন রাজনৈতিক মানচিত্রে অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু ভৌগোলিক মানচিত্রে ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদানের রূপরেখায় বরাক উপত্যকা বৃহৎ বঙ্গদেশেরই অন্তর্ভূক্ত এতে কোন সন্দেহ নেই।

বরাক উপত্যকা বিভিন্ন জনজাতির মিলনতীর্থ। নানা জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি এ অঞ্চলে ঘটেছে অবলীলাক্রমে। 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' এই অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিত্রের মূল চালিকাশক্তি। আগন্তক- ব্রাহ্মণদের দ্বারাই এ অঞ্চলে যেমন সমাজ সংগঠক গড়ে উঠেছে, ঠিক তেমনি বরাক উপত্যকার সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক স্তরটি আজও কৃষিনির্ভর তবু এটাও ঠিক যে, লাঙলভিত্তিক কৃষির হাত ধরে আর্য সংস্কৃতি (আর্য- ব্রাহ্মণ সংস্কৃতি) বরাক উপত্যকায় প্রবেশ করে নতুন সাংস্কৃতিক পরিসরের আগমন ঘটালেও এর পূর্বে এ অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি ছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় বরাক উপত্যকার লোকসমাজে ব্যবহৃত আচার-অনুষ্ঠানের নানা উপাদানে। এ সম্পর্কে একটি মত প্রাসঙ্গিক, "ধর্মের আচারণগত ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সর্বত্রই বিচিত্র সমস্ত অঞ্চলভিত্তিক বৈশিষ্ট্য ও উপাদান রয়েছে।... শাস্ত্র শাসিত ব্রাহ্মণধর্মের অনুশাসন ও পরিকল্পনার বাইরে বহুতর ধর্মাচার বাঙালি জীবনে নিত্যসঙ্গী; এই

সমস্ত আদিম জনগোষ্ঠীর উত্তরাধিকার সেগুলোর সূত্রে আমরা বহন করছি। ... পূর্বভারত বা বাংলাদেশ সম্পর্কে যা প্রযোজ্য, শ্রীহট্ট কাছাড় সম্পর্কেও তা পুরোটাই প্রযোজ্য।"[১২০]

বরাক উপত্যকার সমাজ কৃষিভিত্তিক সমাজ। উপত্যকার সমাজ সংস্কৃতির শেকড় কৃষিতে প্রোথিত। গ্রাম প্রধান বরাক উপত্যকার ৮৫-৯০ শতাংশ লোক গ্রামে বসবাস করেন। ২০১১ সালের লোকগণনা মতে, আসামের মোট জনসংখ্যা ৩,১১,৬৯,২৭২। কাছাড় জেলায় ১৭,৩৬,৩১৯ জন, করিমগঞ্জ জেলায় ১২,১৭,০০২ জন হাইলাকান্দি জেলায় ৬,৫৯,২৬০ জন। অর্থাৎ কাছাড়, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি নিয়ে গঠিত বরাক উপত্যকায় ৩৬,১২,৫৮১। মোট জনসংখ্যার কাছাড় জেলার ৮১.২০%, হাইলাকান্দি জেলা ৯২.৬৯% ও করিমগঞ্জ জেলার ৯০.৯৪% লোক গ্রামে বসবাস করেন এবং মোট ৪৬ শতাংশ লোক কৃষিজীবি। বরাকের জনসংখ্যার ৮৫ শতাংশ বাঙালি। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতিবর্গ কিলোমিটারে করিমগঞ্জে ৬৭৩, কাছাড়ে ৪৫৯ জন ও হাইলাকান্দিতে ৪৯৭ জন। বরাকের মোট জনসংখ্যার ১০০০ জন পুরুষের হারে মহিলা হলেন ৯৫৮ জন।[১২১]

উত্তর পূর্ব ভারতের একটি ঐতিহ্যশালী, সাংস্কৃতিক অঞ্চল আসাম রাজ্যের বরাক ভূমি। যার সাক্ষ্য আজও বহন করে আছে 'সিদ্ধেশ্বর কপিলাশ্রম' ও 'ভূবন পাহাড়ের শিবমন্দির' প্রভৃতি নির্দশন দুটো। সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক দিক থেকে এই বরাকভূমি নানাদিক থেকে স্বীয় কিছু বৈশিষ্ট্যে আসীন। এ অঞ্চলে আর্যসংস্কৃতির পূর্ববর্তী যেমন প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে, ঠিক তেমনি এ অঞ্চলে সামাজিক গঠনেও বর্ণাশ্রমের দিক থেকে দ্বি-বর্ণের সমাজ গড়ে উঠেছে। ১৯৬১ মাতৃভাষা রক্ষায়ও অঞ্চলের মাটি রক্তস্নাত। তাছাড়া প্রাচীন কাল থেকেই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা জাতিগোষ্ঠীর পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে নানা আগন্তক জাতিগোষ্ঠীর লোক এ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছিল উর্বরা-শস্য শ্যামলা এই ভূমির ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে। যে কৃষির হাত ধরেই বরাক উপত্যকার সমাজ গঠন হয়েছিল, সেই কৃষিই বরাক উপত্যকার সংস্কৃতি ও অর্থনীতিকে পরিপুষ্ট করেছে। বরাক উপত্যকার সমাজ ও সংস্কৃতি কোন এক নির্দিষ্ট জাতি ও সংস্কৃতি দ্বারা পুষ্ট ও বৈচিত্র্যময় হয়ে আছে এ অঞ্চলের সমাজ, যার মূল ভিত্তি কৃষি। পণ্ডিতদের মতে, অনার্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তিত রূপই বরাক উপত্যকার বাঙালি সংস্কৃতির মূল ভিত্তি। আর্য ও অনার্যের দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের ফলে বরাক উপত্যকায় এক সুডৌল সামাজিক ও সংস্কৃতিক রূপ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বরাক উপত্যকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দ্বন্দ-সমন্বয়ের অন্তঃসলিলা শক্তি প্রবাহিত। যার অজস্র প্রমাণ ছড়িয়ে- ছটিয়ে আছে বরাকের বাঙালি লোকসমাজের নানা

বিশ্বাস, সংস্কার, আচার অনুষ্ঠানে। তাই, একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, বরাক উপত্যকার সমাজ গড়ে উঠেছে নানা জাতিগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে, যে সমাজের মূল ভিত্তি কৃষিকেন্দ্রিক।

৩.৩ ত্রিপুরা

ভারতের উত্তরে-পূর্বে অবস্থিত সাতটি ভগিনী রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম রাজ্য। ত্রিপুরা উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে বাংলাদেশ কর্তৃক বেষ্টিত; রাজ্যের পূর্বভাগে ভারতের অপর দুই রাজ্য অসম ও মিজোরাম অবস্থিত। এই রাজ্যের রাজধানী আগরতলা। রাজ্যের সরকারি ভাষা বাংলা ও ককবরক। ত্রিপুরার জনসংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ০.৩ শতাংশ। ত্রিপুরার ৩০ শতাংশ অঞ্চল জুড়ে বসতি স্থাপন করে থাকা ভারতের এক তপসিলি সম্প্রদায়।[১২২] এটি একটি পরিবেশ বান্ধব ও দূষণমুক্ত রাজ্য। রাজ্যের একত্রীকরণের পর থেকে এখানে বাঙালি ও আদিবাসীদের মধ্যে জাতিগত দ্বন্দ্ব এবং বিরোধের জন্য দেশে নানা রকমের টানাপোড়েনের সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীকালে এক স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী সংগঠন ও বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে পরিস্থিতি অনুকূল অবস্থায় আনা হয়। ৪৪ নং জাতীয় সড়ক, এই রাজ্যের একমাত্র মহাসড়ক, যা এই রাজ্যকে দেশের অন্যান্য রাজ্যের সাথে সংযুক্ত করে।

ত্রিপুরা নামটির উদ্ভব হয় ত্রিপুরার পৌরাণিক রাজা ত্রিপুরের নামানুসারে। ত্রিপুর ছিলেন যযাতির বংশধর দ্রুহ্যের ৩৯ তম উত্তরপুরুষ। অপর এক ব্যাখ্যা অনুসারে ত্রিপুরা নামটির উৎস হল হিন্দু পুরাণে উল্লিখিত দশমহাবিদ্যার একতম ত্রিপুরাসুন্দরী। তাছাড়া ত্রিপুরা শব্দটির উৎপত্তি রাজ্যের আদিবাসীদের অন্যতম ভাষা ককবরক থেকেও এসেছ বলে অনেকে মনে করেন। ককবরক ভাষায় 'তৈ' হল জল। 'প্রা' হল নিকটে। জলের নিকটবর্তী স্থান তৈ-প্রা থেকে ধীরে ধীরে তেপ্রা, তিপ্রা এবং শেষে বাঙালি উচ্চারণে ত্রিপুরা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।[১২৩] সুপ্রাচীন মহাকাব্য মহাভারতে এবং পুরাণে ত্রিপুরা নামটির উল্লেখ পাওয়া যায়। এরপর ১৪শ শতকে রচিত রাজমালাতেও ত্রিপুরার উল্লেখ পাওয়া গেছে। এটি ছিল ত্রিপুরার মাণিক্য রাজবংশের কাহিনী। মাণিক্য রাজবংশ ১৯৪৭ সালে ত্রিপুরা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বাবধি অঞ্চলটি ধারাবাহিকভাবে শাসন করে। কথিত আছে প্রায় ২৫০০ বছর ধরে ১৮৬জন রাজা এই অঞ্চলটি শাসন করেছেন।[১২৪]

ভারতে ব্রিটিশ শাসনকালে ত্রিপুরা ছিল একটি স্বাধীন করদ রাজ্য। দক্ষিণ ত্রিপুরায় অবস্থিত উদয়পুর ছিল ভূতপূর্ব স্বাধীন রাজতান্ত্রিক ত্রিপুরার রাজধানী। খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকে মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্য পুরাতন

আগরতলায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং পরবর্তীকালে খ্রিস্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজধানী অধুনা আগরতলায় স্থানান্তরিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীকে ত্রিপুরার আধুনিক যুগের সূচনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কারণ এই সময় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর দেববর্মা ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার অনুকরণে তাঁর প্রশাসনকে পুনর্গঠিত করেন এবং বিভিন্ন সংস্কার সাধন করেন।

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হওয়ার পর তিপ্যেরা জেলা পূর্ব পাকিস্তানের একটি অংশ হয়ে যায়। ১৯৪৯ সালে মহারানী রিজেন্ট ত্রিপুরা মিলনাত্মক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ১৯৫৬ সালে এই রাজ্য একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়। ১৯৬৩ সালে এখানে একটি নির্বাচিত মন্ত্রণালয় স্থাপিত হয়।

সিকিম ও গোয়ার পর ভারতের সবচেয়ে ক্ষুদ্র রাজ্য হলো ত্রিপুরা। এই রাজ্যের প্রধান প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য হল এখানকার সমতল ভূমি, পাহাড় ও উপত্যকা। এখানকার ৫টি অপনত পর্বতমালা উত্তর থেকে দক্ষিণে নেমে গেছে। এরা আবার পূর্ব দিকে শাখাঁ, লংথারাই , জম্পুই পাহাড় এবং অথমুরা এবং পশ্চিমে বরোমুরা হয়ে গেছে। এদের মধ্যস্থ ও নিয়ন্ত্রক অঞ্চলগুলি হল- আগরতলা-উদয়পুর, কমলপুর-আম্বাসা, খোয়াই- তেলিয়ামুড়া, ধরমনগর-কাঞ্চনপুর এবং কৈলাশহর ও অনেক উপত্যকা। এই রাজ্যের সর্বোচ্চ বিন্দুটি হল বেটলিং শিব যেটি জম্পুই পর্বতমালায় অবস্থিত। বেটলিং শিব এর উচ্চতা হল ৩,০৮১ ফুট অথবা ৯৩৯ মিটার।[১২৫]

এই রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা ছোটো ছোটো পাহাড়গুলিকে টিলা বলা হয়। অন্যদিকে পশ্চিমে অবস্থিত সংকীর্ণ পাললিক উপত্যকাগুলিকে লুঙ্গা বলা হয়। এই সমস্ত ছোট পাহাড় থেকে সৃষ্ট অনেক নদী বাংলাদেশ দিয়ে বয়ে চলেছে। উত্তরে বয়ে চলেছে ধলাই, খোয়াই, জুরি, লোঙ্গাই এবং মনু, দক্ষিণ-পশ্চিমে বইছে ফেনি ও মুহুরি এবং পশ্চিমে বইছে গোমতী নদী। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি এখানে শীতকাল, মে থেকে সেপ্টেম্বর বর্ষাকাল, গ্রীষ্ম ও প্রাক-বর্ষা হলো মার্চ থেকে এপ্রিল এবং বর্ষা-পরবর্তী হলো অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাস। বর্ষাকালে প্রচন্ড পরিমানে বৃষ্টিপাতের কারণে এই রাজ্যে ঘনঘন বন্যা দেখা যায়।

১৯৪৯ সালে গণমুক্তি আন্দোলনের ফলে ত্রিপুরা অসম রাজ্যের অংশ হিসেবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের ফলে ত্রিপুরার জনপরিসংখ্যান ভীষণভাবে পরিবর্তিত হয় এবং তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত বাঙালি শরণার্থীরাই ত্রিপুরার জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশ হয়ে ওঠে।[১২৬] ১ জানুয়ারি ১৯৬৩ সালে ত্রিপুরা একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে রূপান্তরিত হয় এবং ২১ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে একটি পূর্ণাঙ্গ রাজ্য হিসেবে স্বীকৃত হয়।

ভারতের উত্তর-পূর্বভাগের জনসংখ্যার হার অনুযায়ী ত্রিপুরা আসামের পরের স্থান অধিকার করে আছে। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এই রাজ্যের মোট জনসংখ্যা হলো ৩৬,৭৩,৯১৭।[১২৭] এই রাজ্যের বেশ অনেকটা অঞ্চল বাঙালি জাতির অন্তর্গত।

মানচিত্র ৪: ত্রিপুরা

এই রাজ্যে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ভাষার অন্তর্গত মোট ১৯-টি জাতি গোষ্ঠী ও উপজাতি গোষ্ঠী আছে। এই রাজ্যের এক বৃহত্তম গোষ্ঠী হলো ত্রিপুরি যারা ককবরক ভাষায় কথা বলে। এই রাজ্যের বাকি জনগোষ্ঠী হল- রিয়াং, চাকমা, জামাতিয়া, ভাগ মোগ, হালাম, কুকি, মুন্ডা এবং গারো। রাজ্যে বাঙালি গোষ্ঠী অনেক বেশি হওয়ার ফলে এখানকার বেশির ভাগ মানুষেরই কথ্য ভাষা বাংলা। আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ভাষা হল ককবরক।

ত্রিপুরা গণতান্ত্রিক সংসদীয় মাধ্যমের শাসনাধীন। এখানকার জনগণরা সার্বভৌমিক অধিকার প্রাপ্ত। এই রাজ্যের সরকারের তিনটি শাখা হল্ু বিচার বিভাগ, আইন বিভাগ এবং কার্য বিভাগ। ত্রিপুরা বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য ও বিভিন্ন পদাধিকারীরা বিভিন্ন সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিধানসভার সমাবেশ ও সম্মেলন নিয়ন্ত্রণ করেন। অধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে সহকারী অধ্যক্ষ সম্মেলন নিয়ন্ত্রণ করেন। বিধানসভার সদস্যদের ৫ বছরের জন্য নিয়োগ করা হয়। বিচার পতি তথা ম্যাজিস্ট্রেট, মহা বিচারালয় দ্বারা নির্বাচিত হন। এছাড়া ভারতীয় রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালকে এবং রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন। রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে মন্ত্রী পরিষদে মন্ত্রী নিয়োগ করে থাকেন। ত্রিপুরা থেকে একজন প্রতিনিধি রাজ্যসভায় এবং দুজন প্রতিনিধি লোকসভায় পাঠানো হয়।[১২৮]

স্থানীয় সদস্য দ্বারা রাজ্যের গ্রামগুলিতে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়। এই রাজ্যের দুটি রাজনৈতিক দল হল্ো বাম ফ্রন্ট এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। রাজ্যে বিভিন্ন রকমের জনগোষ্ঠী থাকার জন্যে এখানকার সংস্কৃতিও বিভিন্ন রূপের। এখানকার বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীগুলি হল বাঙালি, ত্রিপুরি, মণিপুরী, রিয়াং, জামাতিয়া, কোলোই, নোয়াতিয়া, চাকমা, মুরাসিং, গারো, হালাম, মিজো, কুকি, মুন্ডা, মোগ, সাঁওতাল, উচোই ও ওঁরাও। এই রাজ্যের বাঙালি জাতিগোষ্ঠী অনেক বেশি। এই কারণে এই অঞ্চলের প্রধান সংস্কৃতি হল বাংলা সংস্কৃতি। শহরে বসবসকারী বহু সংখ্যক আদিবাসী পরিবার বাংলা সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষাকে আপন করে নিয়েছে। ত্রিপুরি রাজাদের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক মহান পৃষ্ঠপোষক বলে মানা হত। এমনকি বাংলা এখানকার আদালত এরও ভাষা ছিল। শহরাঞ্চলে বাঙ্গালি রান্না, সঙ্গীত, সাহিত্যের প্রচলন অনেক বেশি। ত্রিপুরা রাজ্য বাঁশ এবং বেতের হস্তশিল্পের জন্য বিখ্যাত। বেত, কাঠ ও বাঁশ, প্রধানত বাসন, আসবাব, পাখা, মাদুর প্রতিকৃতি, ঝুড়ি, নানান ঘর সাজানোর জিনিসপত্র, মূর্তি ইত্যাদি তৈরিতে কাজে লাগে। নৃত্য ও সঙ্গীত হল এই রাজ্যের সংস্কৃতির একটি প্রধান অংশ।

ত্রিপুরার জেলাসমূহের জনসংখ্যা ও অন্যান্য তথ্য জেলাসমূহের আকার অনুসারে ক্রমান্বয়ে দেয়া হয়েছে।[১২৯] (যেসব তথ্য এখানে দেয়া হয়েছে সেগুলো ২০১১ সালের আদমশুমারি থেকে নেয়া হয়েছে। নতুন চারটি জেলা ২০১২ সালে গঠন করা হয়েছে, ফলে সেই চারটির তথ্য ২০১২ সালের।)

সারণি ৮: ত্রিপুরার জেলাওয়ারি জনসংখ্যা ও জনসংখার ঘনত্ব, আয়তন

জেলার নাম	জনসংখ্যা	আয়তন(বর্গকিমি)	জনসংখ্যার ঘনত্ব(প্রতিকিমিতে)
ধলাই	৩,৭৭,৯৮৮	২৪০০	১৫৭
দক্ষিণ ত্রিপুরা	৪,৩৩,৭৩৭	১৫৩৪.২	২৮৩
সিপাহীজলা	৪,৮৪,২৩৩	১০৪৪.৭৮	৪৬৩
উত্তর ত্রিপুরা	৪,১৫,৯৪৬	১৪৪৪.৫	২৮৮
গোমতী	৪,৩৬,৮৬৮	১৫২২.৮	২৮৭
খোয়াই	৩,২৭,৩৯১	১০০৫.৬৭	৩২৬
পশ্চিম ত্রিপুরা	৯,১৭,৫৩৪	৯৪২.৫৫	৯৭৩
ঊনকোটি	২,৭৭,৩৩৫	৫৯১.৯৩	৪৬৯

৩.৪ মেঘালয়

মেঘের আলয় মেঘালয়। ভারতের উত্তরপূর্ব অঞ্চলের একটি রাজ্য। রাজ্যের মোট আয়তনের এক তৃতীয়াংশ পর্বত ও অরণ্য দ্বারা আবৃত। ভারতের সবচেয়ে সুন্দর রাজ্যগুলোর একটি। মেঘালয়ের রাজধানী শিলং, রাজ্যটি তার উত্তরে আসাম দ্বারা এবং তার দক্ষিণে বাংলাদেশ দ্বারা বেষ্টিত। মেঘালয় ভারতের উত্তরপূর্ব অংশে আচ্ছাদিত রয়েছে। এর বাকি অবশিষ্ট অংশ যা রাজ্যের সীমান্তের এক প্রধান অংশ আসামের উত্তর এবং পূর্ব অংশে অবস্থান করছে। এর দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশ বাংলাদেশের সঙ্গে রয়েছে। এটি বিবেচনা করা যেতেই পারে যে, ১,২০০ সেন্টিমিটার বার্ষিক বৃষ্টিপাতের সম্মুখীন হওয়ায়

মেঘালয় দেশের সিক্ত রাজ্য হিসাবে বিবেচিত হয়। এখানে গানোল, উমিয়াম, উঁমগোট, উমখেম এবং উমিয়াম সহ অনেক নদী রয়েছে। উপরিউক্ত নদীগুলি ছাড়াও আপনি এখানে আরোও অন্যান্য কিছু নদী দেখতে পেতে পারেন যেমন উমিয়াম, মাওয়ফলাং এবং খৃ।[১৩০]

ভাষাগত ভাবে যেমন সংস্কৃত এবং অন্যান্য ভারতীয় উপভাষার গঠন অনুযায়ী, মেঘালয় শব্দটির অভিব্যক্তি বা অর্থ দাঁড়ায় মেঘের আবাস। সমস্ত রাজ্যটি অনেক পর্বত শৃঙ্গের গৃহস্থল হওয়ায় এই নামটি একেবারে আদর্শ। মেঘালয় রাজ্যটি খুব বেশি হলে আসামের দুটি পৃথক জেলাকে বিচ্ছিন্ন করে গঠন করা হয়েছিল। এটি ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারী ছিল যেদিন মেঘালয়কে জয়ন্তিয়া পর্বত এবং সংযুক্ত খাসি পর্বত থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। একটি পূর্ণ রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করার পূর্বে, ১৯৭০ সালে এই রাজ্যটি অর্ধ-স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করে। যখন ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বাংলা ভাগ হয়ে যায় তখন মেঘালয় পূর্ব বাংলা ও আসামের এক নতুন প্রাদেশিক অংশ হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করে। ১৯১২ সালে যখন পুনরায় বিভাজন হয় তখন মেঘালয়, আসাম প্রদেশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে।[১৩১] এটি ১৯৪৭ সাল, ভারতের স্বাধীনতার সময় ছিল যখন মেঘালয় রাজ্যটি দুটি প্রধান জেলা নিয়ে গঠিত হয় এবং প্রকৃত অর্থে আসাম রাজ্যের মধ্যে এক স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য হিসাবে গড়ে ওঠে। এটি একমাত্র ১৯৭১ সালের সময় ছিল উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের আইন অনুমোদনের পর এই রাজ্যটি একটি পূর্ণ রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করে। রাজ্যটি তার নিজস্ব বিধানসভা পরিষদের আস্বাদন গ্রহণ করে।

মেঘালয়ের মোট আয়তন প্রায় ২২,৪২৯ বর্গ কিলোমিটার। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ৯,৬৪,৮৮৯ জন।[১৩২] গারো পর্বতের মধ্যে প্রধান নদীগুলি হলো কলু, রঙ্গি, দারিং, সান্দা এবং সিমসাঙ। রাজ্যের কেন্দ্রীয় ও পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত কিছু প্রধান নদীগুলি হল মীঁতড়, দিগারু এবং উজ্খারি কিয়ানচিয়াঙ।

মেঘালয়ের অর্থনীতি মূলত ভূস্বামী বিশিষ্ট। রাজ্যের মোট জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ দিনমজুর ও কৃষিতে নিযুক্ত। যদিও মোট জনসংখ্যার অধিকাংশই কৃষির সাথে সংযুক্ত, তবে এই বিভাগ রাজ্যের স্থূল ঘরোয়া উৎপাদনে (জি.ডি.পি) খুবই কম অবদান রেখেছে। এখানকার জলবায়ুর পরিস্থিতি, রাজ্যে বিভিন্ন প্রকারের উদ্যানজাতীয় ফসলের চাষে উৎসাহিত করেছে যার মধ্যে রয়েছে সবজি, ফল, মশলা, ফুল ইত্যাদি। রাজটি প্রাকৃতিক সম্পদ এবং উপলব্ধ প্রচুর খনিজের ভান্ডার যেমন সিলিমিনাইট, চুনাপাথর, কয়লা, গ্রানাইট ইত্যাদির প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ রয়েছে।

সাধারণ বিচার বিভাগ, রাজ্যপাল এবং মন্ত্রী পরিষদ নিয়ে সরকারের অন্তর্নিহিত কাঠামো গঠিত হয়। জেলাগুলির নিজস্ব নিরাপত্তা ও বিভিন্ন স্থানীয় উপজাতিগুলির অধিকার নিশ্চিতকরণই হল জেলা পরিষদগুলির একমাত্র দ্বায়িত্ব। এই জেলা পরিষদগুলি বিভিন্ন আদিবাসী উপজাতিগুলির অধিকার সংরক্ষণ ও স্বার্থরক্ষায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মেঘালয়ের জনসংখ্যার অধিকাংশই উপজাতি মানুষদেরকে নিয়ে গঠিত। এই রাজ্যে খাসি নামে একটি বৃহত্তম সমষ্টি দেখা যায়। খাসিদের পর, রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী গারো। এগুলি ছাড়াও মেঘালয়ের অন্যান্য কিছু আদিবাসি যেমন মিকির, হমার, বোরো, জয়ন্তিয়া এবং লাখার সাম্প্রতিক আদমশুমারিতে একটি তথ্যে আলোকপাত করা হয়েছে যে প্রায় ৪০,০০০-৫০,০০০ নেপালি এখানে বসবাস করে। এখানে প্রায় ৭০.৩ শতাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রীষ্টান সম্প্রদায় রয়েছেন।[১৩৩]

মানচিত্র ৫: মেঘালয়

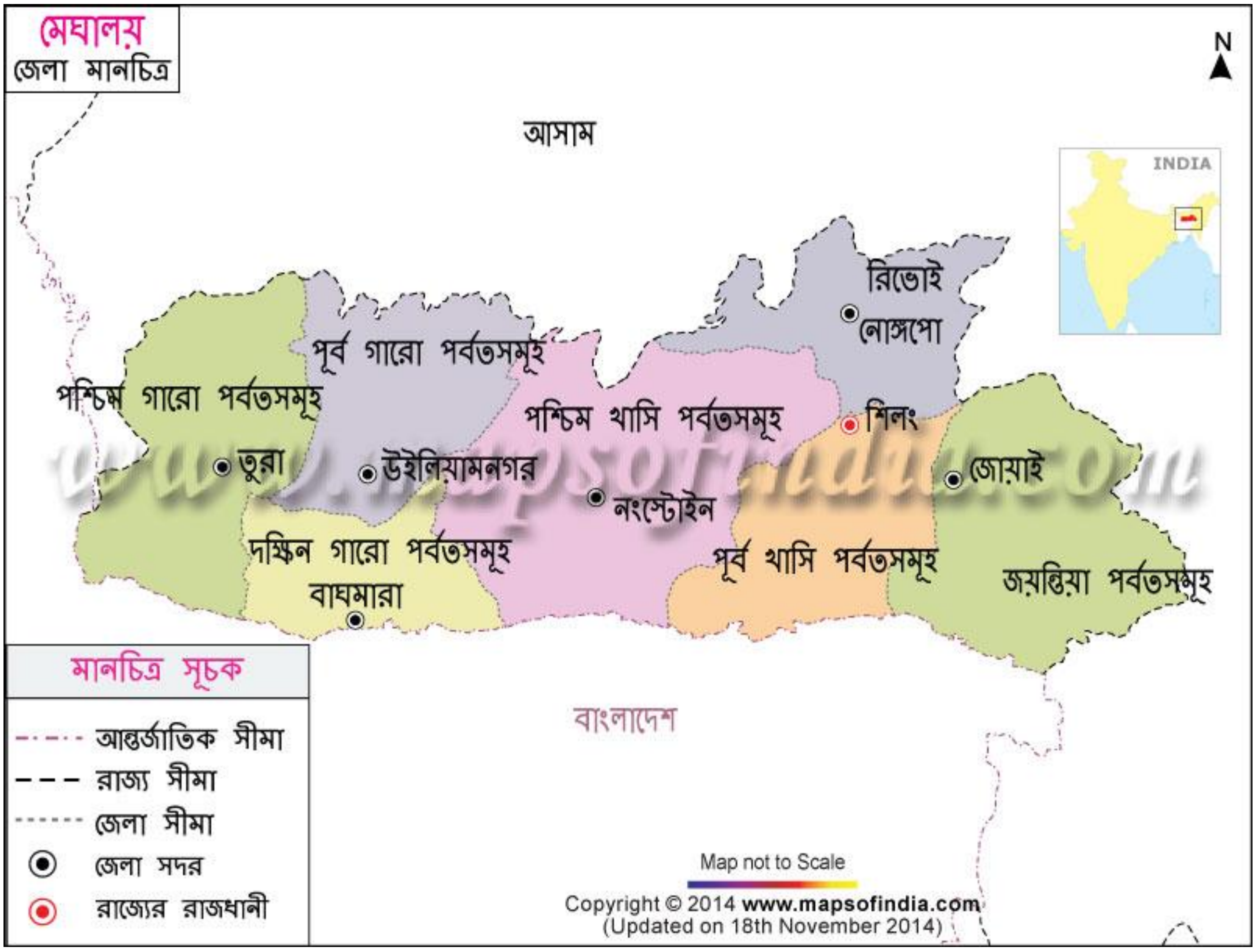

মেঘালয়ের সংস্কৃতি সংক্রান্ত বিষয়ে বলা যেতে পারে যে, মালভূমিটি খুব বেশি হলে তিনটি প্রধান প্রভাবশালী উপজাতি দ্বারা অধ্যূষিত। মালভূমিতে বসবাসকারী তিনটি প্রধান উপজাতিগুলির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে গারো, জয়ন্তিয়া এবং খাসি। এখানে বেশ কিছু নৃত্য রয়েছে যা নিয়ে মেঘালয়ের সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ গঠিত যেমন লহু, শাদ নংক্রেম, ডোরেগাতা, শাদ সুকুমিয়েনশিয়েম এবং দো দ্রু-সূয়া। রাজ্যটি ভারত দেশের খুব ছোট অংশ দখল করে আছে। **২০১১** সালের সংগৃহীত আদমশুমারিতে একটি ঘটনার উপর আলো এনেছে যে রাজ্যের মোট সাক্ষর জনসংখ্যা হল ৭৫.৪৮ শতাংশ।

মেঘালয়ে বেশ কিছু কথ্য ভাষা রয়েছে। গারো, খাসি এবং প্নার সহ বেশ কিছু ভাষা রয়েছে যেগুলি মেঘালয়ের মানুষ কথা বলার সময় ব্যবহার করে। খাসি ভাষাটিকে অস্ট্রো-এশীয় ভাষা রূপে বিবেচনা করা যেতে পারে, যেটিতে প্রাথমিকভাবে মেঘালয়ের মানুষ কথা বলে। খাসি ভাষাটি অস্ট্রো-এশীয় ভাষী পরিবারের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ নিয়ে গঠিত। এর সঙ্গে মুন্ডা শাখার পরিবারেরও সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। সম্পূর্ণ মেঘালয় রাজ্যের মধ্যে প্রায় ৮,৬৫,০০০-এরও বেশি খাসি কথ্যভাষী মানুষ দেখতে পাওয়া যায়। আসামের পার্বত্য জেলাগুলিতে বসবাসকারী মানুষও এই একই ভাষায় কথা বলে।

মেঘালয়ে সাম্প্রতিককালে **১১**টি জেলা রয়েছে।[১৩৪]

সারণি ৯: মেঘালয়ের জেলাসমূহ

জৈন্তিয়া পাহাড়	খাসি পাহাড়	গারো পাহাড়
পশ্চিম জৈন্তিয়া পাহাড় (জাওয়াই) পূর্ব জৈন্তিয়া পাহাড়	পূর্ব খাসি পাহাড় (শিলং) পশ্চিম খাসি পাহাড় (নংস্তৈন) দক্ষিণ পশ্চিম খাসি পাহাড় রী ভোঈ (নংপো)	উত্তর গারো পাহাড় (রেসুবেলপাড়া) পূর্ব গারো পাহাড় (উইলিয়ামনগর) দক্ষিণ গারো পাহাড় (বাঘমারা) পশ্চিম গারো পাহাড় (তুরা) দক্ষিণ পশ্চিম গারো পাহাড় (আমপাতি)

৩.৫ মিজোরাম

মিজোরাম ভারতের সাতটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মধ্যে একটি। এর পূর্বে এবং দক্ষিণে মায়ানমার, পশ্চিমে বাংলাদেশ এবং উত্তরদিকে মণিপুর, আসাম ও ত্রিপুরার রাজ্য দ্বারা বেষ্টিত। মিজোরাম কথার অর্থ হল *উচ্চভূমির দেশ* এবং স্থানীয় ভাষায় হল মিজো। মায়ানমার সীমান্তের কাছে ২০০০ মিটারেরও

(৬৫৬০ ফুট) বেশি উঁচু হয়ে ওঠা মিজো পর্বত, যা এই রাজ্যের ভূ-সংস্থানকে আয়ত্ত করে আছে। রাজ্যের রাজধানী আইজল, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত।[১৩৫]

মিজোরাম উত্তর ও দক্ষিণ লুসাই পার্বত্য জেলাগুলির মিশ্রণে গঠিত। বিশাল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, উদ্ভিদ ও প্রাণীকূল সমৃদ্ধ, বিশাল পাইনের গুচ্ছ সহ অসীম সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য, বাঁশের উপর নির্মিত গৃহসহ গ্রাম সমৃদ্ধ এক রাজ্য। কর্কট রেখা মিজোরামের মধ্যে দিয়ে যাওয়ায় এখানে সারা বছর ধরে এক মনোরম নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অনুভূত হয়। খাড়া পর্বত এবং গভীর গিরিখাত পূর্ণ রাজ্য মিজোরামের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ *দ্য ব্লু মাউন্টেন* ২১৬৫ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। এই পার্বত্য রাজ্যটির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলি হল তালেং, সোনাই, টুইভাওয়াল, কোলোডাইন এবং কামাফুলি। মিজোরামে ৪০টি আসনের একক কক্ষবিশিষ্ট একটি বিধানসভা পরিষদ রয়েছে।

এই রাজ্য থেকে দুইজন সদস্য ভারতীয় সংসদে পাঠানো হয়, একজন রাজ্যসভায় (উচ্চ কক্ষে) এবং একজন লোকসভায় (নিম্ন কক্ষে)। রাজ্যে ৮টি জেলা রয়েছে।[১৩৬] খ্রীষ্টীয় ১৭৫০ থেকে ১৮৫০ এর মধ্যে মিজো (পূর্বে লুসাই নামে পরিচিত) উপজাতিরা নিকটবর্তী চীন পর্বত থেকে এসে স্থানীয় আদিবাসীদের পরাজিত করে বসতি স্থাপন করে; এই উপজাতিগুলি একত্র হয়ে সেখানে তাদের একটি নিজস্ব সমাজ গড়ে তোলে। মিজোরা তাদের ৩০০ জন বংশগত মুখ্য নেতাদের উপর ভিত্তি করে একটি স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের উত্থাপন করে। ১৮২৬ সালে ইয়ান্দাবো-র চুক্তির অধীনে আসাম ব্রিটিশ শাসনের সংযুক্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত মিজোরাম উপজাতিরা কিন্তু কোনও বিদেশি রাজনৈতিক প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত ছিল না। পরবর্তী দশকে মিজোরা ব্রিটিশ অঞ্চলের মধ্যে অভিযান শুরু করার কারণে, ব্রিটিশরাও তাদের উপর শাস্তিমূলক আক্রমণ চালায়। ১৮৯০ সালের শুরু পর্যন্ত আনুষ্ঠনিকভাবে মিজোরাম ব্রিটিশদের দখলে সংযুক্ত না হলেও, এই অঞ্চলটি দুই দশক আগেই তাদের নিয়ন্ত্রণে এসে গিয়েছিল।[১৩৭]

সারণি ১০: মিজোরামের জেলাওয়ারি জনসংখ্যা ও জনসংখার ঘনত্ব, আয়তন

জেলার নাম	জনসংখ্যা	আয়তন(বর্গকিমি)	জনসংখ্যার ঘনত্ব(প্রতিকিমিতে)
আইজল	৩৩৯,৮১২	৩,৫৭৭	৯৫

সাম্ফাই	১০১,৩৮৯	৩,১৬৮	৩২
কোলাশিব	৬০,৯৭৭	১,৩৮৬	৪৪
লঙ্টাই	৭৩,০৫০	২,৫১৯	২৯
লুংলে	১৩৭,১৫৫	৪,৫৭২	৩০
মামিত	৬২,৩১৩	২,৯৬৭	২১
সাইহা	৬০,৮২৩	১,৪১৪	৪৩
চারসিপ	৫৫,৫৩৯	১,৪২৪	৩৯
মোট	৮৮৮,৫৭৩	২১,০৮১	৪২

মানচিত্র ৬: মিজোরাম

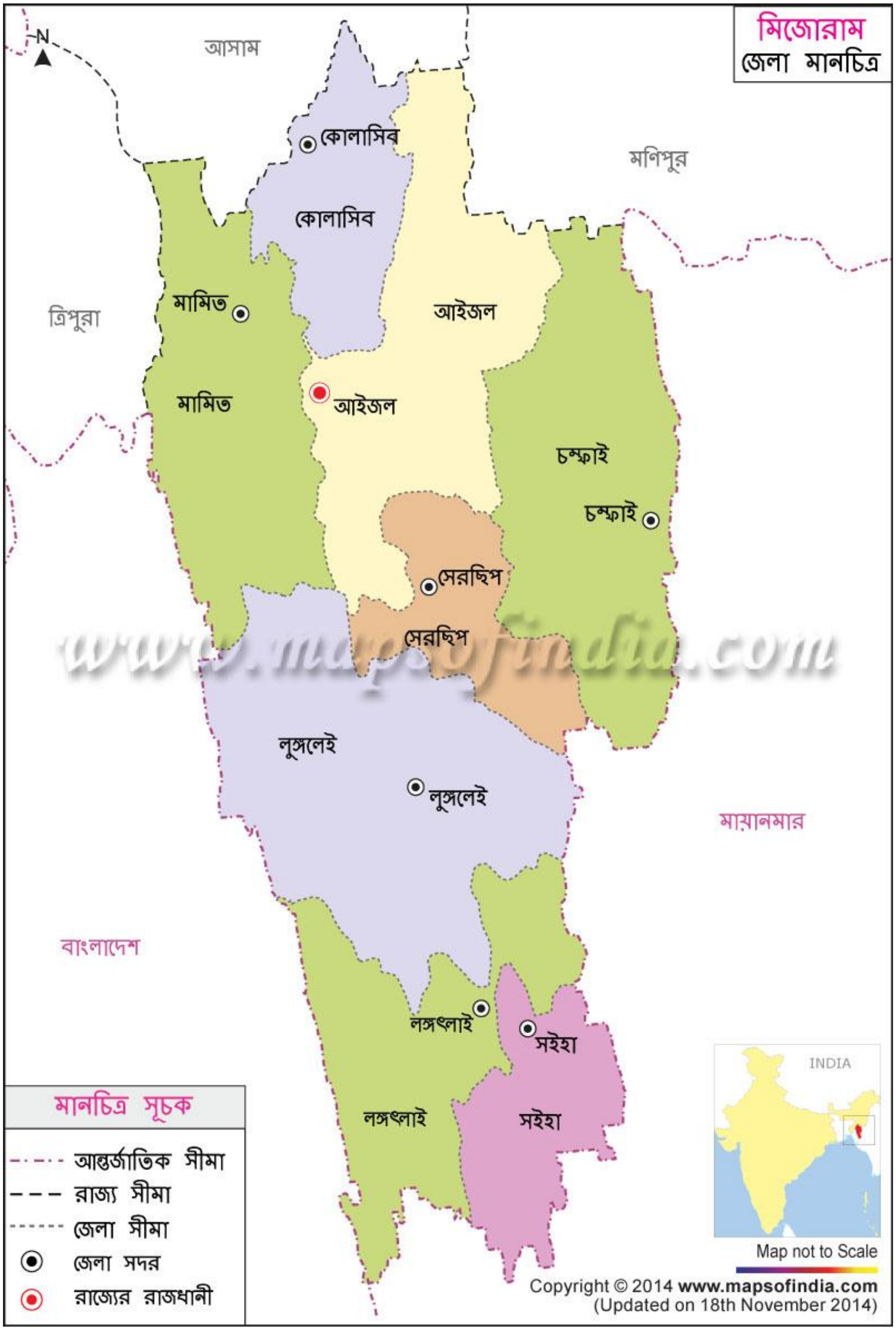

৪. সাধারণ মানুষ বলতে কাদের বোঝায়

সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহের সাধারণ মানুষ বলতে স্পষ্টত রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে সম্পর্কহীন জনসাধারণকে নির্দেশ করেছি। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে, সেই সময়ে সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে

বেসরকারি যে সহযোগিতা, উদ্যেগ সেটাকে বুঝাতে চেয়েছি। রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে সম্পর্কহীন সীমান্ত রাজ্যগুলোর কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষক-ছাত্র থেকে শুরু করে সিভিল সোসাইটি সবাই এটার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। যদিও রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে সম্পর্কহীন লোকজন বুঝাতে সাধারণ মানুষ প্রত্যয়টি ব্যবহার করেছি, তবু একাত্তরে দেখা যায় এই সাধারণের কাতারে নানাভাবে রাজনৈতিক লোকজন ঢুকে পড়েছিল। যেমন পশ্চিমবঙ্গে যে বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম সহায়ক সমিতি গঠন করা হয়েছিল, পুরো উদ্যোগটি ছিল একটি বেসরকারি উদ্যেগ, কিন্তু এর প্রধান ছিলেন কংগ্রেস নেতা ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়।[১৩৮] আসামের বরাক উপত্যকায় কাছাড় পৌরসভা নিয়েছিল সহায়ক সমিতি গঠনের উদ্যেগ, স্বভাবতই পৌরসভার মেয়র দ্বিজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে সহায়ক সমিতির প্রধান করা হয়।

একাত্তরে বাংলাদেশের প্রতি ভারতের যে সহযোগিতা ও সহমর্মিতা সেটির আমি স্পষ্টত দুটি বিভাজন দেখি। একটি সরকারি পর্যায়ে সহায়তা, যেটির অনেকগুলি কারণ বিদ্যমান। একাত্তরে ভারত সরকার কেন বাংলাদেশকে সহায়তা করেছিল গত প্রায় সাড়ে চার দশক ধরে সেটি নিয়ে বিতর্ক চলছে। হয়তোবা এই বিতর্কটি ইতিহাসে অনেকদিন স্থায়ী হবে। সেই বিতর্কের বৃত্ত থেকে বের হয়ে নাগরিক পর্যায়ে যে সহযোগিতা সেটি তুলে আনার চেষ্টা করেছি। আমার গবেষণায় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছি, নাগরিক সহায়তা কীভাবে মুক্তিযুদ্ধকে প্রভাবিত করেছে। ক্ষমতাসীন কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা রাজ্য সরকারগুলো কীভাবে সেই নাগরিক ঐক্যে প্রভাবিত হয়েছিল।

একাত্তরে ভারতে বেসামরিক কিংবা নাগরিক পর্যায়ে সহায়তা সীমান্ত রাজ্যগুলোতে সবচেয়ে প্রবল ছিল। অন্যান্য রাজ্যগুলোতে সাধারণ ভারতীয়রা বাংলাদেশের সমর্থনে কাজ করেছে, তবে সেটা সীমান্তবর্তী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা কিংবা আসামের মতো ছিল না। মূলত শরণার্থীরা প্রবেশ করেছে এই রাজ্যগুলো দিয়ে, তাদের অবস্থান ছিল এখানে, ফলে সবচেয়ে আক্রান্ত, ভুক্তভোগী ছিল এই তিনটি রাজ্য। প্রায় এক কোটি শরণার্থী আগমনের মধ্যে বিপর্যস্ত এই তিন রাজ্যে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে বাংলাদেশকে নিয়ে আগত উদ্বাস্তুদের নিয়ে তাদের ভালোবাসা, সহায়তা আর নয়মাসের ভিন্ন এক সংগ্রামের ইতিবৃত্ত এখানে আমি তুলে ধরেছি।

প্রতিটি সমাজের ভেতরে দুটি প্রধান শ্রেণি ক্রিয়াশীল যাকে এদের ভেতরে একটি শ্রেণী উচ্চবর্গ (Elite) অন্যটি নিম্নবর্গ (Subltern) । এছাড়াও আরও নানা শ্রেণির দেখা পাওয়া যায়। একাত্তরে দুইটি বর্গের সমান উপস্থিতি ছিল বাংলাদেশের সহায়তায়। তবে সমাজের অতি সাধারণ মানুষ, কার্ল মার্কস এবং ফ্রাইডরিখ এঙ্গোলস যাদেরকে প্রলেতারিয়েত বলেছেন, আনতোনিও গ্রামসি যাদের সাবঅলটার্ন বলেছেন,

আর বাংলায় রণজিৎ গুহ কিংবা গৌতম ভদ্র যাদেরকে নিম্নবর্গ বলেছেন তাদের সহায়তা একাত্তরে বেশ চোখে পড়ার মতো। গৌতম ভদ্র *ইমান ও নিশান* গ্রন্থে লিখেছেন, "নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের অসাধারণত্ব নির্মাণ করা সম্ভব।"[১৩৯]

পশ্চিমবঙ্গের মুচিরা একাত্তরে তাদের একদিনের উপার্জন দান করেছিলেন বাংলাদেশের শরণার্থীদের কল্যাণে। আগস্ট, ১৯৭১ আগরতলা সেন্ট্রাল জেলের বন্দীরা অনশন পালন করলেন বাংলাদেশে গণহত্যার প্রতিবাদে।[১৪০] তাদের একবেলা খাবারের সরকারি ভুর্তকি জেলখানা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দান করলেন বাংলাদেশ সহায়তা তহবিলে। আসামের বরাক উপত্যকায় সাধারণ কবিয়ালরা গান বেঁধেছিলেন বাংলাদেশের জন্য, বের করেছিলেন কবিগানের পুস্তিকা, বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়েছেন শরণার্থী সহায়তায়। ডাঃ সারওয়ার আলী একাত্তরে আশ্রয় নিয়েছিলেন ত্রিপুরার মেলাঘরে। সেই শরণার্থী জীবনের স্মৃতিচারণে তিনি লিখছেন, তার চেকলুঙ্গি দেখে দোকানদার তাকে পূর্ববঙ্গের লোক হিসেবে সণাক্ত করেন, এবং দুধের দাম নিতে অস্বীকৃতি জানান, প্রতিদিন বাচ্চার জন্য বিনামূল্যে দুধ নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানান।[১৪১]

শরণার্থী জীবনের স্মৃতি নিয়ে প্রায় ৩০টি গ্রন্থ আমি পড়েছি। প্রত্যেকটির সাধারণ ভাষ্য, সাধারণ মানুষের সহায়তার স্মৃতি। গ্রামের গৃহবধূ যার কোনভাবে সহায়তার সুযোগ নেই, সেও সম্পৃক্ত হচ্ছে শরণার্থীদের সহায়তায়। একটু কচু শাক দিচ্ছেন কিংবা একটু আলু, চাল দিচ্ছেন শরণার্থীদের।

সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহের সাধারণ মানুষের যে ভূমিকা নিয়ে আমার গবেষণা, স্পষ্টতই তা নিম্নবর্গের ইতিহাস। নকশাল আন্দোলনের পটভূমিকায় কবি সব্যসাচী দেব লিখেছিলেন,

"একদিন, কোন একদিন ভারতবর্ষ
জেগে উঠবে।"[১৪২]

এটাই সে জেগে উঠা ছিল। কবি আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন, "গেরিলারা উঠে আসবে রাইফেলের ট্রিগারে আঙ্গুল রেখে।" একাত্তরে সীমান্তরাজ্যের নিম্নবর্গের পাশাপাশি উচ্চবর্গের লোকজনও জেগে উঠেছিল। পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা মিলে গঠন করেছিল বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা পুরো নয়মাস বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতির ব্যানারে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। সীমান্ত-অঞ্চলের ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্য সহকারীরা নেমেছিল ভিন্ন এক যুদ্ধে। একদিকে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, শরণার্থী অন্যদিকে কলেরার ভয়াল গ্রাস। সাধারণ লোকজন জানত কলেরা, চোখ উঠা ছোঁয়াছে রোগ, বিশেষ করে কলেরায় পশ্চিমবঙ্গে শত শত লোক মারা যাচ্ছে। কিন্তু তারা দমে যাননি। ঝুঁকি নিয়ে সেই চরম দুর্দিনে মহামারি কলেরা আক্রান্ত শরণার্থীদের সেবায় কাজ করেছেন।

২০১৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর, কুর্মিটোলা গলফ ক্লাবে একাত্তর টিভি এবং ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনের যৌথ আয়োজনে 'মিত্রবাহিনীর মুক্তিযুদ্ধের গল্পের আসরে' উপস্থিত থাকার সুযোগ হয়েছিল। গল্প বলার এই আসরে অংশ নিয়ে ভারতের সাবেক সেনা কর্মকর্তা লে. জেনারেল সিহোতা। গল্পের আসরের শেষে মুখোমুখি হয়েছিলাম সাবেক এই সেনা কর্মকর্তার। একাত্তরে ভারতের তৃণমূলের এই সহায়তা সম্পর্কে বলছিলেন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ আসলে মানবিকতা ও সাহসিকতার অসাধারণ এক গল্প। সেদিন মুগ্ধ করেছিল পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসামের মানুষের মানবিক মূল্যবোধ। অসংখ্য গল্প বলা যায়, যেখানে একেবারে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা এবং মিত্রবাহিনীকে সহায়তা দিয়েছে। সাধারণ মানুষের এই সহায়তার কারণেই বাংলাদেশের মানুষের বিজয় ত্বরান্বিত হয়েছিল।'[১৪৩]

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকাতে সাধারণ মানুষকে সংজ্ঞায়িত করেছে, 'Who are members of neither royalty nor nobility nor the priesthood'. [১৪৪] অর্থাৎ সাধারণ জনগণকে আভিজাত্য ও পুরোহিততন্ত্রের বাইরে আলাদা সামাজিক বিভাজন হিসেবে দেখিয়েছেন। এটা অনেকটা খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের প্যাট্রিসিয়ানস ও প্লেবিয়ানসদের সামাজিক দ্বন্দ্বের কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়। সেন্ট অগাস্টিন সাধারণত মানুষ বলতে পুরোহিত ও অভিজাত (রাজবংশ বোঝাতে) ছাড়া সবাইকে বুঝিয়েছেন।

"Sometimes this would be expressed us, those who prayed, theose who tought, and those who worked. The latin terms for the three classes- oratores bellatores and laboratores."[১৪৫]

১৬৪৭ সালে গ্রেট ব্রিটেনে ক্রমওয়েলের শাসনামলে সাধারণ মানুষ বা জনগণ নতুন ধারণায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ফরাসি বিপ্লব, শিল্প বিপ্লব কিংবা নেপোনিয়নের যুদ্ধ সাধারণ মানুষের ধারণাকে আরো সহজতর করেছে। এসময় সাধারণের পক্ষে কলম ধরেছে বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিকরা। নিকরাসভ, হারজেন, টলস্টয়ের লেখনিতে উঠে এসেছে সাধারণের মুক্তি। ১৯৪২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস-প্রেসিডেন্ট হেনরি এ ওয়ালেস এক বক্তৃতায় বিশ্বকে 'সাধারণ মানুষের শতাব্দীতে' প্রবেশের ঘোষণা দেন। All over the world the common people-were on the march, specially referring to chines, Indian and Russians as well as Americans. [১৪৬]

১৯৪৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যান এক বক্তৃতায় ঘোষণা দেন, Government that will work in the interests of the common people and not in the interests of the man who have all the money.[১৪৭]

'সাধারণ মানুষ' একটি সাপেক্ষ শব্দ। একে আলাদা করে খোঁজার চেয়ে অসাধারণের সাথে এর সম্পর্কের সূত্রে খোঁজা দরকার। এই সম্পর্ক ক্ষমতার সম্পর্ক। Collings social dictionary তে এই সাধারণ মানুষকে সাধারণ ভাবেই তুলে ধরা হয়েছে, "People in a society as the general public specially whey you are Contrascing people in general with a small group." [১৪৮]

অন্য এক অভিধানে সাধারনের সংজ্ঞা উঠে এসেছে একটু অন্যভাবে, "A person who holds no title there was too much for one person to do." [১৪৯]

গবেষণায় 'সাধারণ মানুষ' শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছি একটি বিশেষ প্রত্যয় হিসেবে। যে প্রত্যয়ের হাত ধরে সত্তরে দশকে পুরো ভারতবর্ষে শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, আদিবাসি আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। যে প্রত্যয়টি মাটির সঙ্গে মানুষের বদলে যাওয়া সম্পর্কটিকে নতুন করে আবিষ্কার করেছিল। কেন্দ্রের সাথে প্রান্তিক মানুষের চলমান সম্পর্ককে নতুন ভাবনায় প্রতিষ্ঠা করেছিল।

সাধারণ মানুষ হিসেবে সীমান্তরাজ্যের কোন শ্রেণীকে বুঝিয়েছি সেটার চেয়ে সহজতর কাদের কে এই বিভাজন থেকে আলাদা করেছি। স্পষ্টত তখন কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের রাজ্য সরকারের সমস্ত কর্মকান্ডকে বিবেচনার বাইরে রেখেছি। রাজনৈতিক দল, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর বিধিবদ্ধ সরকারি কর্মকান্ড, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম, সরকারিভাবে প্রদানকৃত রেশনিং সহায়তাকে চেষ্টা করেছি আলোচনার বাইরে রাখতে। ক্ষমতার সাথে সরাসরি সম্পর্কহীন সাধারণ লোকজনের বেসরকারি, বেসামরিক সহায়তা ও তাদের নানাবিধ কার্যক্রমের ভিত্তিতে তৃণমূলের অবদান তুলে আনা হয়েছে এই অভিসন্দর্ভে।

৫. উপসংহার

প্রান্তিক কণ্ঠস্বরকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের মূলস্রোতে তুলে আনার চেষ্টা করেছি এই গবেষণায়। যা নিচের দিক থেকে ইতিহাসকে দেখবার ইঙ্গিত বহন করে, ওপরের দিক থেকে নয়। বলা যায় অনেকটা সাব-অলটার্ন ইতিহাস চর্চা। মার্কসবাদে সাব-অলটার্ন শব্দটির ব্যবহার পুরনো। আন্তেনিও গ্রামশির (১৮৯১-

১৯৩৭) তাঁর বিখ্যাত *প্রিজন নোটবুক* বইটিতে এ-সম্পর্কিত আলোচনার অবতারণা করেন। গ্রামশির মতে, কৃষকদের পক্ষে কলম ধরতে হবে বুদ্ধিজীবীদের। রণজিৎ গুহ ঔপনিবেশিক ও জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চা উভয় ধারার মধ্যেই অনেক অনাবশ্যক খুঁটিনাটি তথ্যের জড়ো হওয়াকে একটি বড় মানসিক সমস্যা হিসেবে তুলে ধরেছেন। আমাদের দেশের জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও কোনো কোনো বিষয়ে আমাদের 'প্রখর স্মৃতিশক্তি'র পরিচয় পাই। বস্তুত ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ- এই তিনটি দেশেই জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চার একটি বড় অংশজুড়েই রয়েছে অনাবশ্যক নানা তথ্যের বিপুল আয়োজন, যা পাঠককে [ও নাগরিককে] ক্লান্ত করে দেয়।

কিন্তু সাধারণের ইতিহাস উপেক্ষিত মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক ইতিহাস চর্চায়। আমাদের ইতিহাস চর্চার সেই সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরেছেন মুনতাসীর মামুন তাঁর *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অন্যভাবে দেখা* গ্রন্থে। তিনি লিখছেন, "গত চার দশকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসচর্চা রীতিবদ্ধ করে ফেলা হয়েছে। বিবরণ বা যাকে আমরা ন্যারেটিভ বলি তার ধরণ একই রকম।"[১৫০] "মুক্তিযুদ্ধ তো শুধু যুদ্ধ নয় মুক্তির জন্য যুদ্ধ। এ বিষয়টি তখন কেন, এখনও আমরা গভীরভাবে বিবেচনা করি না। মুক্তিযুদ্ধ কেন হাইজ্যাক হয়ে গেল সংখ্যাগরিষ্ঠের হাত থেকে এটি আমাদের ভাবনায় কখনো আসেনি এবং এর অভিঘাত পরবর্তীকালে কী হয়েছিল তাও বিবেচনা করা হয়নি।"[১৫১] সেই সীমাবদ্ধতাটাকে ইঙ্গিত করে বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর লিখেছেন, "মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিবৃদ্ধি ও বিভাজন বহুমুখী না হওয়ার দরুণ বাংলাদেশের ইতিহাসের ধারা স্পষ্ট নয়।"[১৫২]

এসব সীমাবদ্ধতাগুলো বিবেচনায় রেখেই বাচনিক ইতিহাসের স্মৃতিকে অবলম্বন করে সাধারণের সম্পৃক্ততার ইতিহাস লেখার উদ্যোগ নিয়েছি। তুলে এনেছি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের নাগরিক সমাজের ভূমিকা।

তথ্য নির্দেশিকা

১. ফজলুল বারী, *একাত্তরের আগরতলা*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৯

২. মুহাম্মদ সামাদ (সম্পা.), *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ উৎসব স্মরণিকা*, আগরতলা, ১১-১৩ জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ৫

৩. ২০১৩ সালের জুন থেকে ২০১৭ সালের আগস্ট পর্যন্ত আমি পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ে কাজ করেছি। সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোর মধ্যে খুব বেশি শরণার্থী প্রবাহ ও সম্পৃক্ততা না থাকায় মিজোরাম যাওয়া হয়নি। তবে সীমান্তবর্তী না হওয়া সত্ত্বেও গবেষণা তত্ত্বধায়কের পরামর্শে তথ্যসংগ্রহে সুপারভাইজারসহ মনিপুরের রাজধানী ইম্পলে যাই।

৪. মৈত্রেয়ী দেবী, *এতো রক্ত কেন?*, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ ৩৯

৫. পশ্চিমবঙ্গের বালুরঘাট থেকে বসিরহাট, বনগাঁ, নদীয়া, জলপাইগুড়ি, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, ত্রিপুরার সাব্রুম থেকে ধর্মনগর, আসামের বরাক উপত্যাকা, ব্রক্ষপুত্র উপত্যাকা, মেঘালয়ের শিলং, তুরা, বালাটসহ সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোর নানা প্রান্তে গিয়েছি মাঠ পর্যায়ের তথ্যসংগ্রহে। কলকাতা, আগরতলা, মেলাগড়, বিলোনিয়া, বনগাঁ, মুর্শিদাবাদে গিয়েছি একাধিকবার।

৬. ‘The Pakistani Refugee Disaster’, *Life,* New York, Vol. 70 No 23, 18 June 1971

৭. *দৈনিক যুগান্তর*, ৪ জুন ১৯৭১

৮. তপন বন্দোপাধ্যায়, ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতার ভূমিকা’, *অন্য ক্যানভাস*, পশ্চিম মেদিনীপুর, এপ্রিল সংখ্যা, ২০০৪, পৃ. ১৭

৯. *দৈনিক আনন্দবাজার*, কলকাতা, ১৬ মে ১৯৭১

১০. বাচনিক বা কথ্য ইতিহাস রচনার অংশ হিসেবে সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোর মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী-সাহিত্যিকদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার পাশাপাশি সাধারণ লোকজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ

করি। বিশেষ করে চায়ের দোকানে, পাড়ার ক্লাবে বসে গ্রুপ ইন্টারভিউ গ্রহণ করি। যেটিতে অজানা অনেক তথ্য উঠে এসেছে এবং তথ্যের সত্যতা নিরুপন সহজ হয়েছে।

১১. Rehman Sobhan, *Untranquil Recollections: The Years of Fulfilment*, Sage, New Delhi, 2015

১২. *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ঢাকা, ৩১ জানুয়ারি ২০১৬

১৩. Rehman Sobhan, *Untranquil Recollections: The Years of Fulfilment* গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে লেখক, ৩০ জানুয়ারি ২০১৬

১৪. সিমিন হোসেন রিমি, *তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি* (চার খণ্ড একত্রে), প্রতিভাস, ঢাকা, ২০১৭ (২য় সংস্করণ)

১৫. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (১৫ খণ্ড), তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৭৮-১৯৮৫* (পনেরটি খণ্ড একসাথে পিডিএফ পাওয়া যাবে এই লিংকে *http://www.liberationwarbangladesh.org/2014/06/blog-post_1121.html)*

১৬. *Bangladesh Documents,* Ministry of External Affairs, Government of India, 1971

১৭. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০২- ২০১৮

১৮. Rajani Palme Dutt, *Problems of Contemporary History,* Lawrence and Wishart, London,1963 (https://www.marxists.org/archive/dutt/1963/contemporary-history.htm এই লিংকে বইটি বিনামূল্যে পড়া যায়)

১৯. ছদ্রদদীন, *মুক্তিযুদ্ধ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে*, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৭০

২০. প্রাগুক্ত

২১. মহিউদ্দিন আহমদ, মুক্তিযুদ্ধের ধাত্রী, *দৈনিক প্রথম আলো,* ১৬ ডিসেম্বর ২০১৬

২২. বদরুদ্দীন উমর, *দৈনিক যুগান্তর* , ১৭ ডিসেম্বর ২০১৬

২৩. প্রাগুক্ত

২৪. আশীষ কুমার দাস, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারত*, লাকী পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ২৪৫

২৫. Indor Malhotra, *Indira Gandi: A personal and Political Biography,* Hodder & Stoughton, London, 1989, p. 133

২৬. শাহরিয়ার কবির, 'বাংলাদেশের মুক্তিুদ্ধে ভারত', সালাহউদ্দীন আহমেদ ও অন্যান্য সম্পা., *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস* ১৯৪৭-৭১, আগামী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ.২৯১

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০

২৮. মোহাম্মদ সেলিম, *বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক ১৯৭১-১৯৮১*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৪৩

২৯. Daniel C. Park, 'India's Intermission in East Pakistan: A Humanization Intermission or an Act of National Interest? ', *Synergy, The Journal of Contemporary Asian studies* , Vol. 155re-3 Feb 2016

৩০. Jaglul Haider, 'A Revisit to the Indian Role in the Bangladesh Liberation War', *Sage, Journal of Asian and African studies*, 44.5, 2009, 537-51 Online: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0021909609340062

৩১. Navine Murshid, 'India's Role in Bangladesh's war of independence: Humanitarianism or self- Interest? ', *Economic and Political Weekly*, Vol. 46, No. 52 (December 24, 2011), pp. 53-60

৩২. Srinath Raghavan, *1971: A Global History of the Creation of Bangladesh*, Harvard University Press, London, 2013, p. 5 (Online:https://books.google.com.bd/books?id=2S-wAQAAQBAJ&printsec =frontcover&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false)

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. 58-59

৩৪. Richard Sisson & Leo E. Rose , *War and Secession (Pakistan, India and the creation of Bangladesh),* University of California Press, Las Angles,1990

৩৫. Major Kamrul Hasan, *India's Decisive intermission: Effectiveness of its Assistance during the Liberation war of Bangladesh 1971*, US Army Staff College (Online- (www.dtic.mil / get-tr-doe/ pdf- এ পুরো অভিসন্দর্ভটি online- এ পাওয়া যায়)

৩৬. Gary J. Bass, *The Blood Telegram: India's secret war in east Pakistan*, Random House publishes pvt ltd, New Delhi, 2013

৩৭. Sarmila Bose, *Dead Reckoning: Memories of the 1971 Bangladesh War*, C. Hurst & Co, London, 2011

৩৮. মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অন্যভাবে দেখা*, সময়, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৩৯

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

৪০. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, দ্বাদশ খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৮৫

৪১. গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সিরিজে এই পর্যন্ত ২৫টি গ্রন্থ বের হয়েছে

প্রথম খণ্ড- মুক্তিযুদ্ধের কার্টুন

দ্বিতীয় খণ্ড-*দি ফ্রন্টিয়ার*

তৃতীয় খণ্ড-অবরুদ্ধ বাংলাদেশ ও মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সংকলন

চতুর্থ খণ্ড-অবরুদ্ধ বাংলাদেশ ও মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সংকলন

পঞ্চম খণ্ড-অবরুদ্ধ বাংলাদেশ ও মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সংকলন

ষষ্ঠ খণ্ড- *দৈনিক আনন্দবাজার*

সপ্তম খণ্ড- *দৈনিক আনন্দবাজার*

অষ্টম খণ্ড- *দৈনিক আনন্দবাজার*

নবম খণ্ড-অবরুদ্ধ বাংলাদেশ ও মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সংকলন

দশম খণ্ড-অবরুদ্ধ বাংলাদেশ ও মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সংকলন

একাদশ খণ্ড- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে প্রকাশিত পত্রিকা

দ্বাদশ খণ্ড- *হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড*

ত্রয়োদশ খণ্ড-*দৈনিক কালান্তর*

চতুদর্শ খণ্ড-*দৈনিক কালান্তর*

পঞ্চদশ খণ্ড-*দৈনিক কালান্তর*

ষোড়শ খণ্ড-*দৈনিক কালান্তর*

সপ্তদশ খণ্ড-*দৈনিক কালান্তর*

অষ্টদশ খণ্ড-*দৈনিক কালান্তর*

উনবিংশ খণ্ড- *পরিচয়, দেশ ও অন্যান্য সাময়িক পত্র*

বিংশ খণ্ড- *পরিচয়, দেশ ও অন্যান্য সাময়িক পত্র*

একাবংশ খণ্ড- *সাপ্তাহিক দর্পণ, দৈনিক কালান্তর*

দ্বাবিংশ খণ্ড- ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত পত্রিকা

ত্রয়োবিংশ খণ্ড- *সাপ্তাহিক সপ্তাহ*

চতুবিংশ খণ্ড-*দৈনিক যুগান্তর*

পঞ্চবিংশ খণ্ড- *দৈনিক যুগান্তর*

৪২. মুনতাসীর মামুন ও চৌধুরী শহীদ কাদের (সম্পা.), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, খণ্ড ২৪, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৭

৪৩. ফজলুল বারী, *একাত্তরের কলকাতা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

৪৬. মৈত্রেয়ী দেবী, *এতো রক্ত কেন*, কলকাতা, পৃ. ৯৬

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

৪৮. অমর সাহা, *কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, আগামী, ঢাকা,* ১৯৯৯

৪৯. আশীষ কুমার দাস, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারত*

৫০. দেবব্রত ভট্টাচার্য, বাসব দাসগুপ্ত, বিকাশ সরকার (সম্পা.), *অশ্রু হল বারুদ*, সিপিএম, কলকাতা, ১৯৭১

৫১. আশিস কুমার চক্রবর্তী অনূদিত (মূল সালাম আজাদ), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান*, এনবিটি, নয়াদিল্লী, ২০১৪

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. xvi

৫৩. Salam Azad, *Contribution of Assam in the Liberation War of Bangladesh,* Synergy Books, 2016

৫৪. হারুন হাবীব, *মুক্তিযুদ্ধ ডেটলাইন আগরতলা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯২

৫৫. বিকচ চৌধুরী, *লক্ষ মুঠিতে ঝড়ের ঠিকানা*, ত্রিপুরা দর্পণ, আগরতলা, ২০০৩

৫৬. চৌধুরী শহীদ কাদের, *মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরাঃ শরণার্থী, সংবাদপত্র ও সাধারণ মানুষ*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৬

৫৭. সুকুমার বিশ্বাস (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে আগরতলা ত্রিপুরা দলিলপত্র*, ইত্যাদি, ঢাকা, ২০০৭

৫৮. কল্যাণব্রত চক্রবর্তী (সম্পা.), *এপারে একাত্তর*, অক্ষর, আগরতলা, ১৯৯৭

৫৯. ফজলুল বারী, *একাত্তরে আগরতলা*

৬০. Salam Azad, *Contribution of Tripura in Liberation war of Bangladesh,* Bookwell, Delhi, 2014

৬১. হারুন হাবীব, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত তথ্য ও দলিল পশ্চিমবঙ্গ*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮

৬২. হারুন হাবীব, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত তথ্য ও দলিল ত্রিপুরা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮

৬৩. হারুণ হাবীব, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত তথ্য ও দলিল আসাম মেঘালয়*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮

৬৪. অঞ্জলি লাহিড়ীর, *স্মৃতি ও কথা* **১৯৭১**, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), ঢাকা, ১৯৯৯

৬৫. সুখেন্দু সেন, *শরণার্থী ১৯৭১, সময়, ঢাকা, ২০১৭*

৬৬. ইদরিস আলম (নাসিরুদ্দিন চৌধুরী সম্পা.), *আমরা তখন যুদ্ধে*, প্রজ্ঞালোক, ঢাকা, ২০১৩

৬৭. আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৭

এ. আর. মল্লিক, *আমার জীবনকথা ও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম*, আগামী, ঢাকা, ২০০৭

বুলবুল মহালনবীশ, *মুক্তিযুদ্ধের পূর্বপ্রস্তুতি ও স্মৃতি'৭১, ইত্যাদি*, ২০০৬

ধীরাজ কুমার নাথ, *শরণার্থী শিবির ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৭

৬৮. একাত্তরের কয়েকটি লিফলেট, পোস্টার, হ্যান্ডবিল সীমান্ত রাজ্যগুলোতে মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় পাওয়া গেছে, কয়েকটির মূল কপি আবার কোনটির বা অনুলিপি আমি সংগ্রহ করতে সমর্থ হই।

৬৯. একাত্তরে যারা ত্রাণ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত ছিল, আমার ধারণা ছিল তাদের অফিসিয়াল ডকুমেন্টসে তার কিছু তথ্য থাকবে। কোথাও আমি তথ্যের খোঁজ পেয়েছি, আবার কোথাও বা নিরাশ হয়েছি।

৭০. আসামের রেডক্রসের চিকিৎসক নলীনাক্ষ চৌধুরীর ছেলে সাংবাদিক নীলোৎপল চৌধুরী তার বাবার তোলা প্রায় শতাধিক দুষ্প্রাপ্য ছবির একটি অ্যালবাম আমাকে দেন। মেঘালয়ের আহমেদ হোসেন, গোয়াহাটির কমল রায়, নদীয়ার সৌমেন গুহরায়ের সৌজন্যে একাত্তরের সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততার কিছু ছবি পাওয়া গেছে।

৭১. চৌধুরী শহীদ কাদের, 'মুক্তিযুদ্ধে শহীদ দুই বিদেশি সাংবাদিক', *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ১৮ মার্চ ২০১৭

চৌধুরী শহীদ কাদের, 'মুক্তিযুদ্ধে বরাকের কবিতা ও কবিগান', *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৯ ডিসেম্বর ২০১৭

চৌধুরী শহীদ কাদের, 'মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরার চিকিৎসা কর্মীদের ভূমিকা', প্রবন্ধ সংগ্রহ ১, বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী, ঢাকা, ২০১৬

চৌধুরী শহীদ কাদের, 'মুক্তিযুদ্ধে বরাকের চিকিৎসা কর্মীদের ভূমিকা', প্রবন্ধ সংগ্রহ ৩, বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী, ঢাকা, ২০১৭

৭২. তথ্যটি দিয়েছেন *সংবাদের* বর্তমান সম্পাদক প্রদীপ চন্দ্র ভৌমিক

৭৩. সাক্ষাৎকার, গৌতম দাস, আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

৭৪. বিদ্যুৎ দে, 'ইতিহাসচর্চার স্বাধীনতা ও সীমাবদ্ধতা', *বাংলা ট্রিবিউন*, ২২ ডিসেম্বর ২০১৭

৭৫. *মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি বন্ধুদের বিশেষ সম্মাননা। একাত্তরের কৃতিত্বপূর্ণ ও মানবিক অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার বেশ কয়েকজন বিদেশি রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাধারণ মানুষজনকে বিভিন্ন পর্যায়ে **মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা** প্রদান করেছেন।

৭৬. *সুরমার স্মৃতি* একাত্তরে দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়ের কণ্ঠে আকাশবাণীতে নিয়মিত প্রচারিত হতো। কবিতাটি লিখেছেন বরাকের অতীন দাশ।

৭৭. ব্যারিস্টার মুজাম্মিল আলী লস্কর, ব্যারিস্টার গোলাম ওসমানী ও রেডক্রসের চিকিৎসক নলীনাক্ষ চৌধুরীকে সম্মাননা দেওয়া হয়েছিল আসামের বরাক ভ্যালিতে। কিন্তু স্থানীয়দের ভাষ্য মুক্তিযুদ্ধে ব্যারিস্টার মুজাম্মিল আলী লস্করের কোন ভূমিকা ছিল না।

৭৮. E. H. Carr, What Is *History*?, Cambridge University Press, London, 1961

৭৯. bn.wikipedia.org/ wiki/ ভারত

৮০. Ministry of Home Affairs, Department of Border Management এর ওয়েবসাইট থেকে, আফগানিস্তানের সাথে যে সীমান্ত বাস্তবিক পক্ষে সেটি বর্তমানে পাকিস্তান-অধিকৃত জম্মু-কাশ্মিরে।

৮১. N.S Journal, 'Border Management: Dile of Guarding the India-Bangladesh Border', *Institute for Defense Studies and Analyses Journal*, (Idsa.in), India, Vol-28 Issue-1

৮২. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *বঙ্গ পরিচয়*, ১ম খণ্ড, ওরিয়েন্টাল প্রেস, কলকাতা, ১৩৪০,পৃ. ১

৮৩. হারুনূর রশীদ, *পার্টিশন অব বেঙ্গল*, বাংলাপিডিয়া (http://en.banglapedia.org/index.php?title=Partition_of_Bengal,_1905)

৮৪. তপন চক্রবর্তী, *মুক্তিযুদ্ধের ধূসর স্মৃতি : মিজোরামের শরণার্থী*, অবসর, ঢাকা, ২০১৭

৮৫. *Bangladesh Documents*, Vol-1, Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi, 1971, p-446

৮৬. Area, population, decennial growth rate and density for 2001 and 2011 at a glance for West Bengal and the districts: provisional population totals paper 1 of 2011: West Bengal, Office of the Registrar General & Census Commissioner, Govt. of India, 26th March 2001 & (http://www.indiabudget.gov.in/es2006-07/chapt2007/tab97.pdf)

৮৭. *https://www.mapsofindia.com I* wikipedia.org

৮৮. http://legislativebodiesinindia.gov.in/States\westbengal

৮৯. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, *বাঙালির ইতিহাস*, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ ২৩

৯০. https://wb.gov.in/portal/web/guest/history2

৯১. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস: সুলতানি আমল*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৮

৯২. The State Economy, *Indian States Economy and Business: West Benga*, India Brand Equity Foundation, Confederation of Indian Industry, pg. 9

৯৩. Press Release–Provisional Population Results – Census of India 2001, Office of the Registrar General & Census Commissioner, India, 26th march 2001

৯৪. Section 2 of West Bengal Panchayat Act, 1973, Department of Panchayat and Rural Department, West Bengal & www.wb.gov.in

৯৫. India: metropolitan areas, World Gazetteer, wikipedia.org

৯৬. David Christiana , *Arsenic Mitigation in West Bengal*, *India: New Hope for Millions,* Southwest Hydrology, pg. 32

৯৭. Area, population, decennial growth rate and density for 2001 and 2011 at a glance for West Bengal and the districts: provisional population totals paper 1 of 2011: West Bengal, Office of the Registrar General & Census Commissioner, Govt. of India, 26th March 2001

৯৮. প্রাগুক্ত

৯৯. *Nirode K. Barooah, David Scott In North-East India, 1802–1831, New Delhi, Munshiram Manoharlal Publishers, 1970, pg.18*

১০০. Peter Jackson, *The Delhi Sultanate: A Political and Military History*, Cambridge University Press, 2003, P. 141

১০১. *Hem Barua, Assamese Literature, New Delhi: National Book Trust, 1965, pg. 55*

১০২. *www.mapsofindia.com*

১০৩. প্রাগুক্ত

১০৪. Barua Gunaviram, *Assam Buranji or A History of Assam* (4th edition), Publication Board of *Assam,* Guwahati, 2008, pg. 116-117

১০৫. William Cooke Taylor, *A Popular History of British India.* J. Madden, London, 1842, p. 505 (Book digitized by Google from the library of Oxford University and uploaded to the Internet Archive by user tpb, http://books.google.com/books?id=C916lXtZqiAC&oe=UTF-8)

১০৬. *প্রাগুক্ত*

১০৭. *www.mapsofindia.com*

১০৮. *www*.assam.gov.in

১০৯. *প্রাগুক্ত*

১১০. Area, population, decennial growth rate and density for 2001 and 2011 at a glance for Assam and the districts: provisional population totals paper 1 of 2011: Assam, Office of the Registrar General & Census Commissioner, Govt. of India, 26th March 2001

১১১. *Distribution of the 22 Scheduled Languages*, Census of India. Registrar General & Census Commissioner, India, 2001, Retrieved 4 January 2014

১১২. *District Census 2011,* Census2011.co.in

১১৩. সঞ্জীব দেবলস্কর, ইতিহাস কিংবা প্রাক-ইতিহাস, বরাক একশো ভাগ বাঙালি, *দৈনিক আনন্দবাজার*, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

১১৪. আলি হায়দার লস্কর, *বরাক উপত্যাকা ও ইসলাম*, হযরত শাহজালাল পাবলিকেশন্স, হাইলাকান্দি, ২০১৬, পৃ ১৯

১১৫. Saroj Kumar Barman, *Reminiscence of the past,* Kasturi Barman, Silchar, 1995, p. 18

১১৬. S. S. Tunga, *Bengali and other Related Dialects of South Assam,* Mittali, Delhi, 1995, p. 27

১১৭. নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩ (চতুর্থ সংস্করণ), পৃ. ১০৩

১১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

১১৯. অচ্যুতচরণ চৌধুরী, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত*, পূর্বাংশ, কলকাতা, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১

১২০. সুজিত চৌধুরী, *শ্রীহট্ট-কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস*, দিনকাল, শিলচর, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫৮

১২১. আলি হায়দার লস্কর, পৃ ২২-২৭,

ও কামালুদ্দীন আহমেদ, *করিমগঞ্জের ইতিহাস*, নতুন দিগন্ত, শিলচর, ২০১৩, পৃ. ১৪৬

১২২. *Census population (PDF), Census of India, Ministry of Finance India, Archived (PDF) from the original on 19 December 2008, Retrieved* 18 December 2008

১২৩. *Sukhendu Debbarma, Origin and growth of Christianity in Tripura: with special reference to the New Zealand Baptist Missionary Society 1938–1988, Indus, NewDelhi, 1996, p.20 (https://books.google.com.bd/books?id=vyfrzVvJNxUC&pg=PA20&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)*

১২৪. *সাক্ষাৎকার, মহারানি বিভু কুমারী দেবী ও কালী প্রসন্ন সেন (সম্পা.), রাজমালা, অক্ষর, আগরতলা, ২০০৩*

১২৫. *www*.tripura.gov.in

১২৬. *প্রাগুক্ত*

১২৭. Provisional population totals at a glance figure: 2011 – Tripura, *Registrar General & Census Commissioner, India,* Archived *from the original on 20 January 2012* and Retrieved 20 April 2012.

১২৮. *www.mapsofindia.com*

১২৯. *প্রাগুক্ত*

১৩০. *প্রাগুক্ত ও www*.meghalaya.gov.in

১৩১. History of Meghalaya State, Government of India

১৩২. List of states with Population, Sex Ratio and Literacy Census 2011, *Census2011.co.in,* Retrieved 2012-11-09.

১৩৩. *Report of the Commissioner for linguistic minorities: 47th report (July 2008 to June 2010), Commissioner for Linguistic Minorities, Ministry of Minority Affairs, Government of India. pp. 84–89,* Retrieved 16 February 2012.

১৩৪. *Meghalaya State Portal, Meghalaya.gov.in:8443. 31 March 2011. Archived from the original on 18 December 2012, Retrieved* 9 November *2012.*

১৩৫. *Economic Survey,* Mizoram 2012-13, Planning & Programme Implementation, Department Government of Mizoram , 2013

১৩৬. *www.*mizoram.gov.in

১৩৭. *www.mapsofindia.com*

১৩৮. *৩ এপ্রিল, ১৯৭১; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের উদ্যোগে প্রায় সব রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম সহায়ক সমিতি'; উদ্দেশ্য- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ও উদ্বাস্তুদের সহায়তা করা। কোলকাতার ৩৪ নং ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিটে এর অফিস করা হয়। এই সমিতির সভাপতি ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী, কার্যকরী সভাপতি বিজয় সিং নাহার, সাধারণ সম্পাদক ছিলেন- বাংলা কংগ্রেসের হরিদাস মিত্র, সিপিআইয়ের অধ্যাপক অমিয় দাশগুপ্ত, কংগ্রেসের ডা. জয়নাল আবেদীন, অরুণ মৈত্র এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের অধ্যাপক নির্মল বসু। সম্পাদকমন্ডলীতে ছিলেন- প্রণব মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লকান্তি ঘোষ, গোপাল কুমার,কাশীকান্ত মৈত্র, সন্তোষ মোহন রায় ও অরুণেশ দত্ত রায় প্রমুখ।*

১৩৯. *গৌতম ভদ্র, ইমান ও নিশান উনিশ শতকে বাংলার কৃষক চৈতন্যের এক অধ্যায় (আ.১৮০০-১৮৫০), সূবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৯৪, ভূমিকা*

১৪০. আবুল আজাদ, *মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরার সংবাদপত্রের ভূমিকা*, রাইটার্স ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৯৫

১৪১. সারওয়ার আলী, *পেরিয়ে এলাম অন্তবিহীন পথ*, মাখদুমা নার্গিস, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৯৩

১৪২. *সব্যসাচী গোস্বামী, 'নকশালবাড়ি আন্দোলন ও বাংলা কবিতা', মঙ্গলধ্বনি, কলকাতা, ২৬ মে ২০১৫*

১৪৩. *মিত্রবাহিনীর মুক্তিযুদ্ধের গল্পের আসর*, কুর্মিটোলা গলফ ক্লাব, একাত্তর টিভি এবং ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের যৌথ আয়োজনে, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৬

১৪৪. *Online: www.britannica.com*

১৪৫. Roger Osborne, *civilization: A new History of the western world,* Jonathan cape ltd, 2006, p- 292-297

১৪৬. Henry Wallace, *The century of the common man*, Winrock International Archived from the original on 29-09-2007

১৪৭. Robert Reich, *The real lesson from Obama's victory, Financial Times,* 09th November 12

১৪৮. *Online: www.collinsdictionary.com*

১৪৯. *Online:* www.thefreedictionary.com

১৫০. মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অন্যভাবে দেখা*,সময়, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৯

১৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

১৫২. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *ইতিহাস নির্মাণের ধারা*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১৮ (প্রথম সুবর্ণ প্রকাশ), পৃ. ৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর একাত্তরের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের *এনবিসিকে* সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় একজন সাংবাদিক ইন্দিরা গান্ধীকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, যুদ্ধে আপনার দেশ অনেক মূল্য দিয়েছে। বিনিময়ে ভারত কী পেয়েছে?' এ প্রশ্নের জবাব ইন্দিরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসা রার্লফ চ্যাপলিনের একটি কবিতার চার লাইন উদ্ধৃত করে বলেন,

Mourn not the dead

But rather mourn the apathetic throng

Who see the world's great anguish and its wrong

and dare not speak!

সেই সাক্ষাৎকারে ইন্দিরা এক মানবিক ভারতের একাত্তরে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানোর, সহমর্মী হওয়ার প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। 'ভারত কথা বলেছে কেবল বাংলাদেশের মানুষের জন্য। ভারতের জন্য নয় শুধু, দুনিয়ার সব নির্যাতিত মানুষের জন্য।'[১]

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় সমকালীন আঞ্চলিক ও বিশ্বরাজনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। স্নায়ুযুদ্ধকালীন বিশ্ব রাজনীতির নানা সমীকরণে একটি জাতি রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশে একাত্তরের মুক্তিসংগ্রাম জন্ম দিয়েছিল নানা অভিঘাতের। ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষায় গঠিত বৈশ্বিক জোটগুলোতে দেখা দিয়েছিল নানা বিভাজন। বাংলাদেশ প্রশ্নটি একদম গোড়া থেকেই পরাশক্তির ঠান্ডা লড়াইয়ের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের চিরাচরিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা তো ছিলই, তার সঙ্গে যুক্ত হয় আনবিক ক্লাবের সর্বশেষ সদস্য চীনের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ। তৃতীয় বিশ্বের মুখপাত্র বলে পরিচিত চীন ১৯৭১-এ বাঙালিদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সমর্থনের বদলে পাকিস্তানের সামরিকতন্ত্রের পক্ষ নেয়। বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করে সোভিয়েতকে কাবু করার কৌশল হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সাথে হাত মেলায়। মুসলিম বিশ্বের সাথে পাকিস্তানের একটা আবেগগত সম্পর্ক ছিল। ইসলামি উম্মাহ্‌র নামে মুসলিম বিশ্ব পাকিস্তানের অন্ধ সমর্থকে পরিণত হয়।[২]

আঞ্চলিক রাজনীতিতেও বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন প্রবল ছিল না। বার্মা ও শ্রীলঙ্কা ছিল পাকিস্তানের মিত্র, নেপালের প্রতিক্রিয়া ছিল নেতিবাচক।[৩] জাতিসংঘেরও কোন শক্ত ভূমিকা ছিল না। জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব উ. থান্ট তার আত্মজৈবনিক গ্রন্থ 'ভিউ ফ্রম দি ইউ এন' এ তে খোলামেলাভাবেই স্বীকার করেছেন জাতিসংঘের ব্যর্থতার কথা।[৪] নানাবিধ এসব সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিম-উত্তর-পূর্বদিকে সীমান্ত বেষ্টিত ভারতের অবস্থান। শরণার্থীদের আশ্রয় দান, প্রবাসী সরকারে গঠনে সহায়তা এবং সর্বোপরি মুক্তিবাহিনীর সংগঠন, প্রশিক্ষণ ও সমরাস্ত্র সরবরাহে ভারতের ভূমিকা ছিল প্রত্যক্ষ। মোহাম্মদ সেলিম 'বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক' নিয়ে যে গবেষণা করেছেন, সেখানে তিনি স্পষ্ট করে লিখেছেন, 'ভূ-রাজনৈতিক এবং ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, প্রত্যক্ষ ও সুনির্দিষ্ট।'[৫]

ভারতের এই প্রত্যক্ষ ও সুনির্দিষ্ট ভূমিকার ফলে ঠান্ডাযুদ্ধকালীন সময়ে বিশ্বের একমাত্র দেশ হিসেবে যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। বাংলাদেশের মুক্তিকামি জনতার আত্মনিয়ন্ত্রণের আন্দোলনটি ঠান্ডাযুদ্ধের কারণে পায় আন্তর্জাতিক মাত্রা। ক্ষমতার ভারসাম্যের নীতিতে আকুণ্ঠ সমর্থন পায় সোভিয়েত রাশিয়ার। সবকিছু মিলিয়ে স্নায়ুযুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাবে প্রভাবান্বিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। ২৫ মার্চ, ১৯৭১। পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মমতা, গণহত্যা, রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে এক আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করে।[৬] স্বভাবতই মানুষ এমন আবহ থেকে পালাতে চেয়েছে, এ ক্ষেত্রে ভারতই হয়ে ওঠে আশ্রয়স্থল। এর পেছনে ভারতের গণতন্ত্র বা ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি আবেগ বা উৎসাহের ভূমিকা যতটা না ছিল, তার চেয়ে ছিল ভৌগোলিক নৈকট্য এর ভূমিকা। একাত্তরে ভারত একদিকে হয়ে উঠেছিল এক কোটি শরণার্থীর নিরাপদ আশ্রয়স্থল অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম কেন্দ্রে। এখান থেকেই পরিচালিত অস্থায়ী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার, মুক্তিফৌজকে দেওয়া হয়েছিল প্রশিক্ষণ। পাশাপাশি অবরুদ্ধ বাংলাদেশে গেরিলা বাহিনীর জন্য রসদ, অস্ত্র সহায়তা, বাংলাদেশের সপক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত তৈরি, পাকিস্তানের কারাগারে আটক মুজিবের মুক্তির জন্য জনমত সৃষ্টি, নানা ধরনের উদ্যোগে একাত্তরে মুখর ছিল প্রতিবেশি ভারত।

মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সেই বহুমাত্রিক ভূমিকা নিয়ে কাজ করেছেন সালাম আজাদ। তুলে ধরেছেন একাত্তরে ভারতের ত্যাগের বিবরণ, প্রকৃত বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে হাত বাড়িয়েছিল ভারত। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়ে বাংলাদেশ থেকে ৯৮,৯৯,৩০৫ জন শরণার্থী ভারতের ভূখণ্ডে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে ভারতের জনগণ ও সরকার হাসিমুখে আশ্রয় ও খাদ্য সহায়তা প্রদান করে। শুধু তাই নয়, মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং, অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করে। এসব কাজে ভারতকে খরচ করতে হয়েছিল সাত হাজার কোটি টাকা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মিত্র বাহিনীর ভূমিকা রাখতে ভারতকে হারাতে হয়েছিল বহু অফিসার ও সৈনিককে। ১৯৭১ সালে পূর্ব ও পশ্চিম রণাঙ্গন মিলে শহীদ ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা ৩৬৩০ জন, নিখোঁজ ২১৩ জন এবং আহত ৯৮৫৬ জন। যাঁদের রক্ত এই স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে মিশে রয়েছে।[৭]

মুক্তিযুদ্ধে ভারত সহযোগী নয় বরং একটি পক্ষে পরিণত হয়েছিল। প্রভাবিত, আলোড়িত করেছিল রণাঙ্গন থেকে বিশ্বজনমত। ‘সরকারি বিবৃতির মধ্য দিয়ে, লোকসভার সদস্যদের বক্তৃতার মধ্য দিয়ে, দিল্লীর জনসভার মধ্য দিয়ে, কলকাতার ময়দানের জনসভার মধ্য দিয়ে, বোম্বাইয়ে ও অন্যত্র বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষের প্রতি এদেশের মানুষের অভূতপূর্ব মমতা প্রকাশ পেয়েছে। আর

সেই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে ঐ সংগ্রামী মানুষগুলির পাশে এসে দাঁড়াবার জন্য, যেভাবে হোক, তাদের সাহায্য করার জন্য একটা গভীর আকুতি।'[৮] সেই আকুতি থেকে একাত্তরে ভারত পালন করেছিল বহুমুখি ভূমিকা। ভারতের বহুমাত্রিক সে ভূমিকাগুলো নিম্নে কয়েকটি ভাগে তুলে ধরা হল।

চ. মুজিব নগর সরকার বা স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনে সহায়তা

ছ. শরণার্থীদের আশ্রয় ও সহায়তা

জ. আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টি

ঝ. মুজিবের মুক্তি

ঞ. মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহ

ক. মুজিবনগর সরকার বা স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনে সহায়তা

একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী ও সুদূরপ্রসারী সাংবিধানিক পদক্ষেপ ছিল মুজিবনগর সরকার গঠন। এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠান আয়োজন করে বিশ্বব্যাপী প্রচারের ব্যবস্থা করা। আর এই সরকার গঠনের মূল দায়িত্ব পালন করেছিল ভারত সরকার। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সবচেয়ে তাৎপর্যময় অবদান স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জন্মলগ্নটাকে আইনি পথে পরিচালিত করা। এর ফলে বাঙালিদের সদ্য শুরু হওয়া সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ লাভ করে ব্যাপকতা এবং বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের স্বপক্ষে জনসমর্থন অর্জনে ব্যাপক সাড়া। প্রকৃতপক্ষে ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ী দলের নেতাদের দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে মুজিবনগর সরকার গঠন করাটা ছিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ। এটি একদিকে বিশ্বব্যাপী জনমত গঠনে ভূমিকা রেখেছে, অন্যদিকে রাজনৈতিক তৎপরতার বিশ্ব গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা পেয়েছে, তুলে ধরেছে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক চালানো গণহত্যার সংবাদ।

মুজিবনগর সরকার গঠন করা ছিল একটা বাস্তবসম্মত ও সময় উপযোগী সাংবিধানিক পদক্ষেপ। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন আওয়ামী লীগ যথাক্রমে ১৬৭ ও ২৯৩ পদ লাভকারী দল হিসেবে তাদের ওপর অর্পিত সাংবিধানিক ও জাতীয় দায়িত্ব পালন করেছিল সেদিন মুজিবনগর সরকার। যেটি ছিল একমাত্র আইনসম্মত রাজনৈতিক উদ্যোগ। আর তাই এর গ্রহণযোগ্যতাও ছিল ব্যাপক এবং প্রশংসিত হয়েছিল সর্বত্র এবং সর্বমহলে।[৯]

একাত্তরের ২৫ মার্চ রাতে 'অপারেশন সার্চলাইট' বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ঢাকাসহ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে নিরীহ জনসাধারণের ওপর অকস্মাৎ আক্রমণ পরিচালনা করে। বাঙালিকে জাতিগতভাবে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্য নিয়ে গণহত্যা শুরু করে পাকিস্তানি বাহিনী। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।[১০] বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বর্ণনা পাকিস্তানি জেনারেল নিয়াজির তৎকালীন জনসংযোগ কর্মকর্তা সিদ্দিক সালিক তার Witness to surrender গ্রন্থে দিয়েছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন: 'এইভাবে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সামরিক কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। এখন আঘাত হানার নির্ধারিত মুহূর্তে [এইচ-আওয়ার] পর্যন্ত স্থির থাকার চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে গেল। নরকের দরজা উন্মুক্ত হয়ে গেল। যখন প্রথম গুলিটি বর্ষিত হল, ঠিক সেই মুহূর্তে পাকিস্তান রেডিওর সরকারি তরঙ্গের [ওয়েভ লেন্থ] কাছাকাছি একটি থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল। ওই কণ্ঠের বাণী মনে হল আগেই রেকর্ড করে রাখা হয়েছিল। তাতে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ হিসেবে ঘোষণা করলেন।'[১১]

ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রকাশিত *বাংলাদেশ ডকুমেন্টস* এ এই ঘোষণার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। ঘোষণায় বলা হয়: 'এই-ই হয়তো আপনাদের জন্য আমার শেষ বাণী হতে পারে। আজকে থেকে বাংলাদেশ একটি স্বাধীনদেশ। আমি আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি যে যেখানেই থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন এবং হাতে যার যা আছে তা-ই নিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। ততদিন পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যান যতদিনে না দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর শেষ সৈনিকটি বাংলাদেশের মাটি থেকে বহিষ্কৃত হচ্ছে এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হচ্ছে।'[১২] সেই রাতেই শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়।

২৫ মার্চের হঠাৎ আক্রমণে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব অনেকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। যে কারণে আসন্ন সামরিক হামলার বিরুদ্ধে যথোপযোগী সাংগঠনিক প্রস্তুতি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।[১৩] তবে মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার জন্য আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের সুপরিকল্পিত বা সুশৃঙ্খল না হলেও কিছু প্রস্তুতি ছিল।[১৪] এই প্রস্তুতির একটা বড় জায়গা জুড়ে ছিল ভারতীয় সহায়তার বিষয়। এ প্রসঙ্গে একাত্তরে মুজিব বাহিনীর অন্যতম সংগঠক আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সম্ভাব্য ভারতীয় সাহায্যের বিষয় বঙ্গবন্ধু বহু পূর্বেই নিশ্চিত করেছিলেন।[১৫] একাত্তর সালে মার্চ মাসের শুরুতে শেখ মুজিবের নির্দেশে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ ঢাকাস্থ ভারতের

ডেপুটি হাইকমিশনার কে. সি. সেনগুপ্তের সঙ্গে আক্রমণের মুখে ভারতীয় সাহায্য-সহযোগিতার ধরন সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই আলোচনায় ভারতের কাছ থেকে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতর আশ্বাস পেলেও সহায়্যের প্রকৃতি বা পরিমাণ নিয়ে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে ভারতের স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসন ও সীমান্ত রক্ষীবাহিনী [বিএসএফ] আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের পর বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় সাদরে গ্রহণ করেছে।[১৬] সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের মাটিতে পৌঁছলে বিএসএফ এর আঞ্চলিক প্রধান গোলক মজুমদার তাদের হাই কমান্ডের নির্দেশেই তাজউদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।[১৭] পরবর্তীতে বিএসএফ এর প্রধান রুস্তমজী ও গোলক মজুমদার ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাজউদ্দীনের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। ৩ এপ্রিল ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাজউদ্দীনের আলোচনার পূর্বেই মিসেস গান্ধী লোকসভায় বক্তৃতায় বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করেন।[১৮]

৩১ মার্চ লোকসভা ও রাজ্যসভার যৌথ অধিবেশনে মিসেস গান্ধীর উত্থাপিত রেজুলেশনে বলা হয় 'The house wishes to assure them that their struggle and sacrifices will receive the whole hearted sympathy and support of the people of India.'[১৯] মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে ভারত সরকারের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মধ্যে সম্ভাব্য ভারতীয় সহায়তা সম্পর্কে আশার সঞ্চার করে। সহানুভূতি ও সমর্থনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার প্রয়োজনে সরকার গঠন জরুরি হয়ে পড়ে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাজউদ্দীন বৈঠকের শুরুতে মিসেস গান্ধীকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণার পাশাপাশি ইতোমধ্যে শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রপতি করে একটি সরকার গঠন করা হয়েছে।[২০] তাজউদ্দীনের এই উপস্থিত সিদ্ধান্তের ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অসামান্য শক্তি সঞ্চারিত হয়।[২১] এপ্রিল মাসের শুরুতে তাজউদ্দীন-ইন্দিরার মধ্যে অনুষ্ঠিত দু'দফা বৈঠকে মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতের সাহায্য-সহযোগিতার প্রকৃতি ও ধরন সম্পর্কে কতিপয় সিদ্ধান্ত হয়। প্রথমত, ভারতের মাটিতে অবস্থান করে বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধ পরিচলনা করতে পারবে। দ্বিতীয়ত, সীমান্ত উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে, যাতে করে শরণার্থীরা ভারতে আশ্রয় নিতে পারে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রের সংস্থান করা। তৃতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য একটি বেতার কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।[২২] বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও সরকার গঠনকে আইনগত বৈধতা দেওয়ার প্রয়োজনে ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়।[২৩]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করেন। সৈয়দ নজরুর ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি এবং বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়। তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমেদ ও এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে মন্ত্রীপরিষদের সদস্য নিয়োগ করা হয়। ১১ এপ্রিল এম এ জি ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী ১১ এপ্রিল বাংলাদেশ বেতারে মন্ত্রিপরিষদ গঠনের ঘোষণা দিয়ে ভাষণ প্রদান করেন।[২৪]

ভারতের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় মুজিবনগর অস্থায়ী সরকার গঠন ছিল একটা বড় ধরনের উদ্যোগ। উদ্যোগটি আরো গুরুত্ব পায় ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সরকারটির আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে। ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ বিএসএফ-এর সক্রিয় সহযোগিতায় ভারতীয় সীমান্ত থেকে বাংলাদেশের প্রায় এক মাইল অভ্যন্তরে কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলায় ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সামনে নবীন বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী পরিষদের আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৭ এপ্রিলের অনুষ্ঠানের আয়োজন সম্পর্কে আমীর উল-ইসলাম লিখেছেন যে, ‘বিএসএফ এর শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়কে বলি আমাদের জন্যে ১০০টি গাড়ির ব্যবস্থা করতে। এর ৫০টি থাকবে প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের বহন করার জন্য। অবশিষ্ট ৫০টির মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নেতাদের বাংলাদেশ সীমান্তে পৌঁছানো হবে।[২৫] ভারতীয় সীমান্তে এক কন্টিজেন্ট বিএসএফকে সতর্কাবস্থায় রাখা হয় সম্ভাব্য পাকিস্তানি আক্রমণের মুখে সহায়তা দেওয়ার জন্য। সংক্ষিপ্ত ও অনাড়ম্বরভাবে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত মুজিবনগর ছিল বাংলাদেশ সরকারের রাজধানী। যে কারণে এই সরকারকে ‘মুজিবনগর সরকার’ বলেও অভিহিত করা হয়েছে। যদিও পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা থেকেই এই সরকারের কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।[২৬]

১৭ এপ্রিল ১৯৭১ সেই মাহেন্দ্রক্ষণে তাজউদ্দীন আহমদ ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম অন্য নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে সকাল ৯টার দিকে বৈদ্যনাথতলায় পৌঁছান। দেশি বিদেশি শতাধিক সাংবাদিক এবং ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরাও আসেন। তার মধ্যে ছিলেন ব্রিটিশ সাংবাদিক মার্ক ট্যালি ও পিটার হেস। বহু প্রতীক্ষিত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শুরু হয় বেলা ১১টায়। মেজর আবু ওসমান চৌধুরীর পৌঁছাতে বিলম্ব হওয়ায় ক্যাপ্টেন মাহবুব উদ্দীন আহমেদ ইপিআর, আনসার এর একটি ছোট দল নিয়ে নেতৃবৃন্দকে অভিবাদন জানান। অভিবাদন গ্রহণের পর স্থানীয় শিল্পীর জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সৈয়দ নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর আওয়ামী লীগের চিফ হুইফ

অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ আলী বাংলার মুক্ত মাটিতে স্বাধীনতাকামী কয়েক হাজার জনতা এবং শতাধিক দেশি-বিদেশি সাংবাদিকের সামনে দাঁড়িয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। তিনিই রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের অনুপস্থিতিতে উপরাষ্ট্র প্রধান হিসাবে সৈয়দ নজরুল ইসলামের নাম ঘোষণা করেন এবং প্রধানমন্ত্রির সাথে পরামর্শ ক্রমে মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেন এবং শপথ পাঠ করান।[২৭] এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানেই কর্নেল এম এ জি ওসমানী এবং সেনাবাহিনীর চিফ অফ স্টাফ কর্নেল আব্দুর রবের নাম ঘোষণা করা হয়। এরপর তাজউদ্দীন আহমদ ৩০ মিনিট ভাষণ দেন এবং বৈদ্যনাথতলাকে 'মুজিবনগর' নামকরণ করেন। তিনি বিশ্ববাসীর কাছে নতুন রাষ্ট্রের স্বীকৃতিদান ও সামরিক সাহায্যের আবেদন জানান। সেই দিন থেকেই বৈদ্যনাথতলা মুজিবনগর নামে পরিচিত হয়। বক্তৃতা ও শপথ গ্রহণ পর্ব শেষে নেতৃবৃন্দ মঞ্চ থেকে নেমে এলে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন মেজর আবু ওসমান চৌধুরী। উপস্থিত জনতার মূহুর্মূহু জয় বাংলা ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে মুজিবনগরের আম্রকানন। সব মিলিয়ে ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ হয়।[২৮]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকারকে শপথ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ যুদ্ধ মোকাবেলার জন্য মনোযোগ দিতে হয় সামরিক সংগঠনের দিকে। মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর প্রতিরোধ পর্যায় পর্যন্ত রাজনৈতিক সংগঠনের ভূমিকা যথেষ্ঠ হলেও এপ্রিলের শেষ নাগাদ রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে অনিবার্যভাবেই যুক্ত হয় সামরিক সংগঠন। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের সামান্য সংখ্যক বাঙালি সদস্য নিয়ে গড়ে তোলা হয় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী।[২৯]

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়ক, রাজনৈতিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, বিশিষ্ট নাগরিক সংগঠন এবং সাংবাদিকদের সহায়তা ও সাহায্য লাভ করে। আর এ সহায়তা ও সাহায্য লাভে মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা ছিল অসাধারণ।[৩০] মার্কিন সরকার যদিও ছিল পাকিস্তানের পক্ষে, সেখানকার বহু জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। দেশের এ দীর্ঘ দুঃসময়ে ভারত, নেপাল, ভুটান, রাশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, আর্জেন্টিনা, সুইজারল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, নেদারল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, অষ্ট্রেলিয়া, কিউবা, শ্রীলংকা, তুর্কি, মিশরের অবদান অনন্য। তবে ভারতের অবদান এক্ষেত্রে অনন্য সাধারণ ছিল। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে বর্হিবিশ্বের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভে মুজিবনগর সরকারের অবদান ছিল অপরিসীম।[৩১]

ব্যারিস্টার আমীর উল ইসলাম রচিত অধ্যাপক ইউসুফ আলী পঠিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বাংলাদেশের মূল সাংবিধানিক ভিত্তি। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আইনগত বৈধতা প্রদান করে স্বাধীনতা সংগ্রামের। বাংলাদেশের সংবিধানেও সংযোজিত এই ঘোষণাপত্র।[৩২] স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি নিম্নে দেওয়া হল:

যেহেতু ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়েছিল, যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ উক্ত অঞ্চলের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭টি নির্বাচিত করেছিলেন, যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ তারিখে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহ্বান করেন, যেহেতু আহুত এই পরিষদ স্বেচ্ছাচার এবং বেআইনিভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন, যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করার পরিবর্তে বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিদের সাথ পারস্পারিক আলোচনাকালে ন্যায়নীতি বহির্ভুত এবং বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্য উদ্ভুত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনা করছে এবং এখনো বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন গণহত্যা ও নির্যাতন চালাচ্ছে, যেহেতু পাকিস্তান সরকার অন্যায় যুদ্ধ ও গণহত্যা এবং নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার পরিচলনা দ্বারা বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের একত্রিত হয়ে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব করে তুলেছে, যেহেতু বাংলাদেশের জনগণের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপর তাদের কার্যকরী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে, সেইহেতু সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি যে ম্যান্ডেট দিয়েছেন সেই ম্যান্ডেট মোতাবেক আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা পারস্পারিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমাদের সমবায়ে গণপরিষদ গঠন করে বাংলাদেশের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ গঠনের কথা ঘোষণা করছি এবং এই ঘোষণাকে অনুমোদন করছি এবং এতদ্বারা আমরা আরও অনুমোদন করছি ও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে কাজ করবেন। রাষ্ট্রপ্রধানই সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়ণের ক্ষমতার অধিকারী হবেন। তিনি একজন প্রধানমন্ত্রী এবং প্রয়োজনবোধে মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যদের নিয়োগ

করতে পারেন। আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, বিশ্বের একটি জাতি হিসেবে এবং জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক আমাদের উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তেছে তা যথাযথভাবে পালন করবো।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে আমাদের এই স্বাধীনতার ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকরী বলে গণ্য হবে। আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে যথাযথভাবে ও নিয়মানুগ উপায়ে রাষ্ট্রপ্রধানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করে তাকে এই কাজের জন্য নিযুক্ত করলাম।

২৬ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ১৭ এপ্রিল সরকার গঠন সমগ্র মুক্তিযুদ্ধকে একটি কাঠামো এনে দেয়। মুজিবনগর সরকার সাংবিধানিকভাবে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালনা করতে থাকেন সমগ্র মুক্তিযুদ্ধ। বন্ধুপ্রতীম ভারত সরকারসহ বিশ্বের সব রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ চালিয়ে যায় এই সরকার। জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা এভাবে প্রবাসী সরকার গঠন করে একটি সফল মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার ইতিহাস বিশ্বে বিরল। মুক্তিফৌজ, মুক্তিবাহিনীসহ দেশের ভেতরে ব্যক্তি উদ্যোগে গড়ে ওঠা আঞ্চলিক বাহিনীসমূহ একটি পতাকাতলে সম্মিলিতভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচলনা করতে থাকেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য মুজিবনগর সরকারের ভেতর নানা অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে কষ্টলব্ধ মুক্তিসংগ্রামকে নসাৎ করার একটি প্রচেষ্টাও লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সরাসরি বিরোধিতাকারী বৃহৎ পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে সরকারের ভেতরে খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র গ্রুপ পাকিস্তানের সঙ্গে আপোষের নানা আয়োজন করতে থাকে।

সেসময়ে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ঘনিষ্ঠ সহচর মঈদুল হাসানের *মূলধারা ৭১*, মার্কিন সাংবাদিক লরেন্স লিফশুলৎসের গবেষণা গ্রন্থ *আন ফিনিশড রেভুলেশন* থেকে এই সংক্রান্ত অনেক তথ্য জানা যায়।[৩৩]

‘৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সালে ইসলামাবাদে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত যোসেফ ফারল্যান্ড প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে প্রস্তাব করেন, কোলকাতায় বাংলাদেশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে [খন্দকার মোশতাক] তারা জানিয়ে রাখতে চান যে, ইয়াহিয়া মোশতাকের সঙ্গে গোপন আলোচনা শুরু করতে সম্মত হয়েছেন।[৩৪]

ভারতের পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকদের বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে আনুগত্য ঘোষণার ক্ষেত্রে ভারতের সম্পৃক্ততা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতাস্থ পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনের ৬৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ ডেপুটি হাইকমিশনার এম. হোসেন আলী বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে যোগ দেন। ১৮ এপ্রিল ডেপুটি হাইকমিশন ভবনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে এই

আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। এম. হোসেন আলীর বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নিতে তাজউদ্দীন নিজে তাঁকে প্ররোচিত করেন।[৩৫] এটাই ছিল প্রথম বাংলাদেশ মিশন। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতার বাংলাদেশ মিশনের বিষয়ে কোন আপত্তি তুলবে না বলে বাংলাদেশ সরকারকে আশ্বস্ত করেন। পাকিস্তান সরকার হোসেন আলীকে চাকুরিচ্যুত করে কলকাতার ডেপুটি হাইকমিশনের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য মাহদী মাসুদকে নতুন ডেপুটি হাইকমিশনার নিয়োগ করেন। কিন্তু মাহদী মাসুদকে সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান থেকে বিরত থাকে ভারত সরকার।[৩৬] কলকাতার সেই পাকিস্তান বিরোধী প্রচন্ড বৈরী পরিবেশে পাক কূটনীতিকের পক্ষে সফল হওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁর হোটেল কক্ষের সামনে শরণার্থী ও স্থানীয় বাঙালিদের অবরোধের কারণে তিনি অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। এমন কি হোটেল কর্মচারীরা তাকে খাবার ও পানীয় সরবরাহে অস্বীকৃতি জানায়।[৩৭] শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান কলকাতায় তার ডেপুটি হাইকমিশন বন্ধ ঘোষণা করে এবং পাল্টা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ভারতকে ঢাকাস্থ তার ডেপুটি হাইকমিশন বন্ধ করতে বলে।

অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ২৮ মার্চ নয়াদিল্লীতে পাকিস্তান হাইকমিশনের বাঙালি কূটনীতিক সেকেন্ড সেক্রেটারি কে এম শিহাবউদ্দিন ভারতের বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পাকিস্তান ডেস্কের দায়িত্বপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব এ কে রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দিল্লীতে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন।[৩৮] মি: রায় তাকে অনুৎসাহিত করেননি। তবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রশ্নে ভারত সরকারের নীতি প্রণয়নে কিছু সময়ের প্রয়োজন বলে জানান। সহকারী প্রেস অ্যাটাসে আমজাদুল হকসহ ৬ এপ্রিল পাকিস্তানের ফরেন সার্ভিস থেকে পদত্যাগ করে যৌথ বিবৃতিতে উল্লেখ করেন যে, We have severed our connection with the fascist military dictatorship in Islamabad. ... From now our allegiance is to Bangladesh.[৩৯] এপ্রিল মাসের শেষ দিকে বাংলাদেশ সরকার দিল্লীতে বাংলাদেশের দূতাবাসের আদলে বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে। এর প্রধানের দায়িত্ব পান শিহাব আর আমজাদ হলেন প্রেস অ্যাটাসে। ভারতের বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক মন্ত্রী সর্দার শরণ সিংয়ের অনুমোদন নিয়ে ভারতের রাজধানীতে এই সেন্টার কার্যক্রম পরিচালনা করে।[৪০]

বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে নয় মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় এই সরকার ভারতের সর্বাত্মক সহযোগিতা লাভ করে। ভারতের আশ্রয় ও সাহায্যের ওপর এই সরকারের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল ছিল। এই সরকারের ওপর আওয়ামী লীগের কর্তৃত্ব ধরে রাখার ক্ষেত্রেও ভারতের কার্যকর

সহায়তা অব্যাহত ছিল। “India’s clear support to the Awami League did non let any serious challenge develop from the liftist elements and it sustainen the pre-eminent role of the Awami League in the Bangladesh movement.”[৪১]

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দেশের জনগণের প্রতিরোধযুদ্ধ শুরু হলেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য মুক্তিবাহিনী সংগঠন ও সমন্বয় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন আদায় এবং এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষ সহায়তাকারী রাষ্ট্র ভারতের সরকার ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক রক্ষায় এই সরকারের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। এই সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধযুদ্ধ প্রবল নেয় এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের বিজয় অর্জন ত্বরান্বিত হয়।

খ. শরণার্থীদের আশ্রয় ও সহায়তা

একাত্তরে ভারতে আশ্রিত শরণার্থীদের দেখতে কলকাতায় এসেছিলেন অ্যালেন গিন্সবার্গ (১৯২৬-১৯৯৭)। বিট সাহিত্য আন্দোলন, যুদ্ধাবাজ মার্কিন প্রশাসনের তীব্র সমালোচনা, কিউবার পক্ষে সমর্থন এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরোধিতা, সর্বোপরি ব্যক্তিগত জীবন সবকিছু মিলিয়ে ততদিনে মার্কিন এই কবি ব্যাপক নন্দিত ও নিন্দিত।[৪২] কলকাতায় এসে শরণার্থী জীবনের বেদনা অনুভবে লিখেন ১৫২ লাইনের দীর্ঘ কবিতা। একাত্তরে শরণার্থীদের কথা বললেই গিন্সবার্গের সেই কবিতা মৌসুমী ভৌমিকের মোহনীয় কণ্ঠে আমাদের প্রাণে বাজে।

‘শত শত মুখ হায় একাত্তর
যশোর রোড যে কত কথা বলে
এত মরা মুখ আধ মরা পায়ে
পূর্ব বাংলা কলকাতা চলে।’

একাত্তরে পাকিস্তানি বাহিনী নির্বিচারে গণহত্যা শুরু করলে বাংলাদেশ থেকে প্রায় এক কোটি মানুষ জীবন বাঁচাতে সীমান্ত পার হয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, সীমান্তঘেঁষা এসব রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয়প্রার্থী হয়। ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে সহায়-সম্বল ছেড়ে ভারতমুখী হন পূর্ব বাংলার জনগণ। ২৬ মার্চ সকাল থেকেই এই উদ্বাস্তু স্রোত শুরু হলেও এটি তীব্রতা পায় এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে। বাংলাদেশের মোট সীমান্তের ৯৩.৮৭% ভারতের সাথে, যেটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৪১৫০

কিলোমিটার। একাত্তরে যে সীমান্তের প্রায় পুরোটাই ছিল উন্মুক্ত। সেই উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে জীবন বাঁচাতে পূর্ব বাংলার লোকজন ভারতে প্রবেশ শুরু করে।

‘বন্যার স্রোতের মত শরণার্থী আসছেন। পেট্রোপোল, বয়রা, হসনাবাদ এবং বসিরহাটে আর স্থান সঙ্কুলান হচ্ছে না। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন রেজিষ্ট্রেশন দপ্তর। কত নাম লিখবেন তারা? জায়গাই বা দেবেন কোথায়? ভেঙ্গে পড়ছে সব ব্যবস্থা। কলকাতার দিকে ছুটছেন শরণার্থীরা। লবণ হ্রদ এলাকা জনাকীর্ণ।’[৪৩]

সারণি ১১ : ১৯৭১ সালের ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শরণার্থী শিবিরের সংখ্যা, তাতে আশ্রয় লাভকারী শরণার্থীর সংখ্যা এবং শরণার্থী শিবিরের বাইরে শরণার্থী সংখ্যার চিত্র।[৪৪]

ক্রম	রাজ্যের নাম	ক্যাম্প সংখ্যা	ক্যাম্পে আশ্রিত শরণার্থী	ক্যাম্পের বাইরে আশ্রিত	সর্বমোট
১	পশ্চিমবঙ্গ	৪৯২	৪৮,৪৯,৭৮৬	২৩,৮৬,১৩০	৭২,৩৫,৯১৬
২	ত্রিপুরা	২৭৬	৮,৩৪,০৯৮	৫,৪৭,৫৫১	১৩,৮১,৬৪৯
৩	মেঘালয়	১৭	৫,৯১,৫২০	৭৬,৪৬৬	৬,৬৭,৯৮৬
৪	আসাম	২৮	২,২৫,৬৪২	৯১,৯১৩	৩,৪৭,৫৫৫
৫	বিহার	৮	৩৬,৭৩২	-	৩৬,৭৩২
৬	মধ্য প্রদেশ	৩	২,১৯,২৯৮	-	২,১৯,২৯৮
৭	উত্তর প্রদেশ	১	১০,১৬৯	-	১০,১৬৯
	সর্বমোট	৮২৫	৬৭,৯৭,২৪৫	৩১,০২,০৬০	৯৮,৯৯,৩০৫

একাত্তরে ভারতের সবচেয়ে বড় ঋণ এইসব উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দেয়া। আশ্রয় দিতে গিয়ে অনেক জায়গায় দেখা গিয়েছে আশ্রয়দাতার চেয়ে আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে। ত্রিপুরার তখনকার লোকসংখ্যার চেয়ে শরণার্থী সংখ্যা বেশি হয়ে পড়েছিল।

২৫ মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর 'অপারেশন সার্চ লাইট' নামক নারকীয় সামরিক আক্রমণ শুরু হবার পর থেকে ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ পর্যন্ত প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজারের মত শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নেয়।[৪৫] পাকিস্তান সরকার সম্ভাব্য প্রতিরোধ মোকাবিলার জন্য এপ্রিল মাসের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী নানা বাহিনী গড়ে তুলে। রাজাকার, আলবদর, আলশামস এবং শান্তিবাহিনীর সদস্যরা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে যেখানে স্বাধীনতার ১০/১৫ বছর পরেও যাতায়াত অত্যন্ত দুরূহ ছিল সেখানে পাকিস্তানি বাহিনীর পথ প্রদর্শক ও বিশস্ত সহযোগীর ভূমিকা পালন করে। ২০১৫ সালের ৩০ অক্টোবর আমার তত্ত্ববধায়ক (অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন) আমাকে খুলনার চরেরহাট নিয়ে যান।[৪৬] খুলনা শহর থেকে চরেরহাট যাওয়ার পথটি খুবই সংকীর্ণ, কাদা মাটির রাস্তা। গাড়ি ছাড়ার পর দুই কিলোমিটার হেঁটে আমরা চরেরহাট বধ্যভূমিতে পৌঁছাই। একাত্তরের মে মাসে মাছ কোম্পানির দুটি নৌকা থামিয়ে পাকিস্তান বাহিনী এখানে প্রায় তিনশ লোককে হত্যা করেন। অধ্যাপক মামুন আমাকে বলছিলেন, 'গণহত্যার তীব্রতা বোঝাতে, ব্যাপ্তি বোঝাতে তোমাকে আমি এখানে নিয়ে এসেছি।' স্বাধীনতার চার দশক পরেও আমাদের কাছে যে এলাকাটি দূগর্ম, প্রত্যন্ত মনে হচ্ছে একাত্তরে সেই নির্জন গ্রামটিও রক্ষা পায়নি পাকিস্তানিদের হাত থেকে।[৪৭] তাছাড়া এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে অবরুদ্ধ বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচার, নিপীড়ণ, হত্যা আর গণধর্ষণ কল্পনাতীতভাবে বৃদ্ধি পাবার কারণে বাঁধ ভাঙ্গা স্রোতের ন্যায় শরণার্থীরা ভারতের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন রাজ্যে প্রবেশ করতে থাকে। ২১ মে শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় চৌত্রিশ লক্ষের ওপরে। ১৯৭১ সালের ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত শরণার্থীর সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পেয়ে ৯৮,৯৯,৩০৫ জনে এসে দাঁড়ায়। শরণার্থীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল হিন্দু। আগস্ট ১৯৭১ পর্যন্ত হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ৬৯,৭১,০০০ জন এবং মুসলিম ও অন্য ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ছিল প্রায় ছয় লাখ।[৪৮]

প্রথম আঘাত এসেছিল হিন্দুদের ওপর যা পরে ধর্মীয় পরিচয়ে আবদ্ধ থাকেনি। বাঙালি মাত্রই, আক্রমণের শিকার হয়ে সীমান্ত পাড়ি দিতে বাধ্য হয়। জুন মাস পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে দেখা যায় শরণার্থীদের মধ্যে সিংহভাগই ছিল মুসলমান।[৪৯] শরণার্থীদের প্রাথমিক চাপ পড়ে সীমান্ত সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ও মেঘালয় রাজ্যে। তবে সর্বাধিক শরণার্থী আশ্রয় নেয় পশ্চিমবঙ্গে, এর পরে ত্রিপুরায়। আসামের আশ্রিত শরণার্থীদের বড় একটি অংশ আশ্রয় নিয়েছিল সীমান্তবর্তী বরাক উপত্যকায়। সম্ভবত বাংলা ভাষাভাষি

হবার কারণে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও বরাকে শরণার্থীদের প্রতি সহমর্মিতা আর সহানুভূতি ছিল তীব্র।[৫০] এটা কেবলমাত্র আবেগগত বিষয় ছিল না, পশ্চিমবঙ্গ বা ত্রিপুরার পক্ষে বিরাট সংখ্যক শরণার্থীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। পশ্চিম বাংলার পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় ১৩ লাখ শরণার্থী এসেছে। ঐ জেলার মোট জনসংখ্যা সাড়ে ১৮ লাখ। ২৪ পরগণার বসিরহাট শহরে যেখানে মোট জনসংখ্যা ৬৩ হাজার, সেখানে ২ লাখ ৭৫ হাজার শরণার্থী এসেছেন, বনগাঁ শহরে যেখানে জনসংখ্যা ৫১ হাজার সেখানে ২ লাখ ৭৪ হাজার শরণার্থী এসেছে। এর অর্থ এই দুটি সীমান্ত শহরে মোট জনসংখ্যা (শরণার্থীসহ) কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। নদীয়া জেলায় প্রায় তিন লাখ শরণার্থী এসেছে। ঐ জেলায় মোট জনসংখ্যা ২৫ লাখ। কোচবিহার জেলায় প্রায় ২ লাখ ২০ হাজার শরণার্থী এসেছে। ঐ জেলায় মোট জনসংখ্যা ১৪ লাখ ১২ হাজার। ফলে, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, নদীয়া এবং ২৪-পরগণার বসিরহাট ও বনগাঁ এলাকাই শরণার্থীর চাপে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।[৫১]

২১ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যে সকল রাজ্যকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানায়। পশ্চিমবঙ্গের একার পক্ষে শরণার্থীদের জন্য খাদ্য, আশ্রয় এবং স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান সম্ভব নয়। এই অবস্থায় দিল্লীতে কেন্দ্রীয় শ্রম, কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন মন্ত্রী আর কে খাদিলকার ঘোষণা করে দেন যে, শরণার্থীদের ত্রাণকার্যে সকল ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবে।[৫২] ত্রাণকার্য তদারকির জন্য পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে একজন অতিরিক্ত সচিবকে প্রদান করে কলকাতা শাখা সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। আসাম এবং ত্রিপুরায় এর লিয়াজোঁ অফিস খোলা হয়। খাদিলকার জানান যে, সীমান্ত এলাকার রাজ্যসরকারগুলো প্রায় ৫৫টি অভ্যর্থনা কেন্দ্র খুলেছে এবং প্রয়োজন অনুসারে কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। ত্রাণকার্যে সমন্বয় ও শরণার্থী শিবির প্রতিষ্ঠার মূল দায়িত্বে ছিলেন কর্নেল পি. এন. লুথার। তিনি সাতটি রাজ্য সরকার, ২৪টি ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং ১২টি আন্তর্জাতিক সংস্থার সমন্বয়ে কাজ করেন। কর্নেল লুথার নয় মাসের কম সময়ের মধ্যে ৮৯৬টি শরণার্থী ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৬.৮ মিলিয়ন শরণার্থীর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। অবশিষ্ট প্রায় তিন মিলিয়ন শরণার্থী ক্যাম্পে অবস্থান না করলেও নিয়মিত রেশন ও চিকিৎসা সহায়তা পেতেন। পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় অধিকাংশ ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করা হলেও আসাম, মেঘালয়, বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং মধ্য প্রদেশেও ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৫৩] শরণার্থীদের সেবায় এসব রাজ্য ছাড়াও ভারতের প্রায় সবগুলো রাজ্যই সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। প্রত্যেকটি রাজ্যতেই সরকারিভাবে, বেসরকারি উদ্যেগে শরণার্থীদের জন্য তহবিল সংগ্রহ, সাহায্য সংগ্রহ কার্যক্রম চলেছে। সংগৃহীত হয়েছে বিপুল সংখ্যক অর্থ।

আফ্রিকার কবি জিন্ডালা মেবু, যে নিজেই একজন শরণার্থী। শরণার্থী জীবন নিয়ে লিখেছেন,

‘সারা পৃথিবীর সমস্ত শরণার্থী শিবিরের তাবু নীল কেন?

সারা পৃথিবীর সমস্ত সীমান্তের রং হলুদ কেন

এই নীল আর হলুদের বুনে যাওয়া সোয়েটার নিয়ে

আমার বাড়িতে মা বসে আছেন।’[৫৪]

দালাইলামা নিজের শরণার্থী জীবন নিয়ে লিখেছেন, ‘এই জীবনে কোন সবুজ নেই, জল নেই, ভালবাসা নেই, শুধু রক্ত হলুদ রাঙ্গা।’[৫৫] সেই জনহীন, ভালবাসাহীন রুক্ষ জীবনে একাত্তরে একরাশ মমতা নিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছিল ভারত।

শরণার্থীদের নিয়ে সরকারি পর্যায়ে ভারতের নীতির প্রধান দুটি দিক ছিল। প্রথমত, মানবিক কারণ। দ্বিতীয়ত, জাতীয় স্বার্থ। অবশ্য ভারতের সুশীল সমাজের প্রতিক্রিয়া ছিল একান্তই মানবিক। ৮ মে ভারতের পূর্বাঞ্চলের পাঁচটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা জাতির উদ্দেশে এক বিবৃতিতে শরণার্থী-সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা উল্লেখ করে বলেন, এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে, যাতে শরণার্থীরা পূর্ববঙ্গে ফিরে যেতে পারে। এর পরই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৬ মে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরায় বেশ কিছু শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন। ১৮ মে রাণীক্ষেতে এক জনসভায় ভাষণদানকালে ইন্দিরা গান্ধী শরণার্থী-সমস্যার ব্যাপকতা অনুধাবনের জন্য বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।[৫৬]

প্রধানত, দুটি লক্ষ্য সামনে রেখে ভারত শরণার্থী বিষয়ে নীতি প্রণয়ন করেছে। ১. বাংলাদেশ-সংকটের আন্তর্জাতিকীকরণ ও হস্তক্ষেপের পটভূমি তৈরি এবং ২. জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে সাহায্য গ্রহণ। প্রথম লক্ষ্যটি ছিল সুস্পষ্ট। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ও সরকার বহির্বিশ্বে জোরালো প্রচারণায় অংশ নেয়। ভারত যুক্তি দেখায় যে, পাকিস্তান তার বেসামরিক নাগরিকদের ভারতে ঠেলে দিয়ে তার অর্থনীতিতে চাপ সৃষ্টি করেছে। ভারত এই সিভিল আগ্রাসন এর পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে প্রতি-আক্রমণের হুমকি দেয়, আন্তর্জাতিক আইনে যাকে বলে আত্মরক্ষার্থে প্রতি-আক্রমণ। ভারত শরণার্থীদের নিজে যেমন সাহায্য করেছে, তেমনি শরণার্থীদের জন্য এসেছে আন্তর্জাতিক সাহায্য। জুন ১৯৭১ পর্যন্ত জাতিসঙ্ঘ ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত ও প্রতিশ্রুত সাহায্যের পরিমাণ ছিল ২৬ কোটি ৩০ লাখ মার্কিন ডলার। জাতিসংঘের ইতিহাসে এটা ছিল আকাশপথে সবচেয়ে বৃহৎ সাহায্য। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানি, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো সাহায্য পাঠায়। ভারত তার নিজস্ব কোষাগার থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ শরণার্থীদের জন্য ব্যয় করে। এ জন্য

ভারতীয় জনগণকে ১৯৭১-৭২ সালে কর দিতে হয়। ভারতে শরণার্থীদের অস্বাভাবিক আগমনে পরিস্থিতি নাজুক হয়ে ওঠে। শরণার্থী শিবিরগুলো পূর্ণ হওয়ায় অন্যরা খোলা আকাশের নিচে, রাস্তায়, ফুটপাতে ও রেলস্টেশনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।[৫৭]

অধ্যাপক দিব্যদুতি সরকার গবেষণা করেছেন 'মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থী সমস্যা' নিয়ে।[৫৮] তিনি তাঁর গবেষণায় শরণার্থী সমস্যাটিকে একটু ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তার মতে, শরণার্থী সমস্যা উদ্ভবের আগে পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ছিল মূলত একটি জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম। এরপর অধ্যাপক সরকার তুলে ধরেন, বিপুল হারে শরণার্থী আগমণের ফলে পূর্ববঙ্গের এই জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে ভিন্ন একটি রাষ্ট্র হিসেবে ভারত সম্পৃক্ত হচ্ছে। তিনি লিখেন, '১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আর শুধু জাতীয়তাবাদী যুদ্ধ থাকেনি। বরং তা সুস্পষ্ট রাজনৈতিক সংঘাতের রূপ পরিগ্রহ করে। বস্তুত একাত্তরে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের জন্য তিনটি পূর্বশর্ত প্রধান হয়ে উঠেছিল। এক. মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক সংগঠন ও মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহ; দুই. ভারতের অব্যাহত ও সক্রিয় সমর্থন এবং তিন. আন্তর্জাতিক সমর্থন। এই তিনটি শর্তকেই পরিপূরণ করার জন্য শরণার্থী সমস্যা উপাদানটি খুবই কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আর এমন কোনো একক উপাদান নেই, যা এই তিনতি পূর্বশর্তকেই সমান্তরালভাবে পরিপূরণ করে। শরণার্থী সমস্যা প্রপঞ্চটি দ্বারাই কেবল এই তিনটি পূর্বশর্তকে তাত্ত্বিকভাবে সংযুক্ত করা সম্ভব। শরণার্থী ইস্যুটি তাই বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের একটি মৌল নিয়ামকে পরিণত হয়েছিল।[৫৯] ভারতবর্ষের যেসব রাজ্যগুলিতে শরণার্থীরা আশ্রয় নিয়েছিল সেই রাজ্য সরকারগুলিও শরণার্থীদের ব্যাপারে নানা ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিল। ২১ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রী ডাঃ জয়নাল আবেদিন জানান যে, বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের জন্য সীমান্তের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে।[৬০] স্বায়ত্তশাসনমন্ত্রী মহম্মদ রউফ আনসারী বলেন, সিএমডি এর মাধ্যমে কলকাতায় ১০০টি ওয়ার্ডের ১০০টি বস্তিতে আধুনিক জীবনযাত্রার সুযোগ করে দেওয়া হবে।[৬১] *দি স্টেটসম্যান* পত্রিকায় 'বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যে সকল রাজ্যকে এগিয়ে আসার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আহ্বান' শিরোনামে যে খবর প্রকাশিত হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গের একার পক্ষে শরণার্থীদের জন্য খাদ্য, আশ্রয় এবং স্বাস্থ্য পরিসেবা দেওয়া সম্ভব নয়। ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলিও এ বিষয়ে এগিয়ে আসা উচিত কেননা তারাও বাংলাদেশের ঘটনায় সহমর্মী। এই পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় শ্রম কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন মন্ত্রী আর কে খালিদকার জানিয়েছিলেন শরণার্থীদের ত্রাণকার্যে সকল ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবে।[৬২] ওই একইদিনে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী সভায় শরণার্থী সমস্যা তদারকির

জন্য একটি সাব কমিটি গঠন করেছিল। যেখানে ছিলেন অর্থমন্ত্রী তরুণ কান্তি ঘোষ, পিডব্লুডি মন্ত্রী সন্তোষ রায়, পুনর্বাসন মন্ত্রী আনন্দমোহন বিশ্বাস। ওই একইদিনে *স্টেটসম্যান* পত্রিকায় দিল্লীর সংবাদদাতাকে উল্লেখ করে লিখেছেন, Mr. Khadilkar did not naturally want to specify the amount, but having regard to humanitarian consideration, the centre was prepared to bear the heavy burden and would give whatever money is required to help the large number of people beig forced out of East Bengal.[৬৩]

শরণার্থী আশ্রয়ের প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তৎকালীন রাজ্যপাল শান্তি স্বরূপ ধাবান যে ভাষণ দিয়েছিলেন বাংলাদেশ থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে যারা ভারতের মাটিতে আশ্রয় চাইবেন তাদের সকলকে আশ্রয় দেওয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি হবে। রাজ্যপাল তার ভাষণে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শেষ কয়েকদিন হতে বাংলাদেশ থেকে অভূতপূর্ব উদ্বাস্তু আগমন হচ্ছে এর ফলে খাদ্য সরবরাহ ও নিরাপত্তার সমস্যা আরো জটিল হয়ে উঠছে। অনুমতি হয় যে দশ লক্ষেরও অধিক নরনারী সীমান্ত পার হয়ে এসেছেন এবং উদ্বাস্তু আগমনের স্রোত অব্যাহত আছে।[৬৪]

একই দিনে বিধানসভার অধিবেশন শেষে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জীর ঘরে বিরোধী দলনেতা জ্যোতি বসু, সিপিএম নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙার, উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় সিংহ নাহার, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ জয়নাল আবেদিন, সিপিআই নেতা বিশ্বনাথ মুখার্জী, সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের আহ্বায়ক সুধীন কুমার, এসইউসি নেতা সুবোধ ব্যানার্জীও মিলিতভাবে বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব রচনা করেন।[৬৫] এই সর্বসম্মত প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় ৮ মে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছিল।[৬৬]

বিধানসভায় বাংলাদেশ সাব-কমিটির সদস্য হিসাবে সন্তোষ রায় এবং জয়নুল আবেদিন উপস্থিত ক্রমবর্ধমান শরণার্থী সমস্যায় বিপাকে পড়ে ৮ মে পূর্বাঞ্চলের পাঁচটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে একটি জরুরি বৈঠকে বসেন। এই বৈঠকে আসামের মুখ্যমন্ত্রী মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী কর্পুরী ঠাকুর, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ, মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী উইলিয়ামসন সাংমা এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় প্রায় দু-ঘন্টা ধরে আলোচনা করেন। এ ছাড়া বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় সিংহ নাহার রাজ্য উপস্থিত মন্ত্রীসভায় বাংলাদেশ সাবকমিটির সদস্য হিসাবে সন্তোষ রায় এবং জয়নাল আবেদিন ছিলেন।[৬৭]

এই বৈঠকে স্থির হয়েছিল তারা কেন্দ্রকে অনুরোধ জানাবেন বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের সমস্যাটি শুধু সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির সমস্যা বলে গণ্য না করে, জাতীয় সমস্যা বলে গণ্য করা হোক। কারণ

হিসাবে বলা হয়েছিল শুধু সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির বহন করার পক্ষে এই সমস্যা অত্যন্ত গুরুভার, বহু জায়গায় এই শরণার্থীদের মাথার ওপর কোন আচ্ছাদন নেই। কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় যে খাদ্যশস্য মঞ্জুর করেছেন তার সরবরাহ অনিয়মিত। লবণ, চিনি, কেরোসিন, বাসনপত্র এবং কাপড় চোপড়ের সরবরাহ সর্বদাই প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। যানবাহনের ঘাটতির ফলে পাঠাবার ব্যবস্থাও ব্যাহত হচ্ছে। স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি রক্ষা সম্পর্কে সমস্যা দেখা দিয়েছে। কলেরা দেখা দিচ্ছে বলে খবর আসছে।[৬৮] বৈঠকের পর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন এই বিপুল সংখ্যক শরণার্থীদের জন্য আশ্রয় ও খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য যা অর্থ লাগে কেন্দ্র সবই দেবেন বলেছেন কিন্তু এছাড়া আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি আরো নানা প্রশ্ন ও সমস্যা আছে। এই দিনের বৈঠকে মোটামুটি ঠিক হয়েছে তারা সীমান্তে আরো নিরাপত্তা ও পুলিশি ব্যবস্থার যে অর্থ আগে তাও কেন্দ্রকে দিতে বলবেন। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীরা আশা করেন তাদের আবেদনে ভারতের সব রাজ্য এই গুরুদায়িত্ব বহন করতে এগিয়ে আসবেন। মানবাধিকার প্রশ্নে ভারতের এই দায়িত্ব বহনে অংশগ্রহণের জন্য মুখ্যমন্ত্রীরা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি এবং সব স্বাধীন রাষ্ট্রকেও অনুরোধ জানাতে মনস্থ করেন। এই বৈঠকের ফল হিসাবে আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, মেঘালয় ও পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে পাঁচটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীতে শরণার্থী পুনর্বাসনের প্রশ্ন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন।[৬৯] ৫ জুন ১৯৭১ যুগান্তর পত্রিকায় 'প্রধানমন্ত্রীর কাছে রাজ্য মন্ত্রীসভা দাবি করবেন-শরণার্থীদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠাতে হবে' এই শিরোনামে যে খবর প্রকাশিত হয়েছিল তাতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মন্ত্রীসভার তরফে কতগুলো দাবি এবং আশঙ্কা প্রকাশ পেয়েছিল এবং তা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে তুলে ধরা হবে বলে দাবি করা হয়েছিল। প্রথমত, বাংলাদেশ থেকে আগত প্রায় অর্ধ কোটি শরণার্থীর রক্ষণাবেক্ষণের পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে কেননা রাজ্য সরকার তার সামগ্রিক সামর্থ্য নিয়োগ করেও শরণার্থী আগমন জনিত সমস্যার মোকাবিলা করতে পারছে না। দ্বিতীয়ত, ভারতের অন্যান্য রাজ্যে তাদের জন্য শিবির স্থাপন করে তাদের স্থানান্তরিত করা উচিত। কেননা তা না হলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ভেঙে পড়বে। তৃতীয়ত, শরণার্থী সমস্যাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় স্তরে আইন শৃঙ্খলার অবনতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। সর্বোপরি উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় সিং নাহার সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, এখন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত উন্নয়ন কাজ বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে, ওদের আশ্রয় দিতে পারছি না, খেতে দিতে পারছি না। একই সঙ্গে অভিযোগ করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার শরণার্থীদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে

পারছে না। পশ্চিমবঙ্গের ত্রাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আনন্দমোহন বিশ্বাস অভিযোগ করেছিলেন শরণার্থীদের বিষয় যে গুরুত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া উচিত ছিল তা তারা দেননি।[৭০]

পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীদের বিপুল সমাগম ও নানা সংকটের প্রেক্ষাপটে শরণার্থীদের দায়দায়িত্ব যাতে দেশের অন্যান্য রাজ্য সরকারগুলো বহন করে সেজন্য বিভিন্ন স্তরে আলোচনা শুরু হয়েছিল। শরণার্থী সমস্যা যে কেবল পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির ওপর চাপ সৃষ্টি করছে তাই নয়, আইন-শৃঙ্খলা, পরিস্থিতি এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাও হুমকীর সম্মুখীন। কারণ শরণার্থী সমস্যা সামাল দিতে রাজ্য সরকারকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। এর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তোলে। ৭ জুন সিপিআই সেক্রেটারী জেনারেল রাজেশ্বর রাও এক বিবৃতিতে বলেন–

Tension was developing between the evacuees and local population and there was every danger of communal riots breaking out a wide scale.[৭১]

ক্রমবর্ধমান শরণার্থীদের চাপে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাস্পের কারণে রাজনীতি হয়ে ওঠে বিস্ফোরণ মুখ। এমন পরিস্থিতিতে ভারত সরকার শরণার্থীদের বিষয়ে পূর্বের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। শরণার্থীদের কেবল সীমান্ত এলাকায় বাসস্থানের ব্যবস্থা করার নীতি পরিবর্তন করে শরণার্থীদের বিভিন্ন রাজ্যে স্থানান্তরের উদ্যোগ নেয়। যদিও পশ্চিমবঙ্গ শরণার্থী সমস্যার একেবারের সূচনালগ্ন থেকেই দাবি জানিয়ে আসছে, পশ্চিমবঙ্গের ওপর শরণার্থীদের চাপ যৌক্তিক পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য। পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং শরণার্থী বিষয়ক ক্যাবিনেট সাব কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ জয়নাল আবেদিন জানান যে, কেন্দ্রীয় সরকার অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে প্রায় তিন লক্ষ শরণার্থীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু শরণার্থীরা পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে অন্যত্র যেতে আগ্রহী নয়। মধ্যপ্রদেশের নানা ক্যাম্পে স্থানান্তরের জন্য ১০০০ শরণার্থীকে দুটি ট্রেনে তোলা হলে, ৮০০ শরণার্থী যেতে অস্বীকৃতি জানায়। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের ওপর শরণার্থীর ভার লাঘব দুরূহ হয়ে পড়েছে।[৭২]

১৬ মে হলদিবাড়িতে বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের ইন্দিরা গান্ধী একটি জনসভায় এই প্রতিশ্রুতি দেন যে ভারতের যদিও জনসংখ্যা অনেক বেশি এবং খাদ্যাভাবও রয়েছে তবু মানবিক কারণে ভারত তাদের (শরণার্থীদের) জন্য খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করবে। তিনি আরো বলেন পাকিস্তানের কাছে যেটা তার অভ্যন্তরীণ ব্যাপার ভারতের কাছে সেটা গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৭৩] দৈনিক *হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড*-এ *World will have to ensure Refuge return* এই শিরোনামে যে খবর প্রকাশিত

হয়েছিল তাতে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জগজীবন রাম সাংবাদিকদের বলেছিলেন– ...the nations of the world have to consider what other steps could be taken to solve the problem created bu the 'unprecedented' influx of evacuees from Bangladesh to India.[৭৪]

বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি এবং বিবৃতির ওপর সদস্যদের যে আলোচনা হয় তার প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় যে বিবৃতি দেন তাতে ভারতের অবস্থানের বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি বলেছিলেন,

Something new had happened in East Bengal a democratic action where an entire people had spoken with almost one voice we had welcomed this, not because we wanted to interfere in another country's affairs, but those were the values, as one of my Hon'ble friends pointed out, for which we have always stood and for which we have always spoken out. And we had hoped that this action would lead to a new situation in our neighboring country which would help us to get closer, which would help us to serve our own, people better and create an entirely new situation, in this sub-continent. As our statement has said this did not happen and a wonderful opportunity for even the strengthening of Pakistan has been lost and has been lost manner which is tragic, which is agonizing and about which we cannot find strong, enough words to speak. This again is a new situation but in a different way. It is not merely an unarmed people with tanks. We are in close touch, as close touch the events as is possible in such situation.[৭৫]

ওই একই দিনে রাজ্যসভায় এক বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী বলেন–

We are not unaware of is taking place in East Pakistan and of what it means not only to the people there but the danger that it holds for us, not for any one part of our country but for the entire country.[৭৬]

শরণার্থীদের পেছনে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছিল ও তার প্রেক্ষিতে ভারতীয় জনগণের ওপর যে কারণে চাপ পড়েছিল সেই প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী বিবৃতিতে বলেন–

Our present estimates, the cost to the central exchequer on relief alone may exceed Rs. 180 crores for a period of six months. All this as Honorable Members will appreciate, has imposed an unexpected burden on us. [৭৭]

প্রায় এককোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দিতে গিয়ে ইন্দিরা সরকারকে মুখোমুখি হতে হয় ভয়াবহ এক বিপর্যয়ের। সেই বিপর্যয় উঠে এসেছে Marcus Franda এর উক্তিতে,

… the ten million refugees that came to India in 1971 own their survival primarily to the generosity of Indian citizens, the dedication of Indian relief workers and the resources of the Indian government.[৭৮]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ছিল অনবদ্য ভূমিকা। ভারত সরকারের সেই অনবদ্য ভূমিকার ফসল বাংলাদেশ।

গ. আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টির প্রয়াস

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে বৈশ্বিক জনমত সৃষ্টিতে ভারত প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে। এই জনমতটি মূলত সরকারি উদ্যোগ এবং নাগরিক পর্যায়ে দু'ভাগেই হয়েছে। নাগরিক পর্যায়ের ভূমিকা অভিসন্দর্ভের অন্যান্য অধ্যায়ে বিশদ আলোচিত হওয়া সরকারি পর্যায়ে ও রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকান্ডে আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টির বিষয়গুলি তুলে ধরছি।

একাত্তরে বাংলাদেশের পক্ষে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম যে মানুষটির, তাঁর নাম ইন্দিরা গান্ধী। মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তি পর্বে মার্কিন প্রশাসনের সাথে আলোচনার জন্য ইন্দিরা গান্ধী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান। ৪ নভেম্বর ১৯৭১ প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সাথে তিনি বাংলাদেশ বিষয়ে আলোচনায় বসেন। শাহরিয়ার কবির সেই বৈঠক সম্পর্কে লিখছেন, আনুষ্ঠানিক বৈঠক ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ, ক্লান্তিকর এবং শীতল।[৭৯]

নৈশভোজে ইন্দিরা গান্ধী বলছিলেন, 'বাংলাদেশের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে তিনি ৩৬,০০০ মাইল ভ্রমণ করেছেন। ৩৭৫টি মিটিং করেছেন এবং বিভিন্ন দেশের সাড়ে তিন লাখ সম্মানিত নাগরিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। আমি এখানে এসেছেন শান্তির প্রত্যাশা নিয়ে।'[৮০]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে ইন্দিরা গান্ধী শুধু ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না, লন্ডনের *ডেইলি মিররের* ভাষায় বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী নেতায় পরিণত হয়েছিলেন, যাকে নিরস্ত্র করার ক্ষমতা আমেরিকারও ছিল না। একাত্তরে ইন্দিরা গান্ধী ও ভারত সমার্থক শব্দে পরিণত হয়েছিল। বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠনের ক্ষেত্রে ভারতের সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যম যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, একই ভাবে বিদেশি গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের শরণার্থীদের দুর্দশা, মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতার এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের নিদর্শনসমূহ দেখানোর ব্যবস্থাও ভারতকে করতে হয়েছিল। আমন্ত্রণ জানাতে হয়েছে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের সদস্য এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের।

এই সব সফল এবং কূটনৈতিক তৎপরতা যে শুধু সরকারি পর্যায়ে হয়েছিল তা নয়। বাংলাদেশের বাস্তবতা সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহের কাছে তুলে ধরার জন্য সিপিআই'র নেতৃবৃন্দকে সেসব দেশে যেতে হয়েছিল। সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। প্রখ্যাত ফরাসী বুদ্ধিজীবী আঁদ্রে মালরো, যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন, বলেছিলেন বাংলাদেশ যদি মুক্তিযুদ্ধের জন্য আন্তর্জাতিক ব্রিগেড গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে সবার আগে তিনি ব্রিগেডে যোগ দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করবেন।[৮১]

মকবুল ফিদা হোসেনের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর ছবি এঁকে বোম্বের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্য। বিকাশ ভট্টাচার্য, প্রকাশ কর্মকার, শ্যামল দত্তরায় আর গণেশ পাইনের মতো খ্যাতমান শিল্পীরা ফুটপাতে দাঁড়িয়ে মাসের পর মাস বাংলাদেশের ওপর ছবি এঁকে বিক্রি করেছেন এবং ছবি বিক্রির টাকা শরণার্থী শিবিরে পৌঁছে দিয়েছেন। শিল্পী বাঁধন দাস ছবি আঁকা ছেড়ে শরণার্থী শিবিরে গিয়ে চিকিৎসা কেন্দ্র খুলেছিলেন তাঁর এক ডাক্তার বন্ধুকে নিয়ে। অন্নদাশঙ্কর রায়, মৈত্রেয়ী দেবী, দীপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, শান্তিময় রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, প্রণবরঞ্জন রায়, তরুণ সান্যাল, নিখিল চক্রবর্তী, রমেণ মিত্র, ইলা মিত্র, গীতা মুখার্জী, স্বাধীন গুহ, সাংবাদিক দিলীপ চক্রবর্তী, দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়, প্রণবেশ সেন, সন্তোষ কুমার ঘোষ, গোবিন্দ হালদার, অংশুমান রায়, সুচিত্রা মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ভূপেন হাজারিকা, হিরন্ময় কার্লেকার, অমিতাভ চৌধুরী, সুখরঞ্জন দাসগুপ্ত, মানস ঘোষ, বাসব সরকার, অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তীর মতো খ্যাতিমান কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশের

মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করতে গিয়ে নিজেরাই রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধায়। দিল্লীর শিল্পী নীরেন সেনগুপ্ত, ধীরাজ চৌধুরী, জগদীশ দে আর বিমল দাসগুপ্তের মতো শিল্পীরা দিল্লী, বোম্বে আর কলকাতায় প্রদর্শনী করে ছবি বিক্রির টাকা তুলে দিয়েছিলেন বাংলাদেশ তহবিলে। বোম্বের চলচ্চিত্র জগতের সাড়া জাগানো তারকা সুনীল দত্ত, নার্গিস, ওয়াহিদা রেহমান, বিশ্বজিৎ, প্রাণ, শাম্মী, লতা মঙ্গেশকর, সলিল চৌধুরী, লক্ষীকান্ত-পেয়ারেলাল ও শচীন দেব বর্মনসহ এমন কেউ ছিলেন না যারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করেননি। শিল্পীরা ছবি এঁকেছেন, গাইয়েরা বাংলাদেশের জন্য গান গেয়েছেন, নাট্যকর্মীরা নাটক করেছেন। ঋত্বিক ঘটক, হরিসাধন দাসগুপ্ত, শুকদেব আর গীতা মেহতারা চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের মতো লেখক রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেছেন।[৮২] হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভারতের শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের ভেতর এমন ব্যক্তি খুব কমই পাওয়া যাবে যারা কোনো না কোনোভাবে তখন বাংলাদেশকে সাহায্য করেননি।

একাত্তরে বৈশ্বিক রাজনীতির মেরুকরণটা ছিল ভিন্ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও মুসলিম বিশ্বের জোরালো সমর্থন ছিল পাকিস্তানের পক্ষে, এমন কী অপর পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নও জুন-জুলাই মাস পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে স্পষ্ট অবস্থান নেয়নি। এমনি পরিপ্রেক্ষিতে ভারত বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে সরকারি, বে-সরকারি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে, বাংলাদেশ সরকারকেও সহায়তা দেয় বিভিন্ন দেশে তাদের প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য, বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক মন্ত্রীসহ অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ এবং প্রধানমন্ত্রী মিসেস গান্ধী বহু রাষ্ট্র সফর করেন। উপরন্তু নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন করে দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী, মানবাধিকার কর্মীদের আমন্ত্রণ জানায়, বিদেশী প্রতিনিধিদলের শরণার্থী শিবির পরিদর্শন ও বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠকের ব্যবস্থা করে। পুরো একাত্তর জুড়ে ভারতের কূটনৈতিক প্রচেষ্টার লক্ষ ছিল ভারতের গৃহীত পদক্ষেপের যৌক্তিকতা তুলে ধরা। অন্যদিকে পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতনের বিবরণ প্রকাশ করে বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল জনমত গড়ে তোলা। এ প্রসঙ্গে শাহরিয়ার কবির লিখেছেন যে, ইন্দিরা গান্ধী অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে নিরাপদ হলেও পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বনকারী আমেরিকা এবং পশ্চিম শক্তিসমূহের চাপ তাঁর জন্য ক্রমশ অসহনীয় হয়ে ওঠেছিল। মুসলিম বিশ্ব এবং পশ্চিমা শক্তিবর্গকে পাকিস্তানের পর্যায়ক্রমিক অপপ্রচারের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং বাংলাদেশের বাস্তবতা তুলে ধরার ক্ষেত্রে ভারতের সরকার বিরোধীদলের নেতারা এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।[৮৩] এ ক্ষেত্রে ভারতীয় কৌশল সম্পর্কে ইতিহাসবিদ সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, 'প্রথম থেকেই ভারত তার প্রচার

মাধ্যমগুলোর সাহায্যে যে বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করে তা ছিল যে, অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের অজুহাতে বাংলাদেশে যে গণহত্যা শুরু হয়েছিল তা প্রতিহত করা বাইরের পৃথিবীর নৈতিক দায়িত্ব।'[৮৪]

১ এপ্রিল জাতিসংঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি সমর সেন জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্টের নিকট প্রেরিত এক পত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিষ্ক্রিয়তা ও নীরবতার সমালোচনা করে বলেন,'পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা বাঙলাদেশের মানুষের ওপর যে-হারে নির্যাতন শুরু করেছে, তা বর্তমানে এমন এক স্তরে পৌঁছেছে যে, তা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার মনে করে নিশ্চেষ্ট থাকার আর সময় নেই। আন্তর্জাতিক মানবগোষ্ঠী কর্তৃক একটি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে।'[৮৫] মুক্তিযুদ্ধ প্রশ্নে চীনের ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে মিসেস গান্ধী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁর সরকারের নীতি ঘোষণা করেন যে, '… China's open support to West Pakistan's military regime against Bangladesh would not affect the country's stand on the issue.'[৮৬] ৮০টি দেশের প্রায় ৭০০ প্রতিনিধির বুদাপেস্টে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনে মিসেস গান্ধীর প্রেরিত বার্তায় পূর্ববঙ্গের জনগণের ন্যায্য দাবির প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থন আহ্বান করা হয়।[৮৭] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট দক্ষিণ এশিয়া সংকটে ভারতীয় পদক্ষেপের অনুকূলে বিশ্বনেতৃবৃন্দকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে ইন্দিরা গান্ধী বেলজিয়াম, অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানী ভ্রমণ করেন। আশ্রিত প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে কেন্দ্র করে বেড়ে ওঠা নানাবিধ সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যার বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু পশ্চিমা দেশগুলো শরণার্থী সমস্যার রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতকে পাশ কাটিয়ে শরণার্থীদের জন্য অর্থনৈতিক সহায়তা বৃদ্ধির প্রস্তাব করে। বাংলাদেশ সংকটের ভারতের কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক সমাধানে পাকিস্তানের ওপর চাপ প্রয়োগে সম্মত হয়নি। ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট নিক্সন প্রদত্ত ভোজসভায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সংকট সম্পর্কে বলেন, "If today we are best with economic uncertainty and faced with the grave threat to our stability and security, if is because our democratic code and geographic proximity have made us the inevitable refuge of millions of helpless victims of medieval tyranny."[৮৮]

তবে অপর পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ভারত বৈশ্বিক রাজনীতিতে এক ধরনের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। তথাপি আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে

মিসেস গান্ধী বলেন, The International response has fallen short of the scale which a grim tragedy of this magnitude demands."[৮৯]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে আন্তর্জাতিক রাজনীতির সংশ্লিষ্টতা ও ভারতীয় ভূমিকার যথার্থতা ব্যাখ্যা করার জন্য ৬৭টি রাষ্ট্রে ১৮টি সরকারি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে ভারত সরকার। এর মধ্যে চারটি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক মন্ত্রী সরদার শরণ সিং। এই বিদেশ ভ্রমণে ভারত সরকারকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। বৈদেশিক মুদ্রায় ৩,৭৪,১৬৮.৭১ রুপি আর ভারতীয় মুদ্রায় ১,৭১,৮৭৫.৩৩। ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার শরণ সিং বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান সম্পর্কে বলেন, 'We would urge the International community as a whole, and countries friendly to Pakistan in particular, to bring their influence to bear on the Pakistan Government for a political solution.[৯০]

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুসলিম উম্মাহ্‌র নামে পাকিস্তানের পক্ষে শক্ত অবস্থান নেয় মুসলিম দেশগুলো। মুসলিম বিশ্বের জনমতকে কিছুটা নমনীয় করার উদ্যোগের অংশ হিসেবে ভারতের বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক মন্ত্রী ইন্দোনেশিয়া সফর করেন। সফর শেষে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর কারণে সৃষ্ট সংকটে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয় জরুরি ভিত্তিতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে শরণার্থীরা তাদের দেশে ফিরে যেতে পারে।[৯১] বাস্তবতা হলো, 'ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর দৃষ্টিতে এ মুক্তিযুদ্ধ ইসলাম-বিরোধী অপপ্রয়াস হিসেবে এবং ইসলামী সংহতির প্রতি হুমকি হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছিল। ১৯৭১-এ ২২ সদস্য-বিশিষ্ট ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (OIC) জেদ্দা অধিবেশন 'জাতীয় সংহতি ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায়' পাকিস্তানের ন্যায়সংগত প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানায়।[৯২] ভারতের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জয়প্রকাশ নারায়ন ১৬ মে হতে ২৭ জুন পর্যন্ত মিশর, ইতালী, যুগোশ্লাভিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন, সুইডেন, পশ্চিম জার্মানী, ফিনল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, কানাডা, ব্রিটেন, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া ভ্রমণ করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমতকে প্রভাবিত করাই ছিল এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য।[৯৩]

ভারত সরকার নিজে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধি প্রেরণ করা ছাড়াও বাংলাদেশ সরকারকেও বহির্বিশ্বে তার অবস্থান তুলে ধরতে সহায়তা দেয়, বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবি এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সফর করেন আব্দুস সামাদ আজাদ। বুদাপেস্টে ১৩-১৬ মে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনে

(World Peace Assembly) পাকিস্তানি বাহিনীর নজিরবিহীন অত্যাচার-নির্যাতনের বিবরণ তুলে ধরেন আব্দুস সামাদ আজাদ।

ভারত সরকারের বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রচার বিভাগ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে পুস্তক, পত্রিকা, দলিল, প্রামাণ্যচিত্র, চলচ্চিত্র তৈরি করে ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে সারাবিশ্বে ব্যাপক প্রচার করে। এসব পুস্তক-পত্রিকায় পাকিস্তান বাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতন ও শরণার্থী সমস্যার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য।[৯৪] কেবল সরকারি প্রচার বিভাগ নয় বেসরকারি গণমাধ্যমেও মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ প্রাধান্য পায়। ভারতীয় গণমাধ্যমের ভূমিকা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সংগঠনে সহায়ক হয়েছিল।

ঘ. মুজিবের মুক্তি

বঙ্গবন্ধু যখন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি, সারা বাংলাদেশ যখন মুক্তির ভিসুভিয়াস, তখন আন্তর্জাতিক মহলে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি নিয়ে চলছে নানা ঠাণ্ডাযুদ্ধ। মুজিবের মুক্তির দাবিতে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে ভারত, বিশেষ করে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিংহের কূটনৈতিক তৎপরতা, ভারতসহ বৈশ্বিক জনমতের চাপে পাকিস্তান সরকার বাধ্য হয়েছিল মুজিবকে মুক্তি দিতে। শেখ মুজিবুর রহমান বিচার ও মুক্তির বিষয়টি নিয়ে ভারতবর্ষের লোকসভা এবং রাজ্যসভায় যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছিল। জনপ্রতিনিধিদের বক্তব্যের বিষয়বস্তু দেশের অভ্যন্তরে গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে যেমন সহায়ক হয়েছিল তেমনি সরকারকে এই বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণে প্রভাবিত করেছিল। বাংলাদেশের পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে ভারতের লোকসভায় ২৬ মার্চ যে আলোচনা হয়েছিল তাতে প্রথম মুজিবুর রহমানের নিরাপত্তার বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন সমর গুহ। তিনি বলেছিলেন– I want to draw the attention of the Government that there is an apprehension that either Mujibur Rahman and other big leaders will be shot or they will be immediately arrested and flown to West Pakistan by using Colombo air port. Therefore, my immediate submission to you and through you to the Prime Minister is that the Government of India should write to the Government of Ceylon that no passage should be given either to the Pakistan Air Force

plane or to Pakistan civilian plane to carry any military personel from West Pakistan to East Bengal via Ceylon." [৯৫]

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী সুরেন্দ্র পাল সিং ২১ জুন লোকসভায় একটি লিখিত প্রশ্নের উত্তরে বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি এবং শেখ ও তার পরিবারের নিরাপত্তার জন্য ভারত সরকার বন্ধুভাবাপন্ন বিদেশী সরকারগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে।[৯৬] বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য উত্থাপিত প্রস্তাবের ওপর যে আলোচনা লোকসভায় হয়েছিল তার ওপর আলোচনা করতে গিয়ে শ্রী মুরাসলী মারান মুজিবর রহমানের অসুস্থতা সংক্রান্ত বিষয়ে যে প্রশ্ন তুলেছিলেন তার উত্তর দিতে গিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং বলেছিলেন, "I fully share the concern expressen about the health of Sheikh Mujibur Rahman. In fact on this issue Prime Minister herself and all of us have been impressing upon the Government that they should take it up very strongly with Pakistan… we have said that every effort should be made by others, to ensure about the safety of Sheikh Mujibur Rahman." [৯৭]

ইয়াহিয়া কর্তৃক মুজিবের জীবননাশের হুমকির বিষয়ে ভারতের লোকসভায় ৪ আগস্ট তুমুল বিতর্ক হয়েছিল। ৪ আগস্ট লোকসভার অধিবেশনে সাংসদ সমর গহ মুজিবর রহমানের হত্যার হুমকি সম্পর্কে প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রামকে সরকারি তরফের ভাষ্য দেওয়ার জন্য বারবার দাবি জানিয়েছিল। অপর সাংসদ অটলবিহরী বাজপেয়ী সমর গুহকে সমর্থন করে বলেন, 'আমার নিবেদন এই যে, শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে পুরো সংসদের মনোভাব এটি।" শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবি জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাশ করবার জন্য সমর গুহ, হীরেন মুখার্জী, অটলবিহরী বাজপেয়ী প্রভৃতি বিরোধী সদস্যরা বারংবার দাবি জানাতে থাকলে অধ্যক্ষ ধীলন বলেন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে এ ব্যাপারে বাধ্য করানো যাবে না।[৯৮] ৯ আগস্ট লোকসভায় সাংসদ সমর গুহ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব এনেছিলেন।

রাজনারায়ণ মুজিবুর রহমানের বিচারের বিষয়টি তুলে ধরে ভারত সরকার কি ধরনের ভূমিকা নিচ্ছে সে বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছিল, 'আমি জানতে চাই, ভারত সরকার কি শেখ মুজিবুর রহমানের হুমকি, ভারতের জনগণের জীবনের হুমকি বলে মনে করেন? শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের ওপর যদি কোন বিপদ আসে তবে ভারত সরকার কি বিশ্বকে এক সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেবেন যে, আমরা সেটা আমাদের জনগণের জীবনের ওপর বিপদ মনে করব? ... ভারত সরকার কি কোন সুনির্দিষ্ট, সুসংবদ্ধ

পদক্ষেপ নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?[৯৯] ভারত সরকারের সমালোচনা করে রাজনারায়ণ আরও বলেন যে, 'যেহেতু, এই দুই রাষ্ট্রই কমনওয়েলথ সদস্যভুক্ত তাই ভারত সরকার কি কমনওয়েলথকে জানিয়েছে যে শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের ওপর কোন বিপদ নেমে আসলে ভারত কমনওয়েলথের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করবে। আমি মনে করি, ভারত সরকার সময়মত পদক্ষেপ নিলে হয়ত এ যাবৎ শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর এরূপ মামলা চলত না।'[১০০] এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, 'আমি চাই ভারত সরকার তার জনগণের কণ্ঠের সাথে সুর মিলিয়ে সোচ্চার হোন যদি মুজিবুর রহমানের জীবনের ওপর বিপদ এসে পড়ে তবে সংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘের দুর্গতিও অনুরূপভাবেই হবে। সংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘ থাকার আর প্রয়োজন কি, তার মানবাধিকার ঘোষণার মূল্য কি, একদিকে মানবাধিকার ঘোষণা বিদ্যমান অন্যদিকে মুজিবুর রহমানের ফাঁসির মামলা চলছে।'[১০১] তিনি আরো বলেন, 'ভারত সরকারের কাছে আমাদের দাবি এই যে, মুজিবুর রহমানের জীবননাশের আশঙ্কা দেখা দিলে সরকার নিজের জনগণের জীবনের ওপর হুমকি মনে করলে আমরা তার সহযোগিতা করব। সরকার কি এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল।'[১০২] ভারত সরকারও যে এ বিষয়ে উদগ্রীব তা তুলে ধরতে গিয়ে মাননীয় মন্ত্রী সুরেন্দ্র পাল সিংহ বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন বিপদাপন্ন এটা সুনিশ্চিত কিন্তু মাননীয় সদস্যের মন্তব্য–এ ব্যাপারে আমরা নিরুদ্বিগ্ন ও উদাসী একথা সঠিক নয়। এ ব্যাপারে আমাদের চিন্তা ভাবনা অনেক। তিনি বেঁচে যান আমরা তাই চাই এবং সে জন্য চেষ্টা করছি।... আমরা সম্ভাব্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করেছি আমাদের দ্বারা যা সম্ভব। অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি এ ব্যাপারে আমাদের মত জানিয়েছি এবং সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল করেছি, অতএব আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আমরা কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের কাছেও লিখেছি তাঁরাও একে একে বলেছেন, আমরাও চাই এরূপ ট্র্যাজেডি না ঘটুক, আর রাজনৈতিক দিক থেকে এর একটা সমাধান হোক। শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের প্রশ্নে সকলেই মনে করেন এই ট্রায়াল হওয়া উচিত নয়, তাঁর জীবন রক্ষা করা প্রয়োজন। এখন এ ব্যাপারে তিনি কি করছেন এ কথা বলা মুশকিল।[১০৩]

এই বিতর্কে অংশ নিয়ে নীরেন ঘোষ সরকারের কাছে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করে জানতে চেয়েছিলেন যে–

Wheather the parliament of India should not address an appeal to all parliaments of the world and to all Governments of the world, whether we should not make a particular point the USa, China, France, Japan, these are the countries which count and if these countries if these Governments, take a firm stand and tell Yahya Khan not to proceed with the trial. So, we should

put the question point is why on this question I want to know the opinion of the Government. [১০৪]

মুজিবের মুক্তির বিষয়ে সরকারি উদ্যোগের কথা বলতে গিয়ে মন্ত্রী সুরেন্দ্রপাল সিং বলেন– I agree with the hon. Member when he says that the life of Sheikh Mujibur Rahman is very precious. There is no doubt about that and we feel the same way. We do want to do everything possible to save his life. One way of doing it, as suggested by the hon. Member, is that the bigger powers should take more effective steps to influence Pakistan's thinking on this issue. That is exactly what we are striving for. It is for that reason that the Prime Minister addressed two letters to all the heads of governments including big powers, except of course China. We are trying our best to activate them to do something more effective and use their influence with Pakistan to save the valient freedom fighter." [১০৫]

বেলজিয়াম, অষ্ট্রিয়া, ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স এবং জার্মনি ভ্রমণ শেষ করে ফিরে এসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তাতে মুজিবের মুক্তির বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশগুলির মনোভাব বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন– Most countries also realies that the release of Sheikh Mujibur Rahman is essential and to impress this upon the military regime of Pakistan." [১০৬]

'মুজিবকে মুক্তি দিন, রাজনৈতিক সমাধানে আসুন ইয়াহিয়া'– এই শিরোনামে ইয়াহিয়ার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, 'বাংলাদেশে রাজনৈতিক সমাধানে আসুন এবং অবিলম্বে শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নিন। পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে এই আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের অবস্থা ভারতের ওপর এক অসহনীয় ভার হয়ে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বান বাণী ভারতীয় হাই কমিশনের শ্রী অটলের মারফত মুখেই চালান করে দেওয়া হয়েছে। তিনি সম্প্রতি শলাপরামর্শের জন্য দিল্লীতে এসেছিলেন। শ্রী অটলের মারফত মুখেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া একটি ঈদের বাণী পাঠিয়েছিল। শ্রীমতী গান্ধীর এই তারই উত্তর।"[১০৭]

সুতরাং উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুজিবের মুক্তির বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে যে অভিঘাত তৈরি করেছিল, তা সুদুরপ্রসারী ছিল। এই প্রতিক্রিয়ার তিনটি স্তর পরিলক্ষিত হয়েছিল।

প্রথম স্তরে মুজিবের বিচার ও মুক্তির দাবিতে বেসরকারি স্তরে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাতে রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, বিভিন্ন সংগঠন এককথায় সাধারণ মানুষ সোচ্চার হয়েছিল। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন এবং আইনজীবীদের সংস্থা, মহিলা সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। সংবাদপত্রে নিয়মিত এই জাতীয় সংবাদ পরিবেশন এবং বিভিন্ন সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের মধ্যে গণসচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। অর্থাৎ এককথায় বিচার ও মুক্তির বিষয়ে ভারতবর্ষের জনমত মুজিবের অনুকূলে নির্ণায়ক শক্তি না হলেও প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। দ্বিতীয় স্তরে, ভারতবর্ষের জনমতের এই প্রতিফলন প্রত্যক্ষভাবে এই ইস্যুতে লোকসভা ও রাজ্যসভায় যে বিতর্ক ও আলোচনা হয়েছিল তা দেশের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলির সাংসদদের প্রভাবিত করেছিল। তার ফল হিসেবে সংসদীয় আলোচনার মধ্যে সরকারকে এ বিষয়ে যথাযথ নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি করতে পেরেছিল। তৃতীয় স্তরে, দেখা যায় যে, একদিকে জনগণের মতামতের প্রতিফলন, অন্যদিকে সাংসদদের মুজিবের পক্ষে অনুকূল মনোভাব ভারতবর্ষের সরকারকে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে সাহায্য করেছিল। যার ফলে জাতিসংঘসহ বিশ্বের প্রভাবশালী দেশগুলির কাছে একদিকে যেমন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের জীবনরক্ষার জন্য পাকিস্তানের ওপর কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগের আবেদন জানিয়ে পত্র লিখেছিলেন। এদিক থেকে দেখলে শেখ মুজিবের বিচার ও মুক্তি বিষয়ে ভারত সরকার তথা ভারতের জনগণ একটি নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছিল।

ঙ. মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহ

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা দেয় ভারত। মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়, তাদের প্রশিক্ষণ, অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের পাশাপাশি তাদের সেনাবাহিনীও মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মিলিত বাহিনীর কাছেই ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানি বাহিনী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় অস্ত্রের সংস্থান করা ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। মার্চ-এপ্রিল বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তার দায়িত্ব বিএসএফের

তত্ত্বাবধানে থাকলেও ৩০ এপ্রিল তাতে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নিযুক্ত করা হয়।[১০৮] প্রায় দুই হাজার তরুণের সামরিক প্রশিক্ষণ মে মাসের শেষ দিকে শুরু হয়। এর মধ্যে বাছাই করা যুবকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হতো; যেমন লক্ষ্ণৌতে গোলন্দাজ প্রশিক্ষণের জন্য, দেরাদুনে সিগন্যাল, আসাম ও নাগাল্যান্ডে কমান্ডো ট্রেনিং, নৌ ও বিমান সৈনিকদের জন্যও প্রশিক্ষণের পৃথক ব্যবস্থা ছিল।

মুক্তিবাহিনীকে সংগঠিত করার পাশাপাশি এপ্রিল-মে মাসের দিকে ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে ক্রমবর্ধমান শরণার্থীর কারণে বাংলাদেশ সংকটের সামরিক সমাধানের কথা ভাবতে শুরু করে ভারত সরকার। ডিরেক্টর অব মিলিটারি অপারেশনস লে. জেনারেল কে কে সিংকে সামরিক পরিকল্পনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ নীতিমালা প্রণয়নের দায়িত্ব ছিল যৌথভাবে বাংলাদেশ বাহিনীর হেডকোয়ার্টার্স এবং ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের।

বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্তে বিভিন্ন এলাকায় মুক্তিযুদ্ধে গমনে ইচ্ছুকদের জন্য যুব শিবির এবং অভ্যর্থনা শিবির স্থাপন করা হয়। 'স্থির হল যুব অভ্যর্থনা শিবির থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের বাছাই করে এই যুব শিবিরে আনতে হবে। সেখানে উচ্চতর মোটিভেশনসহ মাঝারি ধরনের অস্ত্র পরিচালনা প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সেখান থেকে সরাসরি তাদেরকে অস্ত্র দিয়ে গেরিলা হিসেবে দেশের ভেতরে প্রেরণ করা হবে কিংবা কেউ যদি আরো উচ্চতর ভারী অস্ত্রের প্রশিক্ষণ করতে চায়, তাঁদের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ শিবির নামে আরো কয়েকটি শিবির স্থাপন করা হয়। এসব যুব শিবির সরাসরি আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এগুলোতে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ও মেজর পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ। বাংলাদেশ সরকারের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ থাকলেও প্রত্যেক যুব শিবিরে ক্যাপ্টেন পদমর্যাদার একজন ভারতীয় সেনা অফিসার ক্যাম্প প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[১০৯]

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুক্তিবাহিনী গঠিত হলেও কোন সমন্বিত রুপছিল না এবং তখনও নিয়মিত বাহিনী হিসাবে মুক্তিবাহিনী সংগঠিত ছিল না। সংগঠিত বাহিনী হিসাবে মুক্তিবাহিনী যাত্রা শুরু করে ১৯৭১ সালের ১১ জুলাই। এই দিন অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীসভার মিটিং এ প্রধান সেনাপতি আতাউল গনি ওসমানীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের রণাঙ্গনকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে সেক্টর কমান্ডার নিয়োগের মাধ্যমে ইস্ট বেঙ্গল ইপিআর-এর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা নিয়মিত বাহিনীর সদস্য নিয়ে সীমিত সাধ্যের মধ্যেই মোকাবিলা শুরু হয়ে যায় নিয়মিত পদ্ধতিতেই। তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় কিছু পুলিশ-আনসার-মুজাহিদ।[১১০] আর সীমিত সামরিক সহায়তা নিয়ে ভারত।

বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে মেজর জেনারেল উবানের তত্ত্বাবধানে উত্তর প্রদেশের দেরাদুনে এবং আসামের হাফলংয়ে মুজিব বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আওয়ামী লীগ ও এর ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের কর্মীদের নিয়ে এ বাহিনী গঠন করা হয়। প্রায় পাঁচ হাজার সদস্যের এ বাহিনীকে চারটি সেক্টরে ভাগ করা হয় এবং এর নেতৃত্বে ছিল ১৯-সদস্যের কেন্দ্রীয় কম্যান্ড। প্রথমদিকে সেক্টর কম্যান্ডারগণ ভারতের ব্যারাকপুর, শিলিগুড়ি, আগরতলা ও মেঘালয় থেকে নিজ নিজ বাহিনী পরিচালনা করতেন। এ বাহিনীর কেন্দ্রীয় কমান্ডার ছিলেন তোফায়েল আহমদ, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও শেখ ফজলুল হক মনি। শেখ ফজলুল হক মনি মুজিব বাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[১১১] ভারতীয় নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে বিশেষভাবে নির্বাচিত আনুমানিক ৪০০ জন যুবককে সফিস্টিকেটেড টেকনিকস অব ওয়াটারবর্ন অ্যান্ড আন্ডার-ওয়াটার স্যাবোটাজ-এর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ব্লাড টেলিগ্রাম : ইন্ডিয়া'স সিক্রেট ওয়ার ইন ইস্ট পাকিস্তান গ্রন্থে গ্যারি জে ব্যস লিখেছেন, 'অসম্ভব ক্ষিপ্রতা ও সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রেখে ভারত বিদ্রোহীদের পাশে দাঁড়ায়।'[১১২] সে সময়ের বিএসএফ প্রধান রুস্তমজি বিদ্রোহীদের লড়াকু মনোভাবে দারুণ সন্তুষ্ট ছিলেন। তবে মুক্তিবাহিনীর সদস্য এবং রাজনৈতিক নেতাদের বেশিরভাগ চাইছিলেন যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী এপ্রিলেই বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে পরাজিত করার জন্য সামরিক অভিযান শুরু করুক। এমনটি না ঘটায় তাদের অনেকে হতাশ হন। প্রকৃতপক্ষে, টাঙ্গাইল ও গোপালগঞ্জ ব্যতিরেকে গোটা বাংলাদেশ তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর করতলগত। স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ সংগ্রাম স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু জুন মাসের শেষ দিকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত দুই হাজারের বেশি ছাত্র ও তরুণ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং দেশের বিভিন্ন অংশে পাকিস্তানি সেনা এবং তাদের দালাল রাজাকার ও শান্তি কমিটির সদস্যদের নাস্তানাবুদ করতে শুরু করে। তাদের অস্ত্র ছিল সামান্য। কিন্তু মনোবল ছিল তুঙ্গে। তাদের দুঃসাহসিক অভিযানে ছোট-বড় সেতু ধ্বংস হয়, বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হতে থাকে। যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপরেও হামলা হতে থাকে। ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের নৌ-কমান্ডোরা লিমপেট মাইন ব্যবহার করে চট্টগ্রাম, মংলা ও চাঁদপুরে পাকিস্তানি জাহাজগুলোতে হামলা চালিয়ে অনেক জাহাজ ডুবিয়ে দিতে সফল হয়। এ অভিযান ছিল চরম দুঃসাহসিক। ১৬ আগস্ট পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তদন্ত রিপোর্টে লেখা হয় : 'আগে থেকে কিছুই টের পাওয়া যায়নি। গেরিলারা যে এমন ধরনের অভিযান চালাতে পারে বা চালাবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।' *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে* গ্রন্থে মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম লিখেছেন, সমুদ্র ও

নদীবন্দরে এ হামলা পাকিস্তানিদের হতচকিত করে দিয়েছিল। এই কমান্ডোরা বিশেষ ধরনের কষ্টকর ট্রেনিং নিয়েছিলেন ভারতের ভাগিরথী নদীতে।[১১৩]

১৯৭১ সালে *নিউইয়র্ক টাইমসের* সিডনি সানবার্গ বাংলাদেশের গেরিলাদের অভিযান সম্পর্কে অনেক আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রতিবেদন পাঠান। এর একটিতে তিনি লেখেন, 'কারও বয়সই বিশ বছরের ওপরে ছিল না। কেউ কেউ তো দশ বছরের। তারা এসেছে গ্রাম থেকে। তারা তেমনভাবে ইংরেজি বলতে পারে না।'[১১৪] গ্যারি জে ব্যস লিখেছেন, 'জুলাই মাস থেকে ইন্দিরা গান্ধী সরকার বাঙালি যোদ্ধাদের আরও বেশি করে সহায়তা প্রদান করতে থাকে। লন্ডন থেকে প্রবাসী বাঙালিরাও অস্ত্র কিনে ভারতের সহায়তায় গেরিলাদের হাতে তা তুলে দেন।'[১১৫]

সেপ্টেম্বর থেকে প্রতি মাসে ২০ হাজার গেরিলাকে ট্রেনিং প্রদান করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়।[১১৬] মঈদুল হাসান লিখেছেন, 'বাংলাদেশ সরকার নিয়মিত বাহিনী গড়ে তোলার জন্যও পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সশস্ত্র ছাত্র ও তরুণদের বিকাশ ঘটতে থাকে আশাব্যঞ্জকভাবে। গোপন আক্রমণের নিত্যনতুন কৌশলে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অংশ পাকিস্তানি সেনাদের গর্বিত মনোবল ও শৌর্যের দম্ভকে ক্রমাগত আঘাত করে যেতে থাকে। পাকিস্তানের সমরোন্মত্ত সৈনিকেরা সীমান্তে ও অভ্যন্তরে ক্রমশ শ্রান্ত ও হতোদ্যম হয়ে উঠতে থাকে মুক্তিযোদ্ধাদের অদৃশ্য আঘাতে।'[১১৭]

প্রতি মাসে ২০ হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থাপনা সহজ ছিল না। সে সময়ে অভ্যর্থনা শিবির ছিল ৬৭টি এবং যুব শিবির বা ইয়ুথ ক্যাম্প ১১টি। অভ্যর্থনা শিবির থেকে বাছাই করে যুব শিবিরে পাঠানো হতো। সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ অভ্যর্থনা শিবিরের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১০০ এবং যুব শিবির ২৪টি।[১১৮] স্বল্প সময়ে ভিন্ন দেশে আশ্রয় গ্রহণকারী জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে একটি বিশাল গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলার কাজ মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। বাংলাদেশ সরকার এ ক্ষেত্রে চমকপ্রদ দক্ষতা প্রদর্শন করেছে এবং তাদের মিলেছে ভারতের তরফে সর্বাত্মক সহায়তা।

অক্টোবরে মুক্তিযোদ্ধারা আরও সফলতা অর্জন করতে থাকে। তাদের হামলার সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার সুরক্ষিত পাকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনীর স্থাপনাতেও তারা অভিযান চালায়। পাকিস্তানি সেনাদের ক্ষয়ক্ষতি বাড়তে থাকে এবং তাদের মনোবল হ্রাস পায়। 'মুক্তি' শব্দটি তাদের কাছে চরম আতঙ্কের কারণ হয়ে ওঠে। অনেক এলাকাতেই তারা নিজেদের সুরক্ষিত বাঙ্কারে কার্যত বন্দি করে ফেলে। দালালরা সদাসন্ত্রস্ত থাকে। সীমান্তে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর যেসব ঘাঁটি ছিল সেগুলো উচ্ছেদ

করায় মুক্তিবাহিনীর অভিযানে ভারতীয় বাহিনীও অংশ নিতে থাকে। মঈদুল হাসান লিখেছেন, নভেম্বরে মুক্তিযোদ্ধারা আগের তুলনায় অনেক বেশি সক্রিয়। এলোপাতাড়ি আক্রমণ নয়, বরং লক্ষ্য ও কৌশল সম্পর্কে যথোপযুক্ত পরিকল্পনার ভিত্তিতেই তারা দখলদার সৈন্যদের চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে শুরু করে। এ সময়ে রাজাকার বাহিনীর অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও সুবিধাবাদী অংশটি ক্রমশ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়তে থাকে। পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা জামায়াতে ইসলামী ও বিহারিদের নিয়ে গঠিত আলবদর ও আলশামস বাহিনীর একনিষ্ঠ সদস্যদের ওপর অধিকতর নির্ভর করতে থাকে।

এপ্রিল থেকে পরবর্তী কয়েকটি মাস মুক্তিবাহিনীর এ ধরনের তৎপরতার প্রধান লক্ষ্য ছিল দখলদার বাহিনীকে হতোদ্যম ও রণক্লান্ত করে ফেলা, যাতে ডিসেম্বরে চূড়ান্ত আঘাত হানা সম্ভব হয়। পাশাপাশি তারা আরও একটি বড় রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করতে সফল হয়, বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের বাস্তবতা চমৎকারভাবে তুলে ধরা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে এ বার্তা ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের সর্বত্র।[১১৯]

রণকৌশলের মূল বিষয় ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে স্বল্প সময়ে বিপুল সংখ্যক লোককে গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং দেয়া। ৫-১০ জন প্রশিক্ষিত সদস্য নিয়ে গঠিত গেরিলা দল তাদের ওপর অর্পিত সুনির্দিষ্ট কাজের দায়িত্বসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন নির্ধারিত এলাকায় প্রেরণ করা হবে; উদ্দেশ্য পাকিস্তানি বাহিনীকে সব সময় ব্যতিব্যস্ত রাখা। চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রথাগত যুদ্ধের জন্য নিয়মিত বাহিনীর প্রশিক্ষণ ও পুনর্গঠন কাজ চলবে পুরোদমে। শত্রুর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের কৌশল হিসেবে অনিয়মিত বাহিনীর দায়িত্ব হলো যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রভৃতি ধ্বংস করা। ঝটিকা বা অতর্কিত আক্রমণ এবং লুকিয়ে থেকে শত্রুকে আক্রমণ করবে । সুযোগমত সশস্ত্র ঘাঁটি, জ্বালানী ও গোলাবারুদ-রসদ মজুদের স্থানের ওপরও হামলা চালাবে। আর চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়মিত বাহিনীর সর্বাত্মক অভিযানে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করা সম্ভব হবে।[১২০] এ প্রসঙ্গে একজন সেক্টর কমান্ডার লিখেছেন যে, 'আমাদের সব প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিলো গুণগত নয়, পরিমাণগত দিক দিয়ে কি করে আরো বেশি লোক গড়ে তোলা যায়। প্রয়োজনীয় সকল প্রকার দ্রব্য সামগ্রীর সরবরাহ এবং ট্রেনিংয়ের জন্য আমাদেরকে পুরাপুরি ভারতীয় ইস্টার্ণ কমান্ড এর উপর নির্ভর করতে হতো।[১২১] যুদ্ধের সব নীতিমালা যৌথভাবে প্রণয়নের দায়িত্ব ছিল। ব্রিগেডিয়ার পদমর্যাদার ভারতীয় অফিসার বাংলাদেশের দুই/তিনটি সেক্টরের সঙ্গে যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করতেন।'[১২২]

মুক্তিযুদ্ধে অনুসৃত রণনীতি ও রণকৌশল সম্পর্কে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি বলেন, 'আমার উদ্দেশ্য ছিল- (ক) কমপক্ষে ৬০ থেকে ৮০ হাজার গেরিলা সমন্বিত বাহিনী ও (খ) ২৫ হাজারের মত নিয়মিত বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। এই বাহিনী সত্ত্বর গড়ে তুলতে হবে। কারণ, এক দিকে গেরিলা পদ্ধতি এবং সঙ্গে সঙ্গে শত্রুকে নিয়মিত বাহিনীর কমান্ডো ধরনের রণকৌশল দিয়ে শক্তিকে বন্টন করার জন্য বাধ্য করতে হবে যাতে তার শক্তি হ্রাস পায়।[১২৩] সীমান্তের বিভিন্ন এলাকায় মুক্তিযুদ্ধে সামরিক প্রশিক্ষণ নেবার পূর্বে তাদের রাজনৈতিক প্রবণতা, মনোবল ও দৈহিক সুস্থতা বজায় রাখা হয়। বাংলাদেশ সরকার গঠিত হবার পরপরই মুক্তিবাহিনীর জন্য ছাত্র-যুবক সংগ্রহের দায়িত্ব প্রভাবশালী চার ছাত্রনেতাকে দেওয়া হয়। তাঁরা হলেন ক্ষমতাবান এই চার ছাত্র নেতার নেতৃত্বে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা, 'র' এর তত্ত্বাবধানে গড়ে তোলা হয়েছিল বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এলিট দল 'মুজিব বাহিনী'। অবশ্য শুরুর দিকে নাম ছিল 'বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স, বিএলএফ'।[১২৪]

মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পর্যাপ্ত অস্ত্রের সংস্থান করা বাংলাদেশ সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। কেবল পাকিস্তান বাহিনীর কাছ থেকে হস্তগত অস্ত্র-গোলাবারুদের ওপর নির্ভর করা সম্ভব ছিল না।[১২৫] মুক্তিযুদ্ধের সূচনা থেকে চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত ভারতের ভূমিকা একই রকম ছিল না। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র প্রদানের ক্ষেত্রেও ভারতীয় সহায়তায় তারতম্য লক্ষ করা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে ৩০৩ রাইফেল ও সাবমেশিনগানকে সম্বল করে মুক্তিবাহিনী মাঠে নামে।[১২৬] পর্যাপ্ত অস্ত্রের অভাবে এপ্রিলের মাঝামাঝি মুক্তিবাহিনী তার অবস্থান ধরে রাখতে পারেনি। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন **১১** এপ্রিল বেতার ভাষণে অস্ত্র সাহায্যের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'আজকের দিনে বাংলাদেশের জন্যে সবচেয়ে বড় ত্রাণের বাণী বয়ে আনতে পারে উপযুক্ত এবং পর্যাপ্ত হাতিয়ার... তাই আমরা সমস্ত দেশের কাছে অস্ত্র সাহায্য চাচ্ছি।'[১২৭] সারা বিশ্বের কাছে আবেদন করলেও অস্ত্রের জন্য ভারতের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে বিএসএফ, ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ, পরবর্তীতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অস্ত্র, গোলাবারুদ, ডিনমাইট, পেট্রোল সরবরাহ করে। মুক্তিবাহিনীকে দেওয়ার জন্য ভারতীয় চিহ্ন ব্যবহার করা হত না।[১২৮] যাতে করে পাকিস্তানিদের হাতে পড়লেও, ভারতীয় সহায়তার বিষয়টি প্রমাণিত না হয়। The New York Times এর প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, The Indian roads leading north from Calcutta to points along the border already look like a supply route. Bengali truck can be seen heading into

Indian Towns for fresh supplies – carrying empty fuel drums and ammunition boxes.[১২৯]

পাকিস্তান অভিযোগ করে যে, ভারত কেবল বাংলাদেশ সরকারকে আশ্রয় দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের পূর্ব পাকিস্তান প্রেরণ করছে।[১৩০] ভারতে উৎপাদিত উল্লেখযোগ পরিমাণ ছোট অস্ত্র পাকিস্তানের হস্তগত হয়।[১৩১] হস্তগত অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে মার্কিন ৫৭ এমএম রিকোয়েললেস রাইফেল, পানির নিচে বিস্ফোরক হিসেবে ব্যবহারের জন্য ব্রিটিশ মাইন, এছাড়া সোভিয়েত রাশিয়া, ইসরাইল, বেলজিয়াম এবং চেকোশ্লাভিয়া উদ্ভাবিত ভারতের তৈরি সেকেলে ও সাম্প্রতিক অস্ত্র ছিল। মুক্তিবাহিনীর হাতে এ সব যুদ্ধ সরঞ্জাম এসেছিল "...All this equipment either came from Indian Army stores or was acquired from the Far Eastern markets through Indian help."[১৩২] তবে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র প্রদানে ভারতীয় নীতির গুণগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায় ৯ আগস্ট ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের পর। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে ভারতের ভূমিকা দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে অনেকটা প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় হয়ে ওঠে।

মধ্য অক্টোবরের মধ্যে ভারতে সোভিয়েত সামরিক সহায়তা আসতে শুরু করে। বয়রার যুদ্ধের পরই ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে আইনি ও প্রক্রিয়াগত সহায়তার সব বন্দোবস্ত করে ফেলে (বয়রা যশোর সীমান্তবর্তী শহর, ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে সেখানে পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে মিত্র বাহিনীর যুদ্ধ হয়)। দিল্লি থেকে সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের একটি অগ্রগামী দল কলকাতায় যান। সময়টা ছিল নভেম্বরের ২৮ থেকে ৩০ তারিখের মধ্যে। যৌথ কমান্ড গঠনের লক্ষ্যে ভারত ও মুজিবনগর সরকারের মধ্যে একটি খসড়া মতৈক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তারা সেখানে যায়। এ সিদ্ধান্তও হয় যে কমান্ড গঠনের পর অভিযান শুরু হলে ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেবেন।[১৩৩]

১৯৭১ সালের ১ থেকে ৩ ডিসেম্বরের মধ্যে যৌথ কমান্ড গঠনের সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ সিদ্ধান্ত যুদ্ধে সরাসরি কার্যকর হওয়ার কথা ডিসেম্বরের শেষের দিকে। ভারত জানত, তারা একবার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে মূল কাজটি তাদেরই করতে হবে। মুক্তিবাহিনী হয়তো দেশের ভেতরে প্রশাসন ও যোগাযোগব্যবস্থা ধ্বংস করে দিতে এবং পাকিস্তানি বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় অংশের সমন্বয় ভেঙে দিতে পারবে। তবে এটাও পরিষ্কার ছিল যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে এর নেতৃত্ব দিল্লি ও কলকাতায় সামরিক সদর দপ্তরের হাতেই থাকবে। যৌথ কমান্ড আসলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্তিত্ব ও সংবেদনশীলতার প্রতি সম্মান রেখেই গঠন করা হয়েছে। প্রকৃত অর্থে ভারতীয় সেনাবাহিনী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে শুরু করে সেই

অক্টোবরেই। সে সময়ই ভারতীয় কমান্ডো ও মেরিন সেনারা নানা দলে ভাগ হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ঢোকা শুরু করে। তারা আসলে বিশেষায়িত দক্ষতা নিয়ে মুক্তিবাহিনীর অভিযানে পেছন থেকে সমর্থন জুগিয়েছে। প্রশিক্ষিত ভারতীয় সেনাদের উপস্থিতিতে গেরিলাযুদ্ধের কার্যকারিতা বেড়ে যায়। ভারতের সামরিক সমন্বয় কর্মকর্তা বিচ্ছিন্ন যোদ্ধাদের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি ও তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-বিবাদ নিরসনেও ভূমিকা পালন করেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অনেক গ্রুপই স্বতন্ত্র যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল।[১৩৪]

উপসংহার

একাত্তরে শুধুমাত্র প্রতিবেশি হিসেবে নয়, ভারত অন্যতম সহযাত্রী হয়ে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। এক কোটি বিপন্ন মানুষকে আশ্রয় প্রদান খুব সহজ কোন বিষয় ছিল না। একাত্তরে সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশের পক্ষে যে বিশাল আন্তর্জাতিক জনমত তার ক্ষেত্রও ভারত তৈরি করেছিল। রণাঙ্গনে যুদ্ধ পরিচালনা, রণকৌশল প্রণয়ন, গেরিলা যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ সবকিছু মিলিয়ে মুক্তিসংগ্রামের সামরিক দায়িত্বটা পালন করেছিল ভারত। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন, ইন্দিরার কূটনৈতিক লড়াই একাত্তরে আমাদের স্বাধীনতার পথ সুগম করেছিল। ভারত দক্ষ হাতে শরণার্থী সমস্যারও একটা ব্যবস্থাপনা করেছিল। বাংলাদেশের কেউ ভারতে পৌঁছালে খাদ্য, আশ্রয় ও নিরাপত্তা মিলত। জুন মাস নাগাদ প্রতিদিন এক লাখ করে মানুষ ভারতে শরণার্থী হতে থাকে। ভারতের অর্থনীতিতে এর প্রচণ্ড চাপ পড়ে। অর্থনীতির দুর্বলতা সত্ত্বেও ভারতের আচরণ ছিল হৃদ্যতাপূর্ণ। অন্যদিকে, শরণার্থীরা নির্বাসিত সরকারের গেরিলা সংগ্রহেরও বাস্তব সমাধান করে দিয়েছিল। শিবিরগুলো থেকে অনেকেই যোগ দিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে। ভারতের কোনো নিরাপদ স্থানে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে পরে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে দেশে পাঠানো হতো।

বাংলাদেশের নির্বাসিত সরকার এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যেমন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, মুক্তিবাহিনী ইত্যাদি গড়ে তুলতে ভারত ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছিল। আওয়ামী লীগের নেতাদের নিয়ে বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রবাসী সরকার গঠন করা হয়। ভারত বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে। মুজিবের মুক্তিতে পালন করে মূল প্রভাবকের। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে ভারত একটি সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

তথ্য নির্দেশিকা

১. মহিউদ্দিন আহমদ, *মুক্তিযুদ্ধের ধাত্রী*, *প্রথম আলো*, ঢাকা, ১৮ ডিসেম্বর ২০১৬

২. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *ইসলামী বিশ্ব ও বাংলাদেশ*, ডানা, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২৭

৩. সুরমা জাকারিয়া চৌধুরী, *বাংলাদেশ-নেপাল সম্পর্কের ক্রমোন্নয়ন (১৯৭১-১৯৮১)*, ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, ২৩-২৪, ১৪০২-১৪০৪, পৃ. ১৮৯

৪. হাসান ফেরদৌস, *১৯৭১: পরাশক্তি ও জাতিসংঘ*, প্রথম আলো, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৭

৫. মোহাম্মদ সেলিম, *বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক* ১৯৭১-১৯৮১, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৪৫

৬. ইমতিয়াজ আহমেদ, *মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা*, প্রথম আলো, ১২ ডিসেম্বর ২০১০

৭. সালাম আজাদ, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা* (আশিস কুমার দাস অনূদিত), ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়াদিল্লি, ২০১৪ এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরা ও আসামের ওপর আলাদা গ্রন্থ রচনা করেছেন।

৮. মুনতাসীর মামুন ও চৌধুরী শহীদ কাদের (সম্পা.), গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, খণ্ড ২৪, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ২৫

বাংলাদেশের জন্য আমরা কি করতে পারি

বুধবার পশ্চিমবঙ্গে হরতালের ডাক এই রাজ্যের মানুষদের ব্যাপক সমর্থন লাভ করেছে। তার কারণ, মানুষ এই মুহূর্তে বাঙলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও সমর্থন প্রকাশ করার জন্য যে গভীর আকুতি বোধ করছেন সেটা এই হরতালের ভিতর দিয়ে রূপান্তরিত হতে পারে। যদিও একথা বলা যেতে পারে যে এমন একটা প্রচন্ড আবেগ মথিত উপলক্ষে হরতালের উপযোগিতা নিতান্তই সীমাবদ্ধ, তাহলেও এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে, এই হরতালের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনোভাব একটা স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি লাভ করবে। এই হরতালেন মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে যেখানে কোন বিরোধ নেই সেখানে জনসাধারণের ঐক্য যাতে অটুট থাকে সেদিন লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এই হরতাল পরিপূর্ণ শান্তির মধ্যে, সম্পূর্ণ বিনা বাধায় উদযাপিত হওয়া উচিত। আমরা আশা করি যে, বুধবারের হরতালের উদ্যোক্তারা এবিষয়ে দৃষ্টি দেবেন।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে হরতালের পর কি? এটা আদৌ অস্বাভাবিক নয় যে, এই দেশের মানুষ প্রতিবেশী দেশের সংগ্রামীদের বাস্তব ও সুনির্দিষ্ট সাহায্য দেওয়ার জন্য বলতে গেলে অস্থির হয়ে উঠেছে। এই বাংলাদেশের মানুষগুলো কয়েক বছর আগে আমাদেরই স্বদেশবাসী ছিল। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের নাড়ীর যোগ রয়েছে। এই জীবনমরণ পরীক্ষার দিনে তাদের প্রতি এদেশের মানুষের হৃদয়ের গভীরতম তন্ত্রীগুলি সহানুভূতির সুরে অনুরণিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সেকথা ছেড়ে দিলেও সেখানে যা হচ্ছে সেটা বলতে গেলে ইতিহসের একটা অভূতপূর্ব ঘটনা। অসামরিক শসনের

বিরোদ্ধে সামরিক শসনের অভ্যূত্থান আমরা দেখেছি, সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে অসামরিক জনতা কতৃক সামরিক শাসনের অধীন রাষ্ট্রযন্ত্র অধিকার, এমন দৃশ্য কে কবে দেখেছে? ভারতের মানুষ ঘরের পাশে বলেই এই ঘটনার তাৎপর্যটা সঠিকভাবে উপলব্ধি করবে। সরকারি বিবৃতির মধ্য দিয়ে, লোকসভার সদস্যদের বক্তৃতার মধ্য দিয়ে, দিল্লীর জনসভার মধ্য দিয়ে, কলকাতার ময়দানের জনসভার মধ্য দিয়ে, বোম্বাইয়ে ও অন্যত্র বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষের প্রতি এদেশের মানুষের অভূতপূর্ব মমতা প্রকাশ পেয়েছে। আর সেই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে ঐ সংগ্রামী মানুষগুলির পাশে এসে দাঁড়াবার জন্য, যেভাবে হোক, তাদের সাহায্য করার জন্য একটা গভীর আকুতি।

এখন পর্যন্ত এই আকুতি অসংগঠিত ও বাস্তব পরিকল্পহীন। সকলেই বুঝছে একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু ঠিক কি করা দরকার অথবা কতটা করা যায় সেবিষয়ে কারও স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। সেই কারণে পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার কোন চেষ্টা না করে যিনি যেমন বুঝছেন, কেউ পাকিস্তানি দূতাবাসগুলির সামনে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন। আসল কথঅ হল, মানুষের মধ্যে যে আবেগ দেখা গিয়েছে, বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবার জন্য যে গভীর আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে সেটাকে হরতালের পর একটা সুনির্দিষ্টি, একমূখী কর্মসূচির মধ্যে সংগ্রহ করার পরিকল্পনা নেই, সেই উদ্দেশ্যে তাদের সামনে নেতৃত্বেও রাখা হচ্ছে না। মানুষের আগ্রহ-উদ্দীপনাকে এভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে পারে। এমনকি এটা পশ্চিমবঙ্গের গতানুগতিক রাজনৈতিক রাজনৈতিক দলাদলির আরেকটি উপলক্ষে পরিণত হওয়াও সম্ভব। এই আগ্রহ-উদ্দীপনা যাতে একটা নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত হয় সেজন্য নেতৃস্থানীয় মানুষের এগিয়ে আসতে হবে। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গেই এর বেশি প্রয়োজন।

প্রতিবেশী দেশের এই ঘটনা সম্পর্কে নয়াদিল্লীতে ভারত সরকার কি নীতি গ্রহণ করবেন তা আরও কয়েক দিন না গেলে বোঝা যাবে না। সরকারকে অবশ্যই অনেক ভাবনা-চিন্তা করে, চারদিক বাঁচিয়ে তাদের নীতি স্থির করতে হবে। তাহলেও বেসরকারি স্তরে মানুষ যদি সরকারি নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেও কয়েক পা এগিয়ে যায় তাহলে কোন ক্ষতি নেই এবং সরকারও তাতে বাধা দিতে পারবেন না। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের আজ ঠিক কি ধরনের সাহায্য প্রয়োজন তা যাচাই করার জন্য, প্রয়োজনীয় সাহায্য সংগঠিত করার জন্য, সেই সাহায্য যথাস্থানে পৌছে দেওয়ার জন্য রীতিমত একটা সংস্থা গড়ে তোলা দরকার। পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে যদি সর্বস্তরের মানুষদের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা শক্তিশালী কমিটি তৈরি করা হয় তাহলে এমন একটা সংগঠিত কর্মসূচি নিয়ে হয়তো অগ্রসর হওয়া যাবে বাঙলা দেশের মানুষকে তাদের এই বিপদের দিনে সত্যিকার সাহায্য দেওয়া যাবে। আর তা না হলে সমস্ত আবেগই একটা নিরর্থক অপচয়ে পর্যবসিত হবে যেতে পারে অথবা ভুল পথে চালিয়ে হতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক না হয়ে ক্ষতিকারক হয়ে উঠতে পারে।

দৈনিক যুগান্তর, ৩০ মার্চ ১৯৭১

৯. মোহাম্মদ ফায়েকউজ্জামান, *মুজিবনগর সরকার*, বাংলাপিডিয়া (www.bn.banglapedia.org)

১০. Rabindranath Trivedi (Edited*), International Relations of Bangladesh and Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman*, Vol. 1, Parma, Dhaka, 1999, P. 8

১১. বইটির চমৎকার একটি অনুবাদ খুঁজে পেলাম অনলাইনে, দারুচিনি লবঙ্গ অনূদিত (মূল সিদ্দিক সালিক), আত্মসমর্পণের সাক্ষী (Witness to surrender), পৃ. ৯৯ (গ্রন্থটি অনলাইনে পড়া যাবে মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ এর ওয়েবসাইটে)

১২. Bangladesh Documents, Vol-1, Ministry of External Affairs, Government of India, 1971, p-81

১৩. মঈদুল হাসান, *মূলধারা ৭১*, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯২ (২য় সংস্করন), পৃ. ৪

১৪. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *বাংলাদেশের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন*, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬ (২য় সংস্করন), পৃ. ৪১৯

১৫. শাহরিয়ার কবির, ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত’, সালাহউদ্দীন আহমেদ ও অন্যান্য সম্পা., *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস* ১৯৪৭-৭১, আগামী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ.২৯০

16. *Arun Bhattacharjee, Dateline Mujibnagar,* Vikas Publishing House Pvt. Ltd.*, Delhi, 1973, p. 8*

১৭. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, পঞ্চদশ খণ্ড , তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১০০-১০১

১৮. Loksabha Debate, Vol. 1, 27th March 1971, Col 41

১৯. Bangladesh Documents, vol. 1,P. 672

২০. মঈদুল হাসান, *মূলধারা ৭১*, পৃ. ১২

২১. প্রাগুক্ত

২২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ১০৯

২৩. প্রাগুক্ত, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪-৬

২৪. এইচ টি ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১*, আগামী, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১০৮

২৫. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ১২০

২৬. মোহাম্মদ সেলিম, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারতের রাজনৈতিক দল*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৭

২৭. শামসুল হুদা চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর*, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৭৩-৭৪

২৮. নীল কমল বিশ্বাস, *যুদ্ধে যুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ,* ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৭২

২৯. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫

৩০. মোহাম্মদ এমদাদুল হক, *আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কথা*, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৯৬

৩১. রিফাত জফরীন, *মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের অবদান*, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৩

৩২. স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়েছে।

৩৩. মঈদুল হাসানের *মূলধারা ৭১*, Lawrence Lifschultz, *Bangladesh: The Unfinished Revolution, London*, 1979 গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

৩৪. মঈদুল হাসান, *মূলধারা ৭১*, পৃ. ৮৬

৩৫. K. M. Shehabuddin, *Three and Back Again-A Diplomate's Tale*, UPL, Dhaka, 2006, p. 102

৩৬. *The Statesman*, 1 May 1971

৩৭. K. M. Shehabuddin, p. 68

৩৮. প্রাগুক্ত , পৃ. ৭৭

৩৯. প্রাগুক্ত , পৃ. ৮২

৪০. প্রাগুক্ত , পৃ. ১০১

৪১. মোহাম্মদ সেলিম, *বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক ১৯৭১-১৯৮১*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৪০

৪২. সাজ্জাদ শরীফ, *মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় কবিতা*, *প্রথম আলো*, ১২ ডিসেম্বর ২০১১

৪৩. *দৈনিক যুগান্তর*, ২ জুন ১৯৭১

৪৪. Bangladesh Documents, vol 1, 81

৪৫. Bangladesh Documents, vol 1, p. 675

৪৬. ২০১৫ সালের ৩০ অক্টোবর আমার তত্ত্ববধায়ক অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনসহ *১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘরের* একটি টিম নিয়ে খুলনার চরেরহাট বধ্যভূমিতে ফলক স্থাপনের উদ্দেশ্যে চরেরহাট যান।

৪৭. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৩১ অক্টোবর ২০১৫

৪৮. আশফাক হোসেন, *একাত্তরের শরণার্থী*, *প্রথম আলো*, ৭ ডিসেম্বর ২০১০

৪৯. *Morning Star*, 7th July 1971

৫০. মোহাম্মদ সেলিম, *বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক ১৯৭১-১৯৮১*, পৃ. ৫৫

৫১. *দৈনিক যুগান্তর*, ৪ জুন ১৯৭১

৫২. Bangladesh Documents, vol 1, p. 683-84

৫৩. Marcus Franda, *Bangladesh The First Decade,* New Delhi, 1982, p. 100

৫৪. অধীর বিশ্বাস (সম্পা.), *গাঙচিল পত্রিকা,* শরণার্থী সংখ্যা, সূচনা সংখ্যা, কলকাতা, জুলাই ২০১৭

৫৫. প্রাগুক্ত

৫৬. *আনন্দবাজার*, ১৯ মে ১৯৭১

৫৭. আশফাক হোসেন, প্রাগুক্ত

৫৮. দিব্যদুতি সরকার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএসে পিএইচডি করেছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থী সমস্যা : প্রেক্ষাপট, ব্যবস্থাপনা ও ভূরাজনীতি' বিষয়ে

৫৯. *দৈনিক ইত্তেফাক,* ১৬ ডিসেম্বর ২০১৩

৬০. *যুগান্তর,* ২২ এপ্রিল ১৯৭১

৬১. *আনন্দবাজার*, ২২ এপ্রিল ১৯৭১

৬২. আশীষ কুমার দাস, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারত*, লাকী, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৪৮

৬৩. *The Statesman,* 22 April 1971

৬৪. পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কার্যবিবরণী, ৮ মে ১৯৭১

৬৫. *আনন্দবাজার* , ৬ মে ১৯৭১

৬৬. পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কার্যবিবরণী, ৮ মে ১৯৭১

৬৭. *আনন্দবাজার*, ৭ মে ১৯৭১

৬৮. *আনন্দবাজার,* ১০ মে ১৯৭১

৬৯. *যুগান্তর,* ৫ জুন ১৯৭১

৭০. *Hindustan Standard,* 8th June 1971

৭১. *Hindustan Standard,* 10th June 1971

৭২. সাপ্তাহিক যুগশক্তি, ১৯ মে ১৯৭১

৭৩. *Hindustan Standard,* 21 May 1971

৭৪. Bangladesh Documents, Vol 1, p. 669

৭৫. *The Statesman,* 18 June 1971

৭৬. Bangladesh Documents, Vol 1, p. 675

৭৭. প্রাগুক্ত

৭৮. Marcus Franda, *Bangladesh The First Decade,* New Delhi, 1982, p. 108

৭৯. শাহরিয়ার কবির, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধীর অবদান', (http://www.risingbd.com/opinion-news/249183), ১৬ ডিসেম্বর ২০১৭

৮০. *সমকাল*, ৬ ডিসেম্বর ২০১৬

৮১. শাহরিয়ার কবির, *’৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান এবং বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক*, অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী স্মারক বক্তৃতা, কলকাতা, ১৮ জুন ২০১১

82. শাহরিয়ার কবির, ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধীর অবদান’, প্রাগুক্ত

৮৩. প্রাগুক্ত

৮৪. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের ভূমিকা’*, সালাহউদ্দীন আহমেদ ও অন্যান্য সম্পা., *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস* ১৯৪৭-৭১, পৃ. ৩৮৪-৩৮৫

৮৫. *যুগান্তর*, ২ এপ্রিল ১৯৭১

৮৬. *Daily Amritabazar*, 14th April 1971

৮৭. মোহাম্মদ সেলিম, *বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক* ১৯৭১-১৯৮১, পৃ. ৬১

৮৮. Bangladesh Documents, Vol 2, p. 263

৮৯. Bangladesh Documents, Vol 2, p. 238

৯০. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৩০

৯১. Bangladesh Documents, Vol 2, p. 158

৯২. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২৭

৯৩. মোহাম্মদ সেলিম, *বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক* ১৯৭১-১৯৮১, পৃ. ৬২

৯৪. Rajya Sabha Debate, 26th November 1971, Col- 108-109

৯৫. *যুগান্তর*, ২ এপ্রিল ১৯৭১

৯৬. *আনন্দবাজার*, ৫ মে ১৯৭১

৯৭. Loksabha Debate, Vol. 1, 27th August 1971, col.42

৯৮. *আনন্দবাজার*, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

৯৯. Loksabha Debate, Vol. 1, 12th August 1971, col.42

১০০. প্রাগুক্ত

১০১. প্রাগুক্ত

১০২. প্রাগুক্ত

১০৩. প্রাগুক্ত

১০৪. Bangladesh Documents, Vol 1, p. 699

১০৫. Loksabha Debate, Vol. 1, 12th August 1971, col.42

১০৬. Loksabha Debate, Vol. 1, 15th November 1971, col.42

১০৭. *আনন্দবাজার*, ২৮ নভেম্বর ১৯৭১

১০৮. *প্রথম আলো*, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৫

১০৯. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *একাত্তরের দশমাস*, কাকলী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ.৮৪

১১০. বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্র, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫১

১১১. মুজিব বাহিনী, *বাংলাপিডিয়া*, অনলাইন ভার্সন

১১২. *সমকাল*, ৯ মার্চ ২০১৪

১১৩. মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম, *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১৮১

১১৪. *সমকাল*, ৯ মার্চ ২০১৪

১১৫. Gary J Bass, *The Blood Telegram: India's Secret War in East Pakistan*, Random House, New Delhi, 2016, p. 38

১১৬. মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম, *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*, পৃ. ৫৭

১১৭. মঈদুল হাসান, পৃ. ৪০

১১৮. Bangladesh Documents, Vol 1, p. 566

১১৯. *সমকাল*, ৯ মার্চ ২০১৪

১২০. *মুক্তিবাহিনী*, বাংলা পিডিয়া, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২০৩

১২১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৮

১২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-৯

১২৩. *প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯৯-৮০০*

১২৪. মঈদুল হাসান, পৃ. ২২-২৩

১২৫. Md. Abdul Wadud Bhuyiyan, *Emergence of Bangladesh and Role of Awami Leaque*, New Delhi, 1982, p.206

১২৬. *প্রাগুক্ত*

১২৭. বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্র, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১

১২৮. মোহাম্মদ সেলিম, *বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক* ১৯৭১-১৯৮১, পৃ. ৫২

১২৯. *The New York Times*, 29.04.1971

১৩০. মোহাম্মদ সেলিম, *বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক* ১৯৭১-১৯৮১, পৃ. ৫৩

১৩১. Zaman and hasan, *East Pakistan and India*, Dacca, 1971, p 160-162

১৩২. Marcus Franda, *Bangladesh The First Decade*, New Delhi, 1982, p. 100

১৩৩. J. N. Dixit, *Liberation and Beyond, Indo-Bangladesh Relations, Dhaka, 2001, p.65* (প্রতীক বর্ধনের অনুবাদ)

১৩৪. প্রাগুক্ত

তৃতীয় অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ

'পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, বাঙলাদেশের আহ্বানে সাড়া দিন। সেই শিশুটিকে স্মরণ করুন, মায়ের বুকের রক্তের ফোয়ারায় যার মুখ গুঁজে ধরা হয়েছিল, ওর খাদ্য দরকার। সেই জননীকে স্মরণ করুন, পশুরা যার অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়েছে, যার চিকিৎসা দরকার। সেই কিশোরটির কথা স্মরণ করুন, ফ্রন্টে আহত যে বীর দাঁত দিয়ে ঠোট চেপে ক্যাম্পে শুয়ে আছে, দুই চোখে অধীর প্রত্যাশা নিয়ে যে তাকিয়ে আছে আপনার দিকে, পশ্চিমবঙ্গের দিকে।

ওর রক্ত দরকার। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ!

আপনি যে-ই হোন, যেখানেই থাকুন, একবার বিপন্ন বাঙলাদেশের কথা ভাবুন। তার দরকার টাকা। কারণ ওষুধ আর খাদ্য কিনতে হবে। মনুষ্যত্ব জাগ্রত হোক, আমাদের বিবেক শুভবুদ্ধির আহ্বানে সাড়া দিক। যেন ভুলে না যাই ইতিহাসের অগ্নিপরীক্ষায় আমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে।'[১]

একাত্তরে ইতিহাসের সেই অগ্নিপরিক্ষায় ভারতের সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গের সম্পৃক্ততা ছিল সবচেয়ে বেশি। পুরো পশ্চিমবঙ্গ একাত্তরে উত্তাল হয়েছিল পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনীর নারকীয় গণহত্যায়। পূর্ববঙ্গ তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাথে ভারতের সীমান্তরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের রয়েছে ঐতিহাসিক সম্পর্ক ও হৃদ্যতা। একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল জনসাধারণ সেই হৃদ্যতা আর ভালোবাসার এক অনন্য বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল। নদীয়া, ২৪ পরগনা, পশ্চিম দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদা, জলপাইগুড়ির মতো সীমান্ত জেলাগুলো একাত্তরে বিপুল শরণার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিল তাদের দ্বার। শরণার্থীদের আশ্রয়, সহায়তা ও সেবায় সম্পৃক্ত হয়ে মানবিকতার এক অনন্য ইতিহাসের জন্ম দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ।

মার্চ, ১৯৭১। ঢাকা উত্তাল, পূর্ববঙ্গ উত্তাল, জয় বাংলার ধ্বনিতে পূর্বে নতুন সূর্যোদয়ের সম্ভাবনা। দাবি শুধুই স্বাধীনতার। পূর্ববঙ্গের সেই উত্তাল সময়ের ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছিল সহোদর পশ্চিমবঙ্গে।[২] সেই ঢেউয়ে উদ্বেলিত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের নানা শ্রেণী পেশার মানুষ। শ্রমিক থেকে বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক রাজনীতিবিদ। একাত্ম হয়েছিল পূর্ববঙ্গের সমর্থনে। ২৮ মার্চ ১৯৭১, *দৈনিক যুগান্তর* তাদের সম্পাদকীয়তে লিখছেন, 'উদ্বেলিত বঙ্গদেশের নিকটতম প্রতিবেশি ভারত, প্রত্যেকটি ভারতীয় রাগে ফেটে পড়ছেন, ইয়াহিয়া খানের নরমেধযজ্ঞ তাঁরা সহ্য করতে পারছেন না। লোকসভায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে জনগণের অধীর উৎকণ্ঠা-সংগ্রামী বাঙালী জনতার প্রতি তাদের স্বত:স্ফূর্ত মমত্ববোধ। দলমতের ভেদাভেদ উঠে গেছে।'[৩]

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ রাস্তায় নেমে আসল ভিন্ন এক দেশে গণহত্যার প্রতিবাদে, ভিন্ন এক দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমর্থনে। তারা বুঝতে পারছিল, পূর্ববঙ্গের জন্য কিছু করা প্রয়োজন। কিন্তু করণীয় নির্ধারণ করতে পারছিলেন না। শুরুর দিকে হরতাল-ধর্মঘটের ডাক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ জনগণ সংঘটিত হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তরুণ স্যানাল বলছিলেন সেই সময়ের কথা, 'আমরা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, আমাদের কি করা উচিত। এই বাংলাদেশের মানুষগুলো কয়েক বছর আগে আমাদের স্বদেশবাসি ছিল। তাদের জন্য কিছু করার তাগিদে আমরা ৩১ মার্চ পুরো পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিলাম।'[৪] সেদিন রাজধানী কলকাতাসহ পুরো পশ্চিমবঙ্গ স্থবির হয়েছিল বাংলাদেশের সমর্থনে। আর সেই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে ঐ সংগ্রামী মানুষগুলির পাশে এসে দাঁড়াবার জন্য, যেভাবে হোক, তাদের সাহায্য করার জন্য একটা গভীর আকুতি।

বাংলাদেশের সাথে পশ্চিমবঙ্গ ভৌগোলিকভাবে সম্পৃক্ত। পশ্চিমবঙ্গের সাথে বাংলাদেশের ২২১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত। সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোসহ পুরো পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মুখের ভাষা বাংলা। পূর্ববঙ্গের সাথে রয়েছে শেকড়ের টান, দীর্ঘদিন একই সাথে থাকার স্মৃতি। সবকিছু মিলিয়ে একাত্তরে পূর্ববঙ্গের মানুষের কাছে পশ্চিমবঙ্গই ছিল বড় ভরসা। গণহত্যা শুরু হওয়ার পর তাই প্রাণভয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে গন্তব্যটা অবধারিত ছিল পশ্চিমবঙ্গের দিকে।

'আমাদের ঘরের পাশে যখন একটা ঐতিহাসিক ভাঙাগড়া চলছে, তার উত্তাপ, তার আগুন যখন আমাদেরও স্পর্শ করছে, তার পরিণতি যখন আমাদের ভাগ্যকে প্রভাবিত করতে পারে, তখনও আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে আছি?'[৫] হাত-পা গুটিয়ে পশ্চিমবঙ্গের লোকজন বসে থাকেননি। স্মৃতি, অভিজ্ঞতা, ভাষা ও মানবিকতায় সিক্ত পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ জনগণ বুকে টেনে নেন পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের। একাত্তরে

পশ্চিমবঙ্গে সরকারিভাবে স্থাপিত ৪৯২টি ক্যাম্পে ৪৮,৪৯,৭৮৬ জন তালিকাভূক্ত শরণার্থীর পাশাপাশি প্রায় ২৩,৮৬,১৩০ জন শরণার্থী বিভিন্ন মানুষজনের গৃহে আশ্রয় নেন।[৬] শুরুর দিকে হরতাল, ধর্মঘট, মিছিল ও মিটিংয়ে বিপুল এই শরণার্থীর আশ্রয়ের ক্ষেত্রটি তৈরি করেছিল পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল জনতা। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে বাধ্য করেছিল পূর্ববঙ্গের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। 'এপার বাংলা ওপার বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা' ধ্বনিতে মুখরিত হয়েছিল বনগাঁ থেকে কলকাতা, কৃষ্ণনগর, মুর্শিদাবাদের অলিগলি। মিছিল, সমাবেশ, বনধ আর অনশনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ও ভারতের ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার একাত্ম হয়েছিল বাংলাদেশের সহায়তায়। বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্ন, মুজিবের মুক্তি, আন্তর্জাতিক জনমত তৈরির পাশাপাশি রণাঙ্গনে পাকিস্তানকে প্রতিরোধ, অস্ত্র ও সামরিক সহায়তা পুরো প্রক্রিয়াটির সাথে জড়িয়ে পড়েছিল পশ্চিমবঙ্গ। আরো স্পষ্ট করে বললে, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ। একাত্তরে দুই বাংলার সীমারেখা বিলীন হয়েছিল সহায়তা ও মানবিকতার স্পর্শে। 'সীমান্তের ওপারে বাঙলাদেশের হৃদয় হতে যে রক্ত ঝরছে তা আমাদেরই রক্ত। যে আবেগে তারা কম্পিত হচ্ছে, সে আমাদেরই আবেগ। তাদের ক্রোধ আমাদের চোখের অগ্নি। তাদের সংকল্পে আমাদের পেশী আবদ্ধ। পূর্ব বাঙলার ভাইরা, আমরা তোমাদের সহোদর। রাষ্ট্রের কৃত্রিম প্রাচীরে দ্বিধা হৃদয় আমাদের একই সুরে বাজছে। ভাই, আমরা আছি, তোমাদের পাশে। জয় আমাদের হবেই।'[৭]

পশ্চিমবঙ্গের সাথে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সম্পর্ক

সুনা হৈ হো ভি চুকা হৈ ফিরক-এ-জুলমত-ও-নুর
সুনা হৈ হো ভি চুকা হৈ বিসাল-এ-মনজিল-ও-গম
বদল-চুকা হৈ বহুত আহল-এ-দর্দা কা দস্তুর
নিশাত-এ-বস্‌ল হালাল ও আজাব-এ-হিজর হারাম।[৮]

[শুনেছি তো আলোর ছটায় মিলিয়ে গেছে অন্ধকার/ শুনেছি তো মিলনের ভালোবাসায় মিটে গেছে বিষাদ/ ভেবে যারা ব্যাথা পায়, অনেক নাকি পাল্টে গেছে তারা/ পূণ্য শুধু মিলনের আনন্দ, পাপ নাকি বিচ্ছেদের বিষাদ।]

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ এর কবিতায় ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের দেশভাগ স্পষ্ট হয়েছে। স্পষ্ট হয়েছে এক বিরাট উৎসবের নৈপথ্যে সব হারানোর হাহাকার আর লাঞ্ছনা। একদিকে বিজয়ের গন্ধ অন্যদিকে বিভক্তি। শান্তা সেন তার দেশভাগের উপন্যাসে 'জন্ম ও জন্মান্তরে' দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন

দেশভাগের ফলে জন্মভূমি থেকে নির্বাসিত হওয়ার গল্প।[৯] একদিকে একটি নতুন দেশ, নতুন মানুষদের সাথে বেঁচে থাকার সংগ্রাম অন্যদিকে খন্ডিত জন্মভূমির মধ্যে এক স্মৃতিময় মাতৃভূমিকে খুঁজে ফেরা। শঙ্খ ঘোষ হয়তো তাই একাত্তরের *পরিচয়* পত্রিকার *বাংলাদেশ সংখ্যায়* লিখেছেন,

'আমার মুখে অন্তহীন আত্মলাঞ্ছনার ক্ষত
আমার বুকে পালানোর পালানোর আরো পালানোর
দেশজোড়া স্মৃতি।'[১০]

মূলত দেশভাগের এই স্মৃতি, ইতিহাস, ভারতের ইতিহাসের সাথে পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তানকে সবসময় একাত্ম করেছিল। সাতচল্লিশের পর পূর্ব পাকিস্তানের নতুন করে পথচলার শুরু হলেও ভারতে বিশেষ করে সীমান্ত রাজ্যগুলোতে পূর্ব পাকিস্তান নিয়ে আগ্রহ, উদ্বেগ সব সময় কাজ করত। পাশাপাশি দেশভাগের পরেও আত্মার সম্পর্কগুলো অটুট ছিল। একাত্তরে সেই আত্মার সম্পর্ক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রভাবকের কাজ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের সাথে বাংলাদেশের রয়েছে নাড়ির সম্পর্ক। এই সম্পর্ক কিছুটা অভিমানের, ক্ষোভের। দেশভাগের পর এই অভিমান, ক্ষোভ ক্রমাগত বেড়েছে দুই অংশে। অভিমান আর ক্ষোভ দুই অংশের মানুষের মধ্যে বাড়িয়েছে দূরত্ব। সেই দূরত্ব আরো বেড়েছে দাঙ্গা আর গুজবে। পূর্ববঙ্গের ঘটনার বদলা নিতে পশ্চিমবঙ্গেও শুরু হয় *দমদম দাওয়াই* তথা উচিত শিক্ষা দেওয়ার স্পৃহা।[১১] দুই বাংলার মধ্যে যে সাংস্কৃতিক, সামাজিক ঐক্য সুদীর্ঘ পরস্পরায় ঋদ্ধ হয়েছে, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাস্পে সে ঐতিহ্য আর একতায় ফাটল ধরল।

খুব ছেলেবেলায় পড়েছিলাম সতোন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা 'কোন দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল' ইত্যাদি। আর কবিতাটির প্রতি স্তবকের শেষ লাইন

'সে আমাদের বাঙলাদেশ
আমাদের এই বাঙলা রে।'

তারপর কত ঘটনা ঘটেছে। দেশ ভাগ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ লিখতে বাঙলাদেশ কথাটা কখন ভুলেই গিয়েছি। সীমান্তের ওপারের অঞ্চলটাকে 'পূর্ব পাকিস্তান' বলতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। এধারে বয়সও বেড়েছে, প্রথম যৌবনের সেই আবেগমুগ্ধ মনও আর নেই। এমন সময় হঠাৎ বাঙলাদেশের স্বাধীন সরকারের পূর্ব পাকিস্তানের নাম পরিবর্তন করে 'বাঙলাদেশ' রাখার ঘোষণার সমস্ত অনুভূতি যেন অকস্মাৎ ঝনঝন করে বেজে উঠল। অতীতের বিস্মৃত ভাবাবেগ যেন দুকূল ছাপিয়ে চিন্তা ভাবনা সবকিছুকে

একাকার করে দিয়ে গেল। বহুকালের হারানো আবেগকে আবার যেন ফিরে পেলাম।"[১২]

ফিরে পাওয়া সেই সময়টাও ছিল অন্যরকম। একাত্তরে যখন বাংলাদেশে স্বাধীনতার আন্দোলন চলছে, ঠিক সেই সময়েই কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে নকশাল আন্দোলন চলছে। প্রতিদিনই মানুষ মারা যাচ্ছেন, পুলিশ গুলি চালাচ্ছে, প্রায় প্রতিটা পাড়া থেকেই যুবকদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। একটা চূড়ান্ত অস্থির সময় ছিল সেটা।'[১৩] বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সেই অগ্নিগর্ভ সময়ের কথা লিখতে গিয়ে একাত্তরে *সাপ্তাহিক সপ্তাহে* লিখেছিলেন, 'কলিকাতায় ও পশ্চিমবঙ্গে যখন ব্যক্তিগত টেরোরিজম ও খুনখারাবি এক বীভৎস নজিরের সৃষ্টি করিয়াছে এবং বাঙালির মুখে চুনকালি লেপিয়া দিতেছে, তখন পূর্ববঙ্গের যুবক ও জনগণ আশ্চর্য সাহসিকতার সঙ্গে সশস্ত্র শত্রুর বিরুদ্ধে হাতে-কলমে যুদ্ধের দ্বারা ইতিহাসের এক নতুন দিগন্ত খুলিয়া দিয়াছে। পূর্বদেশের নতুন স্বাধীন রূপ 'বাঙলাদেশের' নিকট অন্তত একটি কারণে আমরা অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গবাসীরা ঋণী। কারণ, মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে সেখানকার বাঙালিরা এপারের বাঙালির কিংবা সমগ্র বাঙালি জাতির মুখ রক্ষা করিয়াছেন।'[১৪]

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলা, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ভারতীয় অংশ পশ্চিমবঙ্গ এবং পকিস্তানের অংশ পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত। পরবর্তী কালে কোচবিহার, চন্দ্রনগরের ফরাসি মহল এবং বিহারের কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়। দেশ ভাগের বেদনাতেই এ রাজ্যের নাম তখন লোকের মুখে মুখে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, বিভক্ত বঙ্গের পশ্চিম অঞ্চল। এই নামকরণ, এটা ঠিক রাজনৈতিক নেতাদের সিদ্ধান্তে হয়নি, লোকে এ রাজ্যকে পশ্চিমবঙ্গ বলেছে, সরকারি নথিপত্রে হয়ে গেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল।[১৫]

পূর্বে বঙ্গ নামে পরিচিত পশ্চিমবঙ্গ, এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিল। প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন রাজবংশ দ্বারা শাসিত এই অঞ্চলের প্রকৃত ইতিহাস অবশ্যই গুপ্ত যুগের সময় থেকেই উপলব্ধ। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এই স্থানের অধিকার গ্রহণের পর এই রাজ্যের সমৃদ্ধি এবং গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এটি ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত, ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের অধীনে এটি বঙ্গ প্রদেশ ছিল এবং বঙ্গ প্রদেশের অস্তিত্বও স্থগিত ছিল। মুসলিম-প্রভাবিত জেলাগুলি যেমন, চট্টগ্রাম, ঢাকা, প্রেসিডেন্সির অংশ এবং রাজশাহী বিভাগ সাম্প্রতিক বাংলাদেশের অধীনে চলে গিয়েছিল এবং ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটি অস্তিত্বের মধ্যে চলে আসে।[১৬] ১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি, কোচবিহার জেলাটি এই রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। ১৯৫৪ সালের ২ অক্টোবর পূর্ব অভিহিত চন্দননগর এই রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয় এবং রাজ্য পুনর্গঠন আইন অনুযায়ী, এই

রাজ্যটি তার বর্তমান রাজনৈতিক সীমানা প্রাপ্ত করে এবং বিহার রাজ্যের কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত হয়।[১৭]

বেঙ্গল বা বাংলা, এই নামটি প্রাচীন ভঙ্গ বা বঙ্গ রাজত্ব থেকে উৎপত্তি হয়েছিল।[১৮] সংস্কৃত সাহিত্যে এর প্রথম সূত্রপাত ঘটে তবে তার প্রাথমিক ইতিহাস খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত অস্পষ্ট ছিল। তখন এটি সম্রাট অশোকের দ্বারা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ব্যাপক মৌর্য সাম্রাজ্যের অংশ হিসাবে গঠিত ছিল। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতনের সাথে সাথে অরাজকতা আরোও একবার বাংলার ইতিহাসের (পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশসহ) প্রাচীন চতুর্থ সহস্রাব্দকে ফিরিয়ে আনে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদী ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা হয়ে যায়, এই সময় ভারতীয় ইতিহাসে বাংলা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দুই বঙ্গের বিভাজনের সূচনা করেছিল দেশভাগ। আর মাত্র ২৩ বছরের মাথায় সমস্ত অভিমান ভেঙ্গে সেই বিভেদের মানসিক রেখা বিলীন করে দিয়েছিল একাত্তর। দেশভাগের পর শিশুবয়সে শান্তিপুরের পৈতৃক ভিটের পাট চুকিয়ে পরিবারের সঙ্গে রাজশাহী চলে যাওয়ার কথা ভুলে গিয়েছিলেন রহমত আলি, ‘ভুলে গেছি, নাকি ভুলতে চেয়েছি? ওই দিনটাকে আমি মনে রাখতে চাইনি বলেই কি ভুলে গেছি?’[১৯] কিন্তু একাত্তরে পদ্মার চরের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে আবার জন্মভিটেয় ফেরার সময় কষ্ট আর আনন্দের এক অবর্ণনীয় দোটানা আচ্ছন্ন করে তাঁকে।

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, দাঙ্গার কালো ছায়া, দ্বিজাতিতত্ত্ব, চকিতে ছড়িয়ে পড়া গুজব, রাস্তার পাশে পড়ে-থাকা লাশ দেখে ভয়ে চমকে ওঠা, অদ্ভুত আঁধারের মতো মনে বিছিয়ে-থাকা আতঙ্কের এই ইতিহাস তো আমাদের খুব চেনা, কয়েক দশক ধরে পড়তে পড়তে ক্রমশ গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে।[২০]

সাধারণের অসাধারণ ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ একাত্তরে নানাভাবে সম্পৃক্ত হয়েছিল জয় বাংলার মুক্তিসংগ্রামে। সরকারি পর্যায়ে সহযোগিতা, রাজনৈতিক দলগুলোর সম্পৃক্ততা তো ছিলই, পাশাপাশি একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গে নাগরিক পর্যায়ের সহযোগিতা ছাড়া বিপুল শরণার্থীর আশ্রয় সম্ভব হতো না। এই নাগরিক সহায়তা রাজধানী কলকাতাতেই শুধু সীমাবদ্ধ ছিল না, ছড়িয়ে পড়েছিল প্রান্তিক শহর আর গ্রামগুলোতে। একাত্তরে ভিন্ন এক আবেগে পূর্ববঙ্গের এই সংগ্রামে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল জনতা। তৃণমূলের এই সহায়তা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। নিচে সেই বিশেষ দিক তুলে ধরা হল–

ক. শরণার্থীদের আশ্রয় ও সহায়তা

একাত্তরে বাংলাদেশের সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গে এক অভূতপূর্ব আবেগের সৃষ্টি হয়েছিল। শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে করে রাজনীতিবিদ, রাজনৈতিক কর্মী, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অশিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, চিকিৎসক থেকে শুরু করে গৃহস্থ বধূ নেমে এসেছিল রাজপথে। আশ্রয় আর সহায়তা দিয়ে এক অকৃত্রিম বন্ধন গড়ে তুলেছিল দুই বাংলার। একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামের শুরু থেকে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ লোকজন শরণার্থীদের সহায়তায় এগিয়ে আসেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে কলকাতার সাধারণ নাগরিকদের যে আবেগ সেটা উঠে এসেছে ২৮ মার্চ শহীদ মিনারের এক জনসভায়। বাংলাদেশের প্রতি একাত্মতা জানানোর এই সভায় নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বাংলাদেশ আমাদের বুকের আধখানা কলিজা। তাই শোষণ ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এই অভূতপূর্ব লড়াইয়ে ওপারের সাড়ে সাত কোটি বাঙালির সঙ্গে এপারের পাঁচ কোটি বাঙালিও আছে।'[২১]

এই নাগরিক সমাবেশ এত আবেগে ভরপুর, ক্রোধে এত কম্পমান ছিল, উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গের সিভিল সোসাইটি ও তৃণমূল জনতা পূর্ববঙ্গের এই দুর্যোগে সর্বক্ষণ পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ৫ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের সহয়তায় 'মুক্তিসংগ্রাম সহায়ক সমিতি' গঠিত হয়। এইদিন সমিতির এক বৈঠকের পর সভাপতি অজয় মুখোপাধ্যায় সাংবাদিকদের জানান দাতারা মনি অর্ডার চেকে অর্থ পাঠাতে পারবেন। ৩৪ নং ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রিটে তাদের অফিস (ফোন–২৪-২০২০) খোলা হয়েছে। সেখানে রসিদ দিয়ে দান গ্রহণ করা হবে। ঠিক হয়েছিল রবিবার (১১ এপ্রিল) কৌটো করে চাঁদা সংগৃহীত হবে।[২২] মুখোপাধ্যায় আরও জানান, তাঁরা রাজ্যের জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করবেন। মুক্তিসংগ্রামীদের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ, চিকিৎসার যন্ত্রপাতি, পথ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করবেন এবং চিকিৎসকদের দ্বারা সাহায্য দেবেন। আহত মুক্তি সংগ্রামীদের জন্য রক্ত (প্লাজমা) সংগ্রহ করবেন। সীমান্ত এলাকায় চিকিৎসা, খাদ্যবস্ত্র প্রভৃতি প্রেরণ করবেন। বাংলাদেশ থেকে যাঁরা সীমান্তের এপারে চলে আসতে বাধ্য হবেন তাঁদের সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন।[২৩] একই দিনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক কর্মী অ্যাসোসিয়েশন এক বিবৃতিতে জানিয়েছিল ব্যাঙ্ককর্মীরা একদিনের বেতন দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করবেন।[২৪]

পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য যখন পশ্চিম পাকিস্তানের ফৌজ ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন সীমান্ত পেরিয়ে বেশ কিছু লেখক-বুদ্ধিজীবী কলকাতায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কথাসাহিত্যিক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এখানে গড়ে উঠল বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতি।[২৫] ধর্মতলায় ছিল এর কার্যালয়। সভাপতি ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়। সহ-সভাপতি অজিত দত্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, অমলাশঙ্কর, উদয়শঙ্কর, গোপাল হালদার, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, জ্যোতি দাশগুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন বসু, ডাঃ নীহারকুমার মুন্সী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, মনোজ বসু, মন্মথ রায়, শম্ভু মিত্র, সন্তোষ কুমার ঘোষ, সরযূবালা দেবী, সুচিত্রা মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুশোভন সরকার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক ছিলেন মণীন্দ্র রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ ডাঃ মণীন্দ্রলাল বিশ্বাস। 'বাংলাদেশ-সহায়ক শিল্পী-বুদ্ধিজীবী সমিতির' তরফে একটি আবেদনপত্রে লেখা হয়েছিল, 'পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, রাজপথ, বস্তি, কুটির অথবা অট্টালিকা, যেখানেই আপনি বাস করুন, অবিলম্বে আপনার যতখানি সামর্থ্য তার থেকেও বেশি সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসুন। ১৪৪ লেলিন সরণি, কলকাতা-১৩ (টেলিফোন–২৪-৩৯৩০)–এই ঠিকানায় সমিতির কার্যালয়ে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত উপযুক্ত রসিদের বিনিময়ে আপনার সাহায্য ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে।'[২৬]

... হত্যা ও রক্তের নেশায় জঙ্গী ইয়াহিয়া চক্র উন্মাদ হয়ে গেছে। খবর এসেছে কয়েক লক্ষ লোক মারা গিয়েছে–নিজের দেশে মানুষের অধিকারে মায়ের ভাষায় কথা বলে যারা শান্তিতে বাঁচতে চেয়েছিল। অতর্কিত আক্রমণের শিকার, কামানের খোরাক, কয়েক লক্ষ অমৃতের সন্তান পচা গলা শবদেহ হয়ে শহরে বন্দরে গ্রামে শুকুনির খাদ্য হচ্ছে। তাদের কবর দেবার, দাহ করবার কোনো ব্যবস্থা হয়নি। ইয়াহিয়ার উদ্যত সঙীন কয়েক লক্ষ শবদেহকে নিয়ত পাহারা দিচ্ছে–দেশবাসী যাতে শহীদদের প্রাপ্য মর্যাদাটুকু দিতে না পারে।...[২৭]

সেই আবেদনে ছুঁয়ে গেছে পশিচমবঙ্গের সাধারণ নাগরিকদের মন, 'মায়ের দুই স্তন কর্তন করে দানবরা রক্তের উচ্ছ্বসিত ফোয়ারার মধ্যে অবোধ শিশুর মুখ চেপে ধরেছে। আড়াই বছরের বাচ্চাকে কামানের সামনে দাঁড় করিয়ে গোলা ছুঁড়ছে। ইজ্জত লুণ্ঠ করে তারপর বাঙলাদেশের মা ও বোনদের সঙীন দিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মহান আচার্যদের সারিবন্দী দাঁড় করিয়ে গুলি ছুঁড়েছে। হাসপাতালের প্রত্যেকটি রোগীকে গুনে গুনে খুন করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী আমরা, রবীন্দ্রনাথের উত্তরপুরুষ আমরা, এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে নীরব বা নিষ্ক্রিয় থাকতে পারি না। আমরা ভুলিনি স্পেনের গৃহযুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ এবং ভারতবর্ষের ভূমিকা। আমাদের মহান ঐতিহ্যকে আমরা কিছুতেই ভুলতে পারি না।'

১৮ এপ্রিল তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে 'বাংলাদেশ- সহায়ক শিল্পী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী সমিতির' এক অধিবেশনে কয়েকটি সুস্পষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই সভা গণতন্ত্র ও মানবিক মর্যাদায় বিশ্বাসী প্রতিটি রাষ্ট্রের কাছে দাবি জানাচ্ছেঃ আপনারা প্রতিবাদ করুন; হস্তক্ষেপ করুন পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গী কর্তৃপক্ষকে সংযত হতে বাধ্য করুন। ইসলামাবাদ সাত দিনের মধ্যে আপনাদের আহ্বানে সাড়া না দিলে আপনারা পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করুন। সেই সঙ্গে নির্দেশ দিন, পাকিস্তানকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ থেকে বহিষ্কার করতে হবে।

প্রস্তাবে পৃথিবীর মহান তীর্থক্ষেত্র শিলাইদহের কুঠিবাড়িসহ বাঙলাদেশ-এর সারস্বত সাধনার প্রতিটি কেন্দ্র ও লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষের ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পৈশাচিক আক্রমণকে কঠোর ভাষায় ধিক্কার জানানো হয়।

সভায় সিদ্ধান্ত হয় পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা ২০ এপ্রিল বিকেল পাঁচটায় টাটা বিল্ডিংয়ের উল্টো দিকে গড়ের মাঠের পুকুরপাড়ে সমবেত হবেন এবং তারপর নীরবে শোভাযাত্রা করে বিভিন্ন বৈদেশিক দূতাবাসে যাবেন। দাবি জানাবেন, বাঙলাদেশে পাক ফৌজের জেনোসাইড বন্ধ করার জন্য অবিলম্বে সক্রিয় ব্যবস্থা নিতে, বাঙলাদেশের সার্বভৌম সরকারকে স্বীকৃতি দিতে।[২৮]

বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম সহায়ক সমিতির উদ্যোগে ১০ এপ্রিল রাজ্যাব্যাপী অর্থ সংগ্রহ দিবস পালন করা হয়। কলকাতায় এই উপলক্ষে সকাল ৮টায় শ্যামবাজার নেতাজী মূর্তি ও একডালিয়া পার্ক থেকে দু'টি মিছিল বের হবে। মুখ্যমন্ত্রী অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় সিংহ নাহার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট নাগরিকগণ এই মিছিল দু'টিতে যোগ দেন। এই দিন শুধু কলকাতাতে প্রায় ৫০,০০০ টাকা সংগৃহীত হয়।[২৯] এছাড়াও পুরো পশ্চিমবঙ্গে সহায়ক সমিতির আহবানে পূর্ববঙ্গের দুঃখ, অসহায় শরণার্থী ও রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সাধারণ মানুষজন অর্থ দান করেন।

পি.সি. চন্দ্র এণ্ড সন্স ভারতের সবচেয়ে পরিচিত স্বর্ণের দোকান। একাত্তরে এই পি. সি. চন্দ্র এণ্ড সন্স জুয়েলার্স গ্রুপের সকল শ্রমিক ও কর্মীবৃন্দ বাংলাদেশের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন। ৪ এপ্রিল ১৯৭১ তাদের একদিনের অতিরিক্ত শ্রমলব্ধ অর্থ তুলে দেন বাংলাদেশ ত্রাণ তহবিলে।[৩০] পাশাপাশি সকলশ্রেণীর ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনুরুপ সাহায্য করার আবেদন জানান।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ পেট্রোপোল, বনগাঁ, নদীয়া জেলার বানপুর আশ্রয়কেন্দ্রে দৈনিক প্রায় ২০,০০০ শরণার্থীকে দুবেলা করে খাবারের ব্যবস্থা করেন।[৩১] এছাড়া পশ্চিম দিনাজপুরের তিওর ও হিলি এলাকায় সেবা কেন্দ্র খুলে আগত শরণার্থীদের সহায়তা দেয়া হয়। একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গের বিপুল সংখ্যক সাধারণ

মানুষ *ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের* আহবানে তাদের ঠিকানায় ২১১, রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ, কলিকাতা-১৯ এ ত্রাণ সামগ্রী পাঠান। সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদকের আহবানে সাধারণ নাগরিকরা বাংলাদেশের সহায়তায় নগদ টাকা, খাদ্য-দ্রব্য, বিস্কুট, বার্লিসহ শিশু খাদ্য, নতুন-পুরাতন কাপড় চোপড় সঙ্ঘে দান করেন।[৩২]

সংগ্রামরত বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে কার্যক্রম নির্ধারণের জন্য সাহাপুর হাই স্কুলের শিক্ষার্থীরা স্কুল প্রাঙ্গণে এক সমাবেশের আয়োজন করে ১২ এপ্রিল। স্কুলের শিক্ষার্থীরা তাদের পাঁচদিনের টিফিনের টাকা দান করেন ত্রাণ তহবিলে। বাড়ি থেকে প্রত্যেক শিক্ষার্থী পুরানো কাপড় নিয়ে আসেন শরণার্থীদের জন্য।[৩৩]

পূর্ব রেল হাওড়া বিভাগীয় কর্মচারিবৃন্দ বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের সাহায্যার্থে ৫৫০০ টাকার শাড়ী, ব্লাউজ, সাবান, শিশুখাদ্য ইত্যাদি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মাধ্যমে শরণার্থীদের প্রদান করেন। এছাড়া অক্টোবরে তারা প্রায় ১০,০০০ টাকা সমমূল্যের ত্রাণ রেডক্রসের মাধ্যমে নদীয়া ও পশ্চিম দিনাজপুরের শরণার্থী ক্যাম্পে সরবরাহ করেন।[৩৪] স্ট্যাডমেড প্রাইভেট লিমিটেডের কর্মচারিবৃন্দ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামীদের সাহায্যার্থে তাঁদের এক দিনের বেতন দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ আহত মুক্তি-ফৌজ ও দুর্গতদের সাহায্যার্থে ঔষধপত্র দেবেন বলে স্থির করেছেন।[৩৫] শিলিগুড়ির জ্যোৎস্নাময়ী গার্লর্স স্কুলের শিক্ষিকারা তাদের একদিনের বেতন বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য দান করেন। ছাত্রীরা টিফিনের খরচ কমিয়ে বাংলাদেশের জন্য অর্থ সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেন।[৩৬]

পোস্তা পাইকারী ব্যবসায়ীগণ সিদ্ধান্ত নেন একাত্তরে তারা অনাড়ম্বর হালখাতা উৎসব পালন করবে। হালখাতার জন্য ব্যবসায়ীদের বরাদ্দ অর্থ দান করবেন বাংলাদেশের সাহায্যার্থে। তারা প্রায় ২৫০ মণ আলু, পেয়াজ, আদা সাহায্য হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ ভান্ডারে প্রেরণ করেন।[৩৭]

কলকাতার লেক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা নিজেদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে, শিক্ষিকা ও অশিক্ষিকা কর্মীদের সম্পৃক্ত করে ৫৩৮ টাকার একটি তহবিল গড়ে তুলেন।[৩৮] বাংলাদেশ থেকে আগত দুর্গতদের সহায়তায় এটি প্রধান শিক্ষিকার হাতে তুলে দেয়া হয়। আড়িয়াদহ সর্বমঙ্গলা উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ও অশিক্ষক কর্মচারিগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁদের একদিনের বেতন বাংলাদেশের সাহায্য–ভাণ্ডারে দান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৩৯]

রাচী জেলার সকল সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তাবৃন্দ একাত্তরে বাংলাদেশের পাশে এসে দাড়িঁয়েছিল। তারা নিজেদের একদিনের বেতন ও অন্যান্য উৎস থেকে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে শরণার্থী ত্রাণে তিন লক্ষ টাকার একটি তহবিল গড়ে তুলেন।[৪০] নজরুলের স্মৃতি বিজড়িত আসানসোল একাত্তরে সহকর্মী হয়েছিল পূর্ববঙ্গের মুক্তিসংগ্রামে। আসানসোলের অজয় ভ্যালি মজদুর ইউনিয়নের নেতৃত্বে ময়রা-সাতগাঁ এলাকার পনেরটি কয়লা খনির শ্রমিকরা বাংলাদেশের সাহায্য দুদিনের মজুরি বাবদ ১৫,০০০ টাকা সংগ্রহ করেন।[৪১] এই টাকা তারা বাংলাদেশ ত্রান তহবিলে দান করেন। এছাড়াও এই কয়লা খনি শ্রমিকরা সিদ্ধান্ত নেন তারা প্রতিমাসের বেতনের একদিনের টাকা বাংলাদেশ তহবিলে দিবেন। ২৫ এপ্রিল পনেরটি কয়লাখনির শ্রমিকরা ঘোষণা দেন বেতন দেওয়ার পাশাপাশি প্রয়োজনে তারা রক্তও দিবেন।[৪২]

গুরু সিং সভার প্রেসিডেন্ট সর্দার মেহের সিং গরিব কলকাতার শিখ সম্প্রদায়ের তরফে ৫১০০ টাকার একটি চেক বাংলাদেশি নাগরিকদের সাহায্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী অজয় কুমার মুখার্জীর হতে তুলে দেন।[৪৩] বাংলাদেশে তহবিলে সাহায্যদানের জন্য 'The Federation of Association of Small Industries of India' পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ক্ষুদ্র শিল্পপতিদের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন। Eastern Regional Office at p-31. CIT Road, Calcutta-14 এই অফিসে দানের অর্থ জমা দেওয়ার আহ্বান করা হয়েছিল। বাংলাদেশের অসহায় মানুষের সাহায্যের জন্য হুগলি জেলার ভদ্রেশ্বরের সারদাপল্লীর রামকৃষ্ণ জন্মদিন উদ্যাপন কমিটি রামকৃষ্ণ মিশনের তহবিলে ১০০ টাকা দান করেছিলেন।[৪৪] 'The Calcutta Motor Dealers Association'-এর তরফে ১০,০০০ টাকা ৮ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়েছিল।[৪৫] পশ্চিমবঙ্গের তেরোজন বুদ্ধিজীবীদের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদনপত্রে শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল ভারতের জনগণের কাছে। *অমৃতবাজার* পত্রিকায় এই সংক্রান্ত যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় তাতে লেখা হয়েছিল,

An appeal was made to the public in general and the manufacturers in particular to come forward with their contribution, either in cash or in kind. The following articles were urgently needed at this moments for relief work-Petrol and Mobil oil tins, cycle, tyres and tubes, torch and battaries, water bottles, rubber shoes, matches, milk powder, salt, mustard oil and kerosene, T.A.B.C. injections, vaccines and all types of medicine, necessary for First

aid. The donations in cash of kind could be sent to Mr.Santosh Ghosh, Treasurer (107/ C A.M.Road, Calcutta-25, Phone-47-2020), Sangrami Swadhin Bangla Desh Sahayak Samiti (1A-College Row Calcutta, Phone 34-7211) between 6p.m. and 9p.m).[৪৬]

কলকাতা শিপিং কর্পোরেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ২১ এপ্রিল বাংলাদেশ মিশনকে ৩৩৩১ টাকা প্রদান করা হয়। শিপিং কর্পোরেশনের কর্মীরা পশ্চিমবঙ্গে আগত পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের জন্য নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে এই তহবিলে গড়ে তুলেন।[৪৭]

শরণার্থীদের সাহায্য একাত্তরের এপ্রিলের শুরুতে এগিয়ে আসেন ভারতের ডাক বিভাগের কর্মচারীরা। পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় শ্রেণীর পোস্টাল কর্মীরা ২২ এপ্রিল অনুদানের ১ম কিস্তির চেক (১৫০০ টাকা) প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হাতে তুলে দেন।[৪৮]

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য সংস্থাগুলোর পথ ধরে ট্রেড ইউনিয়নও এগিয়ে আসেন শরণার্থী ত্রাণে। আন্তর্জাতিক কনফেডারেশন অব ফ্রি ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও বাংলাদেশের শরণার্থী সেবার জন্য প্রধানমন্ত্রী গান্ধীর হাতে ৩৭৫০ টাকার একটি চেক তুলে দেন।[৪৯] পোস্টাল অ্যান্ড টেলিগ্রাফস ইন্ডাস্টিয়াল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ও পোস্টাল অ্যান্ড টেলিগ্রাফস মজদুর ইউনিয়নের উদ্যোগে গঠিত বাংলাদেশ রিলিফ ফান্ড কমিটি ৫০৪৮ টাকা চাঁদা তুলে ৮ মে কলকাতাস্থিত বাংলাদেশ মিশনের প্রতিনিধির হাতে অপর্ণ করেন।[৫০]

বাংলাদেশের নির্যাতিত মানুষের সাহায্যার্থে ওয়্যার মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারিং কর্পোরেশনের কর্মীরা তাঁদের একদিনের বেতন বাবদ ১৫৭২ টাকা ২৯ পয়সা দান করেন। কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষও দিয়েছেন ১৫৭২ টাকা। এই টাকা ৩০ এপ্রিল বাংলাদেশ সংহতি ও সাহায্য কমিটির হাতে দেওয়া হয়। বাংলাদেশের সাহায্যার্থে শিবমনি এন্ড কোং ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মীবৃন্দ ৮৮৭ টাকা বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনে জমা দিয়েছেন।[৫১]

ব্যারাকপুর বাস সিন্ডিকেট–রুট নং ৭৯, ৭৮ বি ও ৭৮ সির সভ্যগণ বাংলাদেশের নিপীড়িত জনগণ এবং সেখান থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্যার্থে ১ মে পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষের মাধ্যমে বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতিকে ১০০০ টাকা দান করেছেন।

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কর্মীরা বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে তাঁদের এক দিনের বেতন বাবদ ৮ মে ৫১৭ টাকা ৭৮ পয়সা দান করেন। এই টাকা বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম সহায়ক

সমিতির সভাপতির হাতে দেওয়া হয়। ব্যানার্জী চক্রবর্তী এন্ড কোং শ্রমিক ইউনিয়ন-এর সদস্যগণ বাংলাদেশ-এর মুক্তিসংগ্রামে সাহায্যকল্পে তাদের একদিনের মজুরী 'সাতশ এক টাকা' পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জীর হাতে তুলে দেন।[৫২]

ক্যালকাটা স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ সাহা বাংলাদেশের সংগ্রামের সমর্থনে উক্ত সংস্থার কর্মীদের নিকট হতে সংগৃহীত সমুদয় অর্থ প্রথম দফায় ২৩,২১৮ টাকা বাংলাদেশ সাহায্য ও সংহতি কমিটির সদস্য হরেকৃষ্ণ কোঙ্গারের নিকট এক শ্রমিক সমাবেশের মাধ্যমে অপর্ণ করেন।

বঙ্গীয় ক্যাথলিক সমিতির সভ্যবৃন্দ বাংলাদেশের ত্রাণ তহবিলের জন্য পদ্মজা নাইডুর হাতে ১৫৮৭ টাকা দেন।[৫৩] পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি ১২ মে ৪৮০০ টাকার একটি তহবিল তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্তের হাতে। বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় তিনশত শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীর উপস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অশোকবর্ধন সিংহ ঘোষণা দেন ভবিষ্যতে শরণার্থী সহায়তায় শিক্ষক সমিতি নিয়মিত সহায়তা দিবে।[৫৪]

কালিম্পং তিস্তা নদী বেষ্টিত পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ির একটি জেলা, একাত্তরে এই শহরের সাধারণ নাগরিকরা প্রায় বারোশ টাকা চাঁদা তুলেছিলেন বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য। কালিম্পং সুমি স্কুলের ছাত্ররা তাদের এক বেলা আহারের খরচ বাঁচিয়ে দুইশত টাকা মহকুমা শাসকের মাধ্যমে রেডক্রসে দান করেন। এছাড়াও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন জানিয়ে কালিম্পং-এ প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়।[৫৫] টাটা গোষ্ঠীভুক্ত সংস্থাগুলি বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের জন্য ত্রাণকাজ শুরু করে। চিকিৎসক, সমাজসেবী ও ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে গঠিত টাটার এক সাহায্যকারী দলের জন্য টাটা গোষ্ঠীর সংস্থাগুলি দশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। এছাড়া প্রত্যেকটি সংস্থা ও টাটা ট্রাস্ট বাংলাদেশ সাহায্য কমিটিকে এক লক্ষ করে টাকা দিয়েছেন। টিসকো, টেলকো ও ইণ্ডিয়ান টিউবের কর্মীগণ ত্রাণকাজের জন্য একলক্ষ চৌত্রিশ হাজার টাকা দিয়েছেন।[৫৬] টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানির ডিরেক্টর আর.এস.পাণ্ডের পরিচালনাধীনে টাটা সাহায্যকারী দল বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় কিষেণগঞ্জ শরণার্থী শিবিরের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যবস্থা ও পানীয় জল সরবরাহ ইত্যাদির তদারকি করে।[৫৭] রয়াল ক্যালকাটা গলফ ক্লাবের কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ওই ক্লাবের ক্যাপ্টেন বি. এম. খৈতান পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এ.এল ডায়াসের হাতে বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য ছেচল্লিশ হাজার টাকার চেক দেন।[৫৮] দি জেনারেল ইনসিওরেন্স

এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশন-এর পূর্বাঞ্চল শাখা বাংলাদেশ মিশনকে ৫৭,৭৭৭ টাকা দেন। মধ্য কলকাতা জাতীয় বিদ্যালয় (বালিকা) ও মধ্য কলকাতা জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র, ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ২৮৫ টাকা ও একটি রেডিও মুক্তিযোদ্ধাদের দেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল নন রেজিস্টার্ড ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তহবিলে ৫০১ টাকা দেন।[৫৯]

নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মজদুর পঞ্চায়েত একাত্তরের শরণার্থীদের সহায়তায় ৬৩৪ টাকা সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত অর্থ স্বাস্থ্যমন্ত্রী গোবিন্দচন্দ্র লস্করের হাতে তুলে দেয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা পরিষদের কর্মীবৃন্দের এক সভায় বাংলাদেশের জনগণের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানি ফ্যাসিস্ট বাহিনীর বর্বরোচিত আক্রমণের নিন্দা এবং বাংলাদেশের জনগণের ঐতিহাসিক ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানানো হয়।[৬০]

সভায় স্থির হয় যে, পরিষদের কর্মচারিবৃন্দ তাঁদের একদিনের বেতন বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি তহবিলে দান করবেন। বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি কেন্দ্রীয় ভাবে কিংবা রাজ্যভিত্তিক বিপুল সহায়তা ও ত্রাণ সরবরাহ করেছেন পাশাপাশি সহায়ক সমিতি বেশ কিছু জেলা সমিতি ও সহায়ক ইউনিট গড়ে তুলে শরণার্থীদের সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নাগরিকদের সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেছেন। চেষ্টা করেছেন সাধারণের সামান্য দান অনুদানকে মূল্যায়নের। সকলের সহযোগিতায় শরণার্থীদের কল্যাণে কাজ করার জন্য মুক্তিসংগ্রাম সহায়ক সমিতি বিভিন্ন জায়গায় সভা-সমাবেশ করে সাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। ২৩ মে তেমনি একটি সভায় হাওড়া টাউন হলে সহায়ক সমিতির সভাপতি অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘বাংলাদেশের শরণার্থীদের আপনারা যথাসাধ্য অর্থ ও জিনিস পত্র দিয়ে সাহায্য করুন। সাহায্যের পরিমাণ কম হতে পারে, কিন্তু তার পিছনে যে আন্তরিকতাটুকু রয়েছে, সেটাই হবে বিচার্য।’[৬১] সাধারণের সম্পৃক্ততা ছাড়া এই বিপুল শরণার্থী স্রোত যে সরকারের পক্ষে সামলানো সম্ভব নয়, সেটা বোঝার পর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার বারংবার ভারতের সাধারণ জনগণকে মানবিকতার দোহাই দিয়ে শরণার্থী ত্রাণে, সহায়তায় সম্পৃক্ত হওয়ার আহবান জানান।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বরাষ্ট্র পরিবহণ দপ্তরের টেকনিক্যাল ইন্সপেক্টর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গৃহহীন সহায়-সম্বলহীন ও আহত শরণার্থীদের সাহায্যর জন্য একাত্তরে রবীন্দ্র সদনে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্যের অর্থ ও পরিবহণ মন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষ। শ্রী ঘোষ বলেন, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের একই ভাষা ও একই সংস্কৃতি। একই ভূখণ্ডকে আমরা স্বদেশ বলে ভালোবাসি। পূর্বের স্বাধীনতাকামী মানুষের সেবার আমরা ব্রতী হয়েছি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহণ

বিভাগের কর্মীদের এই উদ্যোগকে শ্রীঘোষ অভিনন্দিত করেন। এই বিচিত্রানুষ্ঠানের মাধ্যমে ১২০০ টাকা সংগ্রহ করা হয়।[৬২] সংগৃহীত অর্থ বাংলাদেশ ত্রাণ তহবিলে প্রদান করা হয়। বাংলাদেশের নিপীড়িত জনগণের সাহায্যার্থে ১২ এপ্রিল অপরাহ্নে সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়ান ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের অফিসার কর্মচারিগণ প্রত্যেকে একদিনের বেতন দানে মোট সংগৃহীত ২৮৩১ টাকা মুখ্যমন্ত্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেয়া হয়।[৬৩]

এপ্রিলের শুরুতে যুবশক্তি, হুগলি শাখা হুগলির সাধারণ জনগণকে শরণার্থী সেবায় সাহায্য করার আবেদন জানান। ১৮ এপ্রিল সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তারা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যারা কাজে আগ্রহী তাদের যুবশক্তি ৭২, বি এল সি মিলস রোড, মাহেশ, হুগলি এই ঠিকানায় যোগাযোগের অনুরোধ জানান।[৬৪]

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি সিদ্ধান্ত নেন, সমিতির অধিভুক্ত সকল শিক্ষক একদিনের বেতন শরণার্থী ত্রাণে দান করবেন। সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুধাংশ পাল ২২ এপ্রিল একটি পত্র দিয়ে সকল সদস্যকে এপ্রিল মাসের একদিনের বেতন সমিতিতে প্রেরণের অনুরোধ জানান।[৬৫] ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানির এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন ও মজদুর ইউনিয়নের যুক্ত উদ্যোগে ৩৫, পণ্ডিতিরা রোডে কলিকাতাস্থ প্রধান কার্যালয়েল ক্যান্টিন হলে ডিরেকটরগণের উপস্থিতিতে ঘোষণা করা হয় কোম্পানির সকল কর্মচারী ও কর্মী একদিন অতিরিক্ত কাজ করে যে বেতন অর্জন করবেন, সেই পুরা টাকাটি সাহায্য ভান্ডারে দান করা হবে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষও উৎপাদিত ঔষধপত্র এবং অন্যান্য জিনিষপত্র দান করবেন বলে জানান। সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য।[৬৬]

ইয়াহিয়া সরকারের পৈশাচিক ও অমানুষিক অত্যাচার ও গণহত্যার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিফৌজের যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলেছে, লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের শোণিত আর অস্থি দিয়ে যে নতুন স্বাধীন বাংলাদেশকে এপার বাংলার মানুষ নিজেদের সর্বপ্রকার শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে সাহয্যের জন্য যে অভিযান চালিয়েছে সে অভিযানে অন্যান্য কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতির সঙ্গে চিত্রশিল্পীরাও একাত্মবোধ হয়ে ভিকটোরিয়া হাউসের সামনে ২৫ এপ্রিল থেকে প্রতি শনিবার চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। উদ্দেশ্যঃ–এই প্রদর্শনীর বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহায্যে দেওয়া হবে। ছবির সর্বনিম্ন দাম শিল্পীরা রেখেছেন মাত্র ১০ টাকা। অবশ্য এর ওপরে সাহায্যকারী বা ক্রেতারা ইচ্ছামত যতবেশী দাম দিয়ে ইচ্ছে এইসব ছবি কিনে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে পারেন। পূর্ব বাংলার মুক্তিযুদ্ধকে সাফল্যমণ্ডিত করার এই মহৎ উদ্দেশ্যে যেসব শিল্পী, এগিয়ে এসেছেন তাঁরা হলেন- সুনীল দাস, শৈলেন মিত্র, শ্যামল দত্তরায়, অনিলবরণ সাহা, অমরেন্দ্রলাল চৌধুরী, অমিতাভ ব্যানার্জি, মনু

পারেখ, মনু রাথোড, পানেশ্বর, অমিতাভ ব্যানার্জি, মাধবী পারেখ, জফিন মুছালা, জগদীশ ব্যানার্জি ও আরও অনেকে। প্রদর্শনী প্রতি শনিবার ৩টা হতে ৬টা পর্যন্ত জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়।[৬৭]

পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা একাত্তরে নানাভাবে সম্পৃক্ত হয়েছিল বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের সেবায়। ১২ এপ্রিল ১৯৭১ হিতসাধিনী সভার কার্যালয় ৭৪ বিবেকানন্দ রোডের মহেশ ভবনে 'বাংলাদেশ তহবিল' নামে একটি সাহায্য ও ত্রাণ ভান্ডার গড়ে তোলা হয়। ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার সভাপতি হেরম্ব ভট্টাচার্য সভায় ওপার বাংলার প্রয়োজনের এই মুহূর্তে সর্বোচ্চ সহায়তার ঘোষণা দেন। এই সভার উদ্যোগে সেপ্টেম্বরে বনগাঁ সীমান্তে শরণার্থী শিবিরগুলোতে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। নভেম্বর মাসে এই সমিতির উদ্যোগে সল্ট লেকের শরণার্থী শিবিরগুলোতে শীতের কাপড় ও ৫০০ কম্বল বিতরণ করা হয়।[৬৮]

কলকাতার শিখ সম্প্রদায় বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছিলেন। খালসা পন্থের ২৭৩তম বার্ষিকী উপলক্ষে ১৩ এপ্রিল গুরুদ্বার জগত সুধারে এক বৃহৎ সমাবেশে গৃহীত প্রস্তাবে নিরস্ত্র, নিরপরাধ নর-নারী ও শিশুদের ওপর পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর নিষ্ঠুরতার নিন্দা করা হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের জন্য যথাসম্ভব সাহায্য দানের জন্যও সমস্ত শিখদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

গুরু সিং সভার সভাপতি সর্দার মোহের সিং গরীব কলকাতার শিখদের পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জিকে বাংলাদেশের মানুষের সাহায্যার্থে পাঁচ হাজার টাকার একটি চেক প্রদান করেন।[৬৯] কলকাতায় বসবাসরত রংপুরের অধিবাসীদের সংগঠন 'রংপুর জেলা সম্মিলনী' একাত্তরে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন রংপুরের শরণার্থীদের জন্য এপ্রিলে রংপুর জেলা সম্মিলনী এক ঘোষণায় রংপুর থেকে আগত শরণার্থীদের সম্মিলনীর আহবায়ক শচীন রায়, প্লট ৬, ৩৪৪ নং নেতাজি সুভাষচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৪৭ (ফোন–৪৬৮১৬১) তে যোগাযোগের আহবান জানান। সম্মিলনী রংপুর থেকে আগত শরণার্থীদের আশ্রয় ও সহায়তায় পুরো মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে কাজ করেছে।[৭০]

জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে পরামর্শক্রমে পশ্চিমবঙ্গ সর্বোদয় মণ্ডল কর্তৃক বাংলাদেশের নিপীড়িত জনগণের সাহায্যের জন্য সর্বোদয় মণ্ডল বাংলাদেশ রিলিফ ফান্ড নামে একটি রিলিফ কমিটি গঠিত হয়েছিল। বিচারপতি শংকরপ্রসাদ মিত্র সভাপতি ও অনঙ্গবিজয় মুখোপাধ্যায় সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাদের সাহায্য পাঠাবার ঠিকানা–সম্পাদক, সর্বোদয় মণ্ডল বাংলাদেশ রিলিফ ফাণ্ড, সি-৫২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট,

কলকাতা–১২। উষা সুয়িং মেশিন ওয়ার্কসের অফিসার ও কর্মীবৃন্দ একাত্তরে শরণার্থী মহিলাদের মধ্যে ১০০০ সেলাই মেশিন বিতরণ করেন।[৭১]

একাত্তরে শরণার্থীদের সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গের বঙ্গবাসী কর্মাস কলেজের ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মচারীরা একটি সাহায্য কমিটি গঠন করেন। কমিটি শরণার্থীদের জন্য বস্ত্র, ঔষধ ও নগদ অর্থ সংগ্রহ করেছেন। বঙ্গবাসী কমার্স কলেজ ছাত্র সংসদ বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান স্থগিত করে এজন্য বরাদ্দ চারশত টাকা বাংলাদেশ ত্রাণ তহবিলে দান করার সিদ্ধান্ত নেন।

একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গে রাজশাহী থেকে আগত শরণার্থীদের সহায়তায় এগিয়ে আসেন রাজশাহী সম্মিলনী। সম্মিলনীর কার্যনিবাহী কমিটি শরণার্থীদের জন্য একটি তহবিল গড়ে তোলেন। এছাড়া আগত শরণার্থীদের সহায়তায় সম্মিলনীর কার্যালয় ডাঃ নীহারকুমার মুজ্জীর বাসভবন (১/ ৩ গরচা ফাস্ট লেন, কলিকাতা–১৯) এ একটি অভ্যর্থনা কেন্দ্র খুলেন।[৭২]

ফিলিপস ওয়ার্কস ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদের জন্য ১৪৭৪ টাকার একটি চেক পিপলস রিলিফ কমিটির তহবিলে দান করা হয়। ফিলিপস সম্পাদক ডাঃ মনি বিশ্বাসের হাতে তুলে দেন। কেন্দ্রীয় সরকারি শ্রমিক কর্মচারী সমিতি সমূহের সমন্বয় কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখা শরণার্থীদের সহায়তায় একটি বিশাল তহবিল গড়ে তুলেন। ১২ জুলাই তারা ১ম কিস্তিতে বাংলাদেশ সংহতি ও সাহায্য কমিটির হাতে ৬০৫০২.৩০ টাকা তুলে দেন। ১৮ সেপ্টেম্বর দেন ৫০,০০০ টাকার চেক। এছাড়া তারা ঔষধ ও শিশুখাদ্য সরবরাহ করেন।[৭৩]

আর্যনগরের তরুণ শিল্পীরা বাংলাদেশের সহায়তায় ১৯০ টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করেন। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত জোড়াসাকোঁ ঠাকুর বাড়ি একাত্তরে সহমর্মী হয়েছিল বাংলাদেশের। জোড়াসাকোঁ সহায়ক সমিতির পক্ষ থেকে একাত্তরের ১৬ এপ্রিল ২০০১ টাকার একটি চেক বাংলাদেশ মিশনে প্রেরণ করা হয়।[৭৪]

কলকাতা ইয়ুথ লয়ার ৫৭০০ টাকা, কলকাতা কর্পোরেশন টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন ১০০১ টাকা, টাটা অয়েল মিলের কর্মচারীরা ৪১৫ টাকা, উডল্যাণ্ড নাসিং হোমের প্রশিক্ষণার্থী নার্সরা ৯৩৫ টাকা, আড়িয়াদহ সর্ব মঙ্গলা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ও কর্মচারীবৃন্দ ১৮৯ টাকা, রাগিনী জুয়েলার্স ১০০০ টাকা ১৮ এপ্রিল ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনে দান করেন।[৭৫] ইউথ ফর বাংলাদেশ নামে একটি সংগঠনের প্রচারপত্রে শরণার্থীদের প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্য তিন ধরনের সহায়তার আবেদন করা হয়েছিল। এক, শরণার্থী শিবিরগুলোতে স্বেচ্ছাশ্রম দান। দুই, সাংগঠনিক কাজকর্ম করার জন্য তরুণ মানুষদের প্রতি

আবেদন এবং তিন, শরণার্থী শিবিরের মানুষদের পরিষেবা দানের জন্য আর্থিক অনুদানের আবেদন করা হয়েছিল। এই আবেদনপত্রে চেয়ারম্যান হিসাবে মিহির সেনের স্বাক্ষর ছিল। দপ্তরের ঠিকানা হিসাবে এই আবেদনপত্রে লেখা হয়েছিল–

Youth for Bangladesh, 14, Ezra Mansion, Calcutta-1, Dated-June 10, 1971.[76]

ভারতবর্ষের বাংলাদেশের শরণার্থীদের বিষয়ে ওপরের বেসরকারি স্তরের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় পরিষ্কার হয় যে ভারতে দেশজুড়ে শরণার্থী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সহযোগিতা করার জন্য সহানুভূতি ও সমর্থনে ঢল নেমে ছিল। ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, মহিলা সর্বস্তরে বাংলাদেশের শরণার্থীদের প্রতি দায়িত্ব পালনের প্রবল তাগিদ অনুভূত হয়। এই তাগিদ থেকে বিভিন্ন ধরনের সংগঠন গড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের শরণার্থীদের সরাসরি আর্থিক সাহায্য প্রদান ছাড়াও তারা জনমত তৈরি এবং তহবিল সংগ্রহ করেছিল। যদিও তাদের এই উদ্যোগ বিপুল পরিমাণ শরণার্থী আগমনের প্রেক্ষিতে নিতান্তই অপ্রতুল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতির পক্ষ থেকে সাধারণ জনগণ, বিশেষত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের নিকট অর্থসাহায্যের আবেদন জানানো হয়। তাতে সাড়া দিয়ে প্রথম এগিয়ে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়ের বিশ্বখ্যাত অধ্যাপক এবং তৎকালীন ভারতের জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বোস।[৭৭] একে একে এগিয়ে আসেন কৃষ্ণনগর মহিলা কলেজ, সরোজিনী নাইডু কলেজ, বেথুন স্কুল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ড. বিধানচন্দ্র রায় ইনস্টিটিউট অব বেসিক মেডিসিন-এর শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগগুলোর ৬১ জন শিক্ষক, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইসলামের ইতিহাস, আধুনিক ইতিহাস ও ইংরেজি বিভাগের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, ভারত চ্যারিটি ট্রাস্ট, মেসার্স প্রেস এজেন্টস প্রা.লি, মেসার্স এ্যালাইড এজেন্সি, প্যাস্টার ল্যাবোরেটোরিজের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ, সিদ্ধেশ্বর হোসিয়ারি ফ্যাক্টরি, গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস কলেজ, উমেশচন্দ্র কলেজ, বাংলাদেশ এইড কমিটি (বোম্বে), এইচপি লোহিয়া, এ্যংলো-ইণ্ডিয়ান জুট মিলের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাবেক এডভোকেট জেনারেল অজিত কুমার দত্ত, ফাদার পি ফ্যালন (এসজে), অমিতেশ ব্যানার্জি, অধ্যক্ষ নীরদকুমার ভট্টাচার্য্য, অধ্যক্ষ মমতা অধিকারী এবং আরও অনেকে। বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক পিবি গজেন্দ্রগদকর এবং অস্টেলিয়ার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অতীন্দ্র মজুমদারও পর্যাপ্ত অর্থসাহায্য করেন। উৎপল চৌধুরী এবং সোমা চ্যাটার্জী বিনামূল্যের ঔষধ সংগ্রহ করেন। এছাড়া, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ সমিতির পক্ষে অর্থ সংগ্রহ করেন। এই

দান গ্রহণের ব্যাপারে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করেন অধ্যাপক জ্ঞানেশ পত্রনবিস, যতিন চ্যাটার্জী, দীপক হাজরা এবং পি সেনশর্মা।[৭৮]

সমিতির কার্যক্রম পরিচালিত হতো দ্বারভাঙা ভবনের দোতলায় সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫:৩০টা পর্যন্ত এবং ১৪ নং বিধান সরণির দোতলায় সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। সমিতির পক্ষ থেকে বলা হয় যে, এই বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই কিছুদিনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী সকলকে নিয়মিত মাসিক অনুদান দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, যাঁরা এই ত্রাণকার্যে সাহায্য করবেন, তাদের আয়কর মওকুফের জন্য সমিতির পক্ষ থেকে ভারত সরকারের নিকট আবেদন জানানো হয় এবং সরকার তা মেনে নেন।

শরণার্থী ও মুক্তিবাহিনীর সাহায্যার্থে মে মাসে সমিতির শুভাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধুরা বেশ কিছু অর্থ দান করেন। অনেকেই এক মাসের বেতন দান করার মতো প্রশংসনীয় প্রতিশ্রুতিও দেন। এই প্রতিশ্রুতি প্রথম পালন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক অসীমা চট্টোপাধ্যায়। এই সময় বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানও অর্থ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়ে সমিতিকে সাহায্য করে। বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতি, বাংলাদেশ এইড কমিটি, আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যবেক্ষক কর্মচারী সমিতি, এগরা সারদা-শশীভূষণ কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, স্টে সুরজমল জলন মহিলা কলেজ, বিদ্যাসাগর মহিলা কলেজ, বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ, বাগনান কলেজ, যোগমায়াদেবী কলেজ, আর কে এন বাণিজ্য কলেজ (বহরমপুর), জঙ্গিপুর কলেজ কর্মচারী সমিতি, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ সমিতিকে অর্থ দান করেন। নীরদকুমার সেন নামে এক ব্যক্তি মুক্তিসেনাদের জন্য পানীয় জলের বোতল দান করেন, যা বিভিন্ন সেক্টরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। মেসার্স দে'জ মেডিক্যাল স্টোর এবং CIBA দান করে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র।

বাংলা গানের তিন কিংবদন্তী শিল্পী সলিল চৌধুরী, সবিতা চৌধরী এবং মান্না দে 'বাংলা আমার বাংলা' শীর্ষক একটি গানের রেকর্ডের সম্পূর্ণ রয়্যাল্টি মুক্তিযুদ্ধের সহায়তায় দান করেন। বোম্বে ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ মোটা অঙ্কের অর্থ দান করার প্রতিশ্রুতি দেন। ঋষিকেশ মুখার্জী এবং হিতেন চৌধুরী নিয়মিত অনুদান দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। বোম্বের জনগণের সঙ্গে এই যোগাযোগের ব্যাপারে কমিটিকে সাহায্য করেন বোম্বের Indian Merchants' Chamber-এর সম্পাদক সিএল ঘীওয়ালা। তিনি অর্থসাহায্যেরও প্রতিশ্রুতি দেন। এছাড়া আরও যাঁরা কমিটিকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁরা হলেন মনোবীণা রায়, ভারতীয় বিদ্যা ভবনের ড. অশোক মজুমদার এবং বোম্বে

হাইকোর্টের আইনজীবী গিরীশ মুনশী, বংশীভাই মেহতা, তাঁর স্ত্রী সুশীলা মেহতা এবং আর সি জাবেরী।[৭৯]

একাত্তরে বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি গজেন্দ্রগদকর একটি কমিটি গঠন করে তহবিল সংগ্রহ করেন এবং সহায়ক সমিতি যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল, সেসব বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

বোম্বের ফিল্ম ডিভিশনও একাত্তরে আন্তরিকভাবে সাহায্যে এগিয়ে আসে। অরুণ চৌধুরীর সহায়তায় সমিতি প্রকাশিত ছবির এ্যালবামের জন্য বেশ কিছু অসাধারণ ছবি ফিল্ম ডিভিশন তাঁদের দান করে। শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের ডব্লিউ এম ভান্ডারী ঘোষণা করেন যে, পরবর্তী অক্টোবরে অনুষ্ঠিতব্য চার দিনব্যাপী চ্যারিটি শোর সমস্ত অর্থ সমিতিকে দান করা হবে। বোম্বে সহায়ক সমিতির জন্য যাঁরা নগদ ও ভবিষ্যৎ সাহয্যের প্রতিশ্রুতি দেন তাঁরা হলেন পি পতি, ক্ষেমেন সেন, প্রফেসর কেএম দেওধর (সহসভাপতি, AIFUCTO), প্রবীর সন্দেল, বসন্ত ব্যানার্জী, বীণা ব্যানার্জী, চিত্রা বড়ুয়া, মিনু মাসানি, এসডি রাজু প্রমুখ। ভারতীয় বিদ্যা ভবনের সম্পাদক এস রামকৃষ্ণ সমিতির সাহায্যের জন্য নানা কর্মসূচির আয়োজন করেন।

যেসব প্রতিষ্ঠান সমিতির সাহায্যে এগিয়ে আসে সেগুলো হলো–শ্রী শিক্ষায়তনের শিক্ষক এবং প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের সংস্থা শ্রীসজ্ঘ, সিউনারেইন রামেশ্বর ফতেপুরিয়া কলেজ, র‍্যাডিয়্যান্ট প্রসেস, রাজা পিয়ারী মোহন কলেজের শিক্ষকবৃন্দ, আমতা বালিকা বিদ্যালয়, উদ্বোধন ট্রাস্ট, মুগবেরিয়া গঙ্গাধর কলেজ ইত্যাদি।[৮০]

সমিতির ফান্ড সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আগস্টের ২৩ ও ২৪ তারিখ কলকাতার রবীন্দ্রসদনে দুটি চ্যারিটি শোর আয়োজন করা হয়। নব নালন্দা গ্রুপ ও শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সজ্ঘ এতে অংশ নেয়। প্রথমদিন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর সেন এবং প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর এ আর মল্লিক। দ্বিতীয় দিন উদ্বোধন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর পি কে বসু এবং প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের এমএনএ আমীর উল ইসলাম। রবীন্দ্রসদনের কর্মকর্তা সুকুমার দাস, বি চক্রবর্তী, ড. ধ্রুব লাহিড়ী এবং প্রফেসর সোমেন বোস বিনামূল্যে সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেন।

একাত্তরে বাংলাদেশের সহায়তায় আয়োজন করা হয় লটারির। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া হতে আরম্ভ হওয়া এই টিকেটের মূল্য ধরা হয় ৫০ পয়সা। মোট এক লক্ষ টিকেট বিক্রির লক্ষ্য নিয়ে এ. এস লটারি এই

আয়োজনটি করেন। প্রথম পুরস্কার রাখা হয় এক হাজার টাকা। বাংলাদেশ সাহায্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে আয়োজিত লটারির বিক্রয়লব্ধ টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করা হয়।[৮১]

এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে তহবিল সংগ্রহে বেশ কিছু লটারির আয়োজন করা হয়। নদীয়াতে অক্টোবর মাসে আয়োজিত এমন একটি লটারিতে প্রায় ৫০০০ টাকা আয় করে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রেরণ করা হয়। হাওড়া যুব সঙ্ঘের উদ্যেগে আয়োজন করা হয় 'বাংলাদেশ লটারির'। বালুরঘাটে এমন একটি লটারি আয়োজনের স্মৃতিচারণ করছিলেন স্থানীয়রা।[৮২]

একাত্তরে শরণার্থীদের সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নাগরিকরা সিনেমা ও লটারির টিকেটের উপর অতিরিক্ত শুল্ক প্রদান করেছে। সিনেমার টিকেটপিছু ১০ পয়সা, লটারির টিকেট পিছু ১০ পয়সা, বেসরকারি যানবাহনের উপর ১০% অতিরিক্ত কর দিয়ে সম্পৃক্ত হয়েছিল স্মরণকালের ভয়াবহ এই মানবিক দুর্যোগ।[৮৩]

দি ইংলিশ স্পীকিং ইউনিয়নের উদ্যোগে ১৭ অক্টোবর ১৯৭১ কলামন্দিরে বাংলাদেশের সাহায্যকল্পে বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যাতে উদয়শঙ্কর ইণ্ডিয়া কালচার সেন্টার, ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার ও বাংলাদেশের শিল্পীগণ অংশ নেন। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংগৃহীত ৭০০ টাকা বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য ব্যয় করা হয়।[৮৪]

আর সি ক্লাবের সদস্যবৃন্দের উদ্যোগে ৪ আগস্ট ছবি বন্দোপাধ্যায়ের *বঙ্গবন্ধুর ডাক* রঙ্গনা রঙ্গমঞ্চে মধ্যস্থ হয়। অমিতাভ চৌধুরীর নির্দেশনায় এতে গৌরিশঙ্কর চৌধুরী, রাজকুমার বসু, অলোক ঘোষ, সোমনাথ চক্রবর্তী, কল্পনা ব্যানার্জি, আরতি দাস, কবিতা গাঙ্গুলি অভিনয় করেন। নাটকটি বিক্রেয় লব্ধ সমুদয় অর্থ বাংলাদেশের শরণার্থীদের সহায়তায় ব্যবহার করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শরণার্থী সাহায্য তহবিলে সাধ্যমতো অর্থদানের উদ্দেশ্যে ২১ জুলাই, ১৯৭১ বর্ধমানের রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে 'সাজাহান' নাট্যনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই আয়োজন বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি, বর্ধমানের পক্ষ থেকে। প্রেক্ষাগৃহে জ্ঞানীগুণীর অপূর্ব সমাবেশ দেখা যায়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ শশিভূষণ চৌধুরী। অভিনয়ে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁরা হলেন– সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়, গীতা দে, মঙ্গল চৌধুরী, রমেন চক্রবর্তী, সুশীল চট্টোপাধ্যায়, মধুমঙ্গল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।[৮৫]

বাংলাদেশের সাহায্যার্থে বঙ্গীয় সমাজসেবী পরিষদের উদ্যোগে হাওয়া সমাজ কর্তৃক পরিবেশিত হয় *নদের নিমাই*। সম্ভাবনা নাট্য সংস্থা ৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ছ'টায় অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস হলে বাংলাদেশের

সাহায্যার্থে এক বিচিত্রানুষ্ঠান এবং পার্থপ্রতিম চৌধুরী রচিত ও নির্দেশিত 'রাজকীয় মৃত্যুদণ্ড' নাট্যভিনয়ের আয়োজন করেন। বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশ নেন–সুচিত্রা মিত্র, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন, সাগর সেন প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ।[৮৬]

বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতির উদ্যোগে একাত্তরের ৩ জুলাই রবীন্দ্র সদনে আয়োজনে করা হয় *রুপান্তরের গান*। সনজীদা খাতুনের পরিচালনায় এতে হাসান ইমাম সূত্রধরের কাজ করেন। অর্থ সংগ্রহে এখানে শাহরিয়ার করিবের *সূর্যের প্রার্থনা* নাটক ও দেবব্রত বিশ্বাসের একক সংগীত সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়। ৪ জুলাই আয়োজন করা হয় রবীন্দ্র সঙ্গীত ও আবৃত্তি অনুষ্ঠানের। ২৫ টাকা, ১০ টাকা, ৫ টাকা ও ৩ টাকার টিকেট দুই দিনে প্রায় হাজার খানেক লোক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন সুচিত্রা সেন।[৮৭]

আকাশবাণী রিক্রিয়েশন ক্লাব রঙ্গনা রঙ্গমঞ্চে এক মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত, দিলীপ সরকার, দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, যোগেশ দত্ত, স্বপন গুপ্ত, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অংশুমান রায়, দিনেন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ প্রথিতযশা শিল্পীরা বিশিষ্ট শিল্পীরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অতিথি শিল্পী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের অভিনেত্রী কবরী চৌধুরী। এর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ বাংলাদেশ ত্রাণ তহবিলে দান করা হয়।[৮৮]

১০ জুলাই থেকে ১২ জুলাই পর্যন্ত তিনদিন স্থানীয় গোপালপুর হাউসে জলপাইগুড়ি সঙ্গীত সংসদ বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করে অর্থ সংগ্রহান্তে বাংলাদেশ থেকে আগত শিল্পীদের সাহায্যের ব্যবস্থা করে। প্রথম দুদিনে সংগৃহীত অর্থ থেকে প্রথম পর্যায়ে সংসদ সভাপতি বি সি ঘোষ পাঁচশত টাকা বিতরণ করেন। এই অর্থ দেয়া হয় বাংলাদেশের সঙ্গীতশিল্পী মরিয়ম বেগম, সুলতানা শাহ, নওয়াজ প্রধান, দিলীপ কারণ, খন্দকার মোখলেসুর রহামান ও আসগর আলী প্রধানকে।[৮৯] তাঁরা বিচিত্রানুষ্ঠোনেও অংশ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের সাহায্যে অর্থ সংগ্রহকল্পে হাজারিবাগের বেঙ্গলী এ্যাসোসিয়েশন সেন্টজেভিয়ার্স স্কুলের মঞ্চে প্রখ্যাত যাদুকর রঞ্জনকুমারের এক যাদু প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। হাজারিবাগ শহরের বহু বিশিষ্ট নাগরিকগণসহ পূর্ণ প্রেক্ষগৃহে যাদুকর রঞ্জনকুমার তাঁর বিস্ময় সৃষ্টিকারী বহু খেলার সাথে একটি বিশেষ খেলা 'জয় বাংলা ও জয় মুজিবর' প্রদর্শন করেন। খেলাটি প্রেক্ষাগৃহে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এছাড়া যাদুকরের অন্যান্য খেলাগুলি যেমন কংকালের নৃত্য, যাদুকরের মঞ্চ থেকে অন্তর্ধ্যান ও মুহূতের্র মধ্যে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে আর্বিভাব ইত্যাদি খেলাগুলি দর্শকদের চোখে বিস্ময় সৃষ্টি করে।[৯০]

স্বাধীন বাংলাদেশের সাহায্যার্থে বঙ্গাইগাঁও মহিলা সমিতি কর্তৃক মহেন্দ্র গুপ্ত রচিত *কংকাবতীর ঘাট* নাটকটি বঙ্গাইগাঁও রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে সাফল্যের সাথে মঞ্চস্থ হয়। মহিলা সমিতির সভ্যবৃন্দ এই নাটকে অংশ গ্রহণ করেন। নাটকটি দেখবার জন্যে যথেষ্ট দর্শক সমাগম হয়। এই ধরনের নাট্যানুষ্ঠান করে বঙ্গাইগাঁও মহিলা সমিতি যে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছেন তা আদর্শ স্বরুপ। ২৪ মে কৃষ্ণনগরের স্থানীয় যুবকবৃন্দ শিবানী সিনেমা হলে বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যকল্পে এক মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীসহ কলকাতার যেসব শিল্পীরা ছিলেন তারা হলেন, পিন্টু ভট্টাচার্য, বনশ্রী সেনগুপ্তা, নিতাই গোস্বামী, শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী (মুকাভিনয়), চন্দনা মুখার্জি, মলয় রাহা (হাস্যকৌতুক), সাওনারা (অর্কেষ্ট্রা)।[৯১]

ছাত্রছাত্রী এবং তরুণদের সংগঠন *সঞ্জীবন* হিন্দী হাই স্কুল প্রেক্ষাগৃহে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাঙলাদেশের সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ করেছিল একাত্তরে। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজী সব্যসাচী, অংশুমান রায়, বটুক নন্দী ও সহশিল্পিবৃন্দ এবং অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ভারতনাট্যম নৃত্যানুষ্ঠান এবং গান্ধারগোষ্ঠী পরিবেশিত চাণক্য সেনের 'তারারা শোনে না' নাটকাভিনয় বিশেষ আকর্ষণ ছিলো। বাঙলাদেশের স্বানামধন্যা চলচ্চিত্রশিল্পী কবরী চৌধুরী এই অনুষ্ঠানে বাঙলাদেশকে সাহায্য এবং স্বীকৃতি দেবার জন্যে বিশ্ববিবেকের কাছে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে আবেদন জানান। 'সঞ্জীবন' গোষ্ঠীর তরফ থেকে সংগৃহীত উনিশশো বারো টাকা ইণ্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের হাতে অপর্ণ করা হয়।[৯২]

বাংলাদেশ থেকে আগত দুর্গত মানুষদের সাহায্যার্থে ৮ মে স্টার থিয়েটারে যে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়, তার বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ (৩৩৮২.৫০) রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদান করা হয়। স্টার-এর স্বত্বাধিকারী রতিতমল কাঙ্কারিয়া উপরোক্ত অংকের একটি চেক মিশনের স্বামীজীর হস্তে অপর্ণ করেন।[৯৩] উল্লেখ্য, এদিন ওই উপলক্ষে স্টার-এর চলতি নাটক 'সীমা' এবং শ্রীদেব নারায়ণ গুপ্তর 'জয় বাংলা' আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্তের সাধারণ মানুষ সম্পৃক্ত হয়েছিল শরণার্থী ত্রাণে। বিক্ষিপ্ত সাধারণের সেই সহায়তার কিছু বিবরণ তুলে ধরলাম। যেগুলোতে সহযোগিতায় তৃণমূলের বহুমুখি প্রয়াস স্পষ্ট। একাত্তরে বাঁশবেড়িয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ৮১ টাকা, ধর্মরাজ গিরিজি হসপিটাল ট্রাস্ট ৩৪৪ টাকা, ব্রতচারী বিদ্যাশ্রমের প্রধান শিক্ষক ১০৪ টাকা, বেড়িয়া গার্লস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ২৫৫ টাকা, বেহালার সারদা বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষিকা ১৯২ টাকা ৪৬ পয়সা, বড়িয়া গালর্স প্রাইমারী স্কুলের প্রধান

শিক্ষিকা ২২৫ টাকা ৭২ পয়সা, বাসন্তী দেবী কলেজের অধ্যাপক, কর্মী ও ছাত্রীবৃন্দ ৬৮৮ টাকা ৫০ পয়সা, ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইণ্ডাস্টিজ ইণ্ডিয়ান স্টাফ এসোসিয়েশন ১,০৭৫ টাকা, ন্যাশনাল লাইব্রেরী ও সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরীর কর্মচারিবৃন্দ ৯৭০ টাকা, ইণ্ডো জি ডি আর ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি ১০১ টাকা, বি এস মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ও ছাত্রবৃন্দ ৪৩৮৬ টাকা, বাঙলাদেশ মুক্তি সহায়ক সমিতি ১০,০০০ টাকা, স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যাপক সমিতির সম্পাদক ৮৫০ টাকা, বালিগঞ্জ শিক্ষা সদন ২০০০ টাকা, পূর্ববঙ্গের ইনকাম ট্যাকস ইন্সপেকটর এসোসিয়েশন ১,৫৭০ টাকা, আই এম এ বেঙ্গল ষ্টেট ব্যাঙ্ক, বি এম জে ষ্টাফ ৪৮ টাকা ১৯ পয়সা, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইনকাম ট্যাকস ক্লাস ফোর এমপ্লয়িস এসোসিয়েশন ১০১৯ টাকা, লক্ষ্মৌর ইউ পি মহিলা সহায়ক সমিতি ১৪১ টাকা ৭৬ পয়সা, আই এম এ হেড কোয়াটার্স ৫০০ টাকা, আই এম এ বারুইপুর রাজপুর ৬৫৮ টাকা ১০ পয়সা, আই এম এ চন্দননগর ১৮২ টাকা ২২ পয়সা, আই এম এ হাবড়া ১০০ টাকা, উলুবেড়িয়া আই এম এ ৩০ টাকা, আই এম এ কোন্নগর ৭০ টাকা, আই এম এ আমতলা ৬৮১ টাকা, আই এম এ বেলডাঙ্গা ৭৩ টাকা, আই এম এ পানিহাটি ৪২ টাকা, আই এম এ চাম্পাদানি ৮০ টাকা, আই এম এ রাণীগঞ্জ ১০০০ টাকা, আই এম এ দেওলালি (নাসিক) ২০১ টাকা, আই এম এ চিরিমিরি (এম পি) ১৩০ টাকা, আই এম এ পুরুলিয়া ও মুক্তিসংগ্রাম সহায়ক সমিতি ৩০০০ টাকা, আই এম এ চম্পাদানি ভবেশ্বর ৩৬ টাকা ৩৯ পয়সা, আই এম এ আসানসোল ১৮০০ টাকা, আই এম এ উলুবেড়িয়া ৭৫ টাকা, আই এম এ বজবজ ৫০ টাকা, আই এম এ হাওড়া ১০৫ টাকা, আই এম এ কোকরাঝাড় (আসাম) ১১০ টাকা, আই এম এ গোলা (ইউ পি) ৫৯ টাকা, আই এম এ বাগুইআটি ১০৫ টাকা, আই এম এ মিরাজ (মহারাষ্ট্র) ৫০ টাকা বাংলাদেশের শরণার্থীদের সহায়তায় বিভিন্ন সহায়ক সমিতি, প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করেন।[৯৪]

এইধরনের সহায়তার অনেকগুলো তালিকা একাত্তরে বিভিন্ন স্থানীয় পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্তে কথ্য ইতিহাসে উঠে এসেছে বিক্ষিপ্ত সাহায্যের নানা বিবরণ।

খ. রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হল স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের স্বীকৃতি। বাস্তবিক সমগ্র একাত্তর জুড়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জনগণ, বিভিন্ন সংগঠন, রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন রাজ্য সরকার, লোকসভা-রাজ্যসভার সদস্য এককথায় ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে

বাংলাদেশের স্বীকৃতির বিষয়টি একটি প্রবল আধিপত্যের উপাদানে পরিণত হয়েছিল। অর্থাৎ স্বীকৃতি প্রদানের জন্য বিভিন্ন স্তর থেকে সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিল।

একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল জনতা একদিকে শরণার্থী ত্রাণে নিজের সবটুকু নিয়ে এগিয়ে এসেছিল, অন্যদিকে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বিপুল শরণার্থীদের আশ্রয় ও ত্রাণ প্রদানে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রেখেছিল। শুরুতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রিয় কর্তৃপক্ষ তাদের করণীয় নিয়ে সন্দিহান ছিল। কিন্তু সাধারণ নাগরিকরা শরণার্থীদের জন্য সীমান্ত উন্মুক্তকরণ, আশ্রয় প্রদান, তাদের জন্য ক্যাম্প নির্মাণ, রেশন প্রদানের দাবি জানাতে থাকে। জনমত শুরুতেই শরণার্থীদের নিরাপদে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ ও আশ্রয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল জনতা শুরু থেকেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য আন্দোলন করেছে। রাজধানী কলকাতা, সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোসহ পুরো পশ্চিমবঙ্গ একাত্তরে পরিণত হয়েছিল মিছিলের নগরীতে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার দাবিতে পালিত হয়েছে হরতাল, ধর্মঘট। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগের অংশ হিসেবে পালিত হয়েছে প্রতিবাদ সমাবেশ, বনধ, অনশন থেকে শুরু করে মশাল মিছিল। একাত্তরে উত্তাল হয়েছিল পুরো পশ্চিমবঙ্গ। ব্যারাকপুরের চায়ের দোকানে কথা হচ্ছিল একাত্তরের সেই উত্তাল সময়ের সাক্ষী কয়েকজনের সাথে। বলছিলেন, ‘একাত্তরে এমন কোন সন্ধ্যা ছিল না, আমাদের ব্যারাকপুরে মিছিল বের হত না, কতবার আমরা ইয়াহিয়া-ভুট্টোর কুশপুত্তলিকা পুড়িয়েছি।’[৯৫]

‘ ভারতের সামনে এসে পড়েছে যুগান্তরকারী সিদ্ধান্তের দিন। স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার দাবি উঠেছে দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে।’[৯৬] তৃণমূলের অপ্রতিরোধ্য চাপে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকার ও কেন্দ্রে ইন্দিরার সরকার শরণার্থীদের জন্য সীমান্ত উন্মুক্ত করেছে, ক্যাম্প ও ত্রাণের ব্যবস্থা করেছে, একসময় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতির প্রশ্নে বেসরকারি স্তরে প্রথম দাবি উত্থাপিত হয়েছিল ২৭ মার্চ। সারা বাংলায় ছাত্র ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে যে সভাগুলি হয়েছিল তার মধ্য দিয়ে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র শিক্ষক-যুবক এবং শিক্ষাবিদদের মধ্য দিয়ে। ‘বাংলাদেশে পাকসেনাদর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গে সভা ও মিছিল’ এই শিরোনামে *দৈনিক যুগান্তর* পত্রিকায় ১৯৭১-এর ২৮ মার্চ যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তাতে উপরোক্ত সংগঠনগুলি দাবি করেছিল স্বাধীন বাংলাদেশকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় স্বীকৃতি দিতে হবে। একই সঙ্গে ছাত্র ধর্মঘট উপলক্ষে যে সভা হয়েছিল তাতে ভারত সরকারের কাছে সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার এবং নৈতিক ও বৈষয়িক

সাহয্যদান করার দাবি উঠেছিল। ওই একই দিনে *গণশক্তি* (সান্ধ্য দৈনিক) পত্রিকায় এই সংক্রান্ত যে সংবাদ প্রকাশিত হয় তাতে লেখা হয়েছিল, 'স্কুল, কলেজ সফল ধর্মঘটের পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এক সুবিশাল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিমল রাউত। মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন বিমান বসু। ওই প্রস্তাবে বাংলাদেশকে লড়াকু জনগণের স্বায়ত্তশাসনের দাবি সমর্থন করা হয়।'[৯৭]

ইন্দিরা সরকারের কাছে 'সার্বভৌম বাংলাদেশ'-এর স্বীকৃতি দাবি করা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রদের পক্ষ থেকে প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছিল ভারত সরকারকে অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে হবে। পশ্চিমবাংলার মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পক্ষ থেকে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সম্পাদক অনিলা দেবী এক বিবৃতিতে বলেন– আমরা ভারত সরকারকে অবিলম্বে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি দেবার দাবি জানাচ্ছি। ১২ জুলাই কমিটির পক্ষে কে. জি. বসু ও অরবিন্দ ঘোষ দাবি করেছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রকে স্বীকৃতি দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন একটি বিবৃতি দিয়েছিল যাতে পূর্ববাংলার সার্বভৌম স্বাধীন সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছিল।[৯৮]

২৯ মার্চ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে এবং মুক্তি ফৌজকে অস্ত্র সরবরাহের দাবিতে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন সংস্থা সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সমর্থনে কলকাতার পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশনার ভবনের সামনে বেলা ১টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত বিভিন্ন ছাত্র সংস্থা একের পর এক বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। এদিন বিক্ষোভকারীদের মুখে অন্যতম স্লোগান ছিল, স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে হবে। বাংলাদেশের সংগ্রামের সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি ৩০ মার্চ যে প্রস্তাব নিয়েছিল তাতে অন্যান্য অনেক বিষয়ের সঙ্গে ভারত সরকারের কাছে দাবি করেছিল বাংলাদেশের স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রকে স্বীকৃতি দিতে হবে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তরে শ্রমিক কর্মচারীদের অনুষ্ঠিত এক সভায় ইউনিয়নের সম্পাদক শান্তি চক্রবর্তী দাবি করেন বাংলাদেশের স্বাধীন সার্বভৌম সরকারকে অবিলম্বে ভারত সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি দিয়ে তাদের মুক্তির আন্দোলনে সহযোগিতা করতে হবে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে ফেডারেশস অব মার্কেন্টাইল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সমীর মুস্তাফিজ যে বিবৃতি প্রচার করেন সেখানে বিভিন্ন দাবির পাশাপাশি বাংলাদেশের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃত দেবার দাবি জানানো হয়েছিল।

বাংলাদেশের সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রকে অবিলম্বে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেবার দাবিতে এবং বাংলাদেশের মুক্তি যোদ্ধাদের উপর জঙ্গীদের বর্বর আক্রমণের প্রতিবাদে পশ্চিমবাংলায় ৩১ মার্চ ধর্মঘটের ডাক

দিয়েছিল রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলি, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন এবং ছাত্র সংগঠনগুলি। *গণশক্তির* সম্পাদকীয় থেকে জানা যায় পশ্চিমবাংলার সাড়ে চার কোটি মানুষ এই সাধারণ ধর্মঘট ও হরতালে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৯৯]

বাংলাদেশের মানুষের বীরত্বপূর্ণ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন, সহানুভূতি ও একাত্মতা জানিয়ে একাত্তরের সূচনায় পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ জনতা নেমে এসেছিল রাজপথে। *আনন্দবাজার* ২৮ মার্চ শিরোনাম করে, ‘ওপারের সাত কোটির পাশে এপারের পাঁচ কোটি’। সহমর্মিতা প্রকাশ ও পাশে দাঁড়ানোর অংশ হিসেবে ৩১ মার্চ ১৯৭১ পুরো পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল পালিত হয়। *দৈনিক যুগান্তর* এই দিন প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনাম করে, ‘ওপারের লড়াই এপারের সমর্থন, সারা পশ্চিমবঙ্গ হরতালে সামিল।’ বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানের বর্বরোচিত গণহত্যার প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গেও এই স্বতঃস্ফূর্ত হরতালে থমকে গিয়েছিল পুরো রাজ্যের সমস্ত কর্মকান্ড। সেদিনের হরতালে অংশ নিয়েছিলেন বনগাঁর সাংস্কৃতিক কর্মী সৌমেন আচার্য। বলছিলেন ৩১ মার্চ এর কথা, ‘বাঙ্গলা বিভক্তির পর এই প্রথম কলকাতার রাস্তায় বাঙ্গালা ও বাঙ্গালির প্রতি প্রকাশ্যে এতো বেশি সোচ্চার সহানুভূতি ও সমর্থন দেখলাম।’[১০০] বাংলাদেশের সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রকে অবিলম্বে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেবার দাবিতে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের উপর জঙ্গীশাহীর বর্বর আক্রমণের প্রতিবাদে পশ্চিম বাংলায় এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলি, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন এবং ছাত্র সংগঠনগুলি।

এদিন সকাল থেকেই দফায় দফায় যুবকরা-ছাত্ররা শেখ মুজিবরের জয়ধ্বনি দিতে দিতে পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশন অফিসে এসে জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানান। এক দল যুবক এবং ছাত্র বার ঘন্টার জন্য অনশন ধর্মঘট শুরু করেন এই অফিসের সামনে।

উত্তর থেকে দক্ষিণে পূর্ব থেকে পশ্চিমে সর্বত্র ধর্মঘট নিয়ে কোথাও কোন হামলার খবর ছিল না। বেলেঘাটা, শোভাবাজার, দমদম, জোড়াবাগান, বরানগর ইত্যাদি অশান্ত এলাকাগুলিও বাংলাদেশের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের সমর্থনে এদিন শান্ত ছিল। পথের মোড়ে মোড়ে যুবকদের জটলা এ দৃশ্য মহানগরীর সর্বত্র। রাজপথগুলি খালি পেয়ে ফুটবল, হকি এমন কি ডাঙ্গুলী খেলোয়াড়েরা তা দখল করে নেয়। দক্ষিণের কয়েকটি স্থানে শহীদ বেদীর সামনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি। হাত দিয়ে তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন– তার নীচে লেখা, ‘এত তাজা প্রাণ বলি হচ্ছে তবু দুর্গম যাত্রাপথে কোন বাধা মানব না।’ কোথাও কোথাও বাড়ির শীর্ষেও অর্ধনমিত জাতীয় পতাকার সঙ্গে কালো পতাকা উড়তে দেখা যায়। সরকারি, আধা সরকারি, বেসরকারি অফিসে, কল-কারখানায় সর্বত্র তালাবন্ধ।[১০১]

পরম আত্মীয়ের বিয়োগ ব্যথায় বাঙ্গালির বাঁচার দাবির সমর্থনে কলকাতা মহানগরী এইদিন কালো পতাকায় শোভিত ছিল। শহরে সকালে এবং বিকালে অনেক পথের মোড়ে মোড়ে শহীদ বেদী। আর প্রতিবাদ মিছিল। শুভ শহীদ বেদীগুলি ফুলে ফুলে সাজানো। উদ্যোক্তা সাধারণ জনগণ। শহীদ বেদীর পাশে অর্ধনমিত জাতীয় পতাকা। আর কালো পতাকা। শহরের নানান এলাকায় অর্থ সংগ্রহের প্রয়াস আর নাগরিকদের বুকে কালো ব্যাজ। অর্থ সংগ্রহ অভিযানে মহিলারাও এগিয়ে আসেন। স্বাধিকার আন্দোলনে নিহত সৈনিকদের জন্য শোকের ছায়া। বিনা হাঙ্গামায় সর্বত্র ধর্মঘট কলকাতা ইতিপূর্বে খুব কমই প্রত্যক্ষ করেছে। দোকান-পাট বন্ধের জন্য এদিন কাউকে শাসাতে হয় নি। কিংবা মিছিল নিয়ে গিয়ে বোমাও নিক্ষেপ করতে হয় নি। রেল লাইন অবরোধ করার আগেই ট্রেন বন্ধ। লোকাল ট্রেন ত চলেই নি, দূরপাল্লার ট্রেনগুলি পর্যন্ত এইদিন রাজ্যে ঢোকে নি। হাওড়া, শিয়ালদা খাঁ খাঁ করছে। স্ট্যাণ্ডে রিকসা আছে, কিন্তু চালক নেই। বন্দরেও একই দৃশ্য। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো যে কর্মবহুল বন্দর বাঁচিয়ে রাখছে সেই কোলাহলমুখর কলকাতা বন্দরেও কোন সাড়া শব্দ নেই। সারি সারি জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে, কোন কাজ হয়নি। শ্রমিকরা কাজ করে নি।

৩১ মার্চের রাজ্যব্যাপী স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল নিয়ে কথা হচ্ছিল সাংবাদিক হিরন্ময় কার্লেকারের সাথে। তিনি বলছিলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের খুব সাধারণ লোকজনের এই হরতালে সামিল হওয়া বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এতে করে পূর্ববঙ্গের শরণার্থীরা বুঝতে পারল পশ্চিমবঙ্গে তাদের আশ্রয় নিশ্চিত। আর রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার বুঝতে পারল জনমত পূর্ববঙ্গের পাশে দাঁড়ানোর।'[১০২] এই সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূলের মনোভঙ্গির চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ।

তবে ৩১ মার্চ পুরো রাজ্যে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হলেও তার আগেই অনেক জায়গায় বাংলাদেশের সমর্থনে ধর্মঘট ও হরতাল পালিত হয়েছে। স্বাধীনতাকামী পূর্ব বাংলার জনসাধারণের উপর ইয়াহিয়া খানের সামরিক বাহিনীর বীভৎস আক্রমণের প্রতিবাদে এবং মুক্তিসংগ্রামের সমর্থনে ২৭ মার্চ হুগলী জেলার শিয়াখালা অঞ্চলে স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্র ধর্মঘট ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। শিয়াখালা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের নেতৃত্বে অঞ্চলের সমস্ত প্রাথমিক ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছাত্ররা ধর্মঘট করে এবং বঙ্গবন্ধু মুজিবর, জিন্দাবাদ, বন্দেমাতরম প্রভৃতি ধ্বনিসহ শোভাযাত্রায় শামিল হয়।[১০৩] শিয়াখালা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ একটি সভায় মিলিত হয়ে মুক্তি সংগ্রামী পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি সমর্থন ও স্বৈরচারী ইয়াহিয়ার অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করে।

২৯ মার্চ হাওড়া, বর্ধমান, দক্ষিণ দিনাজপুরে বাংলাদেশের সমর্থনে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। ৩০ মার্চ হরতাল হয়েছে মেদিনীপুরে, ১ এপ্রিল ৫টি জেলায় সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল পালিত হয়েছে।[১০৪] একাত্তরে কলকাতা থেকে প্রকাশিত রাজ্যভিত্তিক বেশ কয়েকটি দৈনিক এবং বিভিন্ন জেলা থেকে প্রকাশিত স্থানীয় বেশ কিছু দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা মাঠপর্যায়ের গবেষণায় সংগ্রহ করি।[১০৫] সেসব পত্রিকাগুলোর উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, একাত্তরের ২৭ মার্চ থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন রাজ্যে স্থানীয় পর্যায়ে সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল পালিত হয়েছে। বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন ছিল একাত্তরের খুব সাধারণ বিষয়। রাজধানী কলকাতা থেকে শুরু করে সীমান্তপাড়ের বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর, রারাসাত, কৃষ্ণনগর, মুর্শিদাবাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পৃক্ত হয়েছিল এই প্রতিবাদি হরতালে। কলকাতা, যাদবপুরের মতো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে বনগাঁর একটি প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত সমবেত হয়েছিল এতে। এসব হরতাল-ধর্মঘটে শুরুতেই শরণার্থীদের আশ্রয়ের পক্ষে একটি অবস্থান তৈরি হয়েছিল। বাংলাদেশ স্বীকৃতি ও সাহায্যের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি চাপ হিসেবে কাজ করেছিল।

স্বাধীন বাংলাদেশের সমর্থনে হুগলির চুঁচুড়ায় সফল ধর্মঘট ও হরতাল পালিত হয়।[১০৬] হরতাল শেষে চুঁচুড়া ময়দানে পাঁচ সহস্রাধিক মানুষের এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন হুগলীর চুঁচুড়া পৌরসভার পৌরপিতা অমিয় নন্দী। সভাপতি হিসাবে তিনি সভায় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে ভারত সরকারের কাছে দাবি করা হয়েছে যে,অবিলম্বে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে। ৩১ মার্চ বাংলাদেশের সরকারকে স্বীকৃতিদানের দাবিতে উত্তরপাড়া অঞ্চলে সফল ও স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট পালিত হয়। হিন্দুস্তান মোটরসসহ অন্যান্য কারখানাগুলিতেও ধর্মঘট পালিত হয়েছিল। বিকেল চারটায় হিন্দমোটর স্টেশন এলাকা থেকে ছাত্র, যুব, মহিলা, হিন্দুস্তান মোটর ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতিসহ বিভিন্ন গণসংগঠনের ডাকে এক বিরাট ও অভূতপূর্ব মিছিল কোতরং ভদ্রকালি এলাকা পরিক্রমা করে উত্তরপাড়া স্টেশনে এসে শেষ হয়। এই সফল ধর্মঘট ও বিরাট শোভাযাত্রা এলাকার মানুষের মনে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল।[১০৭]

জাতীয় মহিলা সংহতি,পশ্চিমবঙ্গ শাখা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে একাত্তরে বেশ কিছু সভা সমাবেশ করেছে। আয়োজন করেছিল ৫০০ মহিলাদের এক প্রতিবাদ মিছিলের। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার এক আবেদন তারা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রেরণ করেন। সেখানে উল্লেখ করা হয়,

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের পশ্চিম সামরিক দস্যুদের বিরুদ্ধে দুর্জয় সংগ্রাম বিশ্বের বিপ্লব ইতিহাসে এক বিস্ময়কর অধ্যায়। ইতোমধ্যে সমগ্র পূর্ববঙ্গে লক্ষ লক্ষ নরনারী একাত্ম হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য শত্রুর বন্দুক, কামান, ট্যাংক, রকেট, বোমারু বিমানের বিরুদ্ধে এক অসম সংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়ে পূর্ববঙ্গের বহু এলাকা পশ্চিম পাকিস্তানের হাত থেকে মুক্ত করেছেন। আমরা এই বাংলা থেকে বাংলাদেশের বিপ্লবীদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাই এবং দাবি জানাই ভারত সরকারসহ বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক শক্তি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে মানবতার বিরুদ্ধে পাকিস্তনের সামরিক চক্রের গণহত্যার এ অভিযানকে অবিলম্বে স্তব্ধ করে বিধ্বস্ত বাংলাদেশের বিপর্যস্ত মানুষদের সর্বতোমুখী সাহায্যের জন্য উদ্যোগী হোন।'[১০৮]

রমা চৌধুরী, নীলা মজুমদার, গিরিবালা দেবী, নীলা রায়, মৈত্রেয়ী দেবী একাত্তরের ১৪ এপ্রিল এক আবেদনে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার অনুরোধ জানিয়ে বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তারা বলেন, মানবিকতার দোহাই দিয়ে আমরা, পশ্চিমবঙ্গের মহিলাবৃন্দ সমবেতভাবে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রসঙ্ঘকে বাংলাদেশের ব্যাপক গণহত্যা ও নারী-নির্যাতন বন্ধ করবার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। তাঁদের সকলের কাছে এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

কলকাতা এক্সপ্লোরাস ক্লাবের উদ্যোগে বাংলাদেশকে স্বীকৃতির দাবিতে একাত্তরে গণস্বাক্ষরাভিযান এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল। মিহির সেনের নেতৃত্বে শিল্পাচার্য কামিনী রায়ের ৮৪ তম জন্মদিনে তাঁর স্বাক্ষর গ্রহণের মধ্য দিয়ে এই কার্যক্রমের সূচনা করা হয়। তিনটি দাবিতে একাত্তরে তারা দশ লক্ষ সাধারণ নাগরিকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। যে দাবিগুলোর ওপর স্বাক্ষর সংগ্রহ হয়েছে সেগুলো নিম্নরুপ-

(১) সার্বভৌম গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ সাধারণতন্ত্রকে ভারত সরকার অবিলম্বে স্বীকৃতি দিন।

(২) আমাদের সরকার এই নয়া সাধারণতন্ত্রের অবরুদ্ধ জনসাধারণের সাহায্যে খাদ্য, অর্থ, ওষুধ ও অন্যান্য সামগ্রীর সঙ্গে সঙ্গে সামরিক সম্ভারও উদার হস্তে দিতে থাকুন।

(৩) দীর্ঘ বেদনাদায়ক কালহরণ সত্ত্বেও রাষ্ট্রপুঞ্জ পাকিস্তানকে সারা বাংলাদেশে অবিলম্বে যুদ্ধে বিরতি দিতে বাধ্য করে তার অস্তিত্বের যৌক্তিকতা প্রমাণ করুন।

পাশাপাশি সাধারণ নাগরিকদের প্রতি অনুরোধ জানানো হয় এক্সপ্লোরার্স ক্লাব, ৮৭, করনারী এস্টেট, ২০৯ আচার্য জগদীশ রোড, কলকাতা ১৭ তে সাহায্য পাঠানোর।[১০৯]

UNI কে উদ্বৃত করে *অমৃতবাজার* পত্রিকা বিষয়টি সম্পর্কে লিখেন-

The Explorer's club of India has organised a mass signature campaign in support of its domand for immediate recognition of Bangladesh, reports UNI. The campaign was inangurated on Wednesday by noted artist Jamini Roy who signed the petition to be presented to the Prime Minister of India and the UN Secretary General. The club members fanned out to different parts of the city with copies of the petition. The campaign will be carried out throughout the state. [১১০]

সারা ভারত, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শ্রমিক-শিক্ষক-কর্মচারী যুক্ত আন্দোলন কমিটি (১২ জুলাই কমিটির)-র জয়পুর থানা শাখা (বাঁকুড়া) বাংলাদেশের সমর্থনে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন একাত্তরে। বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবি জানিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে তারবার্তা প্রেরণ করেন কমিটি। পুরুলিয়া 'লেখা ও রেখা' পত্রিকা পরিষদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের ওপর পাকিস্তানি ফৌজের আক্রমণের নিন্দা করা হয়। এবং ভারত সরকারের কাছে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার দাবি জানানো হয়।[১১১] ১৭ এপ্রিল গড়িয়ার ভারতীয় গণনাট্য সংঘের 'লোক ও শিল্পী' শাখার উদ্যোগে (গড়িয়া) আজাদ হিন্দ পাঠাগার প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত জনসভায় বাংলাদেশ সরকারকে আশু স্বীকৃতির দাবি জানানো হয়। ১৬ এপ্রিল হুগলি জেলায় বিজয় মোদকের সভাপতিত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের সমর্থনে শ্রীরামপুরের টাউন হলে রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতির আহ্বানে একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশনে বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন গণসংগঠন, জেলা ও স্থানীয় কৃষক সভা হুগলি জেলা কমিটি এবিটিএ, নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি হুগলি জেলা শাখা, হুগলি জেলা ছাত্র ফেডারেশন (এস. এফ. আই), এছাড়াও বহু শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি উপস্থিত হন। এই কনভেনশনের উত্থাপিত প্রস্তাবে স্বাধীন বাংলা সরকারকে স্বীকৃতি দেবার দাবি জানানো হয়েছিল।[১১২]

গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ২ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে তিনটি দাবি উত্থাপন করেন, (১) স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে (২) স্বাধীন বাংলাদেশের অস্ত্রশস্ত্রসহ সর্বপ্রকার সাহায্য প্রেরণ করতে হবে (৩) স্বাধীন বাংলাদেশের সংগ্রামকে সাহায্য করবার জন্য সীমান্তে বাধা অপসারণ করতে হবে।

জ্যোতি বসুকে সভাপতি করে সুধীর কুমারকে সম্পাদক এবং কৃষ্ণপদ ঘোষকে কোষাধ্যক্ষ করে ২১ জন সদস্য নিয়ে যে 'বাংলাদেশ সংহতি ও সাহায্য কমিটি' গঠিত হয়। তারাও বাংলাদেশের সাধারণতান্ত্রিক

সরকারের স্বীকৃতি দাবি করেছিল।[১১৩] বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের দাবিতে বরানগরে ট্রেড ইউনিয়ন কোঅর্ডিনেশন কমিটি একটি জনসমাবেশ আয়োজন করেছিল। এই সমাবেশ থেকে সর্বস্তরের জনগণকে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বপ্রকার সাহায্যদানে বিশেষ করে অর্থ, ঔষধ প্রভৃতি দিয়ে সহায়তার আহ্বান জানিয়েছিল। সমাবেশে ভারত সরকারের কাছে দাবি ছিল কালবিলম্ব না করে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের। সংহতি ও সাহায্য কমিটি সরকারের কাছে তিনটি দাবি তুলে ধরেন- (১) ভারত সরকারকে অবিলম্বে বাংলাদেশের স্বাধীন সরকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে, (২) অস্ত্রসহ প্রয়োজনীয় সমস্ত সাহয্য, মুক্তিবাহিনীকে অবিলম্বে পাঠাতে হবে। (৩) সীমান্তে বাধা অপসারিত করে দিয়ে মুক্তি সংগ্রামকে সাহায্য করতে হবে।[১১৪]

৩ এপ্রিল 'দ্বিধা কেন' শিরোনামে একটি নিবন্ধ *গণশক্তিতে* প্রকাশিত হয়। তাতে মূল বিষয় হিসাবে বাংলাদেশ সরকারকে ভারত সরকারের স্বীকৃতি দানের বিষয়টি উঠে এসেছিল। বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র সংসদের উদ্যোগে স্বাধীন বাংলার সমর্থনে কলেজ কমনরুমে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভারত সরকারের কাছে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের কূটনৈতিক স্বীকৃতি এবং বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্রসহ সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় সাহায্য দানের দাবি জানিয়ে সভা থেকে প্রস্তাব গৃহীত হয়, আলিপুর টেলিগ্রাফ স্টোর ইয়ার্ডে শ্রমিক ও কর্মচারীদের যে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় সেই সভায় গৃহীত প্রস্তাবে ভারত সরকার কর্তৃক অবিলম্বে স্বাধীন বাংলা সরকারকে স্বীকৃতিদানের দাবি জানানো হয়েছিল। ফেডারেশন অব মেটাল অ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়াকার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রবীন মুখার্জী বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে সংবাদপত্রে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন সেখানে এক জায়গায় লেখা হয়েছিল, 'এপার বাংলা তথা ভারতবর্ষের জনগণের এই মুক্তিযুদ্ধকে সর্বপ্রকার সাহায্য দান করার গুরুদায়িত্ব আছে। তাকে কার্যে পরিণত করার জন্য আমরা ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবি করছি যে, অবিলম্বে স্বাধীন বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সাহায্য করা হোক।'[১১৫]

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে একাত্তরে বহরমপুরের বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী-শিক্ষকরা মে মাসে এক বেলা অনশন পালন করেন।[১১৬] অনশন শেষে তারা স্থানীয় জেলা শাসককে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন, যেখানে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ভারত কর্তৃক স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানানো হয় এবং এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়।

একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গে স্থানীয় পত্র-পত্রিকাগুলোর সংবাদ বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে শতাধিক অনশন পালিত হয়েছে।[১১৭] এর অধিকাংশরেই উদ্যোক্তা ছিলেন স্থানীয়

সাধারণ জনগণ। তবে স্থানীয় পর্যায়ের এসব অনশনের অধিকাংশের সংবাদ পত্র-পত্রিকায় আসেনি। কৃষ্ণনগরের নবারুন ক্লাব বাংলাদেশকে সাহায্য করার দাবিতে ২৮ এপ্রিল ১২ ঘন্টার অনশন পালন করে।[১১৮] প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গে অনশন পালন করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, এই অনশনের উদ্দেশ্য ছিল, বাংলাদেশের শরণার্থীদের আশ্রয় প্রদান, সহায়তা, স্বীকৃতি, অস্ত্র প্রদান কিংবা মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সরাসরি হস্তক্ষেপ কামনা। তৃতীয়ত, এসব অনশনের উদ্যোক্তা ছিল পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নাগরিকরা। সাধারণ কোন প্লাটফর্মে তারা এই অনশন পালন করেন। কোন ক্লাব, পাড়ার সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, নারী সংগঠন, শ্রমিক ইউনিয়ন কিংবা কর্মকর্তা-কর্মচারী সংগঠনের ব্যানারে এই অনশন পালিত হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যানারেও অনেকগুলো অনশন পালিত হয়েছে। রাজ্য ও স্থানীয় ভিত্তিতে পালিত এসব অনশনে রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলোর সাধারণ কর্মীরা অংশ নেন। অনশনগুলো সাধারণত ৬ ঘন্টা থেকে ২৪ ঘন্টা স্থায়ী ছিল। একাত্তরে এসব অনশনের সাধারণ লোকজন থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক অংশ নেন।

মতিঝিল টেন্টামেন্ট এ্যাসোসিয়েশনের সভায় গৃহীত প্রস্তাবের এক জায়গায় বলা হয়েছিল, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি যে, ভারত সরকার আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণের এই মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করেননি। তারা বাংলাদেশের এই সংগ্রামকে ছোট করে দেখছেন। কেবলমাত্র মৌখিক সহানুভূতি ছাড়া ভারত সরকার এই সংগ্রামী জনগণের প্রতি আর কিছুই করেননি। তারা বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকেও স্বীকৃতি দিচ্ছেন না। মতিঝিল টেন্টমেন্ট এ্যাসোসিয়েশনের এই সভা অবিলম্বে ভারত সরকারের কাছে দাবি করে যে, বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দিতে হবে।[১১৯] এনড্রু ইউল অ্যাণ্ড কোম্পানি লিমিটেড এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সভায় গৃহীত প্রস্তাবে সার্বভৌম স্বাধীন বাংলাকে অবিলম্বে স্বীকতি দানের জন্য ভারত সরকারের নিকট দাবি জানিয়েছিল। ইএসআইসি এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের এক সভায় গৃহীত প্রস্তাবে মূল যে দাবিগুলি করা হয়েছিল তা হল– (১) অবিলম্বে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে, (২) দুই বাংলার সীমান্তের বেড়াজাল তুলে দিতে হবে, মুক্তিফৌজকে দিতে হবে প্রয়োজনীয় অস্ত্র এবং (৩) বিপ্লবী জনগণের জন্য পাঠাতে হবে ঔষধপত্র, খাদ্য ও চিকিৎসার প্রয়োজনীয় সামগ্রী।[১২০]

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে ভারত সরকারের কাছে যে দাবিগুলি জানিয়েছিল সেগুলি হল– (১) অবিলম্বে অস্থায়ী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান করা হউক। (২) বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য সামগ্রী অবিলম্বে প্রেরণ করা হউক। (৩) পশ্চিমবঙ্গের

জনগণের পক্ষ থেকে বিবিধ সাহায্য প্রদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গের ও পূর্ববঙ্গের সীমান্ত উন্মুক্ত করে দেওয়া হউক।[১২১]

৭ এপ্রিল ১৯৭১ পুরো পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জুড়ে 'বাংলাদেশ সংহতি দিবস' পালিত হয়। ১২ই জুলাই কমিটির ডাকে রাজ্যব্যাপী পালিত এই সংহতি দিবসে সবাই বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন। সংহতি দিবসে ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করে গণবিক্ষোভ ও গণডেপুটেশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সংহতি দিবস উপলক্ষে এ দিন সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে সমাবেশের আয়োজন করা হয় এবং সমাবেশ শেষে পাক ডেপুটি হাই কমিশনারের অফিসে গণডেপুটেশনে যাওয়া হয়। ১২ জুলাই কমিটি এই সংহতি দিবসের আহবায়ক হলে রাজ্যের সাধারণ জনগণ এতে সমর্থন ও একাত্মতা জানায়।

পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদের উদ্যোগে ১৮ এপ্রিল রাজ্যজুড়ে বাংলাদেশ সংহতি দিবস পালন করা হয়। সংহতি দিবস উপলক্ষ্যে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে আয়োজিত জনসভায় শান্তি সংসদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডাঃ মনিন্দ্র লাল বিশ্বাস ও অমীয় মুখার্জি বক্তৃতা করেন। জনগণকে বাংলাদেশের সহায়তায় এগিয়ে আসার আহবান জানানোর পাশাপাশি রাজ্য সরকারের প্রতি আহবান জানান শরণার্থীদের যথাযথ সহায়তার।

৩০ মার্চ টাটা ওয়েল মিলস কর্মচারী ইউনিয়ন একটি সাধারণ সভায় সর্বসম্মতভাবে যে প্রস্তাব নেয় তাতে অন্যান্য দাবি ছাড়াও অন্যতম প্রধান দাবি ছিল ভারত সরকার কর্তৃক অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি। একইদিনে ফারাক্কায় টেগর সেন্টার থেকে শ্রমিক, কর্মচারী, ছাত্র ও কৃষকের এক মিছিল লাল ময়দানে এসে জনসভা করে। জনসভায় অনুপ মৈত্র যে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বাংলাদেশের স্বাধীন, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্রকে স্বীকৃতি দেবার দাবি জানানো হয়।[১২২]

বেহালার এল.আই.জি. হাউজিং এস্টেটের টেনান্ট অ্যাসোসিয়েশন যে সভার আয়োজন করেছিল সেখানে ভারত সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়, ভারত সরকার যেন অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম, লোকতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দান করে। ১২ ই জুলাই কমিটির ফারাক্কা শাখার পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে এক তারবার্তা পাঠিয়ে বলা হয়েছিল– বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলরত লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র দেশপ্রেমীদের উপর পাকিস্তানি সৈন্যের আক্রমণে কেবলমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ করলেই চলবে না, আমরা চাই বাংলাদেশকে রক্ষার্থে মুক্তিফৌজকে সবরকম প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়া হোক এবং

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া হোক।[১২৩] হিন্দুস্তান স্টিল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের গৃহীত প্রস্তাবে বাংলাদেশের সরকারকে স্বীকৃতিদানের জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছিল।

রাজ্যব্যাপী সংহতি দিবস, বাঙলাদেশ দিবস পালনের পাশাপাশি বিভিন্ন জেলা পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে ও এসব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। তেমনি একটি উদাহারণ গড়িয়ায় স্বাধীন বাঙলা দিবস উদযাপন। এই উপলক্ষে নানাস্থানে শহীদ বেদী তৈরি করা হয় এবং অসংখ্য মানুষ কালো ব্যাজ ধারণ করে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মহামায়াপুর স্কুল প্রাঙ্গণে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। সেখানে বিভিন্ন বক্তাগণ ইয়াহিয়া খানের জঙ্গী শাসনের নৃশংস হত্যা ও ধ্বংস তাণ্ডবের তীব্র নিন্দা জানান। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে ভারত সরকারকে স্বাধীন বাংলা সরকারকে স্বীকৃতি দান ও সর্বপ্রকার সাহায্য প্রেরণের দাবি জানানো হয়। সভায় হরিপদ দত্ত যুব নেতা চন্দশেখর চ্যাটার্জি, দীপংকর রায়, দিলীপ দত্ত প্রমুখ বক্তৃতা দেন।[১২৪]

তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের সাহায্য যে মুক্তিসংগ্রাম সহায়ক সমিতি গঠিত হয়েছিল তাদের গৃহীত প্রস্তাবে অবিলম্বে স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার জন্য ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবি জানানো হয়। বাংলাদেশে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর গণহত্যা ও নির্মম অত্যাচার বন্ধ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসংঘকে অনুরোধ করার জন্য এবং এই ব্যাপারে বিশ্বের সকল রাষ্ট্র বিশেষ করে আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রগুলি যাতে উদ্যোগী হয় তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সচেষ্ট হতে অনুরোধ করা হয়।[১২৫] ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষে ইন্দিরা গান্ধীর কাছে স্বীকৃতি দেবার দাবি জানিয়ে একটি পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল– বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে যে সংগ্রামী স্বাধীন বাংলাদেশ সহায়ক কমিটি গড়ে উঠেছিল এবং যার সভাপতি ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত একটি প্রস্তাবে বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানি জঙ্গীশাহীর গণহত্যা, ধ্বংসলীলা, নারী ধর্ষণ এবং লুণ্ঠনের তীব্র নিন্দা করেন। প্রস্তাবে বলা হয় ভারত সরকার যেন কালবিলম্ব না করে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ঔষধাদি এবং অন্যান্য সাহায্যদি পাঠাবার ব্যবস্থা করেন।[১২৬] এই সমিতির পক্ষ থেকে বাংলাদেশের বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতির সম্পর্কে যে আবেদনপত্র প্রচার করেছিল তার এক জায়গায় বাংলাদশের নবজাতক সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছিল।[১২৭] পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির উদ্যোগে শহীদ মিনার ময়দানে যে সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল সেখানে অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিসহ একটি প্রস্তাব ওই সভায় গৃহীত হয়। সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা মাধুরী দাসগুপ্ত এই প্রস্তাবটি

উত্থাপন করে রাজভবনে গিয়ে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল রাজ্যপালের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান, অস্ত্র সাহায্য প্রভৃতি দাবি সম্পর্কিত একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন জ্যোতি চক্রবর্তী, মাধুরী দাসগুপ্তা, কনক মুখোপাধ্যায়, পঙ্কজ আচার্য, বিমলা রনদিভে, বিভা ঘোষ প্রমুখ। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে এবং বাংলাদেশের স্বীকৃতিসহ বিভিন্ন দাবিতে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের একটি জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। এই জমায়েত ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, পেন্টার্স ফ্রন্ট, নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি, নন্দন সিনে টেশনিসিয়ান ওয়াকার্স এ্যাসোসিয়েশন, বি. এস. পি. ই. ইউ. কর্মী ও নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। জমায়েত শেষে রাজ্যপালের কাছে প্রদত্ত স্মারকলিপিতে ভারত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতির দাবি জানানো হয়।[১২৮]

একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গ উত্তাল ছিল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান ও গণহত্যার প্রতিবাদে সাধারণ জনগণের মিছিল সমাবেশে। ২ মে ১৯৭১ বিকালে কলেজ স্ট্রিটের মহাবোধি সোসাইটি হলে ভারত–বাংলাদেশে মৈত্রী সমিতি আয়োজন করে এক প্রতিবাদ সমাবেশের। সভায় সভাপতিত্ব করেন এন সি চ্যাটার্জি। কলিকাতার মেয়র শ্যাম সুন্দর গুপ্ত, অজিতকুমার দত্ত, এস এ মাসুদ, ডাঃ অমীয় মুখার্জী, দক্ষিণারঞ্জন বসু, ধীরেন ভৌমিক, দ্বিজেন্দ্র সেনগুপ্ত এম পি পরেশ সাহা, দিলীপ সিংহ সভায় বক্তৃতা করেন। বাংলাদেশের সমর্থনে বর্ধমানে আয়োজন করা হয় প্রতিবাদি জনসভার। ৩১ মে বর্ধমান টাউন হলে আয়োজিত এই প্রতিবাদ সভায় দেবরঞ্জন সেন সভাপতিত্ব করেন। বাংলাদেশ মুক্তিফৌজের সদস্য সমরকুমার মিত্র সাধারণ জনগণের উপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরোচিত আক্রমণের বিশদ বিবরণ দেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দান, সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য ভারত সরকারের প্রতি এবং রাজ্যের ছাত্র সম্প্রদায়ের প্রতি আবেদন জানান। ছাত্র ব্লকের রাজ্য কমিটির সভাপতি মহম্মদ সোলেমন এবং গণতান্ত্রিক ছাত্র ব্লকের নেতা মেহবুব সাহানা সভায় ভাষণ দেন। তাঁরা গ্রামে গ্রামে মুক্তি সহায়ক কমিটি গড়ে তোলার আহ্বান জানান।[১২৯]

১২ জুলাই কাথিঁর বীরেন্দ্রনাথ স্মৃতিসৌধ ভবনে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও সেখানকার সরকারের স্বীকৃতি দানের দাবিতে প্রতিবাদি জনসভার আয়োজন করা হয়। এতে পাকিস্তানের জঙ্গী সরকারকে আমেরিকার অস্ত্র দানের বিরুদ্ধে ধ্বনিত হয় প্রবল ধিক্কার। বাংলা কংগ্রেস নেতা ও বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম সহায়ক সমিতির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক হরিদাস মিত্র আবেগরুদ্ধ জোরালো ভাষণে এপার বাংলার কর্তব্যের নির্দেশ দেন। অমলেন্দু রায় মুক্তিযুদ্ধের কারণ সংক্ষেপে তুলে ধরেন। কবি গণেশ বসু বাংলাদেশের

মুক্তিসংগ্রাম অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক পটভূমি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন এবং জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট যাতে ব্যাপক ও কার্যকর হয় তার দাবি জানান। ওপার বাংলার প্রথম সারির জনৈক ছাত্রলীগ নেতাও এতে ভাষণ দেন। তাঁর বক্তৃতার সময় সমগ্র সভাগৃহ আবেগে, বিক্ষোভ, ঘৃণায় বারবার ফেটে পড়ে। সভায় সভাপতিত্ব করেন সুধীরচন্দ্র দাস।[১৩০]

স্বাধীন বাংলাদেশ সমিতির পক্ষ থেকে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাবে বলা হয় ভারত সরকার যেন কালবিলম্ব না করে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ঔষধাদি এবং অন্যান্য সকল রকম সাহায্য পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।[১৩১] কলকাতার জেলার গণতান্ত্রিক কনভেনশনে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য এবং অস্ত্রশস্ত্র সহ সমস্ত রকমের সাহায্য অবিলম্বে দেওয়ার জন্য দাবি করা হয়েছিল। আরও বলা হয়েছিল ভারত সরকার যাতে এই দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালন করে তার জন্য আমরা দাবি করছি।[১৩২] ১০ এপ্রিল কলকাতায় ছাত্র-যুবকদের বিক্ষোভ মিছিলের আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লনে এক বিরাট সমাবেশে গৃহীত প্রস্তাবে দাবি জানানো হয় বাংলাদেশের স্বাধীন সরকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে। সভায় সভাপতিত্ব করেন দীনেশ মজুমদার। প্রস্তাব পেশ করেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বক্তা ছিলেন বিমান বসু, সুভাষ চক্রবর্তী, শ্যামল চক্রবর্তী প্রমুখ। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানাভাব হওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে ট্রাম লাইনে এসে জমায়েত হয়।[১৩৩] ফারাক্কাতে ৭ এপ্রিল শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষকদের এক বিরাট মিছিলের পর স্থানীয় রিক্রিয়েশন হলে যে সভা হয় সেই সভার বক্তারা তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারত সরকারের কার্যত নীরবতামূলক নীতির তীব্র সমালোচনা করেন ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান ও প্রয়োজনীয় সাহয্যের দাবিতে ভারত সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি জন্য ব্যাপক গণআন্দোলনের কথা উল্লেখ করেন।[১৩৪]

অবিলম্বে বাংলাদেশের স্বাধীন গণপ্রজাতান্ত্রিক সরকারকে স্বীকৃতি দেবার দাবিতে ১৯ এপ্রিল বিকেলে এবিটিএ হলে শিল্পী, সাহিত্যিক, চলচ্চিত্র কর্মী ও কলাকুশলী এবং সাংবাদিকদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন মুহম্মদ আব্দুল্লাহ রসুল। উদ্বোধনী বক্তৃতায় বাংলাদেশ সংহতি ও সাহায্য কমিটির সদস্য অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্য বলেন, ইতিমধ্যেই ভারত সরকারের উচিত ছিল বাংলাদেশের গণ প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া। প্রথম অবস্থায় স্বীকৃতি দিলে এই সংগ্রামে জনগণের জয়ের পথে আরও সহায়তা হতো। এই সভা থেকে বিবৃতিতে অবিলম্বে বাংলাদেশের স্বাধীন গণপ্রজাতান্ত্রিক সরকারকে স্বীকৃতিদান, সীমান্তের বাধা নিষেধ তুলে দেওয়া এবং জনগণের হাতে উপযুক্ত অস্ত্র দেবার জন্য ভারত সরকারের কাছে দাবি করা হয়েছে। কনভেনশনে যে সমস্ত গণসংগঠন ও

প্রতিষ্ঠান উপস্থিত ছিলঃ ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, সিনে সেন্টাল, নর্থ-ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি, সিনে টেশনিসিয়ান অ্যান্ড ওয়াকার্স ইউনিয়ন, বেঙ্গল মোশান পিকচার্য এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, সিলোটি, পথিক, পাভলভ প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকার মধ্যে ছিলঃ গণশক্তি, দেশহিতৈষী, নন্দন, একসাথে, চতুষ্কোন, বসুমতী, যুগমন প্রভৃতি। শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, নাট্যকার, সঙ্গীতজ্ঞ, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আর যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন- শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, নেপাল মজুমদার, বিজন চৌধুরী, শ্যামল চক্রবর্তী, অমিয় সেনগুপ্ত, সুধী প্রধান, অনুনয় চট্টোপাধ্যায়, তপোবিজয় ঘোষ, জ্যোতি প্রকাশ, ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, রণজিৎ সিংহ, সৌরীন বসু, মদন প্রামণিক, অসীম বসু, শতদ্রু চাকী, গোপীনাথ দে, সরোজ দে এবং উপরোক্ত সংগঠনগুলির নেতৃস্থানীয় কর্মী এবং শিল্পীরা।[১৩৫]

'ভারত সরকারের এত দ্বিধা, এত ভয় কেন? – এই শিরোনামে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাতে এক জায়গায় বলা হয়েছিল–প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রামের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের পক্ষ থেকে আমরা আবেদন জানাইতেছি, অবিলম্বে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যে।[১৩৬] ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক দল, সমস্ত আইনসভা এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমস্বরে ওই দাবি উত্থাপন করিতেছেন। ২৪ এপ্রিল পার্কসার্কাস ময়দানে বাংলাদেশের শহীদদের স্মরণে আয়োজিত সভায় প্রমোদ দাশগুপ্ত ভারত সরকারের সমালোচনা করে বলেন কূটনৈতিক অজুহাত দিয়ে ইন্দিরা সরকার বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না।

বাংলাদেশের স্বীকৃতির সমর্থনে সমগ্র ভারত জুড়ে সভা সমাবেশ অব্যাহত ছিল। এ প্রসঙ্গে *গণশক্তি* পত্রিকায় লেখা হয়, বাংলাদেশে স্বাধিকার অর্জনের যে মৃত্যুঞ্জয়ী সংগ্রাম চলছে, তার স্বপক্ষে এপার বাংলায় রোজই সভা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গড়ে উঠছে সাহায্য সংহতি কমিটি।

কালবিলম্ব না করে বাংলাদেশের সরকারকে স্বীকৃতি দানের দাবিতে স্থানীয় কানাইলাল বিদ্যামন্দিরে এক গণতান্ত্রিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ২৫০ জন ছাত্রছাত্রী এই কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন। ওই একই প্রসঙ্গে হুগলি জেলার উত্তরপাড়ায় এক বিরাট ছাত্র-শিক্ষক মিছিল 'কোতরণ' আদর্শ বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে কোতরণ ভদ্রকালির বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। এই মিছিলের স্লোগান ছিল 'স্বীকৃতি দাও, অস্ত্র দাও, সীমান্তের বেড়া খুলে দাও'। মিছিলের শেষে মনন চৌধুরী ও শিক্ষক আন্দোলনের নেতা অজিত বাগ বক্তব্য রাখেন।[১৩৭]

বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতির দাবিতে মেদিনীপুর জেলার গোয়ালতোড়ে ছাত্র মিছিল বের করা হয়। বাংলাদেশের সরকারকে ভারত সরকারের স্বীকৃতি প্রদানের দাবিতে এরা স্মারকলিপি পেশ করের। এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন শঙ্কর চৌধুরী, শৈবাল পাত্র প্রমুখ। বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতির দাবিতে বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার শ্রীখণ্ডে এক জনসভা হয়। সভাপতিত্ব করেন অমলেন্দু রায়। এই সভায় সকলের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে স্বাধীন বাংলার স্বীকৃতি যৌথভাবে দাবি করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতির দাবিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফুড অ্যান্ড সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের একটি সভার আয়োজন করেছিল একাত্তরে। রায়গঞ্জে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতিসহ তিন দফা দাবির ভিত্তিতে ছাত্র-যুব মিছিল এবং ডেপুটেশনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল।[১৩৮] বাংলাদেশের সমর্থনে রাজারহাটে আঞ্চলিক গণতান্ত্রিক কনভেনশন হয়। এই কনভেনশনটি পরিচালনা করেন রবীন মণ্ডল। সি. আই.টি.ইউ ছাত্র ফেডারেশন, যুব ফেডারেশন, কৃষক সমিতি, গণনাট্য সংঘ, মহিলা সমিতি, এ.বি.পি.টি. ও এ.বি.টি.এ. প্রভৃতি গণ সংগঠনের পক্ষ থেকে বক্তারা বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেবার দাবিতে উত্থাপিত প্রস্তাব সমর্থন করে ভাষণ দেন। মূল বক্তা ছিলেন ২৪ পরগণা জেলার শান্তিময় ঘোষ। চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের ৪০ তম বার্ষিকী দিবস উপলক্ষে ১৮ এপ্রিল বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থার উদ্যোগে একটি সভা হয় কলকাতায়। এই সভা থেকে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি ও সাহায্য দেবার দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১৩৯]

৯ এপ্রিল ১৯৭১ বসিরহাটে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের দাবিতে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বাঞ্চল মফস্বল সংবাদদাতা ফেডারেশন, পশ্চিমবঙ্গ মফস্বল সাংবাদিক সমিতি ও ২৪ পরগনা জেলা সাংবাদিক সংঘের যৌথ আয়োজনের এই সভায় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[১৪০]

পূর্ববাংলার পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর গণহত্যার প্রতিবাদ ও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ভারতের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ কামনা করে একাত্তরের এপ্রিলে রাণাঘাট মহকুমার সকল স্কুল কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা এক প্রতিবাদী জনসভার আয়োজন করেন। কৃষ্ণনগরে আয়োজিত হয় তিনটি ভিন্ন প্রতিবাদ সমাবেশের। স্থানীয় শিল্পী ও সুধীজনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত প্রথম প্রতিবাদ সভায় কৃষ্ণনগর কলেজ মাঠে সহস্রাধিক লোক জমায়েত হয়। স্থানীয় স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা আয়োজন করে আরেকটি প্রতিবাদ সমাবেশের। সর্বশেষ প্রতিবাদ সমাবেশটি আয়োজিত হয় ৩ নভেম্বর সবগুলো রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহনে।[১৪১]

প্রতিবাদ মিছিলে মুখরিত হয়েছিল দক্ষিণ পশ্চিম দিনাজপুর। ঈপ্সিতা গুপ্তের নেতৃত্বে বিশাল প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে। যেখানে প্রায় পাঁচ হাজার লোক সমবেত হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেন। ইন্দিরা গান্ধীর কাছে আবেদন জানানো হয়, বাঙালিদের জাতিগত নির্মূলের আগে ভারত সরকার যেন সেখানে হস্তক্ষেপ করে।[১৪২] দার্জিলিং, নিউ জলপাইগুড়ি, বনগাঁ, ব্যারাকপুর, চুরুলিয়া, নদীয়া, মালদহে অনেকগুলো প্রতিবাদ সমাবেশের সংবাদ একাত্তরের সংবাদপত্রের পাতায় পাতায়। সবগুলো প্রতিবাদ সমাবেশের এক সুর। বাঙলাদেশের এই ক্রান্তিলগ্নে ভারত যাতে পাশে দাঁড়ায়, একটি নতুন রাষ্ট্র হিসেবে ভারত যাতে তাকে স্বীকৃতি প্রদান করে। রাজ্যের নানা প্রান্তের পাশাপাশি রাজধানী কলকাতায়ও হয়েছে অনেকগুলো সভা-সমাবেশ। বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম সহায়ক সমিতি, শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সহায়ক সমিতি, নারী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাইমারী শিক্ষক সম্মিলন, কলেজ শিক্ষক সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন, বিভিন্ন কর্মচারি সমিতি, পেশাজীবি সংগঠন একাত্তরে কলকাতায় নানা সময়ে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করেন। তবে সবগুলো সমাবেশের সুর ছিল অভিন্ন। মূল দাবি ছিল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের।[১৪৩]

এসব সভা-সমাবেশে ট্রেড ইউনিয়নভুক্ত কর্মচারী থেকে শুরু করে শিয়ালদহ রেলষ্টেশনের চা বিক্রেতা, সিনেমা হলের কর্মচারী থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কিংবা স্কুলের ছাত্র থেকে তারাশঙ্কর, তরুণ স্যানাল, বুদ্ধদেব বসুর মতো শিল্পী সাহিত্যিক সমবেত হয়েছিল।

৮ আগস্ট ১৯৭১ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট হলে এমনি এক প্রতিবাদ সভার উদ্বোধন করেন ড: রমেশচন্দ্র মজুমদার। তিনি বলেন, মুক্তিফৌজের সংগ্রাম পৃথিবীর কাছে এক বিস্ময়। কারণ সাড়ে সাত কোটি স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষ সর্বপ্রকার সামরিক অস্ত্রে সজ্জিত একদল নরখাদকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে যে জেহাদ ঘোষণা করেছেন, তার তুলনা খুবই বিরল। এদের সর্বতোভাবে সাহায্য করা প্রয়োজন।

সভায় গৃহীত হয় ছয় দফা প্রস্তাব। ভারত সরকার অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারকে সামরিক সাজসরঞ্জামসহ সকলপ্রকার সাহায্যদানের দাবি করা হয় এই প্রস্তাবে। শরণার্থী সমস্যাকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা হিসাবে ব্যক্ত করে তার মীমাংসার কথা বলা হয়। প্রতিবাদ সমাবেশে সামিল হয় বেঙ্গল বুডিডস্ট অ্যাসোসিয়েশন, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মুসলিম জনগণ। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মুসলিমদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ৩০ এপ্রিল মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে। *পয়গাম* এর সম্পাদক আব্দুল জলিলের সভাপতিত্বে এতে উপস্থিত ছিলেন মুসলিম কমিউনিটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। বক্তৃতা করেন এ কে এম

ইশাক, এম পি, প্রাক্তন এম পি সরকার আমজাদ আলি, গোলাম মহিউদ্দিন, এম এল এ, সাংবাদিক এ. আর. রুস্তম এবং আরও কয়েকজন সাংবাদিক, এ্যাডভোকেট, ডাক্তার, ছাত্র নেতা প্রমুখ।[১৪৪]

সমাবেশে সব ধরনের সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে মানবতার ডাকে সাড়া দিয়ে পূর্ববঙ্গের পাশে দাড়ানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়। সভায় কলকাতার নানা প্রান্তের সাধারণ মুসলিম নাগরিকরা উপস্থিত ছিল। নিখিল ভারত মৌলানা আজাদ সমাজ কল্যাণ মিশন কর্তৃক নভেম্বরে আরেকটি মুসলিম সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। বাংলাদেশকে স্বীকৃতির জন্য ভারতের মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা আহ্বান জানিয়েছিল। জামিয়া রুরাল ইসস্টিটিউট-এ একটি সভায় মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা ভারত সরকারের কাছে আবেদন করেছিল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার জন্য।[১৪৫]

পাকিস্তানি সেনাদের নৃশংসতার বিরুদ্ধে কলকাতার মুসলমান সমাজের প্রস্তাব সম্পর্কিত যে সংবাদ *স্টেটসম্যান* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাতে লেখা হয়েছিল– At a meeting a Muslim citizens in Culcutta on Friday are solution was adopted condemning the burtal attacks on the people of Bangladesh by the West Pkistan Army and urged the Government of India to recognise the Bangladesh Government. It was also stated that India shoud take up the question of genocide in Bangladesg at the U.N. Mr. Ghulam Mohiuddin. M.L.A. presided and among the speakers were Mr. A.K.M. Ishaque, M.P. and Mr. Amzad Ali. [১৪৬]

পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের বড় একটি অংশ একাত্তরে বাংলাদেশের সহায়তায় এগিয়ে এসেছিল। মুসলিম অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলায় মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় এর বাস্তব প্রমাণ প্রত্যক্ষ করেছি।

ভারত-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটির সেক্রেটারি ধীরেন ভৌমিক-এর তরফে যে প্রচারপত্র প্রকাশ করা হয়েছিল তাতে সংগঠনের দশ দফা দাবির মধ্যে প্রথম এবং পঞ্চম দাবিতে বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতির দাবিটি উত্থাপিত হয়েছিল। প্রথম দাবিতে লেখা হয়েছিল–

Immediate recognition of Bangladesh by all civilised countries. Countries believing in civilization freedom and democracy should come for a word.

এবং পঞ্চম দাবিতে লেখা হয়েছিল– Western countres, who are also champion of democracy should come forward to recognise Bangladesh and to stop

planned butehery of civilian population. U.S.A., U.K. Japan, Germany and France have got special resposibilities to stop genocide. [১৪৭]

বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বাংলাদেশ সরকারকে অবিলম্বে স্বীকার করার জন্য ভারত সরকারের কাছে দাবি করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সমন্বয় কমিটির ডাকে সারা ভারত বাংলাদেশ স্বীকৃতি দিবস উপলক্ষে শহীদ মিনার ময়দানে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, কালবিলম্ব না করে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি ও সাহায্য দেওয়া আজ ভারত সরকারের অপরিহার্য কর্তব্য। প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ভারতের বর্তমান জাতীয় জীবন বিপন্ন হবে এবং ভাবী জীবনও হবে চরমভাবে বিপন্ন ও বিড়ম্বিত। এই মতে একটি স্মারকলিপিও রাজ্যপালের কাছে পেশ করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে ভারতের আপত্তি থাকা উচিত নয়। সুনীল ধাড়া বলেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে ভারতই আগে পথপদর্শক হোক। অধ্যাপক হরিপদ ভারতী বলেন, এতদিনও ভারত সরকার বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্নে নীরব থেকে প্রকারান্তরে পাকিস্তানের জঙ্গিশাহীকে সমর্থন জানাচ্ছেন। তিনি অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের সক্রিয় সহযোগিতা দেবার দাবি জানান। অধ্যাপক সমর গুহ সভায় প্রস্তাবটি পাশ করেন।[১৪৮]

শহীদ মিনার ময়দানে ইসলামের ধর্মগুরু পয়গম্বরের জন্মদিবসে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার দাবি জানানো হয়, প্রস্তাবে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয় যে, বাংলাদেশকে শুধু স্বীকৃতি নয় অন্যান্য সাহায্যের সঙ্গে অস্ত্র সাহায্যও দিতে হবে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের বিচারমন্ত্রী অজিত কুমার পাঁজা, বক্তৃতা দেন সর্দার মহতাব সিং, মওলনা মহম্মদ নাসিম আলি আজাদ প্রমুখ। স্বীকৃতিতে অস্বীকৃতি কেন?– এই শিরোনামে *আনন্দবাজার* পত্রিকায় যে সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল তাতে ইন্দিরা গান্ধীর দ্বিধাদ্বন্দ্ব মনোভাবের সমালোচনা করা হয়। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল, ‘সেই পুরাতন স্বীকৃতির প্রশ্নটা মাঝে মাঝে চকিতে আশার রেখা দেখাইয়াই যেন মরীচিকার মতো মিলাইয়া যাইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ প্রবল, প্রায় সমস্ত বিরোধী দল বারে বারে এক বাক্যে বলিতেছেন, বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিন। এই দাবি নানা রাজনৈতিক দলের কণ্ঠে, এমনকী একাধিক রাজ্যের বিধানসভাতেও ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সর্বসম্মত প্রস্তাবটি নানাধিধ হইতে ঐতিহাসিক।’ [১৪৯]

পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার প্রতিবাদে হলদিবাড়িতে ইয়াহিয়া খানের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। বরাকনগর সাংস্কৃতিক সমন্বয় সমিতি পাকিস্তানের গণহত্যার নায়ক ইয়াহিয়ার কুশপুত্তলিকা দাহ করে একাত্তরে। রানাঘাটে ২ এপ্রিল সিপিএমের সহযোগিতায় স্থানীয় সাধারণ জনগণ ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর কুশপুত্তলিকা দাহ করে।[১৫০]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে **১১** মে দুর্গাপরে ট্রেড ইউনিয়ন কোঅর্ডিনেশান কমিটির আহ্বানে যে বিশাল জনসভা হয় সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জ্যোতি বসু বলেন, 'আমরা প্রথম থেকেই দাবি করেছিলাম, বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হোক। দুর্ভাগ্যবশতঃ আজও আমাদের সে দাবিই করতে হচ্ছে। তখন ইন্দিরা বলেছিলেন, কাদের স্বীকৃতি দেবো? কোনো সরকার নেই সেখানে। কিন্তু এখন তো সেখানে আনুষ্ঠানিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখনো তবে স্বীকৃতি দিতে এতো দ্বিধা কেন?' তিনি আরও বলেন যে, 'বাংলাদেশের সরকারকে যদি ভারত সরকার অবিলম্বে স্বীকৃতি না দেয় তাহলে আমাদের জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।'[১৫১]

বাংলাদেশের সমর্থনে বাঁকুড়া জেলার মানুষও এগিয়ে এসেছিলেন। বাংলাদেশ সংহতি ও সাহায্য কমিটি বাঁকুড়া জেলা শাখার ডাকে বাংলাদেশের সংগ্রামের সমর্থনে বাঁকুড়া হিন্দু স্কুল হলে একটি জেলা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশনে ভারত সরকারের কাছে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদান, অস্ত্রশস্ত্রসহ সমস্ত ধরনের সাহায্য এবং সীমান্তের দ্বার খুলে দেবার দাবি জানিয়ে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। রাজ্য সরকারি কর্মচারী কো-অর্ডিনেশন কমিটি, স্টেট ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে মেনস ইউনিয়ন, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি, নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, কৃষক সমিতি, মহিলা সমিতি, ছাত্র ও যুব ফেডারেশন ইত্যাদি বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষে প্রতিনিধিরা প্রস্তাবটি সমর্থন করেন।[১৫২]

বাংলাদেশের জাতীয় অভ্যুত্থান ভারতের জনমতকে যে কী প্রবলভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে তার জাতীয় প্রতিফলন ঘটেছে ভারতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত সর্বসম্মত ঐতিহাসিক প্রস্তাবে। সমগ্র ভারতীয় জনতা এই আশা করেছিল যে এই প্রস্তাবকে যথার্থভাবে কার্যকরী করা হবে বাংলাদেশের স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী সরকারকে আশু স্বীকৃত দিয়ে। কিন্তু ৭ মে বিরোধী পক্ষ ঐক্যবদ্ধভাবে এই মত প্রকাশ করেছেন যা সংসদে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে কার্যকর সাহায্য দেওয়ার জন্য অবিলম্বে এই দেশের স্বীকৃতিদান ভারত সরকারের পক্ষে এক অপরিহার্য জাতীয় কর্তব্য। সরকার পক্ষ মনে করেন যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষে এখনও যথাযোগ্য সময় আসেনি এবং এরূপ স্বীকৃতিদান বর্তমানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে সহায়কও হবে না। পক্ষান্তরে বিরোধী পক্ষ প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকে

প্রায় ঐক্যবদ্ধভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করেছে যে, বাংলাদেশের আশু স্বীকৃতিদান একান্ত আবশ্যক এবং এরূপ স্বীকৃতি দানের পন্থাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কার্যকর সহায়তা দিয়ে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এই সংগ্রামকে সম্পূর্ণ করা সম্ভব। শুধু বিরোধী পক্ষই নয়–বহু রাজ্যের বিধানসভা, ভারতের অগণিত গণপ্রতিষ্ঠান এবং শাসক কংগ্রেসেরও বহু প্রতিষ্ঠিত নেতা বাংলাদেশকে আশু স্বীকৃতিদানের দাবি জানিয়েছেন। এখনই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ার সরকারি নীতি শুধু অস্পষ্ট, অসঙ্গতিপূর্ণ এবং অযৌক্তিক। এবং গণতান্ত্রিক দিক দিয়েও সরকার ভারতের জনমত থেকে বিচ্ছিন্ন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারিদের যে সভা ২২ মে শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত হয় সেই সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছিল বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণ ইতিমধ্যেই স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকার স্থাপন করেছেন এবং পৃথিবীর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও জনগণের কাছে এই সরকার স্বীকৃতি ও অন্যান্য সম্ভাব্য সর্বপ্রকার কার্যকরী সাহায্য প্রদান করা আজকে জরুরী কর্তব্য।[১৫৩] সেই জন্য এই সভা ভারত সরকারের কাছে পুনর্বার দাবি জানাচ্ছে যে, বাংলাদেশের স্বাধীন আবেদনে সাড়া দিয়ে অবিলম্বে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান করা হোক। চব্বিশ পরগণা জেলার ক্ষেতমজুর সমিতি কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে যে প্রস্তাব দিয়েছিল তাতে লেখা হয়েছিল বর্তমান জমিবিরোধী কেন্দ্রীয় সরকার মৌখিক সহানুভূতি ছাড়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ কিছু করেনি। অস্ত্রদিসহ যে বাস্তব সাহায্য প্রয়োজন সেই ব্যাপারে আজও উদাসীন। ক্ষেতমজুর সমিতি প্রস্তাব করেছে যে, অবিলম্বে স্বীকৃতি ও প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতে হবে। কলকাতা কর্পোরেশনের পৌর অধিবেশনেও বাংলাদেশের স্বীকৃতি দাবিতে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ওই সংক্রান্ত যে খবর প্রকাশিত হয়েছিল তাতে লেখা হয়েছিল– 'কলকাতায় কর্পোরেশনের ২৬ মে-র বিশেষ সভায় বাংলাদেশের স্বীকৃতি দাবি করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান করা ছাড়া প্রস্তাবে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান সম্বন্ধে সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত ভারত সরকার তা কার্যে রূপায়িত না করায় এই সভা গভীর ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করছে এবং পৌরসভার ও বিধানসভার গৃহীত প্রস্তাব কার্যকরী করার দাবি করছে। এবং উক্ত প্রস্তাবকে কার্যকরী করার জন্য ভারত সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এই সভা পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে, বিশেষ করে কলকাতায় নাগরিকদের আহ্বান জানাচ্ছে... ইত্যাদি। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা দিয়ে হরপ্রসাদ চ্যাটার্জী বলেন, বাংলাদেশের স্বীকৃতি না দিয়ে ইন্দিরা সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। সি. পি. আই. এম.- ডাঃ নরেশ ব্যানার্জী, ডাঃ দেবীদাস ঘোষ দস্তিদার, এস. এস . পি.-র বিমান মিত্র, ফরওয়ার্ড ব্লকের

শ্যামল দত্ত, ডাঃ কে. পি. ঘোষ, কমলাপতি রায়, এস. ইউ. সি.-র রঞ্জিত ধর, জনসঙ্ঘের শ্যামসুন্দর গোয়েঙ্কা ও কংগ্রেসের এস. কে. খান্না, ডাঃ বীরেন বসু প্রমুখ রাজনৈতিক নেতারা এতে বক্তৃতা করেন।[১৫৪]

ইউনিয়ান ব্যাঙ্কের সামনে ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেসে চারটি ব্যাঙ্কের কর্মীরা যে সভা করেন সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জ্যোতি ভট্টাচার্য বলেছিলেন, ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্নে আজও নীরব। এই স্বীকৃতি আদায়ের প্রশ্নেও আমাদের লড়াই চালাতে হবে, এই দিনের সভার আয়োজন করেছিল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, ইন্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতি ও ইউনিয়নের তরফ থেকে। [১৫৫]

'স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন'– এই শিরোনামে *দৈনিক যুগান্তর* পত্রিকায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হয়েছিল, 'লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে বুকে ধরে অনন্তকাল বসে থাকতে পারে না ভারত। নিরাপত্তা এবং বাঁচার তাগিদেই কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে নিজস্ব পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার প্রাথমিক অঙ্গ, স্বাধীন বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতিদান। বাড়ানো দরকার তাঁদের সংগ্রামী শক্তি। ওদের জয় ত্বরান্বিত হলেই স্বদেশে ফিরবেন শরণার্থীরা। নইলে তাঁরা থাকবেন ভারতে। এ কথা সত্য কোন শান্তিবাদী রাষ্ট্র সহজে বল প্রয়োগ করতে যায় না। ইয়াহিয়া খান নয়াদিল্লির ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করছেন না। বাংলাদেশের সমস্যার সঙ্গে তিনি ভারতকে জড়িয়ে ফেলেছেন।'[১৫৬] চারিদিকে দেখা যাচ্ছে অশান্তির লক্ষণ। মুখ বুজে থাকলেই বিপদ এড়ানো যাবে না। বাস্তব অবস্থার মোকাবিলা করুন কর্তৃপক্ষ। অবিলম্বে স্বীকৃতি দিন স্বাধীন বাংলাদেশকে। প্রশস্ত করুন ইয়াহিয়ার চরম পরাজয়ের পথ। এতেই আসবে পূর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ শান্তি। শরণার্থীরা পাবেন স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের প্রেরণা।

'বাংলাদেশ স্বীকৃতির প্রশ্নে' এই শিরোনামে *গণশক্তি* পত্রিকাতে যে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল তাতে ভারত সরকারের স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে টালবাহানার সমালোচনা করা হয়েছিল।[১৫৭] সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হয়েছিল, 'ভারত সরকারের নিজস্ব পথটা কি? মনে হচ্ছে, সরকারের সামনে কোন পথ নেই। আর তাই সরকার পিছু হটছে। শরণার্থীদের বোঝা অবশ্য একটা দারুণ বোঝা। এতদিন সরকারি নেতারা বলে আসছিলেন, ছয়মাসের মধ্যেই তাঁরা দেশে ফিরে যাবেন। এখন আর সে কথা বলতে শোনা যায় না। কারণ, তাঁরা হয়ত বুঝেছেন সে সম্ভাবনা কম, কিছু কিছু আন্তর্জাতিক সাহায্য আসছে। এমনকী মার্কিন সরকারও যখন একহাতে পাক জঙ্গীবাহিনীকে অস্ত্র যোগাচ্ছে, অন্যহাতে তখন শরণার্থীদের জন্য কিছু চাল, গম দান খয়রাত করছে। তাই বোঝাটা ভারি হলেও, আর অব্যবস্থার দরুণ শরণার্থীদের দুর্ভোগ

চরমে পৌঁছলেও, অন্য দেশ জুড়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার যে দাবি উঠছে, সেখানেও প্রধানমন্ত্রী তাঁর দলদলকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে, এখনই তাড়াহুড়ো করে বাংলাাদেশকে স্বীকৃতি দিলেই পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য। তার মানে, স্বীকৃতি প্রশ্নটা শিকেয় তোলা রইল, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেই পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে কেন? কংগ্রেসি নেতাদের এই যুক্তিকেই বরং আমাদের অযৌক্তিক বলে মনে হয়। দক্ষিণ ভিয়েতনাম অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারকে বহু রাষ্ট্রই স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই বলে কি তাদের সাথে যুদ্ধ বেঁধে গেছে? ভারত সরকারের যদি তার সৈন্য বাংলাদেশে না পাঠায় তাহলে যুদ্ধের প্রশ্ন ওঠে কেন? আসলে, ভারত সরকার এই ভয় দেখিয়ে স্বীকৃতির প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চাইছে। প্রতিবেশী ভারতের স্বীকৃতি পেলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মনোবল বাড়বে।

বাংলাদেশে গণহত্যার প্রতিবাদ, স্বীকৃতি প্রদান ও সহায়তার দাবিতে একাত্তরে কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে একাত্তরে সংঘটিত হয়েছিল বেশ কয়েকটি ছাত্র ধর্মঘটের। এপ্রিলের শুরুতে পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয় ছাত্র সংগঠনগুলোর ডাকে রাজ্যব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। যেদিন রাজধানী কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্কুল কলেজ শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জন করে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে রাস্তায় নেমেছিল।[১৫৮]

এপ্রিলে বারাসাত, বর্ধমান, বালুরঘাট, বনগাঁয়ে ছাত্র ধর্মঘটের সংবাদ ছেপেছে সেই সময়কার সংবাদপত্র। ৩ আগস্ট স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতির দাবিতে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় ও স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়েছে। এই ছাত্র ধর্মঘটের উদ্যোগ দক্ষিণ-বাম সব কটি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠনের। এদিন রাজ্যের সর্বত্র ছাত্র ধর্মঘট হলেও পরীক্ষা যথারীতি হয়েছে। ধর্মঘটের আওতা থেকে পরীক্ষা বাদ দেওয়া হয়েছিল।

ছাত্র ধর্মঘটের পর ছয়টি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠন রাজ্য সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে একটি ছাত্র জমায়েত ডাকেন। সেখানে সভা হয়। সফিউল আলম সভাপতি ছিলেন। সভার পর ছাত্ররা মিছিল করে রাজভবনের সামনে যায়। ছাত্র প্রতিনিধিরা রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে একটি স্মারকলিপি দিয়ে চলে আসে।[১৫৯] স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি, স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে অবিলম্বে ভারত সরকারের স্বীকৃতি দিতে হবে। এবং কেবল স্বীকৃতিই নয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতার মুক্তিযোদ্ধাদের হাতকে শক্ত করবার জন্য মুক্তিফৌজকে অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে হবে।

রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের ছাত্র সভায় বক্তৃতা দেন, বাম ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সুভাষ চক্রবর্তী, পি-এস-ইউ'র ক্ষিতি গোস্বামী ডি-এস-ওর সঞ্জিত বিশ্বাস, ছাত্র ব্লকের ভোলা কুণ্ডু প্রমুখ। এই

সভাস্থল থেকে এসপ্ল্যানেড ইষ্ট পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতির দাবিতে ছাত্রদের বিক্ষোভ ধ্বনিতে সরগরম ছিল।

স্বীকৃতি দেবার পাশাপাশি পাকিস্তানকে মার্কিন অস্ত্র সাহায্যের প্রতিবাদেও একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র ধর্মঘট হয়েছে। ১ জুলাই ১৯৭১ রাজধানী কলকাতার রাজপথে হাজার হাজার সাধারণ ছাত্র নেমে এসেছিল আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে, ২ জুলাই পালন করা হয় ধর্মঘট। ধর্মঘট শেষে একটি স্মারকলিপি রাজ্য সরকারের মাধমে প্রেরণ করা হয়, মার্কিন দূতাবাসে। স্মারকলিপিতে বলা হয়– গণতন্ত্রের পিতা আব্রাহাম লিঙ্কনের দেশ আমেরিকা গণতন্ত্রের পূজারী বাংলাদেশকে সাহয্যের পরিবর্তে জঙ্গীশাহী ইয়াহিয়ার হাতকে জোরদার করছে। ট্যাঙ্ক-মর্টার-রাইফেলের গুলি দিয়ে। অবিলম্বে পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ করার দাবি জানাচ্ছি।[১৬০]

৫ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের চারটি জেলায় ছাত্র ধর্মঘট ডাকা হয় মার্কিন অস্ত্র সাহয্য বন্ধ করা ও ভারত সরকারের মুক্তিসংগ্রামে সরাসরি সম্পৃক্ত করার দাবিতে। এদিন ছাত্র ধর্মঘটে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ভারতের অংশ নেওয়ার দাবিতে কোচবিহারে হাজারখানেক সাধারণ ছাত্র, বিভিন্ন বামপন্থী ছাত্র সংগঠন রাস্তায় নেমেছিল। কোলকাতায় বাংলাদেশকে স্বীকৃতির দাবিতে ৩ আগস্ট ছাত্র ধর্মঘট ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল শেষে রাজ্যপালের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বাংলাদেশকে সর্বপ্রকার সাহায্য ও স্বীকৃতি দেবার দাবি করে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ৪টি রাজনৈতিক দল নিয়ে গঠিত আগস্ট বিপ্লব উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে হরিদাস মিত্র জানান এই বছরে ৯ আগস্ট দিনটার দাবি হবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের। ভারত সরকারের কাছে তারা দাবি জানাবেন অবিলম্বে স্বীকৃতি দানের সঙ্গে মুক্তি সংগ্রামীদের অর্থ সাহায্য সঙ্গে সর্বপ্রকারের সাহায্য দিতে হবে। নিখিল ভারত মেয়র পরিষদ সর্বসম্মতভাবে একটি প্রস্তাব নিয়ে ভারত সরকারকে বলেছিল, অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিন।[১৬১]

বাংলাদেশের সরকারকে স্বীকৃতি দানের দাবিতে বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজে ছাত্র, অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীদের সভায় এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[১৬২] এই একই দাবিতে ১ এপ্রিল সুরেন্দ্রনাথ সান্ধ্য কলেজ ছাত্র সংসদের আহ্বানে কলেজের অধ্যক্ষ সত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে ছাত্র শিক্ষক এবং কর্মচারীদের নিয়ে একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। তাঁদের সংগ্রামের সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণ করে স্বাধীন বাংলার অস্থায়ী সরকারকে ভারত সরকার কর্তৃক অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানানো হয়। নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কলকাতা শাখার সভ্য

থেকেও অবিলম্বে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য ভারত সরকারের নিকট বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কলকাতা শাখার সভা থেকে অবিলম্বে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য ভারত সরকারের নিকট দাবি জানানো হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ছাত্র-শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মীবৃন্দ, পাক ডেপুটি হাইকমিশনারের সামনে বিক্ষোভের পর যে স্মারকলিপি দেন তাতে তারা বাংলাদেশে ব্যাপক গণহত্যা বন্ধ ও স্বাধীন বাংলাকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি একই ধরনের কর্মসূচি নিয়েছিল।[১৬৩] বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামের সমর্থনে ও বাংলাদেশের স্বীকৃতিদানের দাবিতে ৪ এপ্রিল ধাত্রীগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, অন্যান্য কৃষক সমিতি, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি, নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, ছাত্র ফেডারেশ প্রভৃতি সংগঠনের পক্ষ থেকে যে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারত গৃহীত প্রস্তাবে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতিদানের দাবি জানানো হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুপারভাইজার স্টাফ ও অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্মসমিতির এক সভায় বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেবার আবেদন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে এক তারবার্তা পাঠানো হয়েছিল।[১৬৪]

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সংসদ ২৯ মার্চের সভা থেকে ভারত সরকারের নিকট দাবি জানিয়েছিল যে, অবিলম্বে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারকে স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিতে হবে। ওই একই দিনে পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষের বর্বর হামলার প্রতিবাদে সকাল ৮টায় উদয়ন ছাত্রাবাসের (৬১/১ ই নির্মলচন্দ্র স্ট্রীট) ছাত্র, কর্মচারীবৃন্দ মিছিল করে পাক দূতাবাসে গিয়ে প্রতিবাদপত্র অর্পণ করেন। এতে বলা হয়েছিল, বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে এবং সামরিক বাহিনীকে বাংলাদেশ থেকে সরিয়ে নিতে হবে। ভারত সরকারকে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি দিতে হবে। ওই একই দিনে কলকাতা পৌর শিক্ষক ও কর্মীসংঘ এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনগণর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের প্রতি সুদৃঢ় সংহতি জ্ঞাপন এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার দাবি জানিয়েছিল।[১৬৫]

তৃণমূলের চাপে একসময় রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি বিষয়টি বিবেচনার। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভায় 'বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন' এই মর্মে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। প্রস্তাব উত্থাপন করে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী বলেন, 'বাংলাদেশের জনগণের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য মরণপণ সংগ্রামের প্রতি ভারতের আশু ও জরুরি কর্তব্যের কথা বিবেচনা করিয়া এই বিধানসভা ভারত সরকারের নিকট দাবি জানাইতেছে যে, অনতিলম্বে বাংলাদেশের সার্বভৌম

গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও তাহার সরকারকে স্বীকৃতি এবং অস্ত্রশস্ত্র সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় কার্যকরী সাহায্য দিতে হইবে। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী যখন বুকে রক্ত দিয়েছিল, তখন পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ইহার কমে কিছুতেই রাজি হইতে পারে না।'[১৬৬]

পূর্বাঞ্চলের পাঁচটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের যে জরুরি বৈঠক ৮ মে মহাকরণে অনুষ্ঠিত হয় তাতে সর্বসম্মতভাবে স্থির হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের দাবি জানিয়ে গৃহীত সর্বসম্মত প্রস্তাবকে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে তুলে ধরা হবে।[১৬৭] বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্নে লোকসভায় এবং রাজ্যসভায় সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। আর এই জোরালো ভূমিকার পটভূমিটি রচনা করেছিল পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র-জনতা তথা সাধারণ জনগণ।

গ. আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টির প্রয়াস

একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সমর্থনে এক বড় ধরনের আন্তর্জাতিক জনমতের সৃষ্টি হয়েছিল। এই যুদ্ধ একসময় পূর্ব পাকিস্তানের রণাঙ্গন পেরিয়ে বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর গণহত্যা, নারী নির্যাতন, শরণার্থীদের দুর্বিষহ জীবন একসময় অভিঘাত হেনেছিল বিশ্বব্যাপী সাধারণ মানুষের হৃদয়ে। তাই বাংলাদেশের জন্য একাত্তর সালে হাঙ্গেরীর সেন্ট্রাল জেলের কয়েদিরা অনশন পালন করেছিল, জার্মানীর প্রত্যন্ত এক গ্রামে গ্রামবাসীরা জড়ো হয়েছিল বাংলাদেশের সমর্থনে, প্যারিসে এক যুবক ছিনতাই করেছিল পি আইয়ের বিমান। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ বিরোধী ভূমিকা পালনকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১২,০০০ স্কুলের শিক্ষার্থীরা পালন করেছিল অনশন।[১৬৮] তাদের টিফিনের টাকা তুলে দিয়েছিল শরণার্থীদের জন্য।

সারা বিশ্বের সিভিল সমাজ যে অকুণ্ঠভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন যুগিয়েছে তা অভূতপূর্ব। যুক্তরাজ্য বা যুক্তরাষ্ট্রের কথা স্মরণ করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ছিল বাংলাদেশের বিপক্ষে কিন্তু সারা আমেরিকার সাধারণ মানুষ ছিল বাংলাদেশের পক্ষে। ইন্দোনেশীয় সরকার ছিল পাকিস্তানের পক্ষে কিন্তু দেখা যাচ্ছে ছাত্র বা বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশের পক্ষে। আমেরিকা, চীন, সৌদি আরবসহ মুসলিম প্রধান দেশগুলি পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিল। তারা ভাবেনি, বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। যেহেতু তারা সুপার পাওয়ার সেহেতু বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়টিকে তারা এড়িয়ে যেতে চেয়েছে। কারণ, গণহত্যার দায় দায়িত্বতো তাদের ওপরও বর্তায়। সে কারণে, বিশ্বের সিভিল সমাজের যে অবদান তা কখনও তেমন ভাবে উঠে আসেনি। আমাদের দেশেও তা উপেক্ষিত। সারা বিশ্বের সিভিল সমাজ যেভাবে সমব্যথী ছিল

তা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। আমেরিকা বা ইংল্যান্ড বা অন্যান্য রাষ্ট্র ও সিভিল সমাজের পাকিস্তান বিরোধিতার জন্য পাকিস্তানকে সমর্থন করলেও যুদ্ধে নিজেদের জড়ায় নি। কোথায় ইকুয়েডর, সেখানেও একজন পত্রিকার বাংলাদেশের পক্ষে লিখছেন। বুয়েনেস আয়ার্সে বোহের্স, ওকাম্পো বাংলাদেশের সমর্থনে রাস্তায় নামল, জার্মানীর গ্রামে গ্রামবাসীর জমায়েত হয়েছেন বাঙালিদের জন্য, আনা টেইলর হোয়াইট হাউসের সামনে অনশন করছেন। ভিরমিয়েরের ছবি চুরি করছেন একজন, প্যারিসে এক যুবক ছিনতাই করছেন পিআইএয়ের বিমান, লন্ডনে একজন বাংলাদেশকে সহায়তা করার জন্য বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন, ভাবা যায়? [১৬৯]

বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম বিশ্বব্যাপী সত্যিকার অর্থে একটি জনযুদ্ধে রুপ নিয়েছিল। শরণার্থীদের সেবা, আশ্রয় প্রদান, চাঁদা সংগ্রহ, প্রতিবাদ সমাবেশ, সংহতি সমাবেশ, বনধ, সহায়ক সমিতি গঠন, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি নানাবিধ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছিল বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষ। অসীম মমতা দিয়ে সেই চরম দুর্দিনে স্নেহ-ভালবাসার এক অকৃত্রিম বন্ধন গড়ে তুলেছিল তৃণমূল জনতা। সেই পাপুয়া নিউগিনি থেকে ভ্যাটিকান সিটি প্রতিটি মানুষের কাছে, কী জাতি কী উপজাতি, কী ধর্ম কী বর্ণ ‘জয়বাংলা’ পরিণত হয়েছিলো এক ভালোবাসার নামে।

বিশ্বের সাধারণ মানুষের এই মানবিক সহায়তা মুক্তিযুদ্ধে আলাদা একটি শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। এর নিরন্তর ভূমিকা বাংলাদেশের সপক্ষে বৈশ্বিক জনমত সৃষ্টি করে। বিশ্বের বিবেকবান মানুষকে জাগ্রত করে। পাকিস্তানি বর্বরতাকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিয়ে আসে। অসহায় বিপন্ন প্রায় আশ্রয়, রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা পায় সাহস, বাংলাদেশ পায় একটি নতুন মানচিত্রের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

বাংলাদেশের পক্ষে এই আন্তর্জাতিক জনমতের ভিত্তিটা তৈরি করেছিল পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ জনগণ। মূলত তাদের কল্যাণে, প্রচারে এই বিপুল জনমত সৃষ্টি হয়েছিল। একাত্তরে বাংলাদেশ বিষয়ে আন্তর্জতিক দৃষ্টি আকর্ষণে পশ্চিমবঙ্গের লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতি কর্মী, কূটনৈতিবিদ, থেকে শুরু করে পাড়ার স্কুল পড়ুয়া ছাত্র নেমেছিল পথে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির পক্ষে ইউরোপে প্রচারের জন্য বংশীভাই মেহতা এবং সুশীলা মেহতা সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হয়। একই সঙ্গে শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য যাতে অব্যাহত থাকে, সেজন্য সমিতির পক্ষ থেকে সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়।

আগস্ট মাসে সমিতির পক্ষ থেকে প্রায় ২০০ বিদেশি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়, যারা বাংলাদেশের সমর্থনে কাজ করছিল।[১৭০] অক্টোবরে বর্হিভারতে প্রচারে বেশ গুরুত্ব দেয়া হয়। ডাক খরচ

বেড়ে যাওয়ায় সমিতির পক্ষে এসব কাজ করা কঠিন হলেও বিশ্বের সমমনা সংস্থাসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হয়। শিবনাথ ব্যানার্জীকে কাবুলে পাঠানো হয়। তিনি একসময় সেখানকার মক্তব-ই হাবিবিয়ার শিক্ষক ছিলেন। কাবুলে পৌঁছে ব্যানার্জী, খান আবদুল গফফারসহ অন্যান্য আফগান নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বাংলাদেশের সর্বশেষ অবস্থা, বিশেষত শরণার্থী শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরেন। পূর্ণেন্দ্র নারায়ণ রায় যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশ ভ্রমণ শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যান। তাঁর সূত্র ধরে ড. অলের নেতৃত্বে নরওয়ের একটি প্রতিনিধি দল কলকাতায় আসেন। তারা ভারতে স্বল্পমূল্যের উচ্চ প্রোটিনযুক্ত খাবার তৈরির একটি কারখানা স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রতিনিধি দল ভারত সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গেও দেখা করেন এবং তাঁদের ইচ্ছার কথা সরকারকে জানান। World Council of World Federalist Association-এর সভাপতি Prof. Knud Nielson এবং WSCF (Geneva)-র Mr. Lack Laksirch কলকাতা আসেন। তাঁরা সমিতির কার্যালয় এবং কয়েকটি শরণার্থী ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। তাঁরা বাংলাদেশি শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গেও তাঁদের সমস্যার ব্যাপারে আলাপ করেন এবং সমিতির কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন। Jack- কে সমিতির এক সেট প্রকাশনা উপহার দেয়া হয়। চারজন বিদেশি সাংবাদিক সমিতির কার্যালয় পরিদর্শন করেন এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে সমিতির সাহায্য কামনা করেন। তাঁরা হলেন SA Nilsson (Stockholm), AM Skipper (Denmark), VSB Balkert (Denmark) এবং MI Ojha (Sweden) ।

এসময় পার্বত্য চট্টগ্রামের এমএনএ ত্রিদির রায় ইয়াহিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে শ্রীলঙ্কা সফর করছিলেন। বাংলাদেশ বিরোধী তাঁর ঘৃণ্য ভূমিকার বিষয়টি সেখানকার শুভাকাঙ্ক্ষী নীমল পেরেরা গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেন। তিনি বাংলাদেশের কল্যাণ কামনা করে চতুর্দশ শতকের একটি বৌদ্ধ মন্ত্র বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে সমিতির নিকট প্রেরণ করেন এবং তা তাঁদের নিকট পৌঁছে দেয়া হয়।

৩০ নভেম্বর নিউজিল্যান্ডের ইয়ুথ ইন্টারন্যাশনাল কমিটির সম্পাদক ও সহসভাপতি যথাক্রমে অলভিন এফ আর্নল্ড এবং ট্রেভন জে ওয়াল্টন সমিতির কার্যালয় পরিদর্শন করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোর ফ্রেন্ডস অব দ্য বাংলাদেশ মুভমেন্টের এভেলিন চেইতকিন এ-সময় কলকাতায় আসেন এবং তাঁকে কয়েকটি ক্যাম্প স্কুল ঘুরে দেখানো হয়। তিনি এ প্রকল্প পরিচালনায় সমিতিকে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেন।[১৭১]

বাংলাদেশ স্বেচ্ছসেবক দলের চেয়ারম্যান আমীর উল ইসলাম (এমএনএ)এবং ব্রিটিশ এমপি ও war on want-এ মি. জন স্টোনহাউজ কলকাতায় আসেন। সমিতির পক্ষ থেকে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশকে সাহায্যের ভবিষ্যত পরিকল্পনার কথা জানানো হয়। জনসমিতির কর্মকান্ডে সন্তোষ প্রকাশ করেন। সমিতির বিশেষ দূত হিসেবে পিএন রায় ইউরোপ ও আমেরিকায় দীর্ঘ সফর শেষে ফিরে তার সফরের ফলাফল সমিতিকে অবহিত করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন একাত্তরের বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত শিক্ষকদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে একটি প্রকল্প নেন। শিক্ষকদের সহায়তায় সহায়ক সমিতি সিদ্ধান্ত নেন। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়, কালকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউরোপীয় ভাষা বিভাগের প্রধান ফাদার পি ফ্যালনকে ভ্যাটিকানের মাননীয় পোপের নিকট পাঠানো হবে। তাঁর আসা-যাওয়ার খরচ বহন করবেন কলকাতার লর্ড বিশপ। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি সেখানে যান এবং পোপের নিকট বাঙালিদের ওপর ইয়াহিয়ার নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী তুলে ধরেন। পোপের সঙ্গে তাঁর এ সাক্ষাৎকারের খবর অল ইণ্ডিয়া রেডিও এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়। World University Service ও Indian National Committee-র নির্বাহী সম্পাদক VN Thiagarajan সমিতির কার্যালয় পরিদর্শন করেন এবং এর প্রকাশনা ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচির প্রশংসা করেন। তিনি সমিতির ক্যাম্প-স্কুল সম্পর্কেও খোঁজ-খবর নেন এবং এ ব্যাপারে সাহয্যের আশ্বাস দেন।

এ-সময় একটি আন্তর্জাতিক ত্রাণ কমিটি সমিতির কার্যালয় পরিদর্শন করে। কমিটিতে ছিলেন Ambassador Angier Biddle Duke, Mr. Morton Hamburg (General Counsel, International Rescue Committee- IRC), Mrs. Lee Thaw (Director, IRC), Dr. Daniel L Wander (Professor of Surgery, Albert Einstin College of Medicine, NY) এবং Mr. Thomas W Phipps। তাঁরা সমিতির বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করেন। তবে ক্যাম্প-স্কুল কর্মসূচি তাঁদের সর্বাধিক আকর্ষণ করে। তাঁরা স্কুল পরিচালনার জন্য প্রতিমাসে ১০,০০০ ডলার দিয়ে যান। সমিতি এ অর্থ দিয়ে সাতটি ক্যাম্প-স্কুল চালু করে।

বিশ্বের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংগঠনও সহায়ক সমিতির এই ক্যাম্প-স্কুল কর্মসূচির প্রতি আন্তরিক সমর্থন জানায় এবং অর্থ প্রেরণ করে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো অস্টেলিয়ার ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কলম্বোর ইনস্টিটিউট অব সিলোনিজ স্টাডিজ এবং লন্ডনের 'Friends of Dacca University ও Bangladesh Students' Action Council । ইনস্টিটিউট অব সিলোনিজ স্টাডিজ-এর কর্ত্রী নীমল পেরেরা জানান যে, তিনি OUT TO THE PEOPLE নামে একটি কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন

এবং বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুদের এক সমাবেশে মাননীয় মহানায়েককে বক্তব্যদানে সম্মত করেছেন।[১৭২]

অধ্যাপক অতীন্দ্র মজুমদারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অস্টেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ তাঁদের সাহায্যের প্রথম কিস্তি হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতিকে ৬,২৬৫.৫২ রুপি প্রেরণ করেন। শুধু তা-ই নয়, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং ছাত্র সমিতির সহসভাপতি বাংলাদেশের ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। লণ্ডনস্থ Friends of Dacca University এর পরিচালক Prof. Esra Bennatham সহায়ক সমিতি প্রেরিত বাংলাদেশি শিক্ষকদের জীবনবৃত্তান্ত পেয়ে অত্যান্ত খুশি হন এবং তাঁদের পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দেন। এছাড়া বিভিন্ন বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরত উভয় বাংলার কয়েকজন অধ্যাপকও ব্যক্তিগতভাবে সমিতিকে সাহায্য করেন। তাঁরা হলেন এ এইচ সাদউদ্দীন (ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক প্রিয়তোষ মিত্র (ওটাগো বিশ্ববিদ্যালয়, নিউজিল্যান্ড), অধ্যাপক নরেশ নন্দ (লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়) প্রমুখ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি **১৯৭১**-এর এপ্রিল-ডিসেম্বর পর্যন্ত যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল তাতে মে মাসের রিপোর্টের এক জায়গায় লেখা হয়েছিল–

The first major publication of the Samiti Bangladesh- *The Truth* with a four word from our president, the Vice Chancellor of the Calcutta University, Prof. S.N. Sen, appeared on way 9, 1971, the birthday of poet Tagore. This pubication has been sent out to all the world universities, notable elites, Parlimentarians, newspapers. As far as we are aware this publication has evoked very wide interest amongst the world elites regarding the happennigs in Bangladesh. [১৭৩]

শরণার্থী বাংলাদেশের সমস্যা সম্পর্কে বিশ্বজনমত গঠনের বিষয়ে ভারতের রাজ্য বিধানসভাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়নি। বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে বিশ্বজনমত গড়ে তোলার স্বপক্ষে লোকসভা ও রাজ্যসভার সংসদরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

বাংলাদেশের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য ভারতের ৪৪ জন্য অধ্যাপক, লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা আবেদন সম্বলিত যে পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল তাতে লেখা হয়েছিল–

Even in this age when conscience of mankind has been muted by the collapse of moral values, there are still countless men and woman, throughout the world cherish values that have ennobled man. We urge them to hear the strangled cry of the people of East Bengal in the name of humanity, we appeal to them to join us in mobilising world opinion to compel the military rulers of West Pakistan to end this insensate carrige and respect the democratic right of the people.

এই আবেদন পত্রে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সৈয়দ নুরুল হাসান, আব্দুল আলেম, এস. মকবুল আহমেদ, ডঃ ডি. এস. কোঠারী, সুখময় চক্রবর্তী, সুনীতি কুমার চ্যাটার্জী, ডঃ এস. গোপাল, ডঃ রঞ্জনী কোঠারি, পার্থ সারথী, রাজকাপুর, ডঃ দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ এস. এন. বোস, ডঃ আন্দে বেইলি , অধ্যাপক তপন রায় চৌধুরী, অধ্যাপক নিহাররঞ্জন রায়, ডঃ তারা চাঁদ, ডঃ মূলকরাজ আনন্দ, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরা।[১৭৪]

ঈদ-ই-মিল্লাদুন্নবীর সমাবেশে বক্তৃতা দেওয়ার সময় সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ বলেছিলেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বিশ্বজনমত গড়ে তোলার উদ্দেশ্য তিনি বিদেশ সফরে যাবেন বলে স্থির করেছেন। তিনি আরও জানান কায়রো, রোম, মস্কো, বার্লিন, নিউইয়র্ক, জাপান এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে যাবেন। পিটিআই-কে উল্লেখ করে এই সংবাদ *দৈনিক আনন্দবাজার* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কলকাতায় সর্বধর্মের এক সম্মিলিত সভায় বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণের উপর বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলিকে আবেদন জানিয়ে বলেন এই নৃশংসতা বন্ধে আপনারাও তৎপর হোন। এই সভায় বক্তৃতা দেন গোলাম মহম্মদ কাদের, এস কাকর, অমর গাঙ্গুলি প্রমুখ। [১৭৫]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ইস্যুতে যেমন–শরণার্থী সমস্যা, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান প্রভৃতি বিষয়ে যাতে আন্তর্জাতিক বিশ্ব সদর্থক ভূমিকা নেয় তার জন্য পশ্চিবঙ্গের সাধারণ মানুষ নিজ নিজ অবস্থান থেকে উদ্যোগ নিয়েছিল। বিশেষ করে বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী সংগঠন, ছাত্র সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। বিশ্ব জনমত সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্তরে জয়প্রকাশ নারায়ণের সফর তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। পশ্চিমবঙ্গে স্থানীয়দের এসব প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, ধিক্কার আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে তুলে ধরেন। যেটি বাংলাদেশের পক্ষে বৈশ্বিক জনমত বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বড় প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে।

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ জনগণের অব্যাহত চাপের মুখে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার সরকারি তরফে বিশ্বজনমত গড়ে তোলার উদ্যেগ নেয়। মুক্তিযুদ্ধের সূচনায় পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল জনতা সোচ্চার হয়েছিল। তারা একদিকে চেষ্টা করছিলেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে আশ্রয় ও সহায়তায় সম্পৃক্ত করতে, অন্যদিকে গণহত্যা বন্ধে বৃহৎ শক্তিগুলোর হস্তক্ষেপ কামনা করছিল।

পশ্চিবঙ্গের তৃণমূলের সম্মিলিত প্রয়াসে আন্তর্জাতিক মহল যে সচেতন হচ্ছে সে বিষয়টি উঠে আসে ৪ এপ্রিলের *দৈনিক যুগান্তরের* সম্পাদকীয়তে, 'ঘুমন্ত বিশ্ব বিবেক আস্তে আস্তে জেগে উঠছে। বাংলাদেশের রক্ত নদীর ঢেউ সাগরের পাড়ের রাষ্ট্রগুলোকে দোলা দিচ্ছে।'[১৭৬] দুনিয়ার শান্তিবাদী মানুষ ও সংগ্রামী জনতাকে পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা বন্ধে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়ে এই দিন সন্ধ্যায় লেলিন চত্বরে মোমবাতি প্রজ্বলন করেন কলকাতার ছাত্র সমাজ। যেখানে জয় বাংলা ও তাদের নতুন সূর্যোদয়কে স্বাগত জানাতে, প্রেরণা দিতে সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহবান জানানো হয়।

বাংলাদেশ প্রশ্নে 'আফ্রো-এশিয়া নীরব কেন' এই শিরোনামে সম্পাদকীয় করে *যুগান্তর* নীরবতার নিন্দা জানান। *আনন্দবাজারে* ৭ এপ্রিল সম্পাদকীয় শিরোনাম করে, ' কোথায় থারমাপোলির পূণ্য কাহিনী কোথায় হলদিঘাটের ধন্য বাহিনী।' যেখানে বৃটেনের নীরবতায় সমালোচনা করে লিখা হয়েছে, গোটা বিশ্বকে সংসদীয় গণতন্ত্র উপহার দিয়াছে যে বৃটেন, তবে বুড়ো হইয়া সে বুঝি পক্ষকাল প্রায় বোবা ও বধির হইয়াছিল।[১৭৭]

'আফ্রো-এশীয় সংস্থার এই নীতিহীনতা' শিরোনামে *আনন্দবাজার* তাদের সম্পাদকীয় নীতিহীন রাষ্ট্রেগুলোর ক্রীড়ানকে পরিণত হওয়াকে ধিক্কার জানিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূলের নানাবিধ প্রচেষ্টায় বৃহৎ শক্তিগুলোর অবস্থানের কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি। *যুগান্তরের* ২৩ এপ্রিল লিখছেন, কুৎসিত ষড়যন্ত্র আঁটছেন স্বার্থন্বেষী মার্কিন মহল। তাদের মদত দিচ্ছেন বৃটেনের পাক-প্রেমিকরা। *কালান্তর* লিখছে চীনের পাকিস্তান বিষয়ে অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গির কথা। কিন্তু তৃণমূলের মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, চীনের সাধারণ জনগণ পাকিস্তানি বর্বরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল। সে বিষয়টি স্পষ্ট করেছে *সাপ্তাহিক সপ্তাহ*। 'যদি সংবাদপত্রকে মোটামুটি জনমতের বাহকরুপে ধরা যায় তবে, স্বীকার করতেই হবে যে, পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার যোদ্ধারা পৃথিবীর বিবেক স্পর্শ করিয়াছেন এবং সহানুভূতি উদ্রেক করিয়াছেন।' [১৭৮]

'আমরা প্রতিবাদ জানাই, আমরা তীব্র নিন্দা করি' এই শিরোনামে বাংলাদেশে গণহত্যার প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গে লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের তরফে যে বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল তাতে এই বিষয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও জনগণের কাছে বাংলাদেশ প্রশ্নে যে আবেদন করা হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল–

‘পৃথিবীতে আজ বহু দেশ আছে, বহু জাতি আছে, যারা নিজেদের সুসভ্য বলে দাবি করে। সে দাবি অনেকাংশে স্বীকার্য। তাদের বিবেক কি আজ সাড়া দেবে না? আমরা পশ্চিবঙ্গের সংস্কৃতি কর্মীরা। বিশেষ করে আবেদন জানাই পৃথিবীর সবদেশের শিল্পী স্রষ্টা ও জ্ঞান তপস্বীদের কাছে। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র এই বীভৎস বিরাট নরহত্যার সংবাদ তারা পেয়েছেন নিশ্চয়ই। তাঁদের সকলের তীব্র প্রতিবাদ ঘোষিত হোক, তাদের সরকারকে তারা উদ্বুদ্ধ করুন এই অর্থহীন নৃশংসতার নিন্দা করতে, প্রতিরোধ করতে, এ বিষয়ে তাদের যথোচিত কর্তব্য পালন করতে।’[১৭৯] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বাংলাদেশের সাহায্যে যে শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সংস্থা গড়ে উঠেছিল তাদের পক্ষ থেকে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল– ‘আমাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে ও নিজ নিজ সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে আমরা এক ভাবগত আন্দোলন গড়ে তুলতে চাই। আমরা চাই শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, শুধু ভারতবর্ষ নয়, গোটা পৃথিবীর গণতান্ত্রিক চেতনা ও মানবিক শুভবুদ্ধি বাংলাদেশের নবজাত সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়ার এবং সর্ববিধ সাহায্য নিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম শুরু করুক।’[১৮০] বাংলাদেশের সমর্থন ভারতের All India Civil Liberaties কাউন্সিলের পক্ষ থেকে এন চ্যাটার্জী একটি বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন–

What was happing in East Bengal was the concern of the international community and could not be treated as strictly as internal affair of Pakistan. তিনি আরও বলেন, The world is not bankrupt of decency and morality.[১৮১]

‘বাংলাদেশের সমর্থনে রাষ্ট্রসংঘ ও বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধি দল প্রেরণের সিদ্ধান্ত’– এই শিরোনামে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তাতে ভারতের গান্ধীবাদী সংস্থাগুলি বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন আদায়ের জন্য রাষ্ট্রসংঘ ও বিভিন্ন দেশের রাজধানী সমূহের একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। গান্ধী শান্তি ফাউন্ডেশনের সম্পাদক রাধাকৃষ্ণ একটি বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন। আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তোলার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বানের কথা ঘোষণা করা হয়। সানফ্রান্সিস্কো-মস্কো অভিযান অথবা দিল্লি-পিকিং অভিযানের মত একটি আন্তর্জাতিক শান্তি অভিযান শুরু করারও একটি প্রস্তাব করা হয়েছে। ভারতীয় শান্তি সংস্থাগুলি এই প্রস্তাবটির উদ্যোক্তা। যুদ্ধ-প্রতিরোধকারী লীগ, আমেরিকান ফ্রেন্ডস সার্ভিস কমিটি এবং আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তি কনফেডারেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল বাংলাদেশের গণহত্যা বন্ধে।[১৮২]

বাংলাদেশ প্রশ্নে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ চেয়ে একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, স্কুল-কলেজ বিবৃতি দিয়েছেন, পাঠানো হয়েছে তার বার্তা। নদীয়ায় শরণার্থীদের দুরাবস্থার চিত্র তুলে ধরে মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে তার বার্তা প্রেরণ করেছিল কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্ররা।[১৮৩] একাত্তরে কত শতবার বাংলাদেশকে সহায়তায় আন্তর্জাতিক সমর্থন চেয়ে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র সমাজ রাস্তায় নেমেছিল। পশ্চিমবঙ্গে সংবাদ সংগ্রহে আসা বিদেশি সাংবাদিকদের বদলৌতে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ জনগণের এসব বিক্ষিপ্ত, ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ছড়িয়ে পড়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে। জন্ম নেয় শরণার্থীদের পক্ষে, বাংলাদেশের পক্ষে এক অভূতপূর্ব আন্তর্জাতিক জনমতের।

ঘ. বঙ্গবন্ধুর মুক্তি

একাত্তরে পশ্চিমবাংলার তৃণমূল মানুষের কাছে জয় বাংলা আর মুজিব ছিল একটি সমার্থক শব্দ। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে থেকেই অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলোতে মুজিবের দৈনন্দিন কর্মকান্ড, পাকিস্তানের সাথে আলোচনা নিয়মিত ছাপাতে শুরু করে স্থানীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো। স্থানীয় গণমাধ্যমের কল্যাণে শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদ কিংবা তৃণমূলের খুব সাধারণ কোন নাগরিক নিয়মিত খোঁজ খবর রাখছিলেন শেখ মুজিব ও তাঁর কর্মকান্ডের ওপর। বিশেষ করে সত্তরের নির্বাচনে মুজিবের বিজয় পশ্চিমবাংলার সাধারণ লোকজনকে ভীষণভাবে আলোড়িত করেছিল। নির্বাচন পরবর্তী সরকার গঠন দুই পাকিস্তানের মধ্যে যে অচলাবস্থা সেটার নিয়মিত সংবাদ প্রথম পাতায় বড় করে ছাপাতে শুরু করে জনপ্রিয় *দৈনিক যুগান্তর, আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, কালান্তর* কিংবা *সাপ্তাহিক সপ্তাহ।* মার্চের ১ তারিখ থেকে প্রতিদিন প্রথম পাতায় বড় করে পূর্ববঙ্গে চলমান অচলাবস্থার সংবাদ পরিবেশন করেছেন।[১৮৪] ৭ মার্চ রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধুর সেই কালজয়ী ঘোষণা, 'এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম' পূর্ববঙ্গের পাশাপাশি পশ্চিম বাংলায় ও বড় অভিঘাতের সৃষ্টি করেছিল। ৭ মার্চে রেসকোর্সে ভাষণের সংবাদ পশ্চিমবঙ্গের সবগুলো গণমাধ্যমের মূল শিরোনাম হয়।[১৮৫] *যুগান্তর* ৮ মার্চ রেসকোর্সে মুজিবের ভাষণের বিশদ প্রকাশ করে। পাশাপাশি ১ম পৃষ্ঠায় একটি সংবাদে চোখ আটকে যায়। 'পূর্বে সূর্যোদয় হচ্ছে।' [১৮৬] পুলকেশ দে সরকারের লেখা সে সংবাদে স্পষ্ট হয়েছে, 'মুজিবের নেতৃত্বে ওখানে কিছু হতে চলছে।' তিনি লিখেছেন, 'রক্তের মধ্যেই নবজাতকের আবির্ভাব ঘটে। আবির্ভাব ঘটেছে পূর্ব বাংলায় এক নতুন বলিষ্ঠ বাঙালী জাতির।' [১৮৭]

গণমাধ্যমের বরাতে মুক্তিসংগ্রাম শুরু হওয়ার আগেই মুজিব ও জয় বাংলা পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ লোকজনের মনে ভিন্ন এক রোমান্সের জন্ম দেয়। ১০ মার্চ কলকাতায় মুজিবের ৭ মার্চ এর ভাষণ বাজানো হয়।[১৮৮]

২৫ মার্চের রাতে ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতা, গণহত্যা কিংবা মুজিবের গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদ ২৬ মার্চের পত্রিকায় স্বভাবতই উঠে আসেনি। সকালের দিকে পত্রিকাগুলো বিশেষ সংখ্যা ছাপিয়ে পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা ও নতুন সূর্যোদয়ের সংবাদ ছাপায়। *দৈনিক যুগান্তর* ২৬ মার্চ এক পৃষ্ঠার বিশেষ সংখ্যা ছাপায়। শিরোনাম করে, 'বাঙলাদেশ এখন যুদ্ধে লিপ্তঃ বিশ্বের প্রতি মুজিবর রহমান,'[১৮৯] *আনন্দবাজার* বিশেষ সংখ্যায় সংবাদ করে, 'ঢাকা জ্বলছে'।[১৯০]

তবে মুজিবের গ্রেপ্তারের সংবাদ এড়িয়ে যান প্রায় সব গণমাধ্যম। পশ্চিমবঙ্গের গণমাধ্যমে মুজিবের আত্মগোপন নিয়ে নানা রকম জল্পনার সৃষ্টি হয়। *আনন্দবাজার* লিখছেন, মুজিব কৃষ্ণনগরে এসেছেন, *যুগান্তর* লিখছেন, মুজিবের লোকরাই তাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। শুরুতে মুজিবকে নিয়ে জল্পনা থাকলেও শরণার্থীদের আগমনের পর গণমাধ্যম অস্বীকার করলেও সাধারণ লোকজন বুঝতে পারে, পাকিস্তানিরা মুজিবকে বন্দি করে নিয়ে গেছে।[১৯১] আস্তে আস্তে মুজিবের মুক্তির দাবিতে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ লোকজন উচ্চকিত হয়। ২৮ এপ্রিল ১৯৭১ বাংলাদেশ-সহায়ক শিল্পী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী সমিতির সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি গোপাল হালদার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, মনোজ বসু, সরষূবালা দেবী, সুচিত্রা মিত্র, সুশোভন সরকার ও সম্পাদক দীপেন্দনাথ চন্দোপাধ্যায় মুজিবের মুক্তি চেয়ে ইন্দিরা গান্ধীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন।[১৯২]

২৫ সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি মুজিবের মুক্তির দাবিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেন। সমিতির পক্ষ থেকে জাতিসংঘ মহাসচিবের হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়।[১৯৩] পাশাপাশি একাত্তরের নানা সময়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় শতাধিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠক, বাংলাদেশের সহায়তায় গড়ে ওঠা প্রায় সব সহায়ক কমিটি মুজিবের মুক্তি চেয়ে স্মারকলিপি দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর হস্তক্ষেপ কামনা করেছে। রাজধানী কলকাতা থেকে শুরু করে কৃষ্ণনগর, বালুরঘাট, জলপাইগুড়ি, বনগাঁ, মুর্শিদাবাদ, রাণাঘাটে পালিত হয়েছে হরতাল। মুজিবের মুক্তির দাবিতে সাইকেল র‍্যালি করেছে এক্সপ্লোরাস ক্লাব, কলকাতা।[১৯৪]

জয় বাংলার প্রাণের নায়ক মুজিবের মুক্তি চেয়ে ১৬ জুলাই ১৯৭১ জুমার নামাজের পর বিশেষ মুনাজাতের আয়োজন করেছিল মুর্শিদাবাদের কাঁহারপাড়া জামে মসজিদের ইমাম। মোনাজাতে শরীক হয়েছিল স্থানীয় সকল মুসল্লী। [১৯৫]

মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বাঁকুড়া, হাওড়া, কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত সীমান্ত এলাকায় গিয়েছি। একাত্তরের শরণার্থী শিবিরগুলো যেখানে গড়ে উঠেছিল চেষ্টা করেছি সেসবগুলো দেখার। চেষ্টা করেছি একাত্তরের সাথে সম্পর্কিত সাধারণের সাথে কথা বলার। বিচ্ছিন্নভাবে কথা বলেছি দিনমজুর, চায়ের দোকানদার থেকে শুরু করে স্কুল শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, গৃহবধূ থেকে সংস্কৃতিকর্মী। একাত্তরে শেখ মুজিব তাদের অন্তরে কি পরিমাণ অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল, চেষ্টা করেছিলাম তা জানতে। মুর্শিদাবাদের জলাঙ্গীর আবদুর রউফ বলছিল, আমরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় মুজিবের মুক্তি চেয়ে মিছিল করেছি, ভুট্টোর কুশপুত্তলিকা দাহ করেছি।[১৯৬] নদীয়ার দিলীপ দাস বলছিলেন, আমরা মুজিবের একটি বিশাল প্রতিকৃতি তৈরি করেছিলাম, স্থানীয় অনেকে একাত্তরে এটাকে পূজো পর্যন্ত দিয়েছে।[১৯৭]

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের কয়েকজন শিক্ষার্থী নিয়ে ২০১৬ সালের আগস্টে গিয়েছিলাম বনগাঁ সীমান্তে। সীমান্ত পাড়ের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুরো দল নিয়ে আমরা জানতে চেয়েছিলাম, একাত্তরের সেসব দিনের স্মৃতি। সীমান্ত পাড়ের গৃহস্থ বধূ কল্পনা বালা বলছিলেন একাত্তরের কথা।[১৯৮] সীমান্ত দিয়ে যারাই আসত আমরা উৎকণ্ঠার সাথে জানতে চাইতাম মুজিবরের খবর কি। যুদ্ধের মাঝামাঝি ছড়িয়ে পড়ে, পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীরা মুজিবকে মেরে ফেলতে পারে। মুজিবের কল্যাণ চেয়ে সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনার আয়োজন করা হয় রক্ষা কালী বাড়িতে।

বনগাঁ থেকে নদীয়া মুজিবের মুক্তি চেয়ে প্রার্থনা, উপবাস, রোজা কিংবা বিশেষ মোনাজাত পশ্চিম বাংলার সাধারণ লোকজন অন্যরকম এক ইতিহাস রচনা করেছিল একাত্তরে। পশ্চিম দিনাজপুরের এক পুরোহিত বলছিলেন, একাত্তরে মুজিব ঠাঁই নিয়েছিল ঠাকুর ঘরে।[১৯৯]

ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী সংস্থার উদ্যোগে ৮ আগস্ট রাজ্যব্যাপী পালন করা হয় মুজিবর রহমান মুক্তি দিবস। মুজিবের মুক্তি চেয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একাত্তরে মিছিল, প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে।[২০০] পরাশক্তিগুলোর হস্তক্ষেপ কামনা করে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে স্মারকলিপি

দিয়েছে। ১৩ আগস্ট কলকাতায় মার্কিন ও সোভিয়েট দূতাবাসের সামনে মুজিবের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ করেছে কলকাতার সাধারণ নাগরিক, শিল্প-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা।[২০১]

মুজিবের প্রহসনমূলক বিচার বন্ধের দাবিতে মুক্তি চেয়ে লেখা হয়েছে সম্পাদকীয়, উপ- সম্পাদকীয়। ছাপা হয়েছিল লিফলেট। রঘুবীর চক্রবর্তী একাত্তরে 'মুজিবের মুক্তি চাই' শিরোনামে লিখেছিলেন, 'মুজিবকে মুক্ত করতেই হবে কারণ তাঁর জীবনের সাথে আজ এশিয়ার গণতন্ত্র ও স্বাধিকারের ভবিষ্যৎ ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে গেছে।'[২০২]

মুজিবের মুক্তির দাবিতে সক্রিয় ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতি। তারা নানা আন্তর্জাতিক ফোরামে মুজিবের মুক্তি চেয়ে, তার বিরুদ্ধে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার প্রহসনমূলক বিচার বন্ধের দাবি তোলেন।[২০৩]

সহায়ক সমিতির উদ্যোগে মুজিবের মুক্তির দাবিতে আন্তর্জাতিক জনমত বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রতিনিধিকে নানা ফোরামে পাঠানো হয়। প্রখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী কণিকা বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি দল প্রেরণ করা হয় শ্রীলঙ্কায়। ফাদার পি ফ্যালন ও জাস্টিস একে দাসকে প্রেরণ করা হয় ইউরোপে। মুজিবের বিরুদ্ধে সামরিক জান্তার অন্যায় বিচার বন্ধ ও মুজিবের মুক্তি চেয়ে এরা আন্তর্জাতিক জনমত বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। [২০৪]

৮ আগস্ট ১৯৭১ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট হলে এক প্রতিবাদ সভার উদ্বোধন করেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। সভায় গৃহীত হয় ছয় দফা প্রস্তাব। যেখানে বিনাশর্তে শেখ মুজিবরের মুক্তির জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের আশু হস্তক্ষেপের এবং ভারত সরকার অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারকে সামরিক সাজসরঞ্জামসহ সকলপ্রকার সাহায্যদানের দাবি জানানো হয়। 'তোমাদের নেতা মুজিবুর আমাদেরও নেতা। বাঙালি জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার সংকল্পের তিনি প্রতীক। তাঁর নামের অমৃতমন্ত্র এপার বাঙলার বাঙালিদেরও ঐক্যবদ্ধ করুক নিষ্ফল আত্মদ্বন্দ্বের অবসান ঘটাক। বাঙালি আবার জগতসভায় যোগ্য আসন লাভ করুক। তোমাদের সংগ্রাম, তোমাদের আত্মদান আমাদেরও মহান করুক। জয় বাঙলা।' [২০৫]

ঙ. মনোবল বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ

একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গে ভিন্ন এক জীবনের সূচনা হয়। রেলস্টেশন, সীমান্ত পাড় কিংবা রাস্তার ধার উদ্বাস্তু মানুষে পরিপূর্ণ। প্রায় ৭০ লক্ষ উদ্বাস্তুর আশ্রয়, অন্নসংস্থান করার পর পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ জনগণ চেষ্টা

করেছেন তাদের মনোবলে যাতে চিড় না ধরে সে ব্যবস্থা করতে। চেষ্টা করেছেন জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত লক্ষ উদ্বাস্তুর মনোবল অটুট রাখার। চিত্ত ঘোষ তাই একাত্তরে লিখেছিলেন-

‘একই আত্মায় জ্বলেছে আগুন
গোনে একই নির্দেশ।
জয় বাঙলার দুর্বার গতি
ভবিষ্যতেই টানে
এপার বাঙলা ওপার বাঙলা
মিলুক আত্মদানে।’ [২০৬]

শরণার্থীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও তাদের হারানো মনোবল ফিরিয়ে আনতে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল জনতা একাত্তরে নিয়েছিল বেশকিছু উদ্যেগ। ১৯৭১ সালের ২৪ জুলাই নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল মুখোমুখি হয় নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার। নদীয়ার স্থানীয় দর্শকদের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক শরণার্থী এই ম্যাচটি উপভোগ করতে আসেন। নদীয়ার জেলাশাসক দীপক কান্তি ঘোষের আপত্তির মুখেই এই দিন স্বাধীন বাংলাদেশ ফুটবল দল জাতীয় পতাকা নিয়ে মাঠ প্রদক্ষিণ করেন, খেলার আগে বাজানো হয় জাতীয় সংগীত।[২০৭] ম্যাচটি ২-২ গোলে ড্র হয়। সামান্য এই ম্যাচটি নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে শোরগোল লেগে যায়। একদিকে স্থানীয় সাধারণ লোকজনের অভূতপূর্ব সমর্থন, অন্যদিকে নদীয়ার জেলাশাসক দীপক কান্তি ঘোষকে সাসপেন্ড করা হয়। নদীয়া ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে অফিসিয়াল একটি দল নামানোয় ভারতীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগি পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়।

একাত্তরে কলকাতার সাধারণ মানুষদের সহায়তায় শামসুল হকের পরিকল্পনায় সিদ্ধান্ত হয় বাংলাদেশ ক্রীড়া সমিতি গঠনের। তাদের তৎপরতায় পশ্চিমবঙ্গে গঠন করা হয় স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল। ৩৪ জন খেলোয়াড়, সাথে ম্যানেজার এবং কোচসহ সর্বমোট ৩৬ জন নিয়ে গড়া ফুটবল দলের অধিনায়ক ছিলেন জাকারিয়া পিন্টু। সহঃ অধিনায়ক ছিলেন প্রতাপ শঙ্কর হাজরা। ব্যবস্থাপক ছিলেন তানভীর মাজহারুল ইসলাম তান্না (পরবর্তীতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের কর্মকর্তা) এবং প্রশিক্ষক ছিলেন ননী বসাক।[২০৮]

পুরো দলের চিত্রটি নিম্নরূপঃ

স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল : জাকারিয়া পিন্টু (অধিনায়ক), প্রতাপ শঙ্কর হাজরা (সহ-অধিনায়ক), আলী ইমাম, মোহাম্মদ কায়কোবাদ, অমলেশ সেন, আইনুল হক, শেখ আশরাফ আলী, বিমল কর, শাহজাহান আলম, মনসুর আলী লালু, কাজী সালাউদ্দিন, এনায়াতুর রহমান, কেএন নওশেরুজ্জামান, সুভাষ সাহা,

ফজলে হোসাইন খোকন, আবুল হাকিম, তসলিম উদ্দিন শেখ, আমিনুল ইসলাম, আবদুল মমিন জোয়ারদার, মনিরুজ্জামান পেয়ারা, মো. আবদুস সাত্তার, প্রাণগোবিন্দ কুণ্ডু, মুজিবর রহমান, মেজর জেনারেল (অব.) খন্দকার নুরুন্নবী, লুৎফর রহমান, অনিরুদ্ধ চ্যাটার্জি, সনজিত কুমার দে, মাহমুদুর রশিদ, সাইদুর রহমান প্যাটেল, দেওয়ান মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন, মো. মোজাম্মেল হক, বীরেন দাস বীরু, আবদুল খালেক ও নিহার কান্তি দাস প্রমুখ। ম্যানেজার : তানভীর মাজহার তান্না, কোচ : ননী বসাক।

পার্ক সার্কাস রোডের কোকাকোলা বিল্ডিংয়ের একটি রুমে থাকতেন ফুটবলাররা। আর প্র্যাকটিস করতনে পাশের মাঠেই। ৮ আগস্ট কলকাতার অন্যতম ফুটবল পরাশক্তি মোহনবাগানের মুখোমুখি হয় দলটি। নদীয়া থেকে শিক্ষা নিয়ে মোহনবাগানের নাম পরিবর্তন করে গোস্টপাল একাদশ করা হয়। এই ম্যাচটি কলকাতায় অবস্থানরত শরণার্থীদের উদ্দীপনা বোঝাতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পাশাপাশি ম্যাচগুলোর মধ্যদিয়ে শরণার্থীদের জন্য বিপুল সংখ্যক অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে।

স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল ছাড়াও স্থানীয় শরণার্থীদের সাথে বেশ কয়েকটি প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলি ক্লাব ও সামাজিক-ক্রীড়া সংগঠন। জুলাই মাসে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে এবং আগস্টে জলাঙ্গীতে একটি ফুটবল ম্যাচের সংবাদ পাওয়া যায়। স্বাধীন বাংলাদেশ ফুটবল দলের ম্যাচের পরে নদীয়ার স্থানীয় শরণার্থীরা মুখোমুখি হয়, নদীয়ার নবারুন যুব সংঘের সাথে। পশ্চিম দিনাজপুর, বালুরঘাট, বনগাঁ, হাওড়া, জলপাইগুড়িতে অনেকগুলো স্থানীয় পর্যায়ের ফুটবল ম্যাচের সংবাদ মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় সাধারণের স্মৃতিতে উঠে আসে। মুর্শিদাবাদের জলাঙ্গীর নিত্যানন্দ বন্দোপাধ্যায় বলছিলেন, ‘আগস্ট ১৯৭১, মুর্শিদাবাদ ডুবে গেছে অথৈই পানিতে, শরণার্থীদের ভয়াবহ অবস্থা, একদিকে কলেরা, অন্যদিকে বন্যার পানি। সাথে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার, স্বজন হারানোর দুর্বিষহ স্মৃতি। সে সময়ে আমরা ঠিক করলাম কিছু একটা করতে হবে, এদের স্বাভাবিক করতে হবে। আমরা বেশ কিছু উদ্যেগ নিয়েছিলাম, ফুটবল ম্যাচের আয়োজন তার একটি।’[২০৯]

জীবনের ভয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের যেসব শিক্ষক ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতি। তাঁদের জীবনবৃত্তান্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়, যাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারেন। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের কিছু আর্থিক সাহায্য প্রদানেরও ব্যবস্থা করা হয়। এজন্য একটি রেজিস্টার খোলা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. অনিরুদ্ধ রায় এ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর সহযোগী

ছিলেন বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক অনিল সরকার এবং পীযূষ দাস, অংশুমান মল্লিক ও অনিল বসু। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট বাংলাদেশি শিক্ষক-পন্ডিতদের ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে নিয়োগের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে এই প্রকল্প সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। রাজ্য সরকারগুলোর অনুমতি নিয়ে স্কুল পর্যায়েও এ প্রকল্প বিস্তৃত করার সিদ্ধান্ত হয়।[২১০]

মে মাসে সমিতির সভাপতি এবং উপাচার্য এসএন সেন দিল্লী যান। সেখানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং ভারত সরকারের সহায়তায় কয়েকজন বাংলাদেশি শিক্ষককে ভিজিটিং ফেলো হিসেবে নিয়োগের একটি প্রকল্প চূড়ান্ত করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়, যার সম্পাদক নির্বাচিত হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার অরুণ রায়। এ কমিটি বাংলাদেশি শিক্ষকদের অস্থায়ী ভিত্তিতে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দানের উদ্দেশ্যে কাজ করে।

এর পাশাপাশি বিভিন্ন ক্যাম্পে আশ্রয়গ্রহণকারী বাংলাদেশি ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার কথা চিন্তা করে স্কুল সেকশনসহ ক্যাম্প-কলেজ স্থাপনেরও সিদ্ধান্ত হয়। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলোচনার জন্য সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক অধ্যাপক এসএন সেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য পুনরায় দিল্লী যান।

২১ মে সহায়ক সমিতি এবং বাংলাদেশি শিক্ষকদের মধ্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় 'বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি' নামে একটি সমিতি গঠিত হয়, যার সভাপতি, নির্বাহী সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে ড. এ আর মল্লিক, কামরুজ্জামান এবং ড. আনিসুজ্জামান।

ফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে স্থানীয়দের মনে একটি সহানুভূতিশীল ধারণার সৃষ্টি হয়। টিমের সমস্ত খরচ বহন করে সহায়ক সমিতি। এদিকে উপাচার্য অধ্যাপক সেন শিক্ষকদের কর্মসংস্থানের প্রকল্প পাশ করানোর ব্যাপারে দিনের পর দিন দিল্লীতে থেকে চেষ্টা চালিয়ে যান। সেখানে লুৎফুল হক, চিত্ত বসু, ডিএল সেনগুপ্ত এবং সকল সংসদ সদস্যের উপস্থিতিতে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন।

সমিতির আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভারতের, বিশেষত পশ্চিবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ও বাংলাদেশি শিক্ষকদের সাময়িক কর্মসংস্থানের ব্যাপারে এগিয়ে আসে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (WBCUTA)। এ সমিতি সহায়ক কাজের সুবিধার জন্য একটি টাইপ

রাইটার প্রদান করে। অন্যদিকে কেবল বিশ্ববিদ্যালয় এ বছরের রবীন্দ্র-বক্তৃতা প্রদানের জন্য কয়েকজন বাংলাদেশি শিক্ষককে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

জুলাই মাস পর্যন্ত কেবল পশ্চিমবঙ্গেই ৬০৪টি শরণার্থী ক্যাম্প স্থাপিত হয় এবং এ ক্যাম্পগুলোতে ৩১টি স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শরণার্থী শিশুদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। IRC-র অর্থানুকূল্যে এ ক্যাম্প-স্কুলগুলো চালু করা হয়েছিল। অস্টেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদান দিয়ে এসব স্কুলে শ্লেট, খাতা এবং অন্যান্য শিক্ষাপোকরণ প্রদান করা হয়। শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটের 'মেসার্স ভারত স্টেশনারিজ' বিনালাভে এসব উপকরণ সরবরাহ করে। কলকাতার 'প্রকাশক ও বিক্রেতা সংস্থা' বিনামূল্যে অথবা অলাভে এসব স্কুলে পাঠ্য বই সরবরাহে সম্মত হয়। শুধু তা-ই নয়, তারা তাদের হলরুম সপ্তাহে ক'দিন বিনাভাড়ায় ক্যাম্প-স্কুল পরিচালককে ব্যবহারের সুযোগ দেয়। 'মেসার্স নয়াবিকাশ' টেলিফোনসহ একটি সজ্জিত কক্ষ অফিসের জন্য ছেড়ে দেয়।

এদিকে সহায়ক সমিতির সম্পাদক প্রফেসর ডি কে চক্রবর্তীর নেতৃত্বে চার সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল মহারাষ্ট্রের গভর্ণর মাননীয় নওয়াব আলী জাবের জং-এর সঙ্গে রাজভবনে সাক্ষাৎ করলে তিনি একটি আবাসিক স্কুল প্রকল্প গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এ অনুযায়ী প্রফেসর পিএন শর্মা একটি প্রকল্প তৈরি করে তাঁর নিকট প্রেরণ করেন এবং পিডব্লুডি ইঞ্জিনিয়ার এ কে রায় স্কুল ও হোস্টেলের প্লান করে দেন। এ-সময় দিল্লীতে বাংলাদেশ বিষয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। তাতে আয়োজক CASA কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে সমিতির পক্ষ থেকে প্রফেসর অমিয় চৌধুরী অংশগ্রহণ করেন এবং ক্যাম্প-স্কুল কর্মসূচি তুলে ধরেন। এতে উপস্থিত সকলে সন্তোষ প্রকাশ করেন।[২১১]

শরণার্থী বাংলাদেশি শিক্ষকদের কর্মসংস্থানের বিষয়টি চূড়ান্ত করার সমিতির সভাপতি প্রফেসর সেন ২২ জুলাই সমিতির সম্পাদক প্রফেসর চক্রবর্তী দিল্লী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ করেন। তিনি সমিতির কর্মকাণ্ডে খুশি হন এবং এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য পশ্চিমবঙ্গের ইউনিয়ন মিনিস্টার সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন। শ্রী রায়ের সঙ্গে দেখা হলে তিনি কলকাতায় বসে বিস্তারিত আলোচনার কথা বলেন। কিন্তু সময়ের অভাবে তা সম্ভব না হওয়ায় ২৯ জুলাই রাইটার্স বিল্ডিংয়ে তাঁর নিকট একটি নোট পৌঁছে দেয়া হয়, যার কপি প্রধানমন্ত্রীর নিকটও পাঠানো হয়।

বাংলাদেশি শিক্ষকদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে এ-সময় সমিতির সম্পাদক প্রফেসর ডি কে চক্রবর্তী শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের কর্ত্রী মৃন্ময়ী বোসকে নিয়ে দিল্লী যান।[২১২] সেখানে তাঁরা সফররত বাংলাদেশি শিক্ষকসহ গোটা দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং

তাঁকে বাংলাদেশের সমস্যা ও এ ব্যাপারে সহায়ক সমিতির গৃহীত সকল প্রকার উদ্যোগের কথা জানান। তৎকালীন সাংসদ এবং National Co-ordination Committee for Bangladesh-এর আহ্বায়ক প্রফেসর সমর গুহ এ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেন। তাঁরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক আচার্য পদ্মজা নাইডুর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন এবং তিনি শরণার্থী শিশুদের জন্য খাবার ও ওষুধ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এছাড়া UGC- সহ আরও অনেকে সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গেও তাঁরা সাক্ষাৎ করেন।

জুলাই মাসে কলম্বোর Institute of Ceylonese Studies বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি এবং সহায়ক সমিতি থেকে শিক্ষকদের এক যৌথ দলকে আমন্ত্রণ জানায়। এ দলের নেতৃত্ব দেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপচার্য (শিক্ষা) প্রফেসর পি কে বোস।

আগস্ট মাস পর্যন্ত সমিতি মোট ৩১টি ক্যাম্প স্কুল প্রতিষ্ঠা করে–পশ্চিমবঙ্গে ২১টি এবং আগরতলায় ১০টি। এতে চারশতাধিক বাংলাদেশি শিক্ষকদের কর্মসংস্থান হয়। বাংলাদেশি শিক্ষকদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগের ব্যাপারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী, ইউনিয়ন শিক্ষামন্ত্রী এবং UGC সম্মত হয়। ইতোমধ্যে পাতিয়ালা, যোধপুর, মুজফফরপুর ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অব সাইন্স (কলকাতা), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (বোম্বে) ও ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট (কলকাতা) বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি শিক্ষককে নিয়োগ দেয়। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় এবং জওয়াহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ও এ ব্যাপারে সাহায্যের প্রস্তাব দেয়।

প্রাইমারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যেসব শিক্ষক এ পর্যন্ত তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের একটি তালিকা মিস মেরি স্যাটনের অনুরোধে দিল্লীতে পাঠানো হয়। তিনি বাংলাদেশের জন্য প্রধানমন্ত্রীর তহবিলের ফান্ড সংগ্রহ করছিলেন। এ মাসে সহায়ক সমিতি ভারত সরকারের Registration of Societies Act-এর অধীনে নিবন্ধনভুক্ত হয় এবং সমিতির অনুরোধে শরণার্থীদের জন্য সাহায্যদাতাদের আয়কর মওকুফ করা হয়।

সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি যৌথ দল বোম্বে এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সফরে যায়। দলে ছিলেন প্রফেসর এআর মল্লিক, প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান এবং প্রফেসর সুবিমল মুখার্জী। দলের নেতৃত্ব দেন ড. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য। সে সময় জয়প্রকাশ নারায়ণের উদ্যোগে দিল্লীতে বাংলাদেশ বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় সহায়ক সমিতির পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন ড. ভট্টাচার্য্য।

অক্টোবর মাস পর্যন্ত সমিতির উদ্যোগে মোট ৫১টি ক্যাম্প স্কুল চালু হয়। এর মধ্যে ১০টি ত্রিপুরায়, বাকিগুলো পশ্চিমবঙ্গে। এসব স্কুলে মোট ৭১৪ জন বাংলাদেশি শিক্ষকের কর্মসংস্থান হয়। স্কুলগুলোর ব্যয় নির্বাহ হতো প্রধানত আন্তর্জাতিক ত্রাণ কমিটির অর্থ-সাহায্যে।

এ মাসেই বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর গজেন্দ্রগদকর অবসরে যান। এর আগে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের নিকট থেকে সংগৃহীত ৬৭,০০০ রুপির একটি চেক সমিতিকে প্রদান করেন। একক কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে এটাই সবচেয়ে বড় দান। দ্বিতীয় স্থানে ছিল অস্টেলিয়ার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। সেখান থেকে বিভিন্ন সময়ে মোট ৪১,০০০ রুপি দেয়া হয়েছিল। বাংলাদেশি শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের সাহায্যার্থে এ অর্থ দেয়া হয়। ভারতের সর্বদলীয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ শিক্ষদের সাহায্যার্থে এ সময় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় রাষ্ট্রদূত এম হোসেন আলীকে দু লক্ষাধিক রুপি দান করেন।

এ মাসে মঞ্জুরি কমিশনের অর্থসাহায্যে বাংলাদেশের ওপর একটি জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এতে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশের কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তি অংশ নেবেন বলে সমিতি আশা প্রকাশ করে। প্রফেসর যতীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী এ ব্যাপারে আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন।

অক্টোবর মাসে জয়প্রকাশ নারায়ণ বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আলীকে যে অর্থ দিয়েছিলেন, তা থেকে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে সহায়ক সমিতিকে ১,৯৯,৯০০ রুপি দেয়া হয়–শিক্ষকদের সহায়তার জন্য। প্রফেসর এআর মল্লিক এবং মুজিবনগরস্থ বাংলাদেশ পরিকল্পনা বিভাগের সহযোগিতায় এ অর্থ ব্যয়ের একটি পরিকল্পনা করা হয়। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সম্পাদক ড. অজয় কুমার রায়, সহকারী সম্পাদক আনোয়ারুজ্জামান এবং সদস্য নিত্যগোপাল সাহা সক্রিয় সহযোগিতা করেন। এ সময় ক্যাম্প-স্কুলসমূহ আগের মতোই চলতে থাকে। তবে ডিসেম্বরের শেষভাগে শরণার্থীরা বাংলাদেশে ফিরতে শুরু করলে অনেক স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। বাকিগুলোর ছাত্রছাত্রীদের পুস্তকাদি ক্রয়ের জন্য IRC উল্লেখযোগ্য অর্থ দান করে। উল্লেখ্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি এক পত্রে সমিতির এই ক্যাম্প-স্কুল প্রকল্পের ভূয়সী প্রশংসা করেন। মি. ভি এন থিয়াগরাজন এ-সময় ক্যাম্প-স্কুল পরিদর্শন করে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশি ছাত্রদের জন্য শিক্ষামূলক কর্মসূচিতে আর্থিক সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন।[২১৩]

বাংলাদেশের শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দীপিত করার উদ্দেশ্যে একাত্তরের বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন বিকাল বেলায় মিউজিয়ামের সামনে চৌরঙ্গী মাঠে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে *বন্ধু মহল*।[২১৪] পাশাপাশি পালন করা হয় 'বাংলাদেশ দিবস'। যেটিকে বাঙালীদের মিলন মেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এখানে দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, দিলীপ রায়। এছাড়া মিলন মেলায় পূর্ববঙ্গের নবজাগরণকে অভিনন্দন জানিয়ে, যে কোন পরিস্থিতিতে পাশে থাকার প্রত্যেয় ঘোষণা করা হয়।

শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দীপিত করার সবচেয়ে সহজ মাধ্যম ছিল গান, কবিতা রচনা। একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ দৈনিক, সাহিত্য পত্রিকায় বাংলাদেশকে নিয়ে গান, কবিতা, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, বের করা হয়েছে বিশেষ সংখ্যা। *যুগান্তরের* রবিবারের সাহিত্য সাময়িকীতে দক্ষিণারঞ্জন বসু লিখেছেন,

'আমার তোমার মায়ের নাম বাঙলাদেশ

বাঙলাদেশ,

আমরা তের কোটি এক সাথে দেই

হাততালি

অমনি জ্বলে ওঠে চিত্তলোকের সকল প্রত্যাশা।[২১৫]

(আমার তোমার মায়ের নাম)

দুই বাংলার আবেগকে পুজি করে শংকর লিখেছেন 'এপার বাংলা ওপার বাংলা'। বিজ্ঞাপন মারফত জানা যায় একাত্তরে এটির ষোলটি মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল।[২১৬] সংকেত সাহিত্য সংস্থা বের করেছে ধনঞ্জয় দাশের 'আমার জন্মভূমি : স্মৃতিময় বাঙলাদেশ' গ্রন্থটি। ঢাকা ও রাজশাহী কারাগারে দীর্ঘ বন্দী জীবনের অভিজ্ঞতায়, বর্তমান পটভূমিকায় তিনি অতীত স্মৃতি উজাড় করে দিয়েছিলেন এই গ্রন্থে।[২১৭]

এতে স্থান পেয়েছে পূর্ববাঙলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নানা কাহিনী। এক আশ্চর্য স্মৃতিকথা। পূর্ব বাংলার সংগ্রামী ইতিহাসের এক অন্তরঙ্গ নব মূল্যায়ন। গ্রন্থটির দাম ছিল তিন টাকা, মুকুন্দ পাবলিশার্স বের করেছিল

দীপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের 'হওয়া না হওয়া'[২১৮] গ্রন্থটিতে একাত্তরে বাংলাদেশে প্রস্ফুটিত ফুলের সম্ভাবনা-সেটির হওয়া না হওয়া সময়ের কথা তুলে ধরেছিলেন। বের হয়েছিল ৫০টির অধিক কাব্যগ্রন্থ কিংবা কাব্যসঙ্কলন। তরুণ কবি গনেশ বসু লিখেছেন 'অমৃত আস্পদে মৃত্যু বাংলাদেশ' কাব্যগ্রন্থটি। [২১৯]

সেই সব কবিতায় গল্পে উঠে এসেছিল নতুন শপথের প্রত্যয়।

'রাজশাহীর শফিকুল পাবনার কাদের

ঠিক জেনেছিলঃ মুক্তিযুদ্ধ দুর্গাপূজো নয়

কিংবা বন্যাত্রাণ সভা-সমিতির ধূমধাম নয়।

তারা মৃত্যুঞ্জয়।[২২০]

(অসীম রায়, পদ্মার চরে)

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সমর্থনে সংস্কৃতি পরিষদ ও ক্রান্তি শিল্পী সংঘের যৌথ উদ্যোগে এসপ্লানেডে লেনিনের মূর্তির পাদদেশে কবি ও শিল্পীরা কবিতা পাঠ ও সঙ্গীতের মাধ্যমে পশ্চিম বাংলার মানুষের একাত্মবোধ মূর্ত করে তোলেন। রাজ্যসভার সদস্য দ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত এই পথসভায় সভাপতিত্ব করেন। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ এবং আধুনিক কবিদের রচিত সঙ্গীত ক্রান্তিশিল্পী সংঘের সদস্যগণ পরিবেশন করেন। কবিতা পাঠ করেন অরুণ ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাগর চক্রবর্তী, রথীন চট্টোপাধ্যায়, রাণা বসু, সরোজলাল বন্দোপাধ্যায়, সলিল সেন প্রমুখ।[২২১] উত্তম কুমার শিল্পী সংসদের উদ্যোগে একাত্তরে একটি টিম করে শরণার্থী শিবিরগুলোতে বিভিন্ন উদ্দীপনামূলক অনুষ্ঠান পালন করা হত। উত্তম কুমার একাত্তরে নিজেই এসব তদারকি করতেন।

ফেডারেশন অফ ফিল্ম টেকনিশিয়ান্স অ্যান্ড ওয়াকার্স এর সাধারণ সম্পাদক পরিজাত বসু ঘোষণা দেন, পূর্ব বঙ্গ থেকে আগত তাদের কাউন্টার পার্টির কলাকুশলীদের সবধরনের সহযোগিতা করা হবে। বিশ্বজনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যুদ্ধরত মুক্তিফৌজের ওপর, শরণার্থীদের ওপর দলিল চিত্র নির্মাণের ঘোষণা দেয়া হয়।[২২২]

বাঙলাদেশ সংগ্রাম সহায়ক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র কমিটির উদ্যোগে 'বাঙলাদেশের হৃদয় হতে' শীর্ষক আলোচিত প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বাঙলাদেশের ছাত্র নেত্রী শিরিন বানু এতে প্রধান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতা অনুপ মুখোপাধ্যায় এতে সভাপতিত্ব করেন।[২২৩]

চব্বিশ পরগনা জেলার সোদপুরে ২৩-২৫ এপ্রিল আয়োজন করা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। গভর্ণমেন্ট হাউজিং এস্টেটের সেন্ট্রাল পার্কে টেনান্টেস ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এখানে চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।[২২৪] তিনদিনের চিত্র প্রদর্শনী ও এই উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা সোদপুর পানিহাটি এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার সর্বস্তরের মানুষের দৃষ্টি আর্কষণ করে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্ম থেকে ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের একটি ধারাবাহিক চিত্র পোষ্টারের মাধ্যমে রুপায়িত করাই এই চিত্র প্রদর্শনীর বিশেষত্ব ছিল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক গান ও আবৃত্তি এবং স্থানীয় মুভিং থিয়েটার গ্রুপ কর্তৃক 'ইয়াহিয়ার বিচার' নাটক অভিনীত হয়। সমাপ্তির দিন পঁচিশে এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে গোপাল ভট্টাচার্য এম-এল-এর সভাপতিত্ব আলোচনা সভায় যোগদান করেন ডাঃ জ্যোতির্ময় মজুমদার, সাংবাদিক জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনখ্যাত গণেশ ঘোষ।

একাত্তরে দক্ষিণ কলকাতার টাকি হাউসে উত্তর ভারতীর বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের কবিতা ও সঙ্গীত আসরের মাধ্যম। ঐ আসরে উপস্থিত ছিলেন কবি দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়, কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রাক্তন স্পীকার কেশব বোস, কুমারেশ ঘোষ, নমিতা রায় চৌধুরী, সন্তোষ অধিকারী, রানা বোস, ডঃ অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। সঙ্গীতে ছিলেন ছিলেন হিমন রায় চৌধুরী, তপতী মৈত্রী, দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল প্রামাণিক, মঞ্জুশ্রী মুখার্জি ও শ্রাবণী সেনগুপ্ত।

১৬ মে ১৯৭১ বাংলাদেশের সাহায্যার্থে প্রদর্শিত হয় *জলসাঘর* সিনেমা। পরের দিন জ্যোতি সিনেমা হল কর্তৃপক্ষ ও ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটি ইন্ডিয়ার উদ্যোগে পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের জন্য বিনামূল্যে সতিজিৎ রায়ের সিনেমাটি দেখার ব্যবস্থা করা হয়। [২২৫]

পশ্চিমবঙ্গে একাত্তরে শরণার্থীদের উদ্দীপনা যোগাতে মঞ্চস্থ হয়েছে নাটক, আয়োজন করা হয়েছে কবিতার আসরের। যাত্রা পালা, কবিগান, লোকজ মেলা, স্বদেশি মেলা ইত্যাদি নানা আয়োজনে একাত্তরে উদ্বাস্তু জীবনকে রাঙাতে চেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ।

শরণার্থীদের উদ্দীপনা জোগাতে ও তাদের জন্য অর্থসংগ্রহে নারিকেলডাঙ্গায় আয়োজন করা হয় গীতি আলেখ্য। ১৫ এপ্রিল ও ১০ মে নারিকেলডাঙ্গার শুকতারা চিত্রগৃহে আয়োজিত এই গীতি আলেখ্যের নাম ছিল 'সোনার বাঙলা"।[২২৬] অশোক চক্রবর্তী ও দিলীপ রায়ের নির্দেশনায় সাবিত্রী ব্যানার্জি, গোপা গুছাইত, শোভা দাস, পূর্ণিমা ঘোষাল, লঘিমা চক্রবর্তী, উজ্জ্বলা সাহা, মঞ্জুর ভৌমিক, তরুলতা গুছাইত, দীপা সেন, নূপুর সেনগুপ্তা, মিনা চক্রবর্তী, তরুণ দত্ত, জয়ন্তনু মিত্র প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দ অংশ নেয়। গ্রন্থনায় ছিলেন অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়। ওপার বাংলায় পশ্চিমী দস্যুদের অত্যাচারের ফিচার পরিবেশন করেন অজয় গাঙ্গুলী।[২২৭]

চ. মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা

একাত্তরে ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ একদিকে শরণার্থীদের দিয়েছে আশ্রয়, সহায়তা অন্যদিকে রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়েছে সাহস আর নানাবিধ সহায়তা। শরণার্থীদের জন্য যেমন ত্রাণ সরবরাহ করা হয়েছে ঠিক তেমনি রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ অবরুদ্ধ পূর্ববঙ্গে সাহায্য সহায়তা পাঠিয়েছে। পাঠিয়েছে নানা ধরনের ঔষধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে সরকারি উদ্যেগে মুক্তিফৌজের যে ট্রেনিং ক্যাম্পগুলো গড়ে উঠেছিল সাধারণ নাগরিকরা নানাভাবে সেগুলোতে সহায়তা করেছে। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো থেকে পরিচালিত অনেকগুলো গেরিলা অপারেশনে অস্ত্র ও গোলাবারুদ বহনে সহায়তা করার কথা স্বীকার করেছেন সীমান্ত এলাকার সাধারণ গ্রামবাসী।[২২৮]

অবসরপ্রাপ্ত সামরিক, আধা-সামরিক ও সশস্ত্র বিভাগের সাথে সম্পর্কিত সাধারণ পশ্চিমবঙ্গবাসী ও নানাভাবে সম্পৃক্ত হয়েছিল সহায়তা কার্যক্রমে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সাধারণ লোকজন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নানাবিধ জিনিস পাঠাতে শুরু করেন। যেগুলোর মধ্যে বেশ কিছু অপ্রয়োজনীয় ছিল। কিংবা রণাঙ্গনে পাঠানো সম্ভব ছিল না। তাই গণমাধ্যম ও সহায়তায় গড়ে উঠা সহায়ক সমিতিগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় প্রয়োজনীয় উপকরণ, যেমন– বিড়ি, সিগারেট, ফাস্ট এইড, গুড়ো দুধ, পেট্রোলসহ তালিকাভুক্ত দ্রব্যাদি প্রদানের অনুরোধ জানাচ্ছিল। ১৩ এপ্রিল *দৈনিক যুগান্তরে* 'মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কি পাঠাবেন' এমন একটি সংবাদ পরিবেশন করে। যেখানে প্রয়োজনীয় দ্রব্যদির সাধারণ তালিকা দেয়া হয়।[২২৯]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতি রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় ছিল তৎপর । শরণার্থীদের আশ্রয় ও ত্রাণ সরবরাহের পাশাপাশি তারা সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা ও প্রশিক্ষণার্থী গেরিলা যোদ্ধাদের সহায়তায়।

২৫ মার্চ অপারেশন সার্চলাইট শুরু হওয়ার আগ থেকেই বিভিন্ন পথে বাংলাদেশের নেতাকর্মীরা ভারতে প্রবেশ করতে শুরু করেন। এর সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়ছিল। ভারতে গিয়ে তাঁরা সংগঠিত হওয়া এবং যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেয়ার চেষ্টা করেন। এর ফলে মে মাসের মধ্যেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে তাদের যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। সহায়ক সমিতির পক্ষ থেকে এসব ক্যাম্প পরিদর্শন করা হতো এবং সাধ্যানুসারে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য দেয়া হতো। এ উদ্দেশ্যে সমিতির পক্ষ থেকে শ্রীমতী ঈপ্সিতা গুপ্তের নেতৃত্বে একটি টিম মুর্শিদাবাদ জেলার বহরামপুর ক্যাম্পে গুরুত্বপূর্ণ

দায়িত্ব পালন করে। ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানেও টিম পাঠানো হয়। সেখানকার শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসব টিমের অভিজ্ঞতা তাঁকে জানানো হয় আগরতলা থেকে এ ব্যাপারে একটি বিবৃতিও দেয়া হয়, যা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এসব টিমের নেতৃত্বে ছিলেন সমিতির নির্বাহী সভাপতি শ্রী পি কে বসু।

জুন মাসে সমিতির পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন যুব-ক্যাম্পে ওষুধ ও খাদ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়। এ-সময় কোলকাতার লেক গার্ডেনস্থ 'বাংলাদেশ সংগ্রাম সহায়ক সমিতির' সভাপতি নীরদ মুখার্জী মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বেশকিছু কম্বল ও ওয়াটারপ্রুফ ত্রিপল দান করেন। [২৩০]

জুলাই মাসে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সমিতির সাহায্যের ধরন ও পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের চারদিকে অবস্থিত মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন ক্যাম্পে এ-সময় ট্রানজিস্টর-রেডিও, কম্বল, ত্রিপল, ওষুধ এবং চিড়া-গুড়া পাঠানো হয়।

আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং তাঁদের জন্য সাহায্যের ধারা আগের মতোই অব্যাহত থাকে। তাঁদের জন্য মশারি, বুটজুতা ইত্যাদি প্রেরণ করা হয়। কল্যাণ মুখার্জী এবং তাঁর স্ত্রী বাণী মুখার্জী নিয়মিতভাবে চিড়া-গুড়-চিনি সরবরাহ করেন এবং সেগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট পৌঁছে দেয়া হয়।

নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানি সেনা ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধের তীব্রতা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতির কর্মতৎপরতাও বৃদ্ধি পায়। তখন শীতকাল। মৃত্যুকে উপেক্ষা করে মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন রণাঙ্গনে তুমুল যুদ্ধে রত। তাঁদের বিভিন্ন জিনিসের তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়। সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও সহায়ক সমিতি তাঁদের জন্য কম্বল, শীতবস্ত্র, ট্রানজিস্টার, বস্ত্র, ঔষধপত্র ইত্যাদি পাঠায়। বাংলাদেশের রাজশাহী, খুলনা, যশোর ও কুষ্টিয়া জেলার পার্শ্ববর্তী পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং চব্বিশ পরগণা জেলার বিভিন্ন মুক্তিবাহিনী ক্যাম্পে এগুলো পাঠানো হয়। মেঘালয়ের তুরাতে যুবক্যাম্পেও বই ও ট্রানজিস্টর পাঠানো হয়। যুদ্ধে আহত কতিপয় মুক্তিযোদ্ধাকে কোলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়। Institute of Basic Medicine -এর প্রফেসর এবং Board of Health-এর সম্পাদক ডাক্তার প্রবোধ রায় তাঁদের কয়েকজন সহযোগী নিয়ে এ কাজ করেন।[২৩১]

এছাড়াও মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় এগিয়ে আসেন পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু পেশাজীবী সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন, কর্মচারী-কর্মকর্তা সমিতি। কেউ কেউ সাহায্য তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী কিংবা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে। কেউবা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সহায়তা নিয়ে যান কলকাতা হাই কমিশন অফিসে। ১১ এপ্রিল ১৯৭১ বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে কলকাতার রবীন্দ্রসদনে আয়োজন করা হয়

বিচিত্রানুষ্ঠানের। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তহবিল গড়তে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের বঙ্গীয় রাজ্য শাখা এটির আয়োজন করেন। বিচিত্রানুষ্ঠানে টিকেট কেটে বিপুল দর্শনার্থী প্রবেশ করেন। অনেকেই এতে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় নগদ অর্থ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে অংশ নেন পঙ্কজ কুমার মল্লিক, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজী সব্যসাচী, শম্ভু মিত্র, অনুপকুমার, মুকুল দাস, সুচিত্রা মিত্র, সন্ধ্যা মুখার্জী, সুমিত্রা সেন, রুমা গুহঠাকুরতা এবং আরও অনেকে।[২৩২]

কৃষ্ণপুর বালক ও বালিকা বিদ্যালয় বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তার আয়োজন করেন চারদিন ব্যাপী যাত্রা অনুষ্ঠানের। অনুষ্ঠান থেকে আয়কৃত অর্থে শীতের কাপড় কিনে নভেম্বর মাসে পাঠানো হয় রণাঙ্গনে। কৃষ্ণপুর বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের মতো একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একাত্তরে যাত্রা, বিচিত্রানুষ্ঠান কিংবা নাটকের আয়োজন করে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজের ছাত্র শিক্ষক ও কর্মচারীরা এক যুক্ত সভায় সিদ্ধান্ত নেন, শিক্ষক ও কলেজ কর্মচারীরা বাংলাদেশে মুক্তি সংগ্রামে সাহয্যের জন্য একদিনের বেতন দান করবেন। ছাত্র সংসদ এক হাজার টাকা দান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রাতঃকালীন ছাত্রী বিভাগের পক্ষ থেকেও মুক্তিসংগ্রামে অর্থ সাহায্য করা হবে। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ অমরন্দ্রনাথ মজুদার।[২৩৩]

শিবপুর দীনবন্ধু ইনষ্টিটিউশনের (ব্রাঞ্চ) শিক্ষকগণ মুক্তি সংগ্রামে সাহায্যের জন্য এক দিনের বেতন দান করেছেন। শিবপুর শিক্ষালয়েও এক সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অনেকেই বিচ্ছিন্নভাবে মুক্তিফৌজকে সহায়তার ইচ্ছে পোষণ করছিল। সরাসরি সাহায্য পাঠাতে চাচ্ছিল রণাঙ্গনে। শ্রী শ্রী বিজয়কৃষ্ণ আশ্রয় রিলিফ সোসাইটির স্বেচ্ছাসেবকরা একাত্তরে নিয়েছিল সে দায়িত্ব। এসব সাহায্য সংগ্রহ করে তারা স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে পৌঁছিয়ে দিচ্ছিল রণাঙ্গনে, একাত্তরে তারা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে জনগণ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করেন।

‘সীমান্তের ওপার বাংলাদেশের দুঃস্থ নিপীড়িত ভাইবোনদের জন্য যারা সাহায্য পাঠাতে চান, তারা শ্রী শ্রীবিজয়কৃষ্ণ আশ্রম রিলিফ সোসাইটির নিম্মোক্ত ঠিকানায় পাঠাতে পারেন। সোসাইটির স্বেচ্ছাসেবকগুলো সীমান্তে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিনিধির নিকট সাহায্য পৌঁছানোর দায়িত্ব নিয়েছেনঃ সেক্রেটারী, শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ আশ্রম রিলিফ সোসাইটি। মেডিকো অপটিক্যাল, ৯৫/এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা-১২।’[২৩৪]

যাদবপুরের রামকৃষ্ণ পল্লি মঙ্গল সমিতি বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় দুধের কোটা, জলের বোতল, বিস্কুট ও ঔষধ সংগ্রহ করে সীমান্তে দিয়ে আসেন। পশ্চিমবঙ্গ রেলওয়ে (পূর্ব) মহিলা শাখার পক্ষ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় ৫০০০ টাকা তুলে দেয়া হয় মুখ্যমন্ত্রী অজয়কুমার মূখোপাধ্যায়ের হাতে। উষা সুয়িং মেশিন ওয়ার্কসের কর্মীরা ১৫১০ টাকা তুলে দিচ্ছেন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অর্থ দিচ্ছেন হাওড়া কলেজ, বিবেকানন্দ স্কুল কিংবা রাজাবাজার ব্যায়াম সমিতি। মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় মুখ্যমন্ত্রী কিংবা প্রধানমন্ত্রীকে ত্রাণ দিচ্ছেন এইরকম শতাধিক সংবাদ একাত্তরের *যুগান্তর, আনন্দবাজার আর অমৃতবাজারের* পাতায় পাতায়। অসংখ্য সংবাদ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একদিনে বেতন দান করা হচ্ছে বাংলাদেশে ত্রাণ তহবিলে।[২৩৫]

কলকাতা বন্দরের শ্রমিক প্রতিনিধি, জাহাজি ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি, নিয়োগকারী কর্মী এবং অফিসাররা এবং ডকের কর্মী ও নিয়োগকারীরা, পোর্ট কমিশনার্সের চেয়ারম্যান কে কে রায়ের সভাপতিত্বে এক সভায় বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত নেওয়া সকল শ্রমিক কর্মচারী, অফিসার ও কলকাতা বন্দরের সঙ্গে যুক্ত সকলকে একদিনের বেতন এবং বস্ত্রাদি ও কম্বল মুক্তিফৌজের সাহয্যকল্পে দিতে হবে। এ ছাড়া রক্তদানের প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছে। সংগৃহীত অর্থ ইন্ডিয়ান রেডক্রশ সোসাইটি বা মুখ্যমন্ত্রীর তহবিলে জমা দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ (ইউসিআরসি) বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সাহায্য দেওয়ার আহবান জানান।[২৩৬]

আবার মুক্তিযোদ্ধাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখা গেছে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে। গোল্ডেন টোবাকো কোম্পানি মুক্তিফৌজের সহায়তায় তিন লক্ষ পানামা সিগারেট তুলে দেন বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতিকে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাংক কর্মী সমিতির পক্ষ থেকে ১২ মে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রথম কিস্তিতে ৮০ হাজার টাকা দান করা হয়। ব্যাংক সমিতির পক্ষ থেকে ঐ টাকার চেকটি বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হোসেন আলিকে প্রদান করা হয়। ১২ মে সারা ভারতব্যাপী ব্যাংক কর্মীরা বাংলাদেশ দিবস পালন করেন।[২৩৭]

দুর্গাপুরের কারুমেল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা টিফিনের পয়সা জমিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে অর্থ স্কুল কর্তৃপক্ষকে দিয়েছে। বালীগঞ্জ ইনষ্টিটিউটের পক্ষ থেকে ১০ মে বাংলাদেশের সংগ্রামী জনসাধারণের জন্য সাহায্য হিসাবে প্রথম কিস্তিতে ৫০১ টাকা বাংলাদেশের মিশনের হাতে তাদের কার্যালয় কলিকাতাস্থ ৭ নং সার্কাস এভিনিউ অফিসে দেওয়া হয়।[২৩৮]

বেঙ্গল ইমিউনিটি বাংলাদেশের মুক্তিফৌজ ও নিপীড়িত জনগণের সাহায্যার্থে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঔষধপত্র দান করেছেন। কোম্পানির অফিসার, কেমিষ্ট ও সিনিয়র কর্মচারিগণ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামীদের সাহায্যে একদিনের বেতন দান করেছেন।[২৩৯]

কল্যাণী স্পিনিং মিলের অফিসারগণ বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য একদিনের বেতন দিয়ে ত্রাণ সামগ্রী কিনে এবং কয়েকজনে মিলে তা বহন করে সীমান্তের দর্শনা সাহায্য কেন্দ্রে পৌঁছে দিয়ে এসেছেন। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নবদ্বীপে দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছেন। প্রতিদিন কেরোসিন, বেবিফুড, বিড়ি, ঔষধ কাগজ, ওয়াটার বটল প্রভৃতি সীমান্তে নিয়ে গিয়ে রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা ও অবরুদ্ধ লোকজনের জন্য প্রেরণ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসের অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় একাত্তরে এক কিশোর মুক্তিযোদ্ধার গল্পের অবতারণা করেন। অসহায় শীর্ণ এই মুক্তিযোদ্ধাটি সহায়তা হিসেবে খুঁজছিলেন একটি ট্রানজিস্টার। 'আমাদের ক্যাম্পের ট্রানজিস্টারে স্বাধীন বাংলা বেতারের প্রোগ্রাম ভালো শোনা যায় না। যদি একটি ভালো ট্রানজিস্টার পাওয়া যেত।' গৌতম বলছিলেন, 'জামা নয়, কাপড় নয়, চাইলো একটি ট্রানজিস্টার রেডিও- স্বাধীন বাংলার অনুষ্ঠান শোনার জন্য। যে দেশে এমন ছেলে জন্মায়, সে দেশ স্বাধীন না হয়ে পারে না।'[২৪০]

বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্ররা একাত্তরে নিয়েছিল ভিন্ন উদ্যোগ। কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোকজন থেকে তারা সাহায্য তুলেন। সংগৃহীত ১৪৪ টাকার ঔষধ ও অন্যান্য দ্রব্য কিনে তারা সীমান্তে গিয়ে বাংলাদেশের সংগ্রামীদের দান করেন।[২৪১] বাংলাদেশের মুক্তিফৌজের সাহায্যার্থে কলকাতার মেয়র ত্রাণ ভাণ্ডার খুলেছিল একাত্তরে। নবনির্বাচত মেয়র শ্যামসন্দর গুপ্ত সকল নাগরিকদের স্বাধীন বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষের কথা স্মরণ করে ত্রাণ ভাণ্ডারে মুক্ত হস্তে দান করতে অনুরোধ জানান। মেয়র পৌর পিতাদের নিয়ে শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করে চাঁদা তুলেন। স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং সেখানে অস্ত্র পাঠানোর প্রস্তাব মেয়র সমর্থন করেন।

ছ. স্বাস্থ্যসেবা

আহমদ ছফা 'অলাতচক্র' উপন্যাসে লিখেছেন, 'কলকাতা শহরের লোকদের মুখে ইদানিং (১৯৭১) জয় বাংলা শব্দটি শুনলে আমার অস্তিত্বটা যেন কুঁকড়ে আসতে চায়। শেয়ালদার মোড়ে মোড়ে সবচে সস্তা, সবচে ঠুনকো স্পঞ্জের স্যান্ডেলের নাম জয় বাংলা স্যান্ডেল। ... যে চোখ ওঠা রোগটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, কলকাতার মানুষ মমতাবশত তারও নামকরণ করেছিল জয়বাংলা।' [২৪২]

জয় বাংলা একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ লোকজনের কাছে ছিল আবেগ আর আতঙ্কের নাম। একদিকে জয় বাংলার সহায়তায় নিজের সবকিছু নিয়ে এগিয়ে এসেছিল, অন্যদিকে 'জয় বাংলার' মতো চোখের অসুখে বিপর্যস্ত হয়েছিল দৈনন্দিন জীবন। Georges Childs Kohn তাঁর গ্রন্থ Encyclopedia of plague and pesticide: From Ancient Times to the Present গ্রন্থে একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চাশ লক্ষ লোক চোখ উঠায় আক্রান্ত বলে উল্লেখ করেন।[২৪৩] সমসাময়িক পত্র পত্রিকায় এই সংখ্যা আরো বেশি বলে ধারণা পাওয়া যায়। আক্রান্তদের মধ্যে শরণার্থীরা যেমন ছিল তেমনি সংক্রামক এই রোগটি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল স্থানীয় অধিবাসীরাও। ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সরকারি হিসাব মতে প্রায় ৫ লাখ লোক Acute Hemorrhagic Conjunctivitis (AHC)-এর চিকিৎসা সেবা নেন। প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়ে বেশি। কলকাতা শহরের শতকরা ৬৫ জন লোক এই রোগে আক্রান্ত হন।[২৪৪] এই AHC চোখ ওঠা বা Conjunctivitis এর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর ভ্যারাইটি।

একাত্তরে মে মাস থেকে শুরু করে আগস্ট মাস পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের অনেকাংশে এই সংক্রামক রোগটি ছড়িয়ে পড়ে। মূলত এটি ছিল চোখের কনজাংটিভার প্রদাহ বা চোখ ওঠা। বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের মাধ্যমে এই রোগটি বিস্তার লাভ করেছে দেখে স্থানীয়রা একে 'জয় বাংলা' রোগ বলে অভিহিত করেন।

একাত্তরে জয় বাংলায় পশ্চিমবঙ্গ কতটা বিপর্যস্ত হয়েছিল ৪ জুন ১৯৭১ এর *দৈনিক যুগান্তরের* একটি শিরোনামে তা স্পষ্ট। 'চোখের রোগে ট্রেন বন্ধের আশঙ্কা' রিপোর্টটিতে বলা হচ্ছে চোখ ওঠায় রেলওয়ের বিপুল সংখ্যক কর্মী আক্রান্ত হয়েছে। পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশনের ৪৯ জন গার্ড এই রোগে আক্রান্ত হয়ে ছুটি নিয়েছেন। বহু সংখ্যক বুকিং ক্লার্ক চোখের রোগে আক্রান্ত। সাধারণ ছুটিতে থাকা ২৭ কর্মীর ছুটি বাতিল করেও ট্রেন চলাচল অসম্ভব হয়ে পড়েছে।[২৪৫] চোখ ওঠায় বাতিল হয়ে গেছে ফুটবল ম্যাচ। বন্ধ করে দেয়া হয়েছে বেশ কয়েকটি স্কুল। পত্রিকার পাতায় পাতায় চোখের রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার বিজ্ঞাপন, কেউবা দিচ্ছে হোমিওপ্যাথিক এর বিজ্ঞাপন, কেউবা সালফাসিটল কিংবা তরল সাবানের বিজ্ঞাপন।[২৪৬]

হাওড়ার ক্ষেত্র ব্যানার্জী লেনের 'সুরেন্দ্রনাথ সেবা সদন' সকাল ৭ টা থেকে ১০ টা পর্যন্ত জয় বাংলায় আক্রান্ত রোগীদের হোমিওপ্যাথী ঔষধ বিতরণের বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হত প্রতিদিন। আক্রান্ত লোকজনকে একটি শিশি সমেত লাইনে দাঁড়ানোর অনুরোধ করত দোকানটি।[২৪৭]

আবার অনেকেই এই মহামারীতে চেষ্টা করেছেন আনন্দ খোঁজে নেওয়ার। *যুগান্তরে* বিকাশভানু লিখেছেন রম্য কথন 'চোখের রোগের টোটকা নিন'।[২৪৮] চোখ ওঠায় একদিকে বেড়েছে ঔষধ বিক্রি, অন্যদিকে ভীষণ চাহিদা বাড়তে শুরু করল কালো চশমার।

পত্রিকাগুলো ছাপাতে শুরু করল, জয় বাংলা থেকে রেহাই পাওয়ার নানা কৌশল। বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করে এই রোগের চিকিৎসা দেয়া হত। ৬ জুন ১৯৭১ পশ্চিমবঙ্গের সিনিয়র চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. নীহার মুন্সি, ডা. অমল সেন, ডা. আই এস রায়, ডা. প্রকাশ ঘোষ, ডা. জলধর সরকার ও কলকাতা পৌরসভার স্ট্যান্ডিং হেলথ কমিটির চেয়ারম্যান ডা. বীরেন বসু জনসাধারণকে আতঙ্কিত না হয়ে জয় বাংলা রোগে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়ে বিবৃতি দেন। পৌরসভার মেয়র শ্যামসুন্দর গুপ্ত তাদের সাথে বৈঠক করে, জনসাধারণকে কয়েকটি পরামর্শ দেন।[২৪৯]

যথা–

১. নূন জল দিয়ে চোখ পরিষ্কার করুন।
২. এই রোগের কোন ঔষধ নেই। গরম জল দিয়ে চোখ পরিষ্কার করে এতে রেকিউরোক্রোম বা পেনিসিলিন দেয়া যেতে পারে। খুব বেশি যন্ত্রণা হলে সালফা সেটামাইডের ফোঁটা দিলে উপকার পাওয়া যাবে।
৩. পৌরসভার বিভিন্ন চিকিৎসা কেন্দ্রে বিনামূল্যে এসব ঔষধ পাওয়া যাবে।
৪. অপরিষ্কার হাত দিয়ে চোখ স্পর্শ থেকে বিরত থাকুন।
৫. যাদের গলা ব্যাথা তাদের নূন জল দিয়ে গার্গল করতে হবে।

আবার কলকাতার হোমিও চিকিৎসকরা *জয় বাংলা* রোগের বিভিন্ন স্তর ও স্তর অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কি ঔষধ খেতে হবে তা সাধারণকে জানিয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন।

যুগান্তরের রবিবারের সাময়িকী রম্য করে লিখেছেন, 'জ্বালা দিতে ঠাঁই নাই জ্বালা দেয় সতীনের ভাই, কলকাতার লোকের হয়েছে সেই দশা। একেই তো জ্বালা যন্ত্রণার সীমা নেই, তার ওপরে কোথা থেকে এক চোখের রোগ এসে চেপে বসল। জয় বাংলা জয় বাংলা ডাক ছাড়তে ছাড়তে সারা শহর যেন কটা দিনের জন্যে... ধুলি পড়ে একেবারে কলুর... হয়ে গেল।' সাথে জুড়ে দিয়েছে কার্টুন। [২৫০]

এতসবের মাঝেও কলকাতার সাধারণ মানুষ পাশে দাঁড়িয়েছিল শরণার্থীদের। সংক্রামক জেনেও ক্যাম্পগুলোতে শরণার্থীদের মাঝে সাহায্য, সহায়তা ও ঔষধপত্র নিয়ে সহায়তা করেছে। *আনন্দবাজার* পত্রিকা ১৩ জুন লিখছে পশ্চিমবঙ্গের এমন কোন বাড়ি নেই, যে বাড়িতে ২/১ জন করে জয় বাংলা রোগে

আক্রান্ত হয়নি। বাজারে চোখ ওঠা রোগের ঔষধ ও রঙিন চশমার সংকটের কথা পত্রিকাটি তুলে ধরেন।[২৫১]

চোখ ওঠা পশ্চিমবঙ্গে এত বেশি প্রভাব ফেলেছিল একাত্তরে, স্থানীয় গণমাধ্যমের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও উঠে এসেছিল জয় বাংলার প্রাদুর্ভাবের কথা। *নিউইয়র্ক টাইমস* পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চাশ লক্ষ লোকের জয় বাংলায় আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ ছাপে।[২৫২] বাংলাদেশের সংবাদ সংগ্রহে এসে পশ্চিমবঙ্গে বিদেশি গণমাধ্যমের কয়েকজন কর্মীও আক্রান্ত হয়েছেন চোখের এই প্রদাহে।

Kohn তার সম্পাদিত বইটিতে চোখ ওঠা রোগটির সংক্রমণের যে দিক নির্দেশ করেছেন তাতে বাংলাদেশ থেকে একটি তীর পশ্চিমবঙ্গের দিকে নির্দেশ করেছেন।[২৫৩] তিনি বইটিতে আরও উল্লেখ করেছেন এটি ধারণা করা হয় যে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া শরণার্থীদের মাধ্যমে এই রোগ কলকাতায় সংক্রমিত হয়। সত্য যাই হোক। রোগটির নামকরণ তেমনটিই বলছে। লোকের কাছে চোখের এই প্রদাহের স্থায়ী নাম পায় ‘জয় বাংলা’ রোগ। চোখ ওঠা অর্থাৎ চোখের পর্দা কনজাংটিভার প্রদাহকে পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা এখনও *জয়বাংলা* বলে।

তবে রোগটির নাম *জয় বাংলা* হলেও অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, যদি জয় বাংলার লোকেরা এই রোগটি ছড়ায়ে থাকে তাহলে মুম্বাইয়ে কেন প্রথম সংক্রমণ ঘটল এবং মুম্বাই থেকে অন্যান্য অঞ্চলে তা ছড়িয়ে পড়ল কিভাবে? তাছাড়া বাংলাদেশ (জয় বাংলা)-এর শরণার্থীর মাধ্যমে রোগটি যদি ছড়িয়ে থাকে তবে কেন বাংলাদেশের সীমান্তে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে চোখওঠা রোগ ছড়াল না? বাংলাদেশ থেকে শরণার্থীরা পূর্ব, পশ্চিম এবং উত্তর তিনদিকেই আশ্রয় নিয়েছিল।

তবে জয় বাংলা রোগের উৎপত্তি নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এটা স্পষ্ট করে বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গে একাত্তরে জয় বাংলা রোগের যে ব্যাপক বিস্তৃতি, সেটা ঘটেছে শরণার্থী ক্যাম্পের অস্বাস্থ্যকর ঘিঞ্জি পরিবেশ থেকে।

D.D Pramanik তার গবেষণা নিবন্ধ Joy Bangla. An epidemic of conjunctivitis in India তে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন পশ্চিমবঙ্গের জনজীবন একাত্তরে সামান্য এই চোখের প্রদাহে কীভাবে আলোড়িত হয়েছিল। রোগটির ব্যাপক বিস্তৃতির জন্য শরণার্থীদের ভূমিকা, ক্যাম্পের জীবন তিনি তুলে ধরেছেন।[২৫৪]

এই রোগ কল্যাণী, চাপড়ার বড় আন্দুলিয়া, বেতাই, করিমপুর, শিকারপুর শরণার্থী শিবিরে ছড়িয়ে পড়ে। একসময় এটি আক্রান্ত করে কলকাতা শহরের শিবিরগুলোতে।

১৯৭১ সালের জুন মাসে কলকাতা সফরে আসেন লাইফ ম্যাগাজিনের সাংবাদিক জন সার (Jhon Saar) ও ফটোগ্রাফার মার্ক গডফেরি (Mark Godfery) তাঁরা দুজন মিলে একটি গাড়িতে করে ঘুরে বেরিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের আনাচে-কানাচে।[২৫৫] গিয়েছেন সীমান্ত এলাকার ট্রানজিট শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে। প্রত্যক্ষ করেছেন মৃত্যু, অসহায়ত্ব আর মানবিক বিপর্যয়। ১৮ জুন ১৯৭১ প্রকাশিত হয় লাইফ ম্যাগাজিনের Vol 70 No 23 সংখ্যাটি। ম্যাগাজিনটির প্রচ্ছদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের কন্যা ট্রিসিয়া লিঙ্কনের কনের সাজে এক রাজকীয় ছবি, White House Bride শিরোনামে প্রকাশিত লিঙ্কন কন্যার এই হাসিমুখ প্রচ্ছদের অন্তরালে ম্যাগাজিনটির ২২ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে ভয়াবহ এক মানবিক বিপর্যয়ের গল্প। The Pakistani Refugee Diaster শিরোনামে সাংবাদিক জন সার তুলে ধরেছেন ভিন্ন এক গণহত্যার ছবি।[২৫৬] যেখানে পাকিস্তানি গুলিতে সরাসরি হত্যাকাণ্ডের বর্ণনায়, ভিন্ন এক হত্যাকান্ড, ভয়ঙ্কর এক বিপর্যয়ের কথা উঠে এসেছে।

জুন মাসের মাঝামাঝি জন সার গিয়েছেন করিমপুরে। বৈষ্ণব ভক্তিবাদের প্রবক্তা শ্রী চৈতন্যের জন্মস্থান এই গ্রামে। পাকিস্তান সীমান্ত থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম। এই গ্রামের সীমান্ত হয়ে হাজার হাজার মানুষ প্রবেশ করছে ভারতে। পাকিস্তানি বাহিনীর তাড়া খেয়ে, গণহত্যার বর্বরতা থেকে বাঁচতে পালিয়ে, সহায় সম্বল ছেড়ে এই উদ্বাস্তু জীবন বেঁচে নেয়া। কিন্তু এই উদ্বাস্তু জীবনে এসেও রক্ষা পেল না শরণার্থীরা। নতুন এক বিপদে তারা জড়িয়ে পড়ল, জড়িয়ে পড়ল নতুন এক অন্ধকারে। তাদের চারপাশে শুধু মৃত্যু। সর্বত্র মৃত্যুর ভয়ঙ্কর থাবায় তারা আতঙ্কিত।

সাংবাদিক জন সার করিমপুরের রাস্তায় দেখতে পেলেন অসীম দৈর্ঘ্যের লম্বা শরণার্থী মানুষের মিছিল। তাদের কারো কারো মুখে রুমাল গোজা। একজনের কাছে তিনি গেলেন। কোনভাবে রুমালটি সরিয়ে লোকটি বললেন, কলেরা, কলেরা। আর কিছু বলার নেই, পেছনে পাকিস্তানি বাহিনীর গুলি, সঙ্গে কলেরা, সামনে অন্ধকার। কোথায় চলছে তারা, কেউ জানে না। একটি অনিশ্চিত জীবনকে সঙ্গী করে তারা এগিয়ে চলছে।

করিমপুরের মধ্যে দিয়ে যে রাস্তাটি চলে গেছে কলকাতা বরাবর, তার বামদিকে শরণার্থী শিবির। এখানে আশ্রয় নিয়েছে ১৫০০০ মানুষ। এই শরণার্থী শিবিরে কলেরা নির্মমভাবে হানা দিয়েছে। ৭০০ জন ইতিমধ্যে মারা গিয়েছে। বাকীরা শিবির ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পালাবে কোথায়? কলেরাও তাদের সঙ্গে চলেছে। খোলা জায়গায় পড়ে আছে মরা মানুষ। জন সার দেখতে পাচ্ছেন, ঝাঁকে ঝাঁকে শকুন

নেমে এসেছে। তীক্ষ্ণ ঠোঁট দিয়ে ছিড়ে খুড়ে খাচ্ছে মরা মানুষের দেহ। তাদের চোখ চক চক করছে। কিন্তু মৃত মানুষের সংখ্যা এত বেশি যে শকুন খেয়ে শেষ করতে পারছে না। শকুনদেরও খাওয়ায় অরুচি এসে গেছে। মরা মানুষের গা থেকে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলেছে জামা কাপড়। তাদের অনেকের তখনো গা গরম। সবেমাত্র মরেছে। পথে ঘাটে নালা নর্দমায় সর্বত্রই কলেরায় মরা মানুষ পড়ে আছে। জন সার দেখতে পেয়েছেন একটি শিশুর মৃতদেহ।

শিশুটির গায়ে একটি শাড়ির অংশ পেঁচানো। তাঁর হতভাগী মা পেঁচিয়ে পুটুলি বানিয়েছে। ট্রাকের চলার সময় অসুস্থ শিশুটি মারা গেছে। চলন্ত ট্রাক থামেনি। মৃত ছেলের জন্য ট্রাক থামানো কোনো মানেই হয় না। আরও অনেক মৃতপ্রায় মানুষ এই ট্রাকেই ধুঁকছে। আগে পৌঁছাতে পারলে হয়তো কোনো হাসপাতাল পাওয়া যেতে পারে। তাদের সুযোগ মিলতে পারে চিকিৎসার। বেঁচেও যেতে পারে। এই আশায় সময় নষ্ট করতে কেউ চায় না। শিশুটির পুটুলী করা মৃতদেহটিকে ট্রাক থেকে রাস্তার পাশে ধান ক্ষেতে ছুড়ে ফেলা দেওয়া হয়েছে।

একটি ওয়ান ডেকার বাসের ছবি তুলেছে জন সারের সঙ্গী ফটোগ্রাফার মার্ক গডফেরি। বাসটির হাতল ধরে ঝুলছে কয়েকজন হতভাগ্য লোক। আর ছাঁদে বসে আছে, সব মিলিয়ে জনা সত্তর জন। কেউ কেউ বমি করছে। কারো কারো মুখে রুমাল চাপা। কেউ কেউ রুমালের অভাবে হাতচাপা দিয়েছে। ছাঁদের মানুষের বমি জানালা দিয়ে বাসের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আর বাসের মধ্যের বমি জানালা দিয়ে বাইরে ছিটকে পড়ছে। পথে। ঘাটে। মাঠে। খালে। জলাশয়ে। মানুষের গায়ে। বমির সঙ্গে জীবনবিনাশী কলেরার জীবাণু। এইসব হতভাগ্য মানুষের চোখ গর্তের মধ্যে ঢোকানো। আর তার মধ্যে জ্বল জ্বল আতঙ্ক। বাসভর্তি করে কলেরা চলেছে। বাইরে পড়ে আছে একটি মৃতদেহ ।

এই সব মানুষ এত বেশি সংখ্যায় মরেছে যে আমরা গুণতে পারিনি। গোণা সম্ভব নয়। একজন স্বেচ্ছাসেবক সাংবাদিক জন সারকে বলছেন, এরা জানে না তারা কোথায় যাচ্ছে। তারা চলছে তো চলছেই। তীব্র রোদে হাঁটতে হাঁটতে তারা ক্লান্ত অবসন্ন। তৃষ্ণার্ত হয়ে পথের পাশ থেকে আঁজলা ভরে কলেরাদুষ্ট পানি পান করছে। তারা এত দুর্বল হয়ে পড়ছে যে, আক্রান্ত হওয়ার পর একদিনও টিকতে পারছে না। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে।

১৯৭১ সালে জুন মাসের মাঝামাঝি তখন। সবে বর্ষা শুরু হয়েছে। একটানা চলবে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। তারপর টিমেতালে বৃষ্টি হতে পারে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। জুন মাসের প্রথম বর্ষার মাঠগুলো সবুজ। সাংবাদিক জন সার শরণার্থীদের চলার পথে চলতে চলতে দেখতে পাচ্ছেন, খাল

নালায় শাপলা ফুটে আছে। এই শান্ত সৌন্দর্যের আড়ালে ভয়াবহ মৃত্যুর খেলা চলছে। ঘটে চলেছে অসহনীয় মানবিক বিপর্যয়। তিনি চোখে দেখে প্রতিবেদনটি লিখছেন।

তিনি লিখেছেন, কাঁটাখালি গ্রামে রাস্তার পাশ থেকে হৈঁচৈ করে একটি ট্রাক থামাতে চেষ্টা করছে একদল শরণার্থী। তারা করুণ স্বরে আবেদন করছে ট্রাকচালককে তাদেরকে ট্রাকে তুলে নিতে। তাদের মধ্যে যারা অসুস্থ হয়ে পড়েছে তারা রাস্তার পাশে মাটির উপরে শুয়ে আছে। তাদের পরিবার অসহায় হয়ে চেয়ে। তাদের হেঁটে যাওয়ার শক্তি নেই। যাদের সঙ্গে কিছু টাকা পয়সা আছে তারা কোনোমতে ট্রাকে উঠে পড়েছে। ট্রাকে করে তারা কৃষ্ণনগর হাসপাতালে যেতে পারবে। সেখানে চিকিৎসা পাওয়ার চেষ্টা করবে। করিমপুরের আশেপাশে গ্রামগুলোতে কোনো ডাক্তার নেই। কলেরা ভ্যাক্সিন নেই। নেই কোনো প্রতিষেধক ঔষধপত্র। কাছাকাছি কৃষ্ণনগরে একটি হাসপাতাল আছে। হাসপাতালের উদ্দেশ্যে অসুস্থ মানুষ চলেছে মানুষের কাঁধে চড়ে। কেউবা বা বাঁশের তৈরি টেম্পোরারী স্টেচারে করে।

গরুর গাড়িতে। কেউবা রিকশায়। কৃষ্ণনগর হাসপাতালে তিল ধারণের জায়গা নেই। যারা হাসপাতালে এর মধ্যে এসে পড়েছে তখনো বেঁচে আছে, তাদের রাখা হয়েছে বাইরে খোলা মাঠে। যাদের চিকিৎসা শুরু হয়েছে তাদের রাখা হয়েছে অস্থায়ী ছাউনিতে। বাঁশের কাঠামোতে কাপড় বসিয়ে ছোটো ছোটো শিবির করে চাউনি তৈরি হয়েছে। সেখানে কিছু কিছু মানুষ বেঁচে থাকার জন্য মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। তাঁদের চোখ গর্তের মধ্যে ঢুকে গেছে। অর্ধচেতন বা অচেতন জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে পড়ে আছে। তাদের মুখে মাছি পড়ছে। মশা ঘুরছে। অনন্তবিদারী দুর্গন্ধ। স্বজনদের কেউ কেউ হাত দিয়ে, তালে পাখা দিয়ে বা কাপড়ের আঁচল দিয়ে মাছি তাড়ানোর চেষ্টা করছে। সাদা এপ্রোন পরা নার্সরা তাদের শিরায় ঢোকানোর চেষ্টা করছে সেলাইন। তাদের চেষ্টার কমতি নেই। কিন্তু নার্সের বা ডাক্তারের সংখ্যা অপ্রতুল। এই হতভাগ্যদের অর্ধেকই শিশু। সাংবাদিক জন সার একটি সাত বছরের ফুটফুটে মেয়ে শিশুকে তুলে এনেছে রাস্তা থেকে। তার চোখ বড় করে খোলা। তার হাত ঝুলে পড়েছে। নার্স এক পলক দেখেই বলছে, সব শেষ। কিছু করার নেই। মেয়েটি মরে গেছে। একজন ক্লান্ত ডাক্তার বলছেন, এর চেয়ে কুকুর-বেড়ালেরাও ভালো করে মরে। কিছুটা হলেও তারা চেষ্টা তদ্বির পায়। আর এই শরণার্থী মানুষদের কলে পড়া ইঁদুরের মত মরা ছাড়া কপালে আর কিছু লেখা নেই।

এইসব মানুষেরা কেউ কেউ এসেছে ৩০০ মাইল দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে। দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে এসেছে খালি পায়ে হেঁটে, পাকিস্তানি বাহিনীর তাড়া খেয়ে। পুষ্টিকর সামান্য খাবারও অনেকের সঙ্গে নেই। বিশুদ্ধ পানীয় জল নেই। তাদের পায়ে গায়ে কাদা, ময়লা, আবর্জনা তাদের সারা গায়ে কিলবিল করছে।

এই লক্ষ কোটি শরণার্থীর পদভারে পথঘাট কাদাময়। একদা ভক্তির রসে ডুবে যাওয়া গৌরাঙ্গের কৃষ্ণনগর এক আতঙ্কের মৃতের শহর হয়ে উঠেছে।

পূর্ব পাকিস্তানে সঙ্গে ভারতের ১৩৫০ মাইল সীমান্ত এলাকা রয়েছে। এই সীমান্ত পার হয়ে যারা আসছে তারা কলেরা, টাইফয়েড, পোলিও, চর্মরোগ ও মানসিক রোগে আক্রান্ত। জুনের মাঝামাঝি পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রায় অর্ধকোটি শরণার্থী এসেছে। এদের মধ্যে কোলকাতার আশেপাশে রয়েছে ১৫ লক্ষ। আর ৩০ লক্ষ রয়েছে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে। জুনের পরে এই শরণার্থীর সংখ্যা পৌঁছে গেছে এক কোটিতে।

একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গে কলেরা ঘাতকের ভূমিকার অবতীর্ণ হয়েছিল। ঠিক কত লোক কলেরায় মারা গিয়েছে কোন সঠিক পরিসংখ্যান নেই। ৬ জুন *দৈনিক কালান্তর* লিখছে কলেরা মহামারীতে মৃতের সংখ্যা অগণিত, শুধু মাত্র নদীয়াতে মারা গিয়েছে ৩০০০। মুর্শিদাবাদে মৃতের সংখ্যা ১০০০। সরকারি হিসেব মতে ১৬ জুন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে কলেরায় মৃতের সংখ্যা ৩৪৫৩। ১৫ জুলাই পর্যন্ত সরকারি হিসেবে কলেরায় মৃতের সংখ্যা ৪৫৭৬ জন।[২৫৭] যদিও প্রকৃত মৃতের সংখ্যা এইসময় ১০,০০০ ছাড়িয়ে যায়। সরকারি হিসেবে শুধুমাত্র ক্যাম্পে মৃতের খবর পাওয়া যাচ্ছে। রাস্তাঘাটে শত শত লাশের কোন হিসাব এতে উঠে আসেনি, ৯ জুন *যুগান্তর* শিরোনাম করে ‘নদীয়াতেই ছাব্বিশ’শ শরণার্থীর মৃত্যু’, এতে দেখা যায় ক্যাম্পে মৃতের সংখ্যা ১০০০ কিন্তু রাস্তা ঘাটে বেওয়ারিশ পড়ে থাকা লাশের সংখ্যা ১৬০০। [২৫৮] কৃষ্ণনগর-শিকারপুরের রাস্তায় কলেরায় মৃতদেহ আর শকুনের অরুচির বর্ণনা জন সারের রিপোর্টে যা ওঠে এসেছে বাস্তবিকে আরো ভয়াবহ। *যুগান্তর* লিখছেন, ‘দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে শরণার্থীরা হাজারে হাজারে আসছেন। আসার পথে বহু মানুষ মারা যাচ্ছেন। তাঁদের পথের মাঝে ফেলে রেখেই আত্মীয়স্বজনরা চলে আসছেন।’ [২৫৯]

এত বেশি মৃত্যু দেখে *যুগান্তরের* প্রতিনিধি সংবাদে লিখছেন ‘অর্ধেক বোধহয় মরে যাবে’। *New York Times* এ প্রকাশিত Sydney Schanberg এর একটা প্রতিবেদন ৯ জুন ১৯৭১ *Palm beach Post* পত্রিকায় পুনরায় প্রকাশ করা হয়। *টাইমস* ম্যাগাজিনে The Bengali Refugees: A surfeit of woe শিরোনামে ১৯ জুন ১৯৭১ এ আরেকটা প্রতিবেদন প্রকাশ হয়।[২৬০] দুই জায়গাতেই কলেরার কথা বলা হয়। বলা হয় প্রথম ধাক্কাতেই কলেরার শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে ৫ হাজারের বেশি মানুষ। মানুষগুলো হয়তো পাড়ি দিচ্ছে সীমান্তের ওপারে যাবে বলে কিন্তু পথের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে

মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। হিন্দু হলে হয়তো মুখে একটু আগুন দিয়েছে। পুরো শবদাহ হয় নি। বাকিটা কুকুর শকুনের পেটে চলে গিয়েছে।

করিমপুর রিফিউজি ক্যাম্পে পাঁচজন স্বেচ্ছাসেবক ২৪ ঘন্টায় তিনশ'র মত লাশ দাফন করে যারা কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে।[২৬১]

২২ জুন ১৯৭১ এ *ওয়াশিংটন ডেইলি নিউজে* James Foster এর একটা রিপোর্ট প্রকাশ হয়। রিপোর্টটির শিরোনামই ছিল 600,000 of 5 million Refugees Have died ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১-এ Max Beattie এর আরেকটা রিপোর্ট প্রকাশ হয়। যার হেডলাইন ছিল Death reaps a Young hervest.[২৬২]

জুন মাসের মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ শরণার্থীর মধ্যে ৬০০০০ শরণার্থীর মৃত্যু একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থী জীবনের ভয়াবহতা তুলে ধরে। ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১ এ *The New York Times* এ East Pakistan: In Brief শিরোনামে একটা প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। ওখানেও শরণার্থীদের শেষ পর্যন্ত কতজন বেঁচে থাকবে সেটা নিয়ে আশংকা করা হয়।[২৬৩]

The number of refugees who fled to India has been estimated at 10 million and it is not known how many of these survive or how many will choose to return.

মালয়েশিয়ার *দ্যা স্ট্রেইট টাইমস* ৮ জুন লিখেছে কলেরার মহামারির কথা। সেখানে বলা হয়েছে মহামারিতে শরণার্থী শিবিরে এখন পর্যন্ত মৃত মানুষের সংখ্যা আট হাজার। *দ্যাগ্লবাতে নরওয়ে* লিখেছে ৩ লক্ষাধিক শিশু তীব্র অপুষ্টিজনিত মৃত্যু ঝুঁকিতে রয়েছে। *দ্যা অর্ডিন্যান্স নরওয়ে* ২৭ সেপ্টেম্বর লিখেছে শুধু ক্ষুধা ও ঠাণ্ডায় লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু ঘটেছে।[২৬৪]

The Lancet কে বলা হয়ে থাকে পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সবচেয়ে পুরনো মেডিকেল জার্নাল। এটাকে পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানজনক মেডিকেল জার্নালও বলা হয়ে থাকে। তাদের রিসার্চ জার্নালে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়েও সচেতনতা তৈরি হয়। মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থী শিবির নিয়ে একটা প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে তারা তাদের একটি জার্নালে। তাদের ভাষ্য কোলকাতার একটি স্বেচ্ছাসেবক গ্রুপকে নিয়ে, যারা একাত্তরের জুনের শেষ থেকে বাহাত্তরের ফেব্রুয়ারি শুরু পর্যন্ত পাঁচ মাস চালু থাকা একটা রিফিউজি ক্যাম্পের ওপর সার্ভে চালায়। [২৬৫]

এবং তাদের সার্ভেটি (Relief work in a refugee camp for Bangladesh refugees in India) বিশ্বাসযোগ্য। কারণ সেইসব ডাটা প্রত্যেকটি ঘর থেকে আলাদা আলাদা ভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই সার্ভের উদ্দেশ্য ছিলো ক্যাম্পের জনসংখ্যা, সেখানকার মানুষের বয়সের ধরণ আর মৃত্যুহার নিয়ে। তাদের ভাষ্য মতে ১,৭০,০০০ শরণার্থীর ঐ ক্যাম্পে কম করে হলেও ৪০০০ মানুষ মারা যায়। তারা বলেছে সংখ্যাটা আরও অনেক বেশি হতে পারে, স্বাভাবিক মৃত্যুকে তারা বিবেচনা করেনি এবং নিহতদের বড় অংশই ছিলো শিশু।

ভারতের শরণার্থী শিবিরের মধ্যে কোলকাতার শিবিরগুলোই মোটামুটি ভালো বলে বিবেচিত হয়, অন্য অনেক শরণার্থী শিবিরের অবস্থা ছিলো অনেক ভয়াবহ, ছিলো না নূন্যতম খাদ্য আর চিকিৎসা সেবা, সুতরাং সেসব শিবিরে মৃত্যুহার হওয়ার কথা আরও ভয়ঙ্কর রকম বেশি, কিছু ক্যাম্পে কলেরার প্রকোপের কথাও আমরা শুনেছি। বন্যা, শীত এসব তো বাদই দিলাম।

আরিফ রহমান 'ত্রিশ লক্ষ শহীদ বাহুল্য না বাস্তবতা' গ্রন্থে একাত্তরে শরণার্থী শিবিরে মৃতের সংখ্যা নিয়ে একটি ধারণা দিয়েছেন।[২৬৬] 'তবুও অনেক কমিয়ে এই সংখ্যাটাকেই ধ্রুব ধরে যদি শরণার্থী শিবিরে নিহত মানুষদের সংখ্যাটা কত হতে পারে সে নিয়ে ধারণা করতে চাই তাহলে হিসাবটা দাঁড়ায় অনেকটা এরকম:

১,৭০,০০০ মানুষের মধ্যে কমপক্ষে মৃতঃ ৪,০০০

তাহলে; এক কোটি মানুষের মাঝে পাঁচ মাসে ন্যূনতম নিহতের সংখ্যা প্রায় আড়াই লাখ।

ষাট লাখ জনগোষ্ঠী দেশ ছাড়ার পর এই হিসাব করা হয়েছে। পুরো হিসাবটা আরও ভয়াবহ, হয়ত এই সংখ্যাটার দ্বিগুণ কিংবা তিনগুণ। কারণ বলা হয়েছে এটা পাঁচ মাসের হিসাব আর ক্যাম্পটা কোলকাতার সেরা ক্যাম্প যেখানে ছিলো পর্যাপ্ত ডাক্তার, খাদ্য আর থাকার জায়গা আর জন সারের হিসাবে ১৫০০০ মানুষের মাঝে মৃতঃ ৭০০

তাহলে; এক কোটি মানুষের জন্য হিসাবটা হয় প্রায় পাঁচ লাখ এখানে আমরা দেখেছি এটা জুন মাসের হিসাব। যদি ধরেও নেই এই শিবিরটা প্রথম থেকেই ছিলো অর্থাৎ মার্চ শেষ দিক থেকে। তাহলে মাত্র তিন মাসের মৃত্যুর হার এটা। এই ক্যাম্প যদি ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে থাকে তাহলে সম্ভবত আপনারা সংখ্যাটা আঁচ করতে পারছেন। মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থী শিবিরে নিহত মানুষের সংখ্যা কম করে হলেও সাত থেকে থেকে নয় লক্ষ। আর যদি সর্বোচ্চ ছাড় দিয়েও হিসাব করি কোনক্রমেই পাঁচ লাখের কম হবে না।'

একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গে কলেরা ও অন্যান্য রোগে ঠিক কত লোক মারা গিয়েছিল, প্রশ্নটা করেছিলাম উৎপলা মিশ্রকে।[২৬৭] উল্লেখ্য মিসেস উৎপলা একাত্তরের সেই সময়গুলোতে রেডক্রসের কর্মী হয়ে বালুরঘাট, বসিরহাট, নদীয়াসহ সীমান্ত এলাকায় কাজ করছিলেন। তিনি ঠিক অনুমান করতে পারছিলেন না, বলছিলেন সীমান্ত এলাকাগুলো জুন মাসে লাশের স্তুপে পরিণত হয়। এই সংখ্যা তিন লাখের কম নয়। নদীয়ার মৃণাল দত্ত একাত্তরে কাজ করতেন কেন্দ্রিয় সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরে। একাত্তরে দায়িত্বে ছিলেন কলকাতায়। সারা রাজ্যের শরণার্থী মৃত্যুর হিসাব রাখার দায়িত্ব ছিল তার কাছে। বলছিলেন, একাত্তরের ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমার কাছে ৫৮৩৭ জন শরণার্থীর মৃত্যুর রেকর্ড ছিল। তবে আমার কাছে যে তথ্য বিভিন্ন জেলা থেকে আসত তাতে প্রকৃত মৃতের সংখ্যা এর প্রায় পঞ্চাশ গুণ। আমি আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করলাম, এতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থেকে তাহলে আপনি কেন মৃতের সংখ্যা চেপে গেলেন। বলছিলেন, সরকারি নির্দেশে।

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী ৮টি জেলার মধ্যে দার্জিলিং ছাড়া বাকী সাতটি জেলা ২৪ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদা, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে একাত্তরে কলেরা মহামারি ঘোষণা করা হয়। একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২৭ লক্ষ লোককে কলেরার প্রতিষেধক দেয়া হয়েছে।[২৬৮] সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত নদীয়ায় জেট ইনজেকটারের সাহায্যে কলেরার টিকা দেয়া হয়। একসময় ভয়াবহ রকমের কলেরার টিকার সংকট দেখা দেয়, সেই সময় রেডক্রসের সহায়তায় বিভিন্ন দেশ থেকে টিকা ও কলেরার চিকিৎসা সরঞ্জাম আসতে শুরু করে।

বালুরঘাট, কোচচিহার ও মুর্শিদাবাদের ডোমকলে কলেরার টিকার অভাবে অনেক শরণার্থী মারা যায়। এখানে স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীদের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ তোলেন স্থানীয় সাধারণ জনগণ। কলেরা মহামারি ঠেকাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একের পর এক নোটিশ জারি শুরু করে। এই রোগটি ছোঁয়াচে বিধায় সাধারণকে সতর্ক থাকতে বিশেষ নির্দেশনা দেয়া হয়। মৃতের সংখ্যা বেড়ে গেলে মৃতদেহ না পুড়িয়ে কবর দেয়ার আদেশ জারি করা হয়। এবার এই আদেশের বিরুদ্ধে কোথাও কোথাও প্রতিক্রিয়ারও সৃষ্টি হয়। ধর্মীয় কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক শরণার্থী মারা যাওয়ার পর মৃতদেহ দাহ করতে না দেয়ার ফলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু কলেরা জীবানুর জন্য দাহের ওপর মুশির্দাবাদে সরকারি বিধি নিষেধ জারি থাকায় প্রশাসনের সাথে শরণার্থীদের দূরত্বের সৃষ্টি হয়।

একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চাশ লক্ষ লোক চোখ ওঠায় আক্রান্ত, লক্ষাধিক শরণার্থীর কলেরায় মৃত্যু, প্রায় ৫০,০০০ শরণার্থী কলেরা জীবানু বহন, পাশাপাশি নিউমোনিয়সহ বেশ কয়েকটি মারাত্মক অসুস্থতায়

আক্রান্ত পূর্ববঙ্গের শরণার্থীরা।[২৬৯] পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ এটাকে কীভাবে মেনে নিয়েছেন? কিংবা তাদের প্রাত্যাহিক জীবনে এটার অভিঘাত কী ছিল?

মুর্শিদাবাদে সীমান্ত এলাকা কাহারপাড়া। একাত্তরে এই সীমান্ত জনপদে আশ্রয় নিয়েছিল লক্ষাধিক শরণার্থী। ভয়াবহ বন্যা, কলেরাসহ নানাধিক রোগে প্রায় পাঁচ হাজার শরণার্থীর মৃত্যু ঘটেছে মুর্শিদাবাদের জলাঙ্গী, লালগোলা, কাহারপাড়া ও ডোমকলে। জলাঙ্গীতে কথা হচ্ছিল আনিস রহমান, আবু বক্কর, আমির শেখ, আনোয়ার উদ্দীন মন্ডলের সাথে।[২৭০]

একাত্তরে এখানে সাহেবরামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্যাম্প গড়ে ওঠেছিল। বন্যায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মিছিল শুরু হয়, সাথে কলেরা। আনিস রহমান আমাকে নিয়ে যান জলাঙ্গী নদীর পাড়ে, সারি সারি বাঁশঝাড়, সারি সারি কবর। একাত্তরের নিরব ঘাতকের চিহ্ন। জানতে চাইলাম এখানে কত শরণার্থীর কবর আছে। আনিস রহমান বললেন, সেটা সংখ্যায় পরিমান করা যাবে না। একটি কবর খুঁড়ে আমরা ২০-২৫ জনকে একত্রে দিয়েছি। আগস্ট মাসে ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি হলে কবর দেওয়ার আর কোন জায়গা জলাঙ্গীতে ছিল না। কলার ভেলায় ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে শত শত মৃতদেহ।[২৭১]

নদীয়ার গল্প জন সারের বর্ণনাকে ছাড়িয়ে যায়। শত শত লাশ পড়ে আছে রাস্তায়, এতসব প্রতিকূলতা, ছোঁয়াছে রোগের ভয় সাধারণ লোকজন, স্বেচ্ছাসেবকরা মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে পাশে এসে দাঁড়ায় পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের পাশে। একদিকে কলেরা রোগীদের সেবা, ঔষধ প্রদান অন্যদিকে মৃতদেহের সৎকার। নিজে আক্রান্ত হওয়ার ভয়। সবকিছুকে উপেক্ষা করে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ একাত্তরে ভিন্ন এক সহায়তা আর অপ্রতিরোধ্য ভালোবাসার জন্ম দিয়েছিল। সোমেন গুহরায় একাত্তরের বয়স ছিল ২২ বছর। পড়তেন কলকাতায়, একাত্তরে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছেন নিজ শহর পশ্চিম দিনাজপুরে। বলছিলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ লোকজন শরণার্থীদের পাশে না দাঁড়ালে একাত্তরে মড়ক লেগে যেত'।[২৭২]

মৃত্যু শুধু বুলেটের বেশে আসেনি তখন, এসেছে বন্যা হয়ে কিংবা কলেরার চেহারায়। সেই সময়ে জীবন আর মৃত্যুর মাঝে দেয়াল হয়ে দাঁড়ালেন পশ্চিমবঙ্গের কাঁঠালি গ্রামের নলিনী মোহন বিশ্বাস।[২৭৩]

লাইফ ম্যাগাজিনের জন সার লিখেছেন - In the village of Kanthalia, a tubby, globe faced man named Nalini Mohan Biswas, welcomed 125 cholera victims into the courtyard of his home when they collapsed while passing through

town.Biswas himself was unprotected by a vaccination.Even so, he nursed the stricken refugees so conscientiously that only four died.

মানবতা কাকে বলে? শুভবোধের কোন কবচ-কুণ্ডল ধারণ করলে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায়, নিজে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা জেনেও অজানা-অচেনা শতাধিক মানুষের চিকিৎসায় নিজেকে সঁপে দেয়া যায়?

নুরুল আলম নামক এক শরণার্থী তার ক্যাম্প জীবনের বর্ণনায় সে সময়কে তুলে ধরেছেন, ‘ওই ভয়াল পরিস্থিতিতে কিছু ইন্টার্নি ডাক্তারের পেশাগত দায়িত্বের চেয়েও মানবিক মূল্যবোধ যেভাবে আমার কচি মনে নাড়া দিয়েছিল তা জীবনের শেষ মুহূর্তেও ভুলতে পারব না। ওখানে রোগীদের সবাইকে তাঁবুর ভেতর রাখার মত জায়গা ছিল না। হাসপাতালটির চারদিকে ছিল তাঁবু ঘর, মাঝখানের একটি বড় ফাঁকা জায়গায় ত্রিপালের সামিয়ানা টাঙিয়ে তার নিচে চলছিল চিকিৎসা সেবা। সেখানেই রোগীর শরীরে দেয়া হচ্ছিল স্যালাইন। ওই সামিয়ানার নিচে চোখ বুলিয়ে দেখা যায়, শত শত কাচের স্যালাইনের বোতল ঝুলছে। ইন্টার্নি ডাক্তাররা নিরলসভাবে রাতদিন রোগীদের সেবায় নিয়োজিত। একরাশ বিস্ময় নিয়ে দেখি, রোগীরা সারা অঙ্গন জুড়ে পায়খানা করছে, বমি করছে, আর ইন্টার্নি ডক্তাররা হাতে গ্লাভস পরে নির্বিকারভাবে ওই সমস্ত পায়খানা-বমি মেঝে থেকে তুলে তুলে বালতিতে রাখছেন। যে সব কাজ অনেক সময় মায়েরাও সহজে সন্তানদের জন্য করতে চান না, মৃত্যু ঝুঁকি সত্ত্বেও সেসব কাজ সুইপারদের দিয়ে না করিয়ে ডাক্তাররা নিজ হাতে করছেন। এ ধরনের দৃশ্যাবলি দেখার পর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ি, ওই মহান ইন্টার্নিদের কথা মনে পড়লে আজও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। তাঁদেরকে তখন মানুষ নয়, ফেরেস্তা মনে হতে থাকে’। [২৭৪]

শরণার্থী ইস্যুতে জাতিসংঘের টনক নাড়ানোর জন্য যুক্তরাজ্য ভিত্তিক সহায়তা প্রতিষ্ঠান অক্সফাম এগিয়ে আসে। তারা প্রকাশ করে টেস্টিমনি অব সিক্সটি।[২৭৫] ষাট জন বিশ্ব বরেণ্য মানুষের সাক্ষ্য। সাক্ষ্যদাতাদের মাঝে আছেন মাদার তেরেসা, সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি, সাংবাদিক জন পিলজার, মাইকেল ব্রানসন, নিকোলাস টোমালিন, এন্থনি মাসকারেনহাস এবং আরও অনেকে।

বিরাট সেই দলিলে সাংবাদিক সানিকোলাস টেমালিনের লেখা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি; যদি এই শিশুদের অতিরিক্ত প্রোটিন দেওয়া না হয়, তাহলে এরা অবশ্যই মারা যাবে। শিশুদের চার ভাগের তিন ভাগ নয় মাসের মধ্যে অবশ্যই মারা যাবে। তার মানে ‘দশ লাখ শিশু’।

ষাটজনের সাক্ষ্য থেকে সিনেটর কেনিডির লেখাটি উল্লেখযোগ্য, সিনেটর কেনিডি বেশ কয়েকটি শরণার্থী শিবিরে যান। তিনি লিখেছেন, গত তিরিশ বছরে পৃথিবী যত দুর্যোগ মোকাবেলা করেছে তার মধ্যে

ভয়াবহটি হচ্ছে পাকিস্তানের সংকট। তিনি লিখেছেন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ গড়াচ্ছে আর মৃত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। কেউ কেউ ভারতে যাচ্ছেন আর ৯০ লাখের মধ্যে মাত্র কয়েকশ জনকে খাওয়াচ্ছেন এবং শুশ্রূষা দিচ্ছেন।

কোলকাতার সল্ট লেকের শরণার্থী শিবির ঘুরে এসে তিনি জানান ওখানকার ২ লাখ ৫০ হাজার শরণার্থী মোটামুটি ভালো আছেন তারপরেও তার মতে সেখানকার শিশুদের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। বিদেশি ও ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের মতে এই অবস্থা চলতে থাকলে মোট শিশুদের তিন চতুর্থাংশ নয় মাসের মধ্যেই মারা যাবে সংখ্যাটা ১০ লাখ! [২৭৬]

তিনি লিখেছেন, ৩০ হাজার শরণার্থীর দিয়ারা ক্যাম্পের কথা যেখানে বন্যায় পুরো ক্যাম্পটাই তলিয়ে যায়। সেখানকার পরিবারগুলো কাদায় ঢাকা, নিজেদের মল-মূত্র কখনোই ঠিকমত পরিস্কার করা সম্ভব হয় না। পানি ভেঙ্গে খাবার আনতে হয়, ওষুধ থেকেও তারা বঞ্চিত পুরোপুরি। বন্যার পর আসছে শীত, এই মুহূর্তে ৯০ লক্ষ মানুষের চাই ৩০ লক্ষ কম্বল। এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাপড় ও তাবু এর সাথে বাড়ছে কলেরার প্রকোপ।

তিনি লিখেছেন, আমি দেখেছি এক ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্পের অবস্থার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য। কিন্তু অধিকাংশই বর্ণনা দেয়া অসম্ভব। ক্যাম্পগুলোতে শিশু এবং বৃদ্ধের সংখ্যা মোট শরণার্থীর ৫০ শতাংশ। যাদের বয়স পাঁচ থেকে কম এবং যারা বয়োবৃদ্ধ তারাই সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী, এরকম বয়সের মানুষের সংখ্যাই শিবির গুলোতে বেশি, এরা মোট শরণার্থীদের পঞ্চাশ শতাংশ। এদের বেশিরভাগই মৃত্যুবরণ করছে। শরণার্থী শিবিরের মাঝখান দিয়ে হেঁটে গেলে দেখে দেখে সনাক্ত করা সম্ভব এক ঘণ্টার মধ্যে কারা মারা যাবে, আর কাদের ভোগান্তি চিরতরে শেষ হওয়াটা কেবল কয়েকদিনের ব্যাপার মাত্র। শিশুদের দিকে দেখুন, তাদের ছোট হাড় থেকে আলগা হয়ে ভাঁজে ভাঁজে ঝুলে পড়া ত্বক, এমনকি তাদের মাথা তোলার শক্তিও নেই। শিশুদের পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখুন পা ও পায়ের পাতার পানি নেমে অপুষ্টিতে ফুলে আছে। তাদের মায়ের হাতও নিস্তেজ। ভিটামিনের অভাবে তারা অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আর সবচেয়ে সবচেয়ে বেশি কঠিন দৃশ্য, গতরাতে যে শিশুটি মারা গেছে, তার মৃতদেহও এখানেই।

আমি যখন একজন শরণার্থী শিবিরের পরিচালককে জিজ্ঞাসা করলাম তার সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজনটি কি। জবাব এল, 'একটি শবচুল্লি'। পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ একটি ক্যাম্পের তিনি পরিচালক।[২৭৭] ব্রিটিশ গণমাধ্যম সানডে টাইমস ১৯৭১ সালের ১৩ জুন সংখ্যায় যন্ত্রণার মিছিল (procession of trouble) শিরোনামে বাংলাদেশি শরণার্থীদের দুর্ভোগের চিত্র তুলে ধরে লিখেন, ভারত ও পাকিস্তান সীমান্তের একটি

কর্দমাক্ত শহর বারাসাত। এর স্বাভাবিক জনসংখ্যা ২১ হাজার। এশিয়ার মানদন্ডে বিচার করলে এখানকার হাসপাতালটি কোনো রকমে এই অধিবাসীদের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করতে পারে। গত সপ্তাহে দেড়-দুই লাখ লোক বানের পানির মতো বারাসাত শহরে ঢুকে পড়েছে। তারা শহরের চারদিকের জমিতে গিজগিজ করছে। স্কুল, কলেজ, সিনেমা হল এবং পতিত জমিতে এদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।...হাসপাতালের প্রধান ঘরটির পেছনে কলেরা বিভাগ। এতে বিছানা নেই। পাকা মেঝের ওপর ধাতব পাতে রোগীরা শোয়...চারজন লোক মৃতদেহগুলোকে নিয়ে যাচ্ছে।

দি এইজ- এ Max Beattie এর একটা প্রতিবেদন প্রকাশ হয় ১৯৭১ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বরে। এখান থেকে জানা যায় ৮.৯ মিলিয়ন শরণার্থীর মধ্যে ১.৫ মিলিয়নই শিশু।[২৭৮] নিয়মিতই শিশু মারা যাচ্ছে। এরকম চলতে থাকলে জানা নেই যুদ্ধ শেষ হতে হতে কতজন শিশু বেঁচে থাকবে। মাদার তেরেসার সাক্ষাৎকার থেকেও শিশুদের অবস্থার কথা জানা যায়, ঠিক কতটা খাদ্যের অভাব হলে ছয়মাসের বাচ্চাকেও প্রোটিন বিস্কুট খাওয়ানো হয় ভাবতে পারেন?

বাচ্চাগুলো জন্মগ্রহণও করেছে কত নির্মমভাবে। কেউ গাছতলায়, কেউ নদীর ধারে, কেউ নৌকায়, কেউ শরণার্থী শিবিরে। কোন এক মা পাকিস্তানিদের তাড়া খেয়ে বৃষ্টির মধ্যে সন্তানকে কোলে নিয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে এসেছে শিবিরে। কিন্তু এসে দেখে বাচ্চাটি মৃত। বাচ্চার কোন রোগ ছিল না, ছিল একটুখানি দুধের অভাব। বিপদের মধ্যে মায়েরও খেয়াল ছিল না বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর কথা। এক মায়ের ছয় সন্তান ছিল। কিন্তু সে যখন ক্যাম্পে পৌছায় তখন তার কোলের সন্তান ছাড়া আর কেউ জীবিত ছিল না!

সল্ট লেক শরণার্থী শিবিরের নার্স Miss Bridge Battey এর সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় ক্ষুধার জন্য কোন কোন বাবা-মা বাচ্চাদেরও পরিত্যাগ করে দিয়েছে। তিনি একটি বাচ্চাকে পেয়েছিলেন ড্রেনে পরে সেই বাচ্চাকে আরেক সন্তানহারা মা গ্রহণ করেন। কি এক ভাগ্যের পরিহাস চলেছিলো মানুষগুলোর মধ্যে। কেউ খাদ্যের জন্য কাঁদছে, কেউ সন্তানের জন্য, কেউ স্বামীর জন্য, কেউ পরিবারের সবাইকে হারিয়ে।

৩ এপ্রিল ১৯৭১ এ *যুগান্তর* পত্রিকায় দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের, 'এখান থেকে এরা কোন ভবিষ্যতে পাড়ি দেবে?' [২৭৯] শিরোনামে একটা প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। তিনি লিখেছেন, 'আমরা সবে হাসনাবাদে নেমেছি, দেখি তীর থেকে বোঝা মাথায় মানুষের সারি এগিয়ে আসছে। ওরা শুনেছে বারাসতে নাকি নতুন রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে। সেখানে যাবে।

হাঁটবে অতদূর?

আর কী করা বাবু? নৌকোয় আর কদ্দিন কাটে? ছিলো সের পাঁচেক চাল। তাই এক বেলা করে খেয়ে পাঁচ সাত দিন চলছে। শুনছি ক্যাম্পে নাকি চাল ডাল দিতে আছে।

ঠিক জানো তো যে বারাসতে গেলে জায়গা পাবে?

তা ঠিক জানি না। যাই, দেখি ঘুরে যদি না পাই তবে না খেয়েই মরবো। মরণ যদি কপালে থাকে এ পাড়েই মরবো।"

মরা কত সহজ ছিল মানুষগুলোর কাছে। যেখানে জীবনে আগামী দিনটা কেমন যাবে জানা ছিল না সেখানে বোধহয় মরাটা খুব শান্তির! কতশত দুধের বাচ্চার কপালে জুটেনি মায়ের বুকের একফোঁটা দুধ। এ দৃশ্য কি চোখে দেখার! তবুও দেখতে হয়েছিলো একটা সময়ে। একাত্তরে। সেরকমই একটা ঘটনার খানিকটা তুলে দিচ্ছি- 'এতো বেশি সংখ্যায় হাড্ডিসার শীর্ণশিশু মায়ের স্তন চুষছে এবং তাঁদের লোমচর্ম বৃদ্ধের মতো দেখাচ্ছে। এ ধরনের জিরজিরে শিশু কোলে নিয়ে স্তন্যপানের ব্যাপারটায় মায়েরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। এ দৃশ্যটায় তাঁরা অকারণে আঁতকেও উঠছে না। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে যদি শিশুটি না খেতে চায়, যে কোনো তরল প্রত্যাখান করে, তাহলে তাঁকে আর তোষামোদ না করেই ফেলে রাখা হচ্ছে।' শরণার্থী শিবিরের এই ঘটনাটি বিবৃত করেছেন ডা. মেয়ার কারিতাস। [২৮০]

একাত্তরে শরণার্থীদের জন্য হাসপাতাল নির্মাণের প্রথম উদ্যেগটা গ্রহণ করেন কলকাতা পৌরসভা।[২৮১] ৮ এপ্রিল কলকাতা পৌরসভার মেয়র হরিদাসপুর সীমান্তে একটি অস্থায়ী ট্রানজিট শরণার্থী হাসপাতাল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার্থে সীমান্ত সংলগ্ন ২৪ পরগনার বাকছড়ায় নেতাজি ফিল্ড হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়। যশোর রোডের ওপর পেট্রোপোল-বনগাঁ সীমান্ত থেকে বার মাইল দুরে একটি দোতলা বাড়িতে এই হাসপাতালটি চালু করা হয়। এর ইনডোর, আউটডোর ২টি বিভাগ করা হয়। ২৫ টি সার্জিক্যাল শয্যা ও ১টি পরিপূর্ণ অপারেশন থিয়েটারসহ হাসপাতালটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ১৪ জুলাই। আগস্টের দিকে অতিরিক্ত রোগীর চাপে তাঁবু খাটিয়ে হাসপাতালটির ৫০টি শয্যা বৃদ্ধি করা হয়। বর্হিবিভাগে শিশু চিকিৎসা, চোখ, কান ও পরিবার পরিকল্পনার সেবা দেয়া হত। এই হাসপাতাল পরিচালন কমিটিতে ছিলেন ডাঃ শিশিরকুমার বসু (চেয়ারম্যান), ডাঃ জ্যোতির্ময় চ্যাটার্জি (কোষাধ্যক্ষ), ডাঃ এস কে হাজারী ও ডাঃ সত্যেন বসু এবং ডাঃ শচীন রায় (পরিকল্পনা)। [২৮২]

হাসপাতালটি উদ্বোধন করতে গিয়ে অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রী বসু এ শতাব্দীর অন্যতম অগ্রগণ্য মুক্তিযোদ্ধা সুভাষচন্দ্রের দেশে বিদেশে সেবাধর্মের কথা স্মরণ করে বলেন, তাঁর বিশ্বাস, বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এই হাসপাতালের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পাবে এবং আধুনিকতম সরঞ্জামে সুসজ্জিত হবে। একাত্তরে এই হাসপাতালে অনেক আহত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা চিকিৎসা সেবা নেন। রণাঙ্গনে গুলিবিদ্ধ অনেক মুক্তিযোদ্ধার অপারেশন করানো হয়। রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তার পাশাপাশি হাসপাতালটি ট্রানজিট শরণার্থীদের চিকিৎসা সহায়তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

পশ্চিম জার্মানি সরকারের পক্ষ থেকে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সহায়তায় ৬০ বেডের অত্যাধুনিক একটি চলন্ত হাসপাতাল কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে প্রেরণ করা হয়।[২৮৩] পশ্চিম জার্মানির অস্থায়ী কনসাল জেনারেল ডঃ কে এইচ ঘুনো কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারী কর্ণেল পি এন লুথরার হাতে এটি দান করেন। হাসপাতালে দুটি অ্যাম্বুলেন্স, ডিসপেন্সারী, অপারেশন টেবল ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। দ্রুত চিকিৎসা সহায়তা দেয়া ও মারাত্মক আহত যোদ্ধাদের চিকিৎসায় এটি সহায়ক হয়। এছাড়াও শরণার্থীদের চিকিৎসা সেবায় পশ্চিম জার্মানী রেডক্রস সোসাইটি ভারতীয় রেডক্রস পশ্চিমবঙ্গ শাখাকে ১০৫ শয্যার একটি হাসপাতাল দান করেন। ২ আগস্ট ১৯৭১ কলকাতায় পশ্চিম জার্মানীর ভারপ্রাপ্ত কনসাল জেনারেল আনুষ্ঠানিকভাবে হাসপাতালটি ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটির হাতে তুলে দেন।

বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গে তিনটি ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল প্রেরণ করা হয়। ২৫ এপ্রিল প্রথম ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালটি নদীয়া সীমান্তে পাঠানো হয়।[২৮৪] দিল্লীতে বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির যে কমিটি বোর্ড গঠিত হয়েছে, তার একটি সমন্বয়ক কমিটি এই সময় পশ্চিমবঙ্গে গঠন করা হয়। সমন্বয়ক কমিটির প্রধান এস. সি. রায়, এতে পশ্চিমবঙ্গ রেডক্রসের চেয়ারম্যান জে. সি. দে ও ইন্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি হিসেবে ডাঃ এস রায় চৌধুরীকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই কমিটির তত্ত্বাবধানে ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালগুলো পরিচালিত হতে থাকে।

একাত্তরে শরণার্থী ও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসায় তাৎপর্যময় ভূমিকা রাখেন কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও বনগাঁ হাসপাতাল। বিশেষ করে রণাঙ্গনে আহত অনেক গুলিবিদ্ধ ও আহত মুক্তিযোদ্ধাকে হাসপাতালগুলো সেবা দিয়েছে। কলকাতা মেডিকেলে করা হয়েছে বেশ কিছু ঝুকিপূর্ণ অপারেশন।

একাত্তরে কলেরার প্রকোপ মহামারি আকার ধারণ করলে কল্যানী নেহেরা হাসপাতালকে বিশেষায়িত কলেরা হাসপাতাল ঘোষণা করে এতে কলেরায় আক্রান্তদের জন্য বিশেষ সেবা চালু করা হয়। কলেরা

ভিন্ন অন্যান্য চিকিৎসা সেবা এই হাসপাতালটি বন্ধ করে দেয়। হাসপাতালে ১৯০টি অতিরিক্ত বেড সংযুক্ত করা হয়। শরণার্থীদের চিকিৎসায় কল্যানীর আরেকটি হাসপাতাল 'কল্যানী গান্ধী হাসপাতালকে' শয্যাবৃদ্ধি করে সাধারণ হাসপাতালে রুপান্তর করা হয়।

শাঁড়াপুল ও টাকিতে রাজ্য সরকারের উদ্যেগে শরণার্থীদের জরুরী চিকিৎসা সেবা দেয়ার জন্য ২টি অস্থায়ী হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়। এগুলো যথাক্রমে ২৪ ও ১৪ শয্যার। জরুরী ভিত্তিতে এখানে ডাক্তার, নার্স নিয়োগ করা হয়।[২৮৫]

এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে শরণার্থীদের সহায়তায় অস্থায়ী হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়েছে। বসিরহাট, হাসনাবাদ, বালুরঘাট, মুর্শিদাবাদ, লালগোলা, পশ্চিম দিনাজপুর, বনগাঁসহ সীমান্তবর্তী অনেক স্থানে গড়ে উঠেছিল অস্থায়ী হাসপাতাল ও প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র। গড়ে উঠেছিল বেশ কয়েকটি দাতব্য চিকিৎসালয়। ১২ জুন ১৯৭১ *দৈনিক যুগান্তরের* সংবাদে দেখা যায়, বাদুড়িয়া (বসিরহাটে) ডাক বাংলোতে ছয় শয্যার একটি অস্থায়ী হাসপাতালের উদ্বোধন করা হয়।[২৮৬]

এছাড়া বিভিন্ন স্থানে অস্থায়ী তাঁবু করে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র ও ট্রানজিট মেডিকেল ক্যাম্প খোলা হয়েছে। বিভিন্ন হাসপাতালে অতিরিক্ত বেড সংযুক্ত করে শরণার্থী ও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবাদানের কার্যক্রম শুরু করা হয়। বাংলাদেশের শরণার্থী শিশুদের মধ্যে যারা অপুষ্টি ও অন্যান্য রোগে ভুগছে তাদের জন্য সেভ দি চিলড্রেনের অর্থায়নে ৭০ শয্যার একটি অত্যাধুনিক হাসপাতাল চালু করা হয় কল্যানীতে। বিদেশ থেকে আগত শিশু বিশেষজ্ঞ ও পুষ্টিবিদের সমন্বয়ে, প্রশিক্ষিত নার্স, ঔষধ ও অ্যাম্বুলেন্স সম্বলিত হাসপাতাটির পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত করা হয় ডাঃ রোজার হিকম্যানকে। এই হাসপাতালে বহির্বিভাগে দৈনিক ৫০ জন শিশুকে চিকিৎসা সেবা দেয়া হত। পাশাপাশি এতে শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাবার বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষার্থী স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে এখানে দোভাষীর দায়িত্ব পালন করেন।[২৮৭]

স্টেট হেলথ সার্ভিসেস (নন প্র্যাকটিশিং) অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশের বিপুল শরণার্থীদের সহায়তায় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে এক জরুরী সভা ডাকেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয় ইউনিয়নের অন্তভুক্ত সদস্যরা বিনামূল্যে বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে সেবা দিবেন। ডাঃ গুরুদাস রায়ের নেতৃত্বে সংগঠনটি একাত্তরে বালুরঘাটের বিভিন্ন ক্যাম্পে তৎপরতা চালান। [২৮৮]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতি শরণার্থীদের চিকিৎসা সেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ও সিনেট সদস্য ড. পি কে চ্যাটার্জি, ড. বিবেক সেনগুপ্ত ও

প্রবোধ রায় বিনামূল্যে বেশ কিছু ঔষধ সরবরাহ করেন। কল্যাণ মুর্খার্জী ও তাঁর স্ত্রী নিজ খরচে কয়েকজন অসুস্থ ও আহত মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিশেষ করে মৃন্ময়ী বোস মেডিকেল কোরের দায়িত্ব নেয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতি চিকিৎসা সেবায় সরাসরি সম্পৃক্ত হয়। এই সময় পদ্মজী নাইডু ও শ্রীমতি লালের অবদান বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।[২৮৯]

শরণার্থীদের সহায়তায় সল্টলেক এলাকায় একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের উদ্যোগে একটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়। যেখানে পশ্চিমবঙ্গের হোমিও চিকিৎসকরা শরণার্থীদের বিনামূল্যে সেবা প্রদান করেছেন । ডাঃ রামকৃষ্ণ ঘোষের নেতৃত্বে ২০ জন হোমিও চিকিৎসা এখানে নিয়মিত চিকিৎসা সেবা ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করেছেন।[২৯০]

পশ্চিমবঙ্গের ডাক্তারদের সংগঠন বেঙ্গল মেডিক্যাল ইউনিয়নের উদ্যোগে ২৪ পরগনা ও নদীয় জেলায় ৪টি মেডিক্যাল রিলিফ সেন্টার চালু করেন। এগুলোর দায়িত্বে রয়েছেন যথাক্রমে ডাঃ শান্তিপ্রিয় ঘোষ, ডাঃ মহেন্দ্র সিংহ, ডাঃ কে কে ভট্টাচার্য, ডাঃ সুভাষ বোষ। বেঙ্গল মেডিক্যাল ইউনিয়নের সদস্যগণ এই রিলিফ সেন্টারগুলোর সমুদয় খরচ নির্বাহ করছেন। প্রতিদিন এই সকল সেন্টারে বিনামূল্যে কলেরা, জয় বাংলা ও অন্যান্য রোগের হোমিও চিকিৎসা দেয়া হত। শরণার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বেঙ্গল মেডিকেল ইউনিয়ন নতুন করে কয়েকটি মেডিকেল রিলিফ সেন্টার খোলার উদ্যোগ নেয়, ইউনিয়নের সম্পাদক ডাঃ এস ঘোষ ১৯ জুন এক আবেদনে, যারা বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতে আগ্রহী তাদের ৪৮ বি, শাঁখারীটোলা ষ্ট্রীট, কলকাতা-১৪ এই ঠিকানায় যোগাযোগের অনুরোধ জানান। [২৯১]

এছাড়াও ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মিশন ১২ জুন ১৯৭১ ডাঃ তপন চ্যাটার্জির নেতৃত্বে একটি দল গঠন করে শরণার্থী চিকিৎসা সেবায় এগিয়ে আসেন। ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মিশনের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ রাম দাশ এক বিবৃতিতে ঔষধ ব্যবসায়ীদের প্রতি বিনামূল্যে তাদের কার্যলয় ১৭২/১ শিবপুর রোড, হাওড়া-২ এ ঔষধ প্রেরণের আহ্বান জানান।[২৯২]

এছাড়াও পশ্চিম দিনাজপুর, আলিপুর, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকরা শরণার্থী সেবায় এগিয়ে আসেন।

বৃটেনের বৃহত্তম দাতব্য প্রতিষ্ঠান অক্সফাম একাত্তরে শরণার্থীদের স্বাস্থ্যসেবায় নিরলস কাজ করেছেন। বিশেষ করে যখন তীব্র ঔষধ সংকট দেখা দিয়েছে, অক্সফাম এগিয়ে এসেছে। জুনে প্রতিষ্ঠানটি ১৯ টন স্যালাইন ওয়াটার ও ৫ লক্ষ সিরিঞ্জ সরবরাহ করেন। অক্টোবরে তারা ৩০ টন চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ করেন। ১৮ জুন ১ লক্ষ কলেরার টিকা সরবরাহ করেন পশ্চিমবঙ্গে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে আহত, গুলিবিদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রক্তদানের উদ্যোগ নেন বনগাঁ ও পশ্চিম দিনাজপুরে কিছু স্থানীয় তরুণ। তারা সংগৃহীত রক্ত সীমান্তপাড়ের হাসপাতাল ও ট্রানজিট মেডিকেল ক্যাম্পগুলোতে প্রেরণ করেন। ১৪ এপ্রিল ১৯৭১ হাওড়ায় মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে রক্তদান কর্মসূচির উদ্যোগ নেয় হাওড়া জেলা কংগ্রেস।[২৯৩] সকাল ৯টা থেকে হাওড়া কংগ্রেস ভবনে বিপুল সংখ্যক সাধারণ লোকজন, পার্টির নেতা কর্মী বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে স্বেচ্ছায় রক্তদানে অংশ নেন। মুক্তিযুদ্ধের সূচনায় আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসায় কলকাতা মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক থেকে অনুরোধ জানানো হয় সকলকে রক্ত দানের। আলিপুর সেন্ট্রাল জেল হাসপাতালেও একই অনুরোধ জানানো হয়। যারা রক্তদানে আগ্রহী তাদের রক্তের গ্রুপ, নাম ও যোগাযোগের নম্বর নিবন্ধন করার আহ্বান জানানো হয়। এতে সাড়া দিয়ে বিপুল সংখ্যক সাধারণ লোকজন রক্তদানের তাদের আগ্রহ প্রকাশ করে নিবন্ধন করেন। জরুরি রক্তদানের জন্য একটি হট-লাইন সেবা চালু করা হয়।[২৯৪]

রেডক্রস, ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের পাশাপাশি শরণার্থীদের স্বাস্থ্যসেবায় ভূমিকা রাখেন লায়ন্স ক্লাব। বিশেষ করে ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন লায়ন্স ক্লাব একাত্তরে শরণার্থীদের শিশু ও মহিলাদের স্বাস্থ্য সেবায় নিরলস কাজ করেছেন। সংগঠনটি একাত্তরের প্রতিদিন একশত শিশুর মধ্যে পুষ্টিকর জলখাবার, সীমান্ত এলাকায় প্রতিদিন ৩০০ শরণার্থীর সেবা ও পুষ্টিকর খাবার প্রদান করেছেন। সংগঠনটির প্রেসিডেন্ট কে সি বসুর উদ্যোগে তারা কলকাতার এম এন চ্যাটার্জী মেমোরিয়াল আই হাসপাতালে একটি কেবিন প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে কেন্দ্রে শরণার্থীদের জন্য বিনামূল্যে ডাক্তার দেখানো এবং বিভিন্ন প্যাথলজিক্যাল টেস্টের ব্যবস্থা করা হয়।

রোটারি ক্লাবও একাত্তরে আর্ত শরণার্থীদের সহায়তায় এগিয়ে আসেন। ২২ আগস্ট রাজ্য রোটারি সভাপতি কে এন মুখার্জি সীমান্ত এলাকায় কলেরায় আক্রান্ত শরণার্থীদের সহায়তায় ২০০০০ টাকার চিকিৎসা সরঞ্জাম ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনকে প্রদান করেন। পাশাপাশি একটি চিৎিসা তহবিল গড়ে তুলেন।[২৯৫]

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কারিতাস ইন্ডিয়া সল্টলেক শরণার্থী শিবিরে একটি হাসপাতাল চালু করেন। ক্যাথলিক রিলিফ সার্ভিসেস এর সহায়তায় সংস্থাটি ২৭০ শয্যার একটি হাসপাতাল চালানোর পাশাপাশি প্রতিদিন ৮৫০ জন শরণার্থীকে বর্হিবিভাগে চিকিৎসা দেন।

বসিরহাট, টাকী ও হাসনাবাদে আশ্রয় নেয়া প্রায় ৮০ হাজার শরণার্থীর চিকিৎসার জন্য কলকাতা লায়ন্স ক্লাব একটি ভ্রাম্যমান হাসপাতাল চালু করেন। যেটিতে দৈনিক ৫০০ রোগীকে সেবা দেয়া হত।[২৯৬]

পিপলস রিলিফ কমিটি বা পি আর সি শরণার্থীদের স্বাস্থ্যসেবায় বনগাঁ, নদীয়া, বর্ধমান, বারাসাত, পশ্চিম দিনাজপুর ও কলকাতার সল্টলেকে আউটডোর চিকিৎসা কেন্দ্র খোলেন। পিআরসি বনগাঁয় একটি হাসপাতাল চালু করেন। শরণার্থীদের টিকা দানের জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবক টিম গড়ে তোলেন। এছাড়া এই কমিটির উদ্যোগে রেডক্রসের সহায়ক সীমান্ত এলাকায় কলেরার টিকা সরবরাহ করা হয়।[২৯৭]

একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১১ লক্ষ শরণার্থী শিশু আশ্রয় নেন। পূর্ব বাংলা থেকে আগত শরণার্থী পরিবারগুলোর ৮ বছরের কমবয়সী এই ১১ লক্ষ শরণার্থী ভয়াবহ অপুষ্টির শিকার হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অক্টোবরে শরণার্থী শিশুদের অপুষ্টি থেকে বাঁচাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে ১০০টি পুষ্টি চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের অনুরোধ জানান। ১৬ অক্টোবর ১৯৭১ প্রায় তিন কোটি টাকা ব্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম দিনাজপুরে ৭টি, মালদায় ৫টি, নদীয়ায় ৪টি, মুর্শিদাবাদে ৪টি ও ২৪ পরগণায় ৩টি চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেন। স্থানীয়রা যেগুলোতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[২৯৮]

এছাড়া রেডক্রসের উদ্যোগে অপুষ্টির শিকার শিশুদের নানা ধরনের ভিটামিন, দুধ ও পুষ্টিকর খাবার বিতরণ করা হয়। নদীয়, বারাসাত ও বালুরঘাটে স্থানীয় তরুণদের সহায়তায় শিশুদের জন্য ফিডিং সেন্টার খোলা হয়। নদীয়া শহরে শিশুদের বিনামূল্যে দুধ বিতরণের উদ্যোগ নেয় স্থানীয় একটি সংগঠন।[২৯৯] ভারতীয় রেডক্রস নদীয়া জেলা শাখা রানাঘাট রেলষ্টেশনে অবস্থানরত শরণার্থী পরিবারের শিশু ও অসুস্থদের প্রতিদিন দুধ বিতরণ করেছে।

বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর গণহত্যার প্রতিবাদে বেঙ্গল মেডিক্যাল ইউনিয়ন প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউট হলে পশ্চিমবঙ্গের ৩২,০০০ চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ভারত সরকারের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়। ডাঃ কে কে ভট্টাচার্য বলেন, ‘আমরা নীরব দর্শক না হয়ে ওদের পাশে গিয়ে লড়তে চাই’।

২৮ অক্টোবর ১৯৭১ পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে অসামরিক লোকদের হত্যা, নারী নির্যাতন ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী মিছিলের আয়োজন করেন পশ্চিমবঙ্গ চিকিৎসক ইউনিয়ন। প্রায় সহস্রাধিক চিকিৎসক এতে উপস্থিত ছিলেন।[৩০০]

একাত্তরে জামশেদপুরের ষোলজন চিকিৎসক নিয়েছিলেন ভিন্ন এক উদ্যোগ। চিকিৎসকদের এই দলটি শরণার্থীদের সহায়তায় প্রথমে স্থানীয়ভাবে ঔষধপত্র সংগ্রহ শুরু করেন, পর্যাপ্ত ঔষধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম

সংগ্রহের পর অক্টোবরে তারা চলে যান পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সীমান্তে। শরণার্থীদের চিকিৎসা ও বিনামূল্যে ঔষধ সংগ্রহের পাশাপাশি তারা শরণার্থী শিবিরগুলোতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে কাজ করেন।

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে এপ্রিল মাসে বাংলাদেশের আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় ডা: গুরুপদ শান্ডিল্যের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকায় কার্যক্রম শুরু করেন। এই চিকিৎসক দলকে চিকিৎসা সরঞ্জাম ও ঔষধপত্র সরবরাহে এগিয়ে আসেন দেজ মেডিকেল স্টোর্স, স্ট্যানিস্ট্রিট, এম ভট্টাচার্য, পি. কে গুহ, ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মা-সিউটিক্যাল ওয়াকার্স। এই দলটি বনগাঁ, পশ্চিম দিনাজপুর, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ সীমান্তে তাদের কার্যক্রম চালান।[৩০১]

পশ্চিমবঙ্গের তরুণতীর্থ ক্লাবের উদ্যোগে একাত্তরে তরুণতীর্থ মেডিকেল ইউনিট গড়ে তোলা হয়। আহত শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সহায়তায় ইউনিটটি কাজ করেন। তরুণ তীর্থের সমাজকল্যাণ সম্পাদক ডা: প্রবীর সেনগুপ্তের নেতৃত্বে গঠিত মেডিকেল ইউনিটটি চিকিৎসা সহায়তার পাশাপাশি বিভিন্ন ত্রাণ কার্যক্রমেও অংশ নেন।[৩০২]

গান্ধী শান্তি সংস্থার উদ্যোগে একাত্তরে শরণার্থী ক্যাম্পের যুবক-যুবতীদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও নার্সিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে শান্তি সংঘ ও সর্বসেবা সংঘ এই ধরনের ৬টি প্রশিক্ষণ স্কুল খোলেন। যেগুলোতে প্রায় ২০০০ শরণার্থী যুবক-যুবতীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োগ করা হয়। পাশাপাশি স্থানীয় বেশ কিছু তরুণ-তরুণীকে স্বেচ্ছাসেবক স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে গান্ধী শান্তি সংস্থা প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।[৩০৩]

একাত্তরে বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল নন-রেজিস্টার্ড ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন। বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বরতার প্রতিবাদে সংগঠনটি এপ্রিলে প্রতিবাদ মিছিল বের করেন। এছাড়া এই সংগঠনের সদস্য পশ্চিমবঙ্গের পঁচিশ হাজার নন-রেজিস্টার্ড অ্যালোপ্যাথ চিকিৎসক একাত্তরে শরণার্থীদের সেবায় কাজ করেছে। বিভিন্ন ক্যাম্পে চিকিৎসা সহায়তা দিয়েছে। ট্রানজিট মেডিকেল ক্যাম্প করে সদ্য আগত শরণার্থীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে সীমিত ডিগ্রীধারী চিকিৎসক দিয়ে একাত্তরের মতো মানবিক বিপর্যয় সামাল দেয়া সম্ভব হতো না। যদি না এসব নন-রেজিস্টার্ড ডাক্তাররা ভূমিকা না রাখতেন। একাত্তরে শরণার্থীদের চিকিৎসা সেবায় সম্পৃক্ত এমন একজন নন-রেজিস্টার্ড পল্লী চিকিৎসক মুর্শিদাবাদের জলাঙ্গীর বাশার মুন্সী।[৩০৪] একাত্তরের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলছিলেন, 'জলাঙ্গী, কাহাড়পাড়া সীমান্তে একাত্তরে ভয়াবহ কলেরা বিপর্যয় নেমে এসেছিল। বিপুল শরণার্থী আক্রান্ত হয়েছিল কলেরায়। সরকারি হাসপাতাল, ডাক্তার এমনকি ঔষধের ছিল তীব্র সংকট,

সেই অন্তিমে আমরা স্থানীয় নন-রেজিস্টার্ড ডাক্তাররা দিন-রাত ঘুরে বেরিয়েছি ক্যাম্পে-ক্যাম্পে। সেবার পদ্মার পানি রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। শরণার্থীদের আমরা কোমর সমান পানি অতিক্রম করে চিকিৎসা দিয়েছি।'

বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে শরণার্থী সেবায় এসব নন-রেজিস্টার্ড ডাক্তাররাই ছিল এক মাত্র ভরসা। একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন হাসপাতাল স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে প্রায় ৬০০ ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীকে সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হয়। ফলে সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সংকট দেখা দেয়। আবার প্রায় ৮০ লক্ষ বাড়তি শরণার্থীর জন্য এসব হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীদের উপচে পড়া ভীড়ের সৃষ্টি হয়। রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর চিকিৎসা কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হয়।

যেসব ডাক্তার, নার্স ও চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা শরণার্থী হয়ে ভারতে এসেছে তাদেরকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগে যোগাযোগ করে দৈনিক বেতনের ভিত্তিতে কাজে নিয়োগের অনুরোধ জানানো হয়।

জুলাই মাসে এই মজুরি বৃদ্ধি করে এমবিবিএস ডাক্তারদের ২০ টাকা ও লাইসেন্স প্রাপ্ত ডাক্তারদের ১৫ টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রায় ১০০০ শরণার্থী ডাক্তারকে এই কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়।

এছাড়াও মুজিবনগর সরকার কলেরা মোকাবেলায় জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গে ২০০০ চিকিৎসক ও নার্স প্রেরণ করেন। মুজিবনগর সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরে ডাইরেক্টর ডা: টি হোসেন এসব ডাক্তার ও নার্সদের সরাসরি তত্ত্বাবধান করতেন। প্রায় ২৫০০ প্যারা মেডিকেল স্টাফ, ৭০০০ প্রশিক্ষিত নার্স, ২২০০০ অপ্রশিক্ষিত কর্মী একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীদের স্বাস্থ্য সহায়তায় সম্পৃক্ত হয়েছিল।

বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুরের ইসলামপুরে একটি ভ্রাম্যমাণ সার্জিক্যাল ইউনিট পাঠায় রাজস্থান রাজ্য সরকার। ৪০০ শয্যার অত্যাধুনিক এই হাসপাতালে ১৫০ জন স্বাস্থ্য কর্মী রয়েছে, যার মধ্যে ১৫ জন ডাক্তার ও ৫০ জন তাদের সহকারি। ১৫টি মেডিকেল ভ্যান নিয়ে গঠিত এই ভ্রাম্যমাণ সার্জিক্যাল ইউনিটে ল্যাব ও এক্সরে মেশিনসহ অপারেশন থিয়েটার ছিল।[৩০৫]

ডিসেম্বর মাসে যখন ভারত পাকিস্তানের সাথে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, তখন অসামরিক প্রতিরক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসক ও নার্সদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন পশ্চিমবঙ্গ সিভিল ডিফেন্স।

একাত্তরে আহত অনেক মুক্তিযোদ্ধা, বনগাঁ, নদীয়া, দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ ও কলকাতার হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা নিয়েছেন। অনেকে মৃত্যুবরণ করেছেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজে একাত্তরে শতাধিক গুলিবিদ্ধ ও গুরুতর আহত মুক্তিযোদ্ধার অপারেশন করা হয়েছে।

একাত্তরে শরণার্থীদের সেবার ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখা বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। সর্বভারতীয় আইএমএর সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সমর রায় চৌধুরী একাত্তরের এপ্রিলের শুরুতে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণের সাহায্যার্থে ঔষধ ও অন্যান্য সাহায্য চেয়ে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ জনগণের সহায়তা চেয়ে বিবৃতি দেন। বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের স্বাস্থ্যসেবায় আইএমএর এপ্রিলের শুরুতেই একটি কমিটি গঠন করেন। শরণার্থী আগমনের পয়েন্টগুলোতে রেডক্রসের সহায়তায় ট্রানজিট মেডিক্যাল ক্যাম্প গড়ে তোলো। রেডক্রসের পর আইএমএ পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় বেসরকারি সংগঠন যারা শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবায় এগিয়ে আসেন। একাত্তরে এইএমও পশ্চিমবঙ্গে মোট ২৩টি চিকিৎসা কেন্দ্র খোলেন। শুরুতে আইএমএ এর সদস্যভুক্ত ডাক্তাররা এই কার্যক্রমে অংশ নেয়, শরণার্থী বাড়তে থাকলে আইএমও মেডিকেল ও নার্সিং কলেজের শিক্ষার্থীদের নিয়ে বড় ধরনের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলেন।[৩০৬]

আইএমএ, পশ্চিমবঙ্গ চেতাই অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসায় একটি শল্য চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে তোলেন। আইএমএ, বাংলাদেশ রেডক্রশ ও সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্সের যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে এপ্রিলে ৩টি চিকিৎসা কেন্দ্র চালু করেন।

এছাড়া আইএমএ-এর উদ্যোগে একাত্তরে কলকাতায় একটি নাসিং ট্রেনিং ক্যাম্প এর ব্যবস্থা করা হয়। যাতে স্কুল, কলেজের অনেক শিক্ষার্থী নার্সিং ট্রেনিং নিয়ে স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা পালন করেন।

সরকারি ও বেরসরকারি বিভিন্ন সংস্থা, হাসপাতাল ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ব্যক্তিগত পর্যায়েও অনেকে এগিয়ে আসেন শরণার্থী চিকিৎসাসেবায়। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের অনেক ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্য সহকারি, প্যারা মেডিকেল স্টাফ ব্যক্তিগত উদ্যোগে ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে বিনামূল্যে শরণার্থীদের সেবা দিয়েছেন। অনেক প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার ডাক্তার নিজের চেম্বারে শরণার্থীদের বিনামূল্যে ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন। কলকাতার ডাঃ বিমলেন্দু ভট্টাচার্য বলছিলেন, ‘আমার শিয়ালদহের চেম্বারে যেসব শরণার্থী দেখাতে আসতেন আমি বিনামূল্যে ঔষধসহ দিয়ে দিতাম। বিভিন্ন কোম্পানির লোকদের বলতাম, বেশি করে ঔষধ দিতে।’[৩০৭] বারাসাতের ডাঃ ব্রজেন্দ্রলাল বসু কিংবা ডাঃ মোহিত চ্যাটার্জি সারাদিন বিনামূল্যে

রোগীদের ব্যবস্থাপত্র দিতেন। একাত্তরে বারাসাতের মেডিকেল ছাত্র বিমাল বসু এলাকার যুবকদের নিয়ে বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়ে টিকা, ইনজেকশন পুশ করতেন বিনামূল্যে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শরণার্থী আশ্রয় নেওয়ায় একাত্তরে জুন-জুলাই মাস পর্যন্ত বন্ধ ছিল অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে শরণার্থী স্বাস্থ্যসেবায় ভূমিকা রেখেছে। বিশেষ করে মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী, নার্সিং ইনস্টিটিউট ও প্যারা মেডিকেলের শিক্ষানবিসরা এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বাংলাদেশ শরণার্থীদের জন্য দেজ মেডিক্যাল স্টোর্স (ম্যা:) প্রাইভেট লিঃ প্রচুর পরিমাণে স্পেশ্যাল কলেরা ট্যাবলেট, সালফাওরানিডাইন ট্যাবলেট এবং ভিটামিন বি কমপ্লেকস ট্যাবলেট রাজ্যপালের রিলিফ ফান্ড, মুখ্যমন্ত্রীর রিলিফ ফান্ড, পশ্চিমবঙ্গ ডাইরেকটর অফ হেলথ সারভিসেস, বাঙ্গলাদেশ এ্যাসিসট্যান্স কমিটি ও অন্যান্য ত্রাণ সমিতিকে প্রদান করেন।[৩০৮]

রায়গঞ্জ মহকুমার স্বাধীন বাংলা সুহৃদ কমিটি দিনাজপুরের মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি কাঞ্চনে ৩০০০ টাকা মূল্যের ঔষধপত্র দান করেন। রায়গঞ্জ মহকুমার সমস্ত শিক্ষক, কর্মচারীরা তাদের একদিনের বেতন পূর্ববঙ্গের আহত শরণার্থীদের চিকিৎসা তহবিলে দান করেন।[৩০৯]

বয়রা শুশ্রূষা কেন্দ্রে অক্লান্তভাবে কাজ করেছিল গুটিকয়েক তরুণ ডাক্তার। এই শুশ্রূষা কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কলকাতার 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্প্রসারণ পরিষদ'-এর উদ্যোগে। শুশ্রূষা কেন্দ্রের বাইরে দেওয়ালের উপর ঝুলছে একটি ব্যানার, নীল কাপড়ের উপর সাদা অক্ষরে 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্প্রসারণ পরিষদ' লেখা। ডাক্তাররা বললেন, আমরা নীলরতন সরকার হাসপাতালে হাউস সার্জন। কিছুদিন আগে 'দিদি' ('সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্প্রসারণ পরিষদ'-এর সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী দেবী) আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এখানে আসার প্রস্তাব দেন। আমরা তিনজন এখানে ১৩ তারিখ থেকে আছি।[৩১০] ডাক্তারত্রয় হলেন মিহির সরকার, সুভাষ ভট্টাচার্য ও বিমল দাস।[৩১১]

মূল্যায়ন

'পূর্ব থেকে উত্তর, উত্তর থেকে পশ্চিম-সমগ্র বাংলাদেশ আমি আজন্ম বারংবার দেখি। পূর্বে ছিল আমার দেশ, উত্তরে আমার এখনকার বসতি, পশ্চিমে আমার জীবিকা। এইভাবে বাংলাদেশ গাঢ় হয়ে মিশেছে আমার ছড়ানো অস্তিত্বগুলোর সঙ্গে।'[৩১২] একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণের যে সম্পৃক্ততা, সেটির সরলীকরণ করেছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। দেশভাগ, পূর্ববঙ্গ ছেড়ে যাওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা, দাঙ্গার

রক্তের দাগ তখনো শুকায়নি। কিন্তু জন্মভূমির প্রতি একটি অকৃত্রিম টান পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ বাঙালিকে আকুল করেছিল। কিন্তু কেন?

একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গের এই সহমর্মিতা, ভালোবাসার কারণ অনুসন্ধানে প্রায় তিন বছর ধরে সেই সব এলাকাগুলোতে অবস্থান করে, তাদের সাথে মিশে আমি অনুধাবনের চেষ্টা করেছি সেই আবেগ আর ভালোবাসার স্বরুপ অনুসন্ধানের। মৈত্রেয়ী দেবী অকপটে স্বীকার করেছেন সেই কেন এর উত্তর। 'সীমান্তে কেন যেতাম? কোন অদৃশ্য শক্তি যেন আমাকে টানত।'[৩১৩]

এই অদৃশ্য শক্তির উৎস সন্ধানে বালুরঘাট থেকে বসিরহাট, বনগাঁ, নদীয়া, জলপাইগুড়ি, মালদহ, মুর্শিদাবাদ প্রায় তিনশতাধিক সাধারণ মানুষের সাক্ষাৎকার আমি গ্রহণ করি। স্মৃতির উপর ভর করে, আমি সামনে এগুতো চেয়েছি। স্মৃতি নির্ভর হাজারো গল্প থেকে ইতিহাস বিনির্মানের চেষ্টা করেছি। বহরমপুরের পূর্ণিমা দাসগুপ্ত বলছিলেন, একাত্তর ছিল আমাদের দায়বদ্ধতার বছর, বাংলা ভাষী মানুষগুলোর প্রতি আমাদের যে সহমর্মিতা সেটি ছিল মূলত একটি ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা।[৩১৪]

সেই দায়বদ্ধতা থেকে একাত্তরে মুর্শিদাবাদ বহরমপুরে শরণার্থী সেবায় অক্রান্ত পরিশ্রম করেছেন ঈপ্সিতা গুপ্ত। পূর্ণিমা দাসগুপ্ত, ঈপ্সিতার স্বামী রাধারঞ্জন, ত্রিদিব চৌধুরীকে সাথে নিয়ে শরণার্থীদের আশ্রয়, আহারের ব্যবস্থা করেছিলেন ঈপ্সিতা গুপ্ত।পাশাপাশি বাংলাদেশের গণআন্দোলনের সমর্থনে মুর্শিদাবাদ–বহরমপুরে বিশাল জনমতের সৃষ্টি করেছিলেন।[৩১৫]

'বয়স, অভিজ্ঞতা এবং স্বার্থবুদ্ধি বাড়লে মানুষের ভাবাবেগ কমে যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আজও জন্মভূমির প্রতি আমার বালকোপম, তীব্র আবেগপূর্ণ এক ভালোবাসা টের পাই।'[৩১৬] এই তীব্র আবেগপূর্ণ ভালোবাসায় একাত্তরে প্রায় সত্তর লক্ষ শরণার্থী আশ্রয় পেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। কলেরার মতো মহামারিতে শত শত শরণার্থী আক্রান্ত হচ্ছে। লাশের পর লাশ। এতো বেশি লাশ জন সার লিখেছেন শকুনের অরুচি ধরে গেছে।[৩১৭] কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের অরুচি ধরেনি। মহামারি জানার পরেও শরণার্থীদের সেবা প্রদানের জন্য, কলেরার টিকা দিতে ক্যাম্প থেকে ক্যাম্পে ঘুরে বেরিয়েছে শত শত স্বাস্থ্যকর্মী, স্বেচ্ছাসেবক। জয় বাংলা রোগে বিপর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গের জনজীবন। কিন্তু সেটাকে উপেক্ষা করে সন্ধ্যায় ধর্মতলায় ছাত্র-জনতার জয় বাংলা, জয় মুজিবের উদ্দীপিত হয়েছিল একাত্তরের পশ্চিমবঙ্গ।

আশ্রয় দিতে গিয়ে একসময় বিপন্ন হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা, স্বাভাবিক জীবন যাপন। ১৫ মে ১৯৭১ *দৈনিক যুগান্তর* সেইরকম এক সংবাদ তুলে ধরেন, 'শুধু আশ্রয়প্রার্থীরা নয়, আশ্রয়দাতারাও বিপন্ন'।[৩১৮] মাস ছয়েকের মধ্যেই আশ্রয়প্রার্থীরা নিজ দেশে ফিরতে পারবে–এরকম ধারণার উপরই

কেন্দ্রীয় সরকার আপততঃ তাদের সীমান্ত এলাকায় রাখার কথা ভেবেছিলেন। দূরে নিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে এনে স্বদেশে পাঠাতে বিলম্ব ঘটতে পারে। সে আশঙ্কা রোধের জন্যই উপরোক্ত সূত্র কল্পনা করা হয়েছিল।

লাখ লাখ উদ্বাস্তুকে সীমান্তবর্তী চারটি খণ্ড রাজ্যে জড়ো করে রাখলে বৈষয়িক ক্ষেত্রে কতগুলি জটিল সমস্যা অবশ্যম্ভাবী। প্রথম সমস্যা–প্রয়োজনমত জিনিসপত্র জোগানের ব্যবস্থা সম্পর্কে। আশ্রয় প্রার্থীদের প্রয়োজন মাথা গোঁজার জন্য ঠাঁই, খাবার, পরিধেয় ও অন্যান্য অপরিহার্য জিনিসপত্র। সীমান্ত এলাকায় স্কুল-কলেজের বাড়িতে, ছাত্রাবাসে এবং খোলা জমিতে সামরিক ছাউনি ফেলে বিপন্নদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। ব্যাঘাত ঘটেছে ছাত্রদের পড়াশোনায়। খোলা জায়গায় সামরিক ছাউনিগুলো ঝড়-বর্ষার শুরুতেই ধ্বসে পড়ে। তাই সেখানকার বাসিন্দাদের প্রয়োজন পড়ে পাকাপোক্ত জায়গায় সরানোর। বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে সর্দি, জ্বর, নিউমোনিয়া, কলেরা প্রভৃতি রোগ মড়কের আকার ধারণ করে। সীমান্তের চারটি খণ্ড রাজ্যে এত আশ্রয়প্রার্থীর স্থিতি উদ্বাস্তু সমস্যাকে জটিল করে তুলে।[৩১৯]

কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার অনেক ক্ষেত্রে টাকা দিয়ে সহায়তা দিয়েছে। আশ্রয় প্রার্থীদের প্রয়োজন হল ঐ অর্থের বিনিময়ে খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ, অন্যান্য অত্যাবশ্যক জিনিসপত্র। বাঙ্গলা দেশের সীমান্তবর্তী চারটি খণ্ড রাজ্যে এখন এসব জিনিস যে পরিমাণে জোগান হয় তাতে স্থানীয় অধিবাসীদের চাহিদাও কায়ক্লেশে মেটে কিনা সন্দেহ আশ্রয় প্রার্থীদের জন্য তার একটা অংশ কিনে নিলে মাথাপিছু জোগান অনেক হ্রাস পায়। ফলে বাজার দর হু হু করে চড়ে যাওয়ার স্থানীয় অধিবাসীরা স্বভাবতই বিপাকে পড়ে যায়। চাল, ডাল, তেল, নুনসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বেড়ে প্রায় পাঁচগুন হয়ে যায়।[৩২০]

'হাজার হাজার আশ্রয়প্রার্থী সীমান্তে সামান্য এলাকার মধ্যে জড় হওয়ায় রুজি-রোজগারের ব্যাপারেও প্রতিযোগিতা দেখা দিয়েছে। বহিরাগতরা ক্ষুধা নিবারণের তাগিদে কম মজুরী নিয়ে কাজকর্ম শুরু করেছে। ফলে স্থানীয় কর্মীরা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তাদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে থাকে। এরকম অবস্থা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। তাই, আশ্রয়প্রার্থীদের কর্মদক্ষতা সদ্ব্যবহারের জন্যও তাদের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার।'[৩২১]

পূর্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তানি জঙ্গী নায়কদের নৃশংস অভিযানে স্থানীয় জনসাধারণ গুরুতর বিপন্ন। লাখ লাখ আশ্রয়প্রার্থীদের সমাগমে পশ্চিমবঙ্গের বিপদও উপেক্ষণীয় নয়। এই বাবদ প্রয়োজীয় অর্থ, সাজ সরঞ্জাম ও জিনিসপত্র সংগ্রহ করা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে সত্যি কষ্টকর।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ সেই বিপন্নতার মধ্যে থেকেও সর্ব্বোর্চ সহায়তা নিয়ে পাশে ছিল শরণার্থীদের। মালদহের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী অম্লান দত্ত। একাত্তরে বাজার ঘাটায় একটি ছোট দোকান চালাতেন। দোকানে সাধারণ ভারতীদের যে দামে পণ্য বিক্রি করা হতো, শরণার্থীদের দেয়া হতো অর্ধেক দামে। বোকার মতো প্রশ্ন করছিলাম আপনার তো অনেক ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যুত্তরে বলছিলেন দত্ত বাবু, 'পূর্ব পুরুষের দেশের জন্য কিছু করতে পারা তো সৌভাগ্যের বিষয়।'[৩২২]

যে পূর্ববঙ্গের জন্য এতো ভালোবাসা অনেকেই হয়তো পূর্ব পুরুষের সেই জন্মভিটে, এমনকি জন্মদেশ ও কোনদিন দেখেননি। কিন্তু একটি অপ্রতিরোধ্য আবেগে তারা ভেসে গিয়েছেন। যেমনটি লিখেছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, 'অথচ সোনার বাংলা আমি কখনও দেখিনি, আমর কল্পনাতে ও আসেনা শান্ত স্নিগ্ধ বাংলাদেশের কোন ছবি। কিন্তু আমার মন অবিরল প্রার্থনা করে বাংলাদেশ এবার মুক্ত হোক।' [৩২৩]

পশ্চিমবঙ্গের সামান্য জুতা সেলাইয়ের মুচিরা যখন একাত্তরের একদিনের উপার্জিত অর্থ শরণার্থীদের জন্য দান করেন।[৩২৪] একাত্তরে মুচি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পুরানো কাপড়, নগদ অর্থ, ওষুধ, শীতের কম্বল, টর্চলাইট নিত্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যাদি নিয়ে হাজির হয়েছিল শরণার্থীদের পাশে, মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে। নানাজন নানাভাবে চেষ্টা করেছেন পাশে দাড়ানোর। মৈত্রেয়ী দেবী বলছিলেন সে সময়ের কথা। এপ্রিলের শুরুতে অবরুদ্ধ বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলের গল্প।

'আমরা ফেরার আগে সবাই মিলে অনুরোধ করল, কিছু বোমা পাঠাবেন। আমরা শুনেছি আপনাদের ছেলেরা খুব ভালো বোমা বাঁধতে পারে। আমরা তখন খুব ভালো ভাবেই জানি কথাটি কতখানি সত্য এবং এই কাজে আমাদের ছেলেদের কি অদম্য উৎসাহ। যাই হোক আমরা তো বোমার কাজে উৎসাহী নই, আমরা এমন একটা বর্ডার খুঁজছিলাম যেখান থেকে খাদ্য বস্ত্র ও ঔষধ সরবরাহ করে সাহায্য করা যায়। ... সেদিন ফেরার পথে সাধন দত্ত মশায় বলছিলেন যে আমাদের একটি মোবাইল মেডিকেল ভ্যান দেবেন।'[৩২৫]

সহায়তার জন্য নানাজন নানা অস্ত্র তুলে নিয়েছিল। সদ্যপ্রয়াত তরুণ স্যানাল বলছিলেন তিনি কীভাবে স্কটিশ চার্চ কলেজের হোস্টেলটি ছেড়ে দিয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়ের জন্য।[৩২৬] বালুরঘাটের রহমত উল্লাহ্ একাত্তরে চেষ্টা করেছিলেন মুসলিম পদার্নশীল কিছু মহিলা শণোর্থীদের সহায়তা করার। যারা সহজে শরণার্থী ক্যাম্পে আশ্রয় নিতে চাচ্ছে না, পুরুষ সদস্যদের ক্যাম্পে রেখে তিনি সেসব নারীদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন নিজ বাড়িতে।[৩২৭]

শিল্প সমালোচক প্রণব রঞ্জন রায়ের সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য তালিকা তৈরি করে দিয়েছিলেন আমার গবেষণার তত্ত্বধায়ক। আমি জানতাম না, প্রণব রঞ্জন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক নীহার রঞ্জন রায়ের ছেলে। একাত্তরের নানা স্মৃতিময়তায় তিনি আমাকে বিষ্ণুদের কথা বললেন। বিষ্ণু দে একাত্তরে ভাবছিলেন বাংলাদেশের জন্য কিছু করার, দশটি ছবি একেঁ বসে পড়েছিলেন *স্টেটসম্যান* পত্রিকা অফিসের সামনে।[৩২৮] বিক্রি হয়ে গিয়েছিল নয়টি ছবি, (বাকি ছবিটি আমার সংগ্রহে)। সেই অর্থ দান করেছিলেন বাংলাদেশ সহায়ক সমিতিতে।

বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সমিতি একাত্তরে নানাভাবে বাংলাদেশের সহায়তায় সম্পৃক্ত হয়েছিল। তাদের উদ্যোগে কলকাতার বিড়লা একাডেমি অব আর্ট অ্যান্ড কালচারে ২টি প্রদর্শনী হয় ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর। প্রদর্শনীতে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় পঞ্চাশজন শিল্পী তাদের শিল্পকর্মের প্রদর্শনী করে। এ প্রদর্শনীতে পশ্চিমবঙ্গের নামকরা প্রায় সব শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। চিত্রের সাথে কয়েকটি ভাস্কর্য-কর্মও জায়গা পায়, তবে মূলত চিত্র প্রদর্শনী। প্রদর্শনীর নির্বাচন আর একটু সুষ্ঠু হলে মান আরো বাড়ত। অবশ্য বাংলাদেশ পরিস্থিতি এমনকি এক ঘটনা বা ঘটনার চেয়েও বেশি, যেখানে কড়াকড়ির স্থান থাকে না।[৩২৯]

পশ্চিমবঙ্গের প্রদর্শনী দেখে এ কথাই মনে হয়, কি কৃত্রিম একটা বেড়া দিয়ে দুটি বাঙলার সৃষ্টি করা হয়েছে। দ্বিজাতির কি ভীষণভাবে একটা ফাঁকা বুলি। বাঙলাদেশের শিল্পীদের সাথে মানসিকতায় কি গভীর একাত্মতা পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীদের। বাঙলাদেশ আক্রান্ত হওয়া যেন এ-বাঙলার নিজের গায়ে আঘাত পড়া। আর শিল্পীর ক্ষেত্রে তা মনে আঘাত লাগা। বাঙলাদেশের শিল্পীদের মতোই এরা ক্ষিপ্ত, বেদনাহত, গণহত্যার বীভৎসতায় পীড়িত। ভায়ের জন্য ভায়ের যে বেদনাহত, এক সহোদর যেমন আর এক জনের জন্য কাঁদে, তেমনি ক্রন্দন, তেমনি ম্যুহমান, আবার ক্ষেপে গিয়ে সৈনিক। অলোক কুমার ভট্টাচার্যের ‘বিপ্লবের জন্ম’ চিত্রে একই সঙ্গে নব-বাঙলাদেশের জন্ম, দেবতার আর্শীবাদ ও সাধারণ চাষীর রাইফেলধারী বেশ, যথার্থ প্রকাশ।

অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয়, শিল্পী মধু পারেখের পোস্টরটি। কালো পটভূমির উপরের অংশে একটি বোমারু বিমানের অধ্যাস। মাঝে ইংরেজিতে লেখা, ‘নিরীহদের হত্যা বন্ধ কর’। নিচে ভূমির সাদায় পাঞ্জাবী লোকশিল্পীদের দেয়াল চিত্রের মাটিতে আঁকা বাঙলাদেশের প্রাণীসমূহ। তাদের নিরীহ ভঙ্গি শিল্পীর হাতে অপূর্ব হয়ে ধরা পড়ে।

বেশির ভাগ চিত্রে পরাবাস্তববাদকে আশ্রয় করা হয়েছে। এই সুরবিয়্যাল ট্রিটমেন্টের ফলে বাঙলাদেশের হত্যাকাণ্ডের বীভৎসতা সুষ্ঠুভাবে ফুটে উঠেছে। সুনীল দাসের 'ধ্বংসলীলা' চিত্রে সাদা কালোয় আঁকা মনুষ্যদেহী বীভৎস মাংসপিণ্ডের প্রকাশ যথার্থ। এই চিত্রের কেন্দ্রে ঝুলে রয়েছে একটি হাত। এই কোলাজচিত্রটি পরাবাস্তবাদী হলেও যথেষ্ট প্রতীকবাদী। রক্তকলুষিত হাতটি যেন পাকিস্তানের কেন্দ্রের হাত, ইয়াহিয়ার হাত। পরাবাস্তবাদীকে যথেষ্ট ব্যবহার করলেও মূলত প্রদর্শনীর চরিত্র দাঁড়িয়েছে প্রকাশবাদী বা এক্সপেশানিষ্টিক। গণেশ পাইনের 'বন্দর' চিত্রটিও তাই।

গোপাল ঘোষ তাঁর জলরং চিত্রে কালো পটভূমিতে রক্তরঙ সূর্যকে উঠতে দেখছেন। শিল্পী চাতুর্যের সঙ্গে জলরংকে ওপেন করে তাঁর বক্তব্যকে আরো বাঙময় করেছেন। শৈলেন মিত্র 'লক্ষ্যবিন্দু' চিত্রে পোলক কায়দায় যথেষ্ট নিজস্বতা রেখেছেন। পোলকের ঘূর্ণায়মান ফোর্সকে একটা কাঠামো দান করে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মনু পারেখ (মিশ্র রীতির কাজ) তাঁর চিত্র 'নতুন আলো'-র চাপা রঙের মধ্যে একটা দূরাগত আলোর অধ্যাস এবং কাঠামোয় যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচায়ক। বরেণ বসুর তলকে টুকরো টুকরো ভাগ করে করা 'বাঙলাদেশ ১৯৭১' চিত্র যথেষ্ট বলিষ্ঠ। রবীন মন্ডল তাঁর 'শিকার' চিত্রে বাইজেনটাইন রঙিন কাঁচের ব্যবহারের মতো ক্রাইস্ট ও ক্রসের ভেঙে-ভেঙে জ্যামিতিক প্রকাশে দক্ষতা দেখিয়েছেন। যীশু, সেই সরল মানুষটিকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, 'বাঙলাদেশে' বাঙালিদের তাই করা হচ্ছে। এদিক থেকেও চিত্রটি যথেষ্ট অর্থবাহী। ঈশা মহম্মদের 'পলায়ন' চিত্রটি 'মুনশ' কায়দায় যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণশারী। বিকাশ ভট্টাচার্যের 'বাঙলাদেশে'র প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্পে-ধারায় করা এই চিত্রে পুতুলটি নরীহ বাঙালিদের ভাগ্যের প্রতিমূর্তি যেন। এই পুতুলটি নিরীহ বাঙালিদের ভাগ্যের প্রতিমূর্তি যেন। এই পুতুলের মতোই তারা গোটা বিশ্বে পরিত্যক্ত।

স্থাপত্য চিন্তামণি করের 'পুণর্জন্ম' বিশেষ অর্থবহ। দিলীপ সাহার কাজে রাইফেলের আকারকে যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগান হয়েছে। নিরঞ্জন প্রধান ও প্রভাস সেনের কাজটিও দৃষ্টি আকর্ষণকারী। প্রায় পঞ্চাশ জনের এই প্রদর্শনীতে আরো কিছু কাজ দৃষ্টি আকর্ষণ করে: আমিতাভ ব্যানার্জি, সনৎ কর, নিরোদ মজুদার, গণেশ হলোই, শুভ প্রসন্ন ভট্টাচার্য প্রমুখের কাজ উল্লেখযোগ্য। এর আগে প্রথম প্রদর্শনীটি হয়েছিল বাংলাদেশি সতের জন শিল্পী দিয়ে। ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ থেকে ১৩ সেপ্টম্বর সে প্রদর্শনীটিও ছিল বিড়লা একাডেমিতে।[৩৩০]

বাঙলাদেশ-শিল্পীদের প্রদর্শনীতে সতের জন শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন। তার মধ্যে তিনজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ। কামরুল হাসান, দেবদাস চক্রবর্তী ও নিতুন কুন্ডু বাদে বাকী সবাই হয় ছাত্র, নয় মাত্র শিক্ষাজীবন শেষ

করেছেন। আবার কিছু শিল্পী তাঁদের ব্যবহারিক জীবনে সুনাম কিনেছেন, চিত্রশিল্পে তেমন সার্থকতা লাভ করেননি। এই গুণগতভাবে এর মান উঁচু না হওয়াই স্বাভাবিক। তবু এর সদর্থক দিকটিকে তুলে ধরা কর্তব্য।

বাঙলাদেশের শিল্পীরা প্রত্যেকে গৃহছাড়া। প্রাণভয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছেন ভারতে। তাঁদের আত্মীয় স্বজন রয়ে গেছে। এই যুদ্ধকালীন মানসিকতায় কতদূর সার্থকশিল্প সৃষ্টি করা যায় প্রশ্নসাপেক্ষ। উত্তেজনা শিল্পীকে তার উৎকর্ষ লাভ থেকে ব্যাহত করে। উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে গেলেই বড় শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয়। কিন্তু বাংলাদেশের শিল্পীরা এই নীতির ব্যতিক্রম। শিল্পীদের আত্মীয়-স্বজনের মাথার উপর খাঁড়া ঝুলছে, সেইরকম এক পরিস্থিতিতে যুদ্ধের প্রয়োজনে এবং যুদ্ধ মনে করে বলিষ্ঠ হাতে শিল্পীরা তুলি তুলে নিয়েছেন। বিশেষ করে শিল্পী কামরুল হাসান এই প্রদর্শনীতে তাঁর প্রতিভার স্ফুরণের যথাযথ নিদর্শনই শুধু রাখেননি তিনি তাঁর পূর্ব সুনাম ও দক্ষতাকে বিপুলভাবে ছাড়িয়ে গেছেন। কামরুল হাসান তাঁর শিল্পকর্মে লোক শিল্পের মোটিফকে কাজে লাগিয়ে কাজ করে এসেছেন এতদিন। লোকশিল্পের মোটিফ কাঠের পুতুলকে মনুষ্যমূর্তির প্রতিভূ হিসেবে কাজে লাগানোর একটা জড়তা ছিল। এছাড়া তাঁর কাজ বিশেষ একটা জায়গায় এসে পুনঃপৌনিকতায় ভুগছিল, সেই গণ্ডিকে তিনি এবারে এক ধাক্কায় ভেঙে ফেলেছেন। স্বসৃষ্ট গণ্ডির অচলায়তনকে ভেঙে তিনি এই প্রথম তাঁর চিত্রে সঞ্চারণ এবং প্রচণ্ডতাকে জায়গা দিয়েছেন। ‘বাঙলাদেশ কম্পোজিশন’ এক ও দুই, এই চিত্র দুটি তার সাক্ষ্য। একটিতে একসার কঙ্কালের ঘূর্ণায়মান অবস্থা, দ্বিতীয়টিতে যেন কোনো এক অদৃশ্য শত্রুর উপর। আর সেই অদৃশ্য শত্রুটি কে, আমরা জানি, ইয়াহিয়া-টিক্কার হায়েনাগুলো। বাঙলার নিরীহ চাষীও আজ রাইফেল কাঁধে তুলে নিয়েছে। এই নিরীহ লোকটিকেই শিল্পী নিরীহ প্রাণীদের প্রতীকে কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর এপ্রিলের পূর্ণিমার চাঁদ রক্তমেখে রাতের চেহারা দেখে শিউরে শিউরে উঠছে, ভূমিতে ধর্ষিত বঙ্গজননীকে দেখে। নীলের প্রধান্য চিত্রের বক্তব্যকে আরো বাঙময় করে তুলেছে। রঙের বিন্যাসে শিল্পী যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন এবং তার পূর্বের রঙের বদলে এবার তিনি মিশ্ররঙ ব্যবহার করেন। শিল্পীর মানসিকতাকে স্পষ্টভাবে ধারণ করে আছে ক্যানভাসগুলো।

দেবদাস চক্রবর্তী বাংলাদেশের অন্যতম শিল্পী। তাঁর চিত্রেও লোকমোটিফকে কাজে লাগান হয়েছে। নিতুন কুন্ডু তাঁর ক্যানভাসে রঙের ব্যবহারে দক্ষ। মোস্তফা মনোয়ার তাঁর চিত্রে কার্টুনের প্রাধান্য দিয়ে শিল্পগুণকে ক্ষুণ্ন করেছেন। প্রাণেশ মন্ডল ইলাসট্রেটিভ চরিত্র দিয়ে চিত্রগুণ অক্ষুণ্ন রাখতে পারেননি।[৩৩১]

নদীয়ার অভিযান ক্লাবের ১০০ সদস্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংগ্রহ করেছেন শীতের পোশাক, কলকাতা ট্রেড ইউনিয়নের কিছু সদস্য বাংলাদেশের জন্য অর্থ সংগ্রহে শিয়ালদহ ও হাওয়া ষ্টেশনে কুলির কাজ করেছে। পশ্চিম দিনাজপুরের বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বিক্রি করেছে পোস্টার। শ্রীরামপুর কিমারবক্স ম্যানুফাকচারিং শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যরা ১১ এপ্রিল একদিন অতিরিক্ত শ্রম দান করেন বাংলাদেশের জন্য।[৩৩২]

'বাঙলাদেশ সহায়ক সমিতির বারাসত শাখার' উদ্যোগে ১৫ এপ্রিল ১৯৭১ সকাল থেকে একবেলা ক্ষুদ্র সংগ্রহ অভিযান পরিচালিত হয়। শতাধিক মহিলা ও পুরুষ স্বদেশী সঙ্গীত গাইতে গাইতে হরিতলা মোড় থেকে বেরিয়ে স্টেশান, চাপাডলি শেটপুকুর, কলোনী মোড় এবং নবপল্লী এলাকা পরিভ্রমণ করেন।[৩৩৩] দান সংগ্রহ এবং বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রচার করা ছিল এই দিনটির আসল উদ্দেশ্য। বারাসতের মানুষ যে এই অভিযানে বিপুলভাবে সাড়া দিয়েছেন তার প্রমাণ ঐ এক বেলায় সংগৃহীত ১৩৪.৮০ টাকা। পরবর্তী কর্মসূচি ছিল অধিক দান সংগ্রহ।

শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে একাত্তরে সাধারণ যুবকদের যে তৎপরতা তা অকল্পণীয়। নাওয়া-খাওয়া নেই, অনেকের আবার ঘুম নেই। শরণার্থী সেবার ব্রতে নিজেদের নিয়োগ করেছেন এরা। সল্টলেক, স্বরূপনগর, বনগাঁ প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বেচ্ছাসেবক কর্মীরা। তো ক্যাম্প খুলেই বসে আছেন। শরণার্থী আসা শুরু হলে সবচেয়ে আগে এগিয়ে আসেন স্বেচ্ছাসেবকরা। তখনও সরকারি সাহায্য এসে পৌঁছায় নি। কর্মীদের অধিকাংশই যুবক ও তরুণ।

সল্টলেক এলাকায় প্রায় দেড়শো কর্মী প্রাণপণ খাটছেন। সরকারি সাহায্য আসবার আগে লেগেছেন। পাঁচ দিন রুটি তুলে বেশ কয়েক হাজার শরণার্থীকে এরা খাইয়েছেন। শুধু খাবার বন্দোবস্ত করা ছাড়াও ওই ঘরহারা মানুষের স্বচ্ছন্দ্যের জন্য যুবকরা সাধ্যমত চেষ্টা করছেন।

শ্রমিকরাও শরণার্থী ও নিরাশ্রয় মানুষদের সেবায় শ্রমদান করেছেন এবং ভবিষ্যতে আরো করবেন। ব্রেথওয়েটের ৭ জন শ্রমিক ইসলামপুর শিবিরে গিয়ে একটানা ১৫ দিন শ্রম দিয়েছেন, দুর্গাপুরের শ্রমিকরা মালদহ শহর ক্যাম্পে ২০ দিন একনাগাড়ে কাজ করেছেন। শ্রমিকের শ্রেষ্ঠ সম্পদ শ্রম। বাঙলাদেশের সর্বহারা মানুষদের তা দান করতে শ্রমিক যুবকরা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন নি।[৩৩৪] তরুণ ছেলেরা বনগাঁ, বারাসত, কুপাস, স্বরূপনগর, করিমপুর, মহম্মদপুর, মালদহ, ইসলামপুর এবং সল্টলেকের শিবিরগুলিতে বেশ কাজ দিচ্ছেন। পশ্চিম দিনাজপুরে কলকাতা থেকে দুটি দল গিয়েছে ক্যাম্পের কাজের জন্য। তরুণ, যুবকদের সেই আত্মত্যাগ নিয়ে *কালান্তর লিখছে*।[৩৩৫]

‘একটা কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার, পৃথিবীর ভূগোলে বাঙলাদেশ নামক একটি নয়া রাষ্ট্রকে সম্ভাবিত করার জন্য যারা খুন ঢেলেছিল, জীবনবৃত্ত উপড়ে দিয়েছিল তাদের পুরোভাগে ছিল যুবক সমাজ। এখনো যুবকরাই মূলত: তাদের দেশের স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করার জন্য লড়ছেন, মরছেন। সেই যুবক সম্প্রদায় সাহায্য সহযোগিতায় ভরিয়ে দেবার জন্য পৃথিবীর সব দেশের গণতান্ত্রিক চিন্তার যুবকদের গভীর দায়িত্ব রয়েছে। এ বাঙলার যুবকদের তো বটেই। ক্যাম্পে যুব কর্মীদের নিঃস্বার্থ ও অক্লান্ত সেবা আর কষ্ট বরণের প্রয়াসের মধ্যে সেই দায়িত্ববোধের পরিচয় মিলেছে।’ অনেকের সাধ কিংবা সাধ্যে হয়তো সম্ভব হয়নি সম্পৃক্ত হওয়া। কিন্তু তাদের মানসিক সমর্থন ছিল বাংলাদেশের জন্য। তাদের সেই সুরই হয়তো প্রতিধ্বনিত হয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লাইনে, ‘আমিও তোমাদের সঙ্গে আছি। মনের মধ্যে বারবার খুরে ফিরে আসে, আছি, আছি।[৩৩৬]

তথ্য নির্দেশিকা

১. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*, দ্বাদশ খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৩১৫

২. সাব্বির হোসাইন, *মুক্তিযুদ্ধে সহোদর পশ্চিমবঙ্গ*, ২৬ মার্চ ২০১৭, (www.neonaloy.com)

৩. *দৈনিক যুগান্তর*, কলকাতা, ২৮ মার্চ ১৯৭১

নয়াদিল্লী তৈরি থাকুন

ঢাকার জনপথে দখলদারী পশ্চিমা সৈন্যরা ট্যাঙ্ক নামিয়েছে। আকাশ থেকে জঙ্গী বিমানগুলো বোমা ফেলছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। স্বাধীন বঙ্গদেশে জনতা উত্তাল। তারা ইয়াহিয়ার ঘাতকদের বিরুদ্ধে জান কবুল করে লড়ছেন। এ লড়াই সমানে সমানে নয়। একদিকে নিরস্ত্র গণতন্ত্রী জনতা এবং অন্যদিকে আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত সুশিক্ষিত সৈন্যদল।একের সম্বল স্বাধীনতা রক্ষার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা এবং অপরের সম্বল পশুশক্তি। আত্মগোপন করেছেন মুজিবর। মাঝে মাঝে তাঁর কণ্ঠস্বর থেসে আসছে গোপন বেতার কেন্দ্র থেকে। এ কণ্ঠে জ্বলছে দাবানল। হাজার হাজার শহীদ এবং মুক্তিযোদ্ধা দিচ্ছেন তাঁর ভাষা। উদ্বেলিত বঙ্গদেশের নিকটতম প্রতিবেশী ভারত। প্রত্যেকটি ভারতীয় রাগে ফেটে পড়ছেন। ইয়াহিয়া খানের নরমেধযজ্ঞ তাঁরা সহ্য করতে পারছেন না। লোকসভায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে জনগণের অধীর উৎকণ্ঠা–সংগ্রামী বাঙালী জনতার প্রতি তাদের স্বতস্ফূর্ত মমত্ববোধ। দলমতের ভেদাভেদ উঠে গেছে। সবাই একযোগে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ দিচ্ছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্বরণ সিং সতর্ক। সরকার আরও সংবাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। কিন্তু সংবাদ পাবেন কোথা থেকে? সব পথ বন্ধ। এমন কি কূটনৈতিক সংবাদের আদান প্রদানের প্রদানের প্রবাহও থেমে গেছে। বেতার কেন্দ্রগুলো পাঞ্জাবী সৈন্য দলের দখলে। ওদের দেওয়া সংবাদ মিথ্যার ভরপুর। একমাত্র ভরসা, স্বাধীন বাংলা সরকারের গোপন বেতার কেন্দ্র। বঙ্গদেশের ভাগ্য নির্ধারিত হবে আগামী ক'টি দিনে। জোর লড়াই অবশ্যই চলবে। শহরগুলোতে দখলদারী সৈন্যবাহিনীর দাপট চরমে পৌছবে। গ্রামাঞ্চলগুলোর স্বাধীনতা ওরা কেড়ে নিতে পারবে না। মুক্তিযোদ্ধাদের তাড়া খেয়ে প্রাণের দায়ে বিদেশী খুনীরা হয়তো ঢুকবে ভারতে। নরহন্তারা মানবতার শত্রু। অপরাধীর পাপ্য ব্যবহার তাদের জন্য মজুত থাকবে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশ্ন আলাদা। ওরা যদি অবস্থার চাপে ভারতের আতিথা চান তবে সীমান্তের জনতা অবশ্যই তাদের অভ্যর্থনা জানাবেন। কেন্দ্রীয় সরকার তাতে হস্তক্ষেপ করবেন না বলেই আমাদের বিশ্বাস। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যাঁরা জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত তাঁদের স্বাগত জানানো রাজনৈতিক কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনের পথে কোন বাধা মানবেন না সীমান্তের সাধারণ মানুষ। ইসলামাবাদের শাসকচক্র শৃগালের মত ধূর্ত। ওদের বিশ্বাস নেই। বঙ্গদেশকে নিয়ে তাঁরা যে শঠতা এবং হিংস্রতাব নজির রেখেছেন তারপর ভারতের সর্তক না হয়ে উপায় নেই। কাশ্মীর সীমান্তের উপর রয়েছে পাঞ্জাবী স্বৈরাচারীদের শোনদৃষ্টি। সিন্ধী শয়তান ভুট্টো

তাদের দোসর। অধিকৃত কাশ্মীরে গত দু'তিন বছর ধরে চলছে হানাদারদের সামরিক শিক্ষা। ওরা হয়তো আবার অনুপ্রবেশ করবে কাশ্মীরে। পাক সৈন্যদের সাহায্যে বাধাবে সীমান্ত সংঘর্ষ। তারপর করাচী বেতার প্রচার করবে, বঙ্গদেশের অস্থির অবস্থার সুযোগ নিয়ে পাকিস্তানের উপর চড়াও হয়েছে ভারত। বি বি সি তার স্বভাবসিদ্ধ পদ্ধতিতে করাচী বেতারের পো ধরবে। এ সম্ভাবনাকে কার্যে পরিণত হতে দেওয়া অদূরদর্শিতা। অবিলম্বে আরও সৈন্য পাঠাতে হবে কাশ্মীর সীমান্তে। বন্ধ করতে হবে অনুপ্রবেশের রন্ধ্রগুলো। এক পা ভারতের মাটিতে দিলে কোন পাকিস্তানি বেয়াদব যেন জান নিয়ে স্বদেশে ফিরতে না পারে। সতর্কতা হিসাবেই এ ব্যবস্থার আশু প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে আর একটা কঠিন সমস্যা অপেক্ষমান। মুজিবর হয়ত করবেন বঙ্গদেশে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা। তাঁর বিশেষ দূত বেরিয়ে গেছেন বিশ্বপ্ররিক্রমায়। হয়ত এটা সম্ভাব্য ঘোষণার পূর্বভাস। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের কাছেই হয়ত আসবে কূটনৈতিক স্বীকৃতির প্রথম অনুরোধ। বৃটেন দেবে তার চিরাচরিত কমনওয়েলথ আলোচনার দোহাই। এ দোহাই ভারতের বেলায় খাটে না। নিজের স্বার্থ এবং আদর্শের প্রশ্নে কমনওয়েলথকে থোড়াই কেয়ার করে বৃটেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় অস্ত্র সরবরাহ এবং রোডেশিয়ায় শ্বেতাঙ্গ ফ্যাসিস্তদের তোষামোদ তার জ্বলন্ত সাক্ষী। ভারতের মাটিতে মুজিবরের বিশেষ দূত স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। স্বাধীন বঙ্গসরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতিদানের অনুরোধ এলে তা প্রত্যাখ্যান ভারতের আদর্শ বিরোধী। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়ছেন গণতান্ত্রিক শক্তি। এ শক্তির অমর্যাদা এবং তাকে বিলুপ্ত হতে দেওয়া অন্যায়। ইসলামাবাদের বিশ্বাসঘাতকদের কাছে কি পেয়েছে ভারত? পর পর দুটি যুদ্ধ এবং নিরবিচ্ছিন্ন শত্রুতা। আন্তর্জাতিক শিষ্টাচারের কোন নমুনা রাখেন নি পাঞ্জাবী সামরিক চক্র। গণতন্ত্রী ভারত এবং গণতন্ত্রী স্বাধীন বঙ্গদেশ রাজনৈতিক সমধর্মী। তাদের কূটনৈতিক স্বীকৃতি দান এবং পরে সামরিক সাহায্য প্রেরণ ভারতীয় আদর্শের অনুকূলে। নিষ্ক্রিয় বসে থাকার সময় নেই। রক্তে ভিজে যাচ্ছে সোনার বাংলার ধূলিকণা। এ রক্তস্রোত থামাতে হবে। বিশ্বের গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে কূটনৈতিক আলাপ আলোচনা আরম্ভ অবশ্য কাম্য। রাষ্ট্রসংঘ গণহত্যার নির্বাক দর্শক থাকতে পারে না। প্রয়োজন হলে ভারতকে এগিয়ে যেতে হবে। ইয়াহিয়া খানের নরমেধযজ্ঞের প্রতিবাদ উঠাতে হবে বিশ্বসভায়। খুনীর হাত থেকে মারণাস্ত্র কেড়ে নেবার দায়িত্ব ভারতের এবং বিশ্বজনমতের। এটা পররাজ্যের আভ্যন্তরীন সমস্যায় হস্তক্ষেপ নয়। এটা স্বাধীন দেশের গণতন্ত্র রক্ষার কঠিন কর্তব্যের এবং মানবতার চিরন্তন আহ্বান।

দৈনিক যুগান্তর, ২৮ মার্চ ১৯৭১

৪. সাক্ষাৎকার, তরুণ স্যানাল, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি ২০১৬ (২৮ আগস্ট ২০১৭, মুক্তিযুদ্ধের অকৃত্রিম বন্ধু তরুণ স্যানাল প্রয়াত হন)

৫. *দৈনিক যুগান্তর*, ২৭ মে ১৯৭১

আর কি করলে নয়াদিল্লী নড়ে বসবে?

মেঘালয় ও আসামের সীমান্ত এলাকার উদ্বেগজনক ঘটনাবলীর মধ্যে যেটা সবচেয়ে কেলেঙ্কারীর ব্যাপার তা হলো, পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে আমাদের তরফে তেমন কোনো প্রতিরোধ ছিল না। সুতারকান্দিতে এলাকায় ঢুকে পড়ে সীমান্ত ঘাটিটা দখল করে নিয়েছিল। মেঘালয়ের দালু সেক্টারে তারা শুধু গোলার আঘাতে নজন সীমান্তরক্ষী সহ বাইশজন ভারতীয়কে হত্যাই করে নি, কিলাপাড়ায় আমাদের এলাকার মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে টহল দিয়েছিল। তারা এত গভীরে ঢুকে আসতে পেরেছিল যে, চারটি সীমান্ত গ্রামের মানুষ প্রাণভয়ে অন্যত্র পালিয়ে যায়। সন্ধ্যের পর আমরা পাকিস্তানিদের হটিয়ে দিতে পেরেছিলাম এটা কোনো সান্তনাই নয়। কেননা পাকিস্তানিরা ভারতীয় এলাকা দখল করে সেখানে থাকবার জন্যে আসে নি। এসেছিল আমাদের নাক ঘষে দিয়ে নিজেদের গায়ের জোর ফলানোর জন্যে। সেই উদ্দেশ্যে তারা চমৎকারভাবেই সাধন করে ফিরে গেছে। ঘটনা এই যে, আমরা সীমান্তে যেখানে তাদের আটকানো উচিত ছিল সেখানে তাদের বাধা দিতে পারি নি।

কিন্তু কেন? নয়াদিল্লীর হোমরা-চোমরারা যারা বাংলাদেশ সম্পর্কে কোনো সাহসের পরিচয় দেবার কথা চিন্তা করতেই লজ্জায় মরে যাচ্ছেন, তারা এই ব্যর্থতার কি যুক্তি দেখাবেন? সোমবার ও মঙ্গলবার আসাম আর মেঘালয় সীমান্তে যা ঘটেছে তার সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো সম্পর্ক নেই। সেটা একান্তভাবেই আমাদের নিরাপত্তার ব্যাপার। এবং আমাদের সীমান্ত শত্রু সৈন্যের হাত থেকে রক্ষা করা হবে এটাই প্রত্যাশিত। তবু এক্ষেত্রেও এই নূন্যতম রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালনেও আমরা সাহসের পরিচয় দিতে পারলাম না কেন? পাকিস্তানি সৈন্য আমাদের এলাকার অনেক ভেতরে ঢুকে পড়ল তবু কেন আমরা তাদের বাধা দিতে পারলাম না? সুতারকান্দি কিংবা দালুর আক্রমণ হঠাৎ আসে নি। দু'মাস হয়ে গেল একদার পূর্ব পাকিস্তানে অস্থির অবস্থ চলছে। তার চেয়েও বড় কথা, এই দু'মাসে আমাদের সীমান্তে পাকিস্তানিদের আক্রমণের আরো অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। বনগাঁ সেক্টরে ঠিক একইভাবে পাকিস্তানিরা বয়রা গ্রামে ঢুকে পড়ে অন্তত পাঁচজনকে হত্যা করেছিল। উত্তরাঞ্চলের ছিটমহল বাঁশপচাইয়ের ওপর আক্রমণও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু তার পরেও কেন দালু আর সুতারকান্দি মতো ঘটনা ঘটতে পারে? আমাদের সীমান্ত প্রস্তুতি কেন এখনো এতটা দুর্বল।

নাকি এই নগ্ন, নির্লজ্জ, উদ্বত আক্রমণের প্রতিও ভারত সরকার চোখ ফিরিয়ে থাকতে চান, পাছে পাকিস্তান চটে যায়, পাছে ব্যাপারটা ভারত-পাক ব্যাপারে দাঁড়িয়ে যায়? ওরা মেরে যায় মারুক; আহা-হা, তাই বলে কি আমরা মারতে পারি? লোকে কি বলবে? ওরাই বা কি ভাববে? আর মারার কথাও নয়। শত্রু সৈন্য আমাদের সীমান্তে আঘাত হানছে, আমাদের এলাকায় ঢুকে পড়ছে। আমরা তাদের বাধা দেব, সেই জন্যে সীমান্তে আমাদের

আয়োজনকে প্রস্তুত রাখবো। ব্যাপার শুধু এইটুকু। সেটটুকুও আমরা করতে রাজি নই, পাছে পাকিস্তান দুনিয়ার মোড়লদের কাছে বলার সুযোগ পায়–দ্যাখো, ভারত আমাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্যে তৈরি হচ্ছে। নয়াদিল্লীর সতর্কতা সত্যিই ঐতিহাসিক, তাঁদের হিসাবের সত্যিই তুলনা নেই। আমাদের ঘরের পাশে যখন একটা ঐতিহাসিক ভাঙাগড়া চলছে, তার উত্তাপ, তার আগুন যখন আমাদেরও স্পর্শ করছে, তার পরিণতি যখন আমাদের ভাগ্যকে প্রভাবিত করতে পারে, তখনও আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে আছি, পাছ ব্যাপারটা কোনভাবেই ভারত-পাক বিরোধ দাঁড়িয়ে যায়।

ঠিক কথা পাকিস্তান তার গৃহযুদ্ধকে ভারত-পাক ব্যাপারে দাঁড় করাতে চায়। এটাও ঠিক কথা যে, আমরা তা হতে দিতে চাই না। কিন্তু আমরা না চাইলেই কি পাকিস্তানকে ঠেকাতে পারছি? পাকিস্তান কি ইতিমধ্যেই ব্যাপারটাকে ভারত-পাক ব্যাপার করে তোলে নি? যে ৩৫ লক্ষ উদ্বাস্তু ইতিমধ্যেই এদেশে এসেছে এবং আগামী দিনগুলিতে আরো যে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু আসবে, তারা কি? বাংলাদেশ সরকার আজ পাকিস্তান সরকারের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার? আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই, তারা এমনি এমনিই চলে যাবে? নয়াদিল্লী কি তাই ভাবছেন? তাঁরা মনে রাখবেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ ইতিমধ্যেই উদ্বাস্তুদের ভারতীয় দুঃস্থ আর দুষ্কৃতকারী বলে গেয়ে রেখেছেন। তিনি বলেছেন, এদের কিছুতেই আর বাংলাদেশে ঢুকতে দেওয়া হবে না। পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং আমরা জানতে চাই, পাকিস্তানকে বাধ্য না করলে এদের কিভাবে ফেরৎ পাঠাবেন? তাঁর বক্তৃতার হুঙ্কারে?

পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং নির্ভয় না হলে যে উদ্বাস্তুরা ফিরে যেতে পারে না এটা বুঝতে কোনো অসাধারণ জ্ঞানের দরকার হয় না এবং রাজনৈতিক পন্ডিত না হলেও এটাও সকলেই বুঝতে পারে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থা কখনোই স্বাভাবিক ও নির্ভয় হবে না। বুঝতে চাইছেন না শুধু ভারত সরকার। ইশ্বর আর ইয়াহিয়ার ওপর সর্বস্ব ছেড়ে দিয়ে তাঁরা এখনো ভাবছেন, সবকিছু হয়ে যাবে। নাকি তাঁরা ভাবছেন বৃহৎ শক্তিগুলো একদিন না একদিন পাকিস্তানকে বাধ্য করবে উদ্বাস্তুদের ফেরৎ নেবার জন্যে– সেইসব বৃহৎ শক্তি যারা দশ লাখ মৃতের সামনে দাঁড়িয়েও অবিচলিত, যারা ৩৫ লাখ ভাগ্যহতের সমস্ত দায় ভারতের ওপর চাপিয়ে দিতেই ব্যস্ত? সেই জন্যেই কি দৈনিক পঞ্চাশ ষাট হাজার উদ্বাস্তু এলেও আমাদের কিছু করবার নেই? সেই জন্যেই কি পাকিস্তানিরা আমাদের সার্বভৌমত্ব লজ্ঘন করে গেলেও আমরা প্ররোচিত হতে প্রস্তুত নই?

৬. *Bangladesh Documents*, Vol-1, Ministry of External Affairs, Government of India, 1971, p-81

৭. জয় বাঙলা (সম্পাদকীয়), *সাপ্তাহিক সপ্তাহ*, কলকাতা, ২ এপ্রিল ১৯৭১

জয় বাঙলা

সীমান্তের ওপারে বাঙলাদেশের হৃদয় হতে যে রক্ত ঝরছে তা আমাদেরই রক্ত। যে আবেগে তারা কম্পিত হচ্ছে সে আমাদেরই আবেগ। তাদের ক্রোধ আমাদের চোখের অগ্নি। তাদের সংকল্পে আমাদের পেশী আবদ্ধ। পূর্ব বাঙলার ভাইরা, আমরা তোমাদের সহোদর। রাষ্ট্রের কৃত্রিম প্রাচীরে

দ্বিধা হৃদয় আমাদের একই সুরে বাজছে। ভাই, আমরা আছি, তোমাদের পাশে। জয় আমাদের হবেই।

আমরা তোমাদের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছি। কী আশ্চর্য শক্তি তোমাদের এক-পাথুরে ঐক্যের। স্বৈরাচারীর জগদ্দল রথকে তোমরা অচল করে দিয়েছ। তাদের কামান বন্দুক ট্যাঙ্কের সামনে অকুতোভয় তোমরা নির্দ্বিধায় বুক পেতে দিয়েছ। অকাতরে যারা প্রাণদান করতে পারে তাদের কী কখনও ক্ষয় আছে।

তোমাদের নেতা মুজিবুর আমাদেরও নেতা। বাঙালি জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার সংকল্পের তিনি প্রতীক। তাঁর নামের অমৃতমন্ত্র এপার বাঙলার বাঙালিদেরও ঐক্যবদ্ধ করুক নিষ্ফল আত্মদ্বন্দ্বের অবসান ঘটাক। বাঙালি আবার জগতসভায় যোগ্য আসন লাভ করুক। তোমাদের সংগ্রাম, তোমাদের আত্মদান আমাদেরও মহান করুক। জয় বাঙলা।

৮. সেমন্তী ঘোষ (সম্পা.), *দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা*, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৪ (চতুর্থ সংস্করণ), পৃ.৯

৯. শান্তা সেন, *জন্ম ও জন্মান্তর*, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৫ গ্রন্থটিতে দেশভাগের যাতনা, দুইবঙ্গের মানুষের বিশদ উঠে এসেছে।

১০. শঙ্খ ঘোষ, *দেশহীন*, পরিচয় (বাংলাদেশ সংখ্যা), কলকাতা, ১৯৭১ (বর্ষ ৪০, ১৩৭৭-১৩৭৮), পৃ. ৮১৩

১১. *দমদম দাওয়াই* শব্দটি পশ্চিমবঙ্গে উচিত শিক্ষা অর্থে প্রচলিত প্রবাদ। দেশভাগ পরবর্তী মুসলমানদের উচিত শাস্তি দেওয়া অর্থে এর বহুল ব্যবহার দেশভাগ সংক্রান্ত লেখায় লক্ষণীয়। এই বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণণা পাওয়া যায় ছবি বসু, *একটি জীবনের কিছু চিত্র, স্মৃতি*, কলকাতা, ২০০৪ গ্রন্থটিতে।

১২. মুনতাসীর মামুন ও চৌধুরী শহীদ কাদের (সম্পা.), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ত্রয়োবিংশ খণ্ড, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ২২

১৩. অমিতাভ ভট্টশালী, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কেন পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যে-সিনেমায় উপেক্ষিত*, বিবিসি বাংলা, কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৬

১৪. বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ভারতবর্ষ ও বাঙলাদেশের সংগ্রাম, *সাপ্তাহিক সপ্তাহ*, ৯ এপ্রিল ১৯৭১

১৫. www.wb.gov.in(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট)

১৬. www.bengali.mapsofindia.com/west-bengal

১৭. প্রাগুক্ত

১৮. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, *বাঙালির ইতিহাস*, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ৩৩

১৯. রাহুল রায় (সম্পা.), *পশ্চিম থেকে পূর্ববঙ্গ : দেশবদলের স্মৃতি*, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১৩৫

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

২১. *দৈনিক আনন্দবাজার*, কলকাতা, ২৯ মার্চ ১৯৭১

২২. *যুগান্তর*, ৬ এপ্রিল ১৯৭১

২৩. সুবোধ মুখার্জি, *একাত্তরে কলকাতার মুক্তিসংগ্রাম সহায়ক সমিতি*, একুশে সংকলন, বোধন, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ১৪

২৪. *যুগান্তর*, ৬ এপ্রিল ১৯৭১

২৫. http://www.viswayan.com/akash/boimela1410/collegestreet.asp (বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতি নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ একটি প্রবন্ধ এই ওয়েব ঠিকানায় প্রকাশিত হয়েছে।)

২৬. *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, বিজয় দিবস সংখ্যা, ২০১৪

২৭. *বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৩১৫

বাঙলাদেশ-সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী-সমিতির আবেদন

ইয়াহিয়া খাঁ ও তার বর্বর সামরিক চক্র বাঙলাদেশের গণতান্ত্রিক চেতনা, স্বাধিকার বোধ ও মানবিক মর্যাদার পবিত্র অনুভবকে ট্যাঙ্কের চাকায় পিষে ফেলতে চাইছে। প্রকৃতির আশীর্বাদ, কবির স্বপ্ন, নদী-মেঘলা-শোভিতা এই শ্যামল ভূখণ্ড ও তার সাড়ে সাত কোটি মানবসন্তানকে আধুনিকতম মারণাস্ত্রের সাহায্যে একদল নরপিশাচ ঝলসে মারতে চায়।

নাপাম বোমার আগুনে তারা সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীন নিদর্শনগুলি, বহু স্মৃতিঘেরা জনবসতি অঞ্চল, এমনকি গাঁয়ের সবুজ মাটি পর্যন্ত পুড়িয়ে দিচ্ছে। গোটা জাতির স্বপ্ন শ্রম আর সম্পদে নির্মিত সেতু, বাঁধ ও প্রকল্পগুলিকে তারা বেছে বেছে ধ্বংস করছে। সারস্বত-সাধনার পীঠস্থান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এই জঙ্গীচক্র কামান দেগে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রঙপুরের বিখ্যাত কারমাইকেল কলেজ এবং বিভিন্ন অঞ্চলের অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থগার ও গবেষণাগার ঘাতকরা ধ্বংস করেছে। সংবাদপত্রের কার্যালয়কে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। বোমা ফেলে মর্টার ছুঁড়ে তারা হাসপাতাল-ভবনে জ্বেলেছে নরকের ভয়াবহ আগুন। মন্দির-মসজিদ-চার্চের পবিত্রতাটুকুও ঐ যুদ্ধোন্মাদ রাক্ষসদের নখ এবং দাঁতের কামড় থেকে রক্ষা পায়নি।

হত্যা ও রক্তের নেশায় জঙ্গী ইয়াহিয়া চক্র উন্মাদ হয়ে গেছে। খবর এসেছে কয়েক লক্ষ লোক মারা গিয়েছে–নিজের দেশে মানুষের অধিকারে মায়ের ভাষায় কথা বলে যারা শান্তিতে বাঁচতে চেয়েছিল। অতর্কিত আক্রমণের শিকার, কামানের খোরাক, কয়েক লক্ষ অমৃতের সন্তান পচা গলা শবদেহ হয়ে শহরে বন্দরে গ্রামে শুকুনির খাদ্য হচ্ছে। তাদের কবর দেবার, দাহ করবার কোনো ব্যবস্থা হয়নি। ইয়াহিয়ার উদ্যত সঙ্গীন কয়েক লক্ষ শবদেহকে নিয়ত পাহারা দিচ্ছে–দেশবাসী যাতে শহীদদের প্রাপ্য মর্যাদাটুকু দিতে না পারে।

নরনারী শিশু-বৃদ্ধ-কে মরেনি? শ্রমিক-কৃষক বুদ্ধিজীবী-চাকুরে-ব্যবসায়ী... কে মরেনি? শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিক অধ্যাপক... কে মরেনি?

মায়ের দুই স্তন কর্তন করে দানবরা রক্তের উচ্ছ্বসিত ফোয়ারার মধ্যে অবোধ শিশুর মুখ চেপে ধরেছে। আড়াই বছরের বাচ্চাকে কামানের সামনে দাঁড় করিয়ে গোলা ছুঁড়ছে। ইজ্জত লুঠ করে তারপর বাঙলাদেশের মা ও বোনদের সঙীন দিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মহান আচার্যদের সারিবন্দী দাঁড় করিয়ে গুলি ছুঁড়েছে। হাসপাতালের প্রত্যেকটি রোগীকে গুনে গুনে খুন করেছে।

কিন্তু নতুন মর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ সত্য ও সুন্দরের উপাসক বাঙলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ মৃত্যুঞ্জয় প্রতিরোধে রুখে দাঁড়িয়েছে। বীর রোশেনারা বেগম বুকে মাইন বেঁধে জল্লাদদের ট্যাঙ্কের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে নিজের কিশোরী দেহের সঙ্গে একটা আস্ত প্যাটন ট্যাঙ্ককেই ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা ফৌজীদের হাত থেকে একের পর এক ঘাঁটি কেড়ে নিচ্ছে। গোটা বাঙলাদেশ আজ একটিই অস্তিত্ব হয়ে মুক্তিযুদ্ধ করছে। বাঙলাদেশ জিতছে।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী আমরা, রবীন্দ্রনাথের উত্তরপুরুষ আমরা, এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে নীরব বা নিষ্ক্রিয় থাকতে পারি না। আমরা ভুলিনি স্পেনের গৃহযুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ এবং ভারতবর্ষের ভূমিকা। আমাদের মহান ঐতিহ্যকে আমরা কিছুতেই ভুলতে পারি না।

তাই আমরা 'বাঙলাদেশ সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতি' গঠন করেছি।

আমাদের নিজ নিজ ক্ষেত্র ও নিজ নিজ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমরা এক ভাবগত আন্দোলন গড়ে তুলতে চাই। আমরা চাই শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, শুধু ভারতবর্ষ নয়, গোটা পৃথিবীর গণতান্ত্রিক চেতনা ও মানবিক শুভবুদ্ধি বাঙলাদেশের নবজাত সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য এবং সর্ববিধ সাহায্য নিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্য এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম শুরু করুক।

সেই সঙ্গে আমরা বিপন্ন মানবতার পক্ষে বাস্তব আর প্রত্যক্ষ সাহায্যও সংগ্রহ করতে চাই। সীমান্তের ওপারে এই মুহূর্তে দরকার ঔষধ, চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, গুঁড়ো দুধ ও বিস্কুট জাতীয় শুকনো খাদ্য। আর তা কেনার জন্য টাকা পয়সা।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। রাজপথ, বস্তি, কুটির অথবা অট্টালিকা–যেখানেই আপনি বাস করুন, অবিলম্বে আপনার যতখানি সামর্থ্য তার থেকেও বেশি সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসুন। ১৪৪ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ (টেলিফোন: ২৪-৩৯৩০)– এই ঠিকানায় সমিতির কার্যালয়ে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত উপযুক্ত রসিদের বিনিময়ে আপনার সাহায্য ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে।

সীমান্তের ওপারে এই মুহূর্তে দরকার রক্ত। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ! রাজপথ বস্তি, কুটির অথবা অট্টালিকা–যেখানেই আপনি বাস করুন, অবিলম্বে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয়ে (৬৭ লেনিন সরণি, কলকাতা ১৩। সময়: বেলা ২ টা থেকে সন্ধ্যে ৬ টা) গিয়ে রক্তদান করুন।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ–বাঙলাদেশের আহ্বানে সাড়া দিন। সেই শিশুটিকে স্মরণ করুন–মায়ের বুকের রক্তের ফোয়ারায় যার মুখ গুঁজে ধরা হয়েছিল। ওর খাদ্য দরকার। সেই জননীকে স্মরণ করুন–পশুরা যার অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়েছে মা-র চিকিৎসা দরকার। সেই কিশোরটির কথা স্মরণ করুন–ফ্রন্টে আহত যে বীর দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ক্যাম্পে শুয়ে আছে, দুই চোখে অধীর প্রত্যাশা নিয়ে যে তাকিয়ে আছে আপনার দিকে, পশ্চিমবঙ্গের দিকে। ওর রক্ত দরকার। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ! আপনি যে-ই হোন, যেখানেই থাকুন, একবার বিপন্ন বাঙলাদেশের কথা ভাবুন। তার দরকার টাকা। কারণ ওষুধ আর খাদ্য কিনতে হবে। মনুষ্যত্ব জাগ্রত হোকঃ আমাদের বিবেক শুভবুদ্ধির আহ্বানে সাড়া দিক। যেন ভুলে না যাই ইতিহাসের অগ্নিপরীক্ষায় আমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে।

নিবেদন

বাঙলাদেশ-সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতি

সভাপতি, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

২৮. তরুণ স্যানাল, *একাত্তরে কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা*, দহন, পূজা সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ১৪ ও *যুগান্তর*, ১৯ এপ্রিল ১৯৭১

২৯. *যুগান্তর*, ১১ এপ্রিল ১৯৭১

৩০. পি. সি. চন্দ্র এন্ড সন্স জুয়েলার্সের পক্ষ থেকে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে ১ এপ্রিল *যুগান্তর* ও *আনন্দবাজারে* বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়।

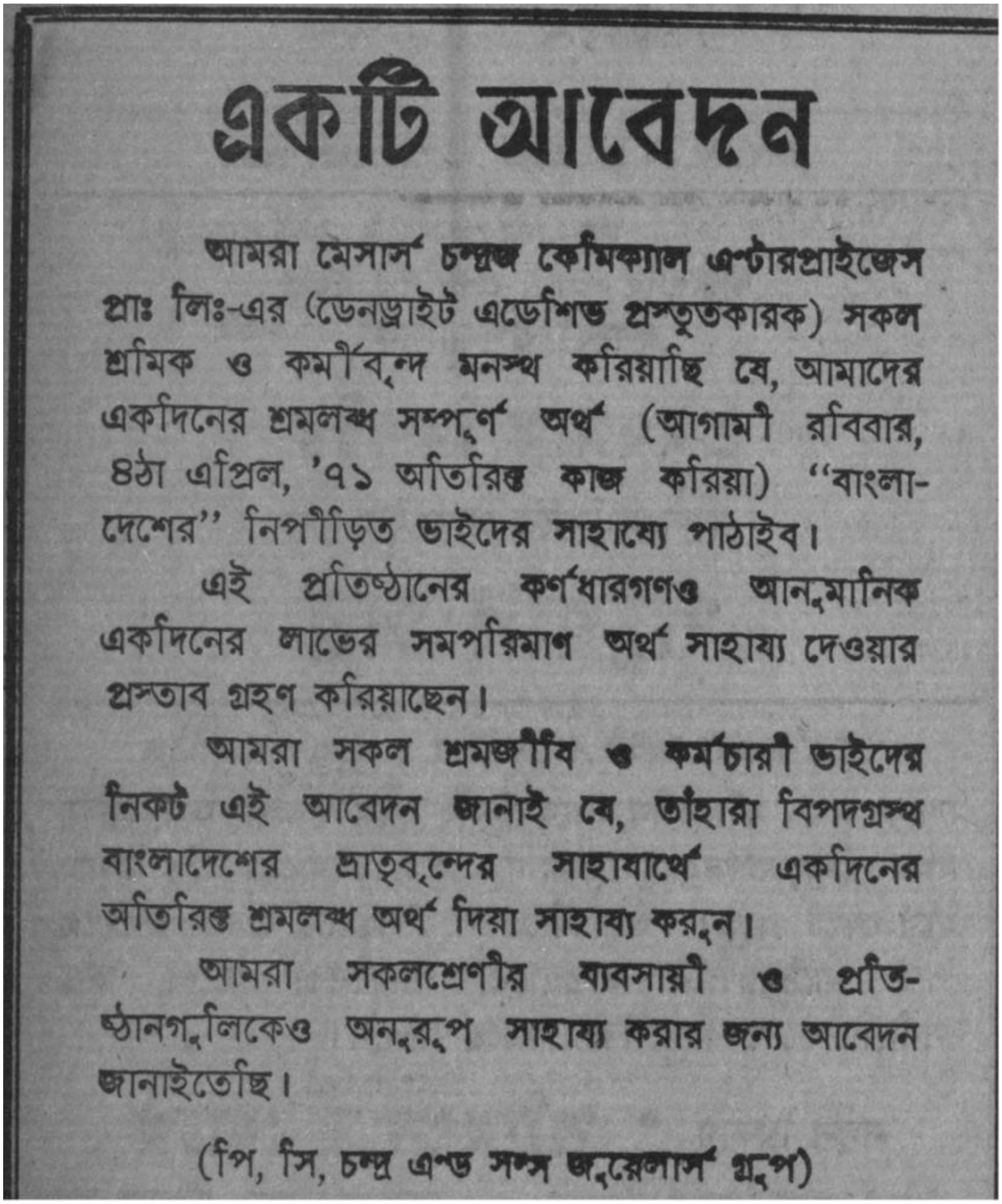

একটি আবেদন

আমরা মেসার্স চন্দ্রজ কেমিক্যাল এণ্টারপ্রাইজেস প্রাঃ লিঃ-এর (ডেনড্রাইট এডেশিভ প্রস্তুতকারক) সকল শ্রমিক ও কর্মীবৃন্দ মনস্থ করিয়াছি যে, আমাদের একদিনের শ্রমলব্ধ সম্পূর্ণ অর্থ (আগামী রবিবার, ৪ঠা এপ্রিল, '৭১ অতিরিক্ত কাজ করিয়া) "বাংলা-দেশের" নিপীড়িত ভাইদের সাহায্যে পাঠাইব।

এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারগণও আনুমানিক একদিনের লাভের সমপরিমাণ অর্থ সাহায্য দেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

আমরা সকল শ্রমজীবি ও কর্মচারী ভাইদের নিকট এই আবেদন জানাই যে, তাঁহারা বিপদগ্রস্থ বাংলাদেশের ভ্রাতৃবৃন্দের সাহায্যার্থে একদিনের অতিরিক্ত শ্রমলব্ধ অর্থ দিয়া সাহায্য করুন।

আমরা সকলশ্রেণীর ব্যবসায়ী ও প্রতি-ষ্ঠানগুলিকেও অনুরূপ সাহায্য করার জন্য আবেদন জানাইতেছি।

(পি, সি, চন্দ্র এণ্ড সন্স জুয়েলার্স গ্রুপ)

৩১. *যুগান্তর*, ৮ এপ্রিল ১৯৭১

৩২. প্রাগুক্ত

৩৩. *আনন্দবাজার*, ১৩ এপ্রিল ১৯৭১

৩৪. *যুগান্তরের* ১৬ এপ্রিল ১৯৭১ ও *আনন্দবাজারে* ৬ অক্টোবর ১৯৭১ এই সংক্রান্ত সংবাদ ছাপা হয়।

৩৫. *যুগান্তর*, ২৪ এপ্রিল ১৯৭১

৩৬. *যুগান্তর*, ২৭ এপ্রিল ১৯৭১

৩৭. *আনন্দবাজার*, ১৯ এপ্রিল ১৯৭১

৩৮. গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ত্রয়োবিংশ খণ্ড, পৃ. ৩৮

৩৯. *যুগান্তর*, ২৬ এপ্রিল ১৯৭১

৪০. সাক্ষাৎকার, *সৌমেন জমাতিয়া*, ১০ ডিসেম্বর ২০১৬ (একাত্তরে রাঁচী জেলায় রাজ্য সরকারের পরিসংখ্যান বিভাগে কর্মরত)

৪১. *যুগান্তর*, ২০ এপ্রিল ১৯৭১

৪২. দেবব্রত ভট্টাচার্য, বাসব দাসগুপ্ত, বিকাশ সরকার (সম্পা.), *অশ্রু হল বারুদ*, সিপিআইএম, কলকাতা, ১৯৭১, পৃ. ৪৮

৪৩. *অমৃতবাজার*, ১৪ এপ্রিল ১৯৭১

৪৪. *অমৃতবাজার*, ১৭ এপ্রিল ১৯৭১

৪৫. আশীষ কুমার দাস, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারত*, লাকী পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৬, প, ৪৩

৪৬. *অমৃতবাজার*, ১৯এপ্রিল ১৯৭১

৪৭. *যুগান্তর*, ১৫ মে ১৯৭১

৪৮. *যুগান্তর*, ২৩ এপ্রিল ১৯৭১

৪৯. সাক্ষাৎকার, অরিজিৎ পুরকায়স্থ, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৭, কলকাতা, সংবাদটি ২৩ এপ্রিল ১৯৭১ *যুগান্তরেও* প্রকাশিত হয়েছে।

৫০. *যুগান্তর*, ১২ মে ১৯৭১

৫১. প্রাগুক্ত

৫২. প্রাগুক্ত

৫৩. *আনন্দবাজার*, ১৮ মে ১৯৭১

৫৪. *যুগান্তর* ১৪ মে ১৯৭১

৫৫. *যুগান্তর*, ৩ এপ্রিল ১৯৭১

৫৬. মুনতাসীর মামুন ও আহমেদ মাহফুজুল হক (সম্পা.), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ষষ্ঠ খণ্ড, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১০৪

৫৭. *আনন্দবাজার*, ২৬ জুলাই ১৯৭১

৫৮. *আনন্দবাজার*, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

৫৯. প্রাগুক্ত

৬০. *যুগান্তর*, মে ১৯৭১

৬১. সুবোধ মুখার্জি, *একাত্তরে কলকাতার মুক্তিসংগ্রাম সহায়ক সমিতি*, পৃ. ১৬

৬২. *যুগান্তর*, ১৫ এপ্রিল ১৯৭১

৬৩. *আনন্দবাজার*, ১৪ এপ্রিল ১৯৭১

৬৪. *যুগান্তর* ১৮ এপ্রিল ১৯৭১

৬৫. *কার্যবিবরণী*, বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ, ১৮.০২.১৯৬৮- ৩০.০৬.১৯৭২

৬৬. *যুগান্তর*, ২৮ এপ্রিল ১৯৭১

৬৭. *যুগান্তর*, ১৫ এপ্রিল ১৯৭১

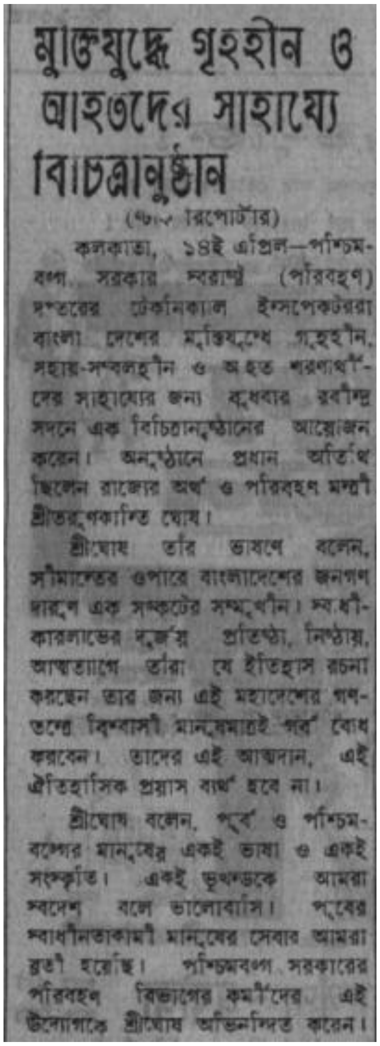

মুক্তিযুদ্ধে গৃহহীন ও আহতদের সাহায্যে বিচিত্রানুষ্ঠান

(স্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ১৪ই এপ্রিল—পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বরাষ্ট্র (পরিবহণ) দপ্তরের টেকনিক্যাল ইন্সপেক্টররা বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধে গৃহহীন, সহায়-সম্বলহীন ও আহত শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য বুধবার রবীন্দ্র সদনে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্যের অর্থ ও পরিবহণ মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ।

শ্রীঘোষ তাঁর ভাষণে বলেন, সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশের জনগণ দারুণ এক সঙ্কটের সম্মুখীন। স্বাধীকারলাভের দুর্জয় প্রতিজ্ঞা, নিষ্ঠায়, আত্মত্যাগে তাঁরা যে ইতিহাস রচনা করছেন তার জন্য এই মহাদেশের গণতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষমাত্রই গর্ব বোধ করবেন। তাদের এই আত্মদান, এই ঐতিহাসিক প্রয়াস ব্যর্থ হবে না।

শ্রীঘোষ বলেন, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের একই ভাষা ও একই সংস্কৃতি। একই ভূখণ্ডকে আমরা স্বদেশ বলে ভালোবাসি। পূবের স্বাধীনতাকামী মানুষের সেবায় আমরা ব্রতী হয়েছি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহণ বিভাগের কর্মীদের এই উদ্যোগকে শ্রীঘোষ অভিনন্দিত করেন।

৬৮. *যুগান্তর*, ১৩ এপ্রিল ও ৩ অক্টোবর ১৯৭১

ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার শরণার্থী সেবা

বাঙলাদেশের শরণার্থীদের সেবায় ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা অংশ গ্রহণ করেছেন। বেশ কিছুকাল যাবত শিয়ালদহ সাউথ ষ্টেশনে (কলকাতা) সভার উদ্যোগে একটি চিকিৎসা-কেন্দ্র (হোমিওপ্যাথি) চালু আছে, যেখান থেকে রুগ্ন শরণার্থীদের বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়ে থাকে। ইতিমধ্যে সভা শরণার্থী ত্রাণ কার্যে কলকাতাস্থ বাঙলাদেশ মিশন প্রধান মিঃ হোসেন আলির হাতে ৪৫০ টাকা অর্পণ করেছেন।

৬৯. *যুগান্তর*, ১৯ এপ্রিল ১৯৭১

৭০. কার্যবিবরণী, বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি

৭১. *যুগান্তর*, ১৬ মে ১৯৭১

৭২. *বসুমতি*, ২৮ এপ্রিল ১৯৭১

৭৩. কলেজ স্ট্রিটের পাশে বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের *ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার* কার্যালয়ে রক্ষিত পুরানো দলিলপত্রে এই সংক্রান্ত তথ্য রয়েছে। এছাড়া ও ১৩ এপ্রিল ১৯৭১ *দৈনিক যুগান্তরে* তাদের সহায়তার সংবাদ ছাপা হয়েছে।

৭৪. *যুগান্তর*, ১৪ এপ্রিল ১৯৭১

৭৫. সাক্ষাৎকার, শচীন রায়, সভাপতি, রংপুর জেলা সম্মিলনী, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

৭৬. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৩৬৫

৭৭. একাত্তরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতি কতৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন।

৭৮. প্রাগুক্ত

৭৯. রঙ্গলাল সেন, দুলাল ভৌমিক, তুহিন রায় (সংকলন ও সম্পাদনা), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধঃ ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৪১

৮০. প্রাগুক্ত

৮১. *যুগান্তর*, ১২ এপ্রিল ১৯৭১

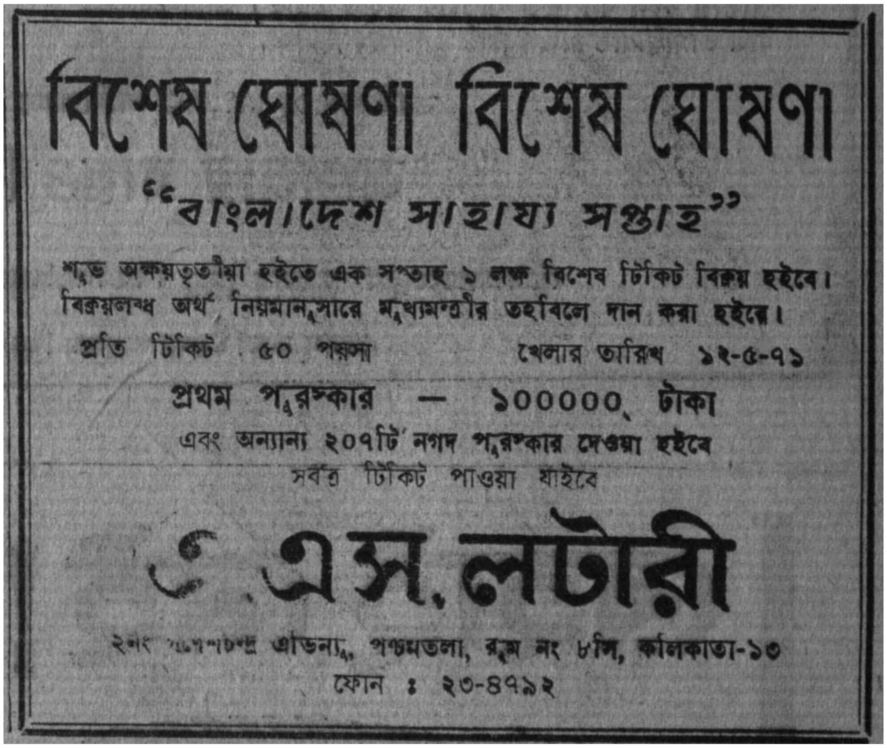

৮২. বালুরঘাটে স্থানীয় সিদ্বেশ্বরী ক্লাব জয় বাংলার লটারির আয়োজন করে, প্রথম পুরস্কার রাখা হয় একশ টাকা। পুরো আয়োজন থেকে সংগৃহীত ৪৫০ টাকার কাপড় কিনে শরণার্থীদের বিলি করা হয়।

৮৩. *যুগান্তর*, ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১

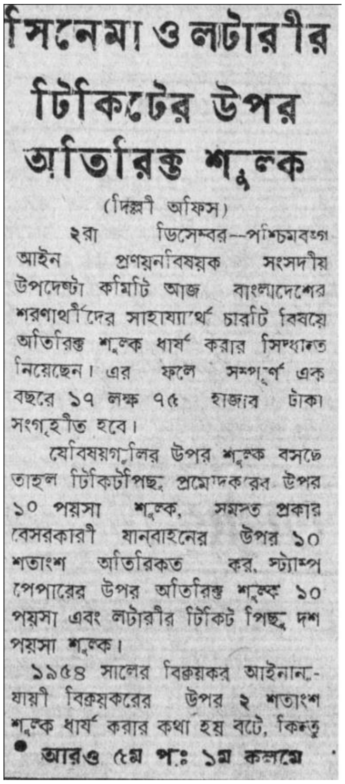

সিনেমা ও লটারীর টিকিটের উপর অতিরিক্ত শুল্ক

(দিল্লী অফিস)

২রা ডিসেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ আইন প্রণয়নবিষয়ক সংসদীয় উপদেষ্টা কমিটি আজ বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যার্থে চারটি বিষয়ে অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর ফলে সম্পূর্ণ এক বছরে ১৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা সংগৃহীত হবে।

যেবিষয়গুলির উপর শুল্ক বসছে তাহল টিকিটপিছু প্রমোদকরের উপর ১০ পয়সা শুল্ক, সমস্ত প্রকার বেসরকারী যানবাহনের উপর ১০ শতাংশ অতিরিকত কর, স্ট্যাম্প পেপারের উপর অতিরিক্ত শুল্ক ১০ পয়সা এবং লটারীর টিকিট পিছু দশ পয়সা শুল্ক।

১৯৫৪ সালের বিক্রয়কর আইনানুযায়ী বিক্রয়করের উপর ২ শতাংশ শুল্ক ধার্য করার কথা হয় বটে, কিন্তু

• আরও ৫ম পঃ ১ম কলমে

৮৪. *আনন্দবাজার*, ১৮ অক্টোবর ১৯৭১

৮৫. *Hindustan Standard*, 22nd July 1971

৮৬. যুগান্তর, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

৮৭. *অমৃতবাজার*, *যুগান্তর*, *আনন্দবাজার*, ৪ জুলাই ১৯৭১

৮৮. *যুগান্তর*, ১৯ অক্টোবর ১৯৭১

৮৯. *যুগান্তর*, ২৬ জুলাই

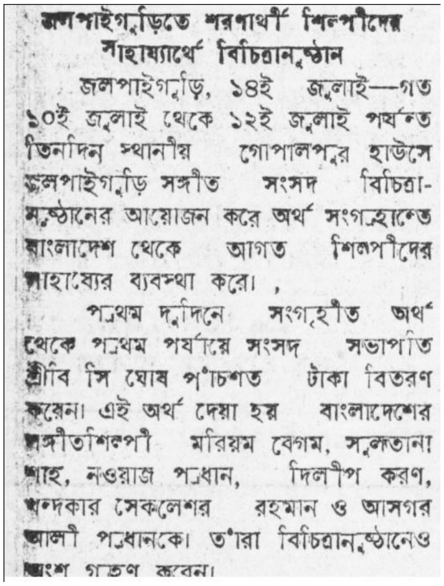

জলপাইগুড়িতে শরণার্থী শিল্পীদের সাহায্যার্থে বিচিত্রানুষ্ঠান

জলপাইগুড়ি, ১৪ই জুলাই—গত ১০ই জুলাই থেকে ১২ই জুলাই পর্যন্ত তিনদিন স্থানীয় গোপালপুর হাউসে জলপাইগুড়ি সঙ্গীত সংসদ বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করে অর্থ সংগ্রহান্তে বাংলাদেশ থেকে আগত শিল্পীদের সাহায্যের ব্যবস্থা করে। ,

প্রথম দুদিনে সংগৃহীত অর্থ থেকে প্রথম পর্যায়ে সংসদ সভাপতি শ্রীবি সি ঘোষ পাঁচশত টাকা বিতরণ করেন। এই অর্থ দেয়া হয় বাংলাদেশের সঙ্গীতশিল্পী মরিয়ম বেগম, সুলতানা শাহ, নওয়াজ প্রধান, দিলীপ করণ, খন্দকার সেকলেশর রহমান ও আসগর আলী প্রধানকে। তাঁরা বিচিত্রানুষ্ঠানেও অংশ গ্রহণ করেন।

৯০. *যুগান্তর*, ২৬ জুলাই

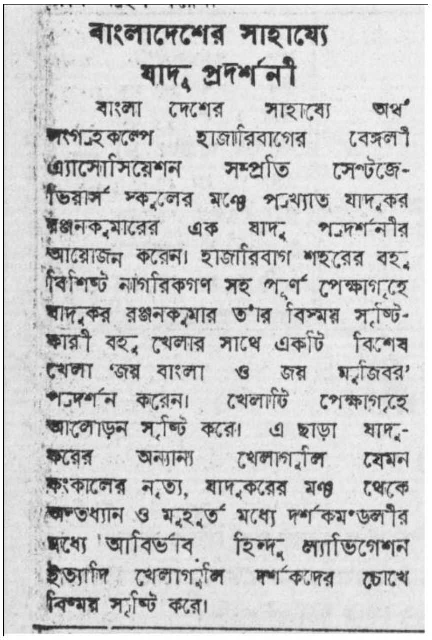

বাংলাদেশের সাহায্যে যাদু প্রদর্শনী

বাংলা দেশের সাহায্যে অর্থ সংগ্রহকল্পে হাজারিবাগের বেঙ্গলী এ্যাসোসিয়েশন সম্প্রতি সেণ্টজেভিয়ার্স স্কুলের মঞ্চে প্রখ্যাত যাদুকর রঞ্জনকুমারের এক যাদু প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। হাজারিবাগ শহরের বহু বিশিষ্ট নাগরিকগণ সহ পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে যাদুকর রঞ্জনকুমার তাঁর বিস্ময় সৃষ্টিকারী বহু খেলার সাথে একটি বিশেষ খেলা 'জয় বাংলা ও জয় মুজিবর' প্রদর্শন করেন। খেলাটি প্রেক্ষাগৃহে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ ছাড়া যাদুকরের অন্যান্য খেলাগুলি যেমন কংকালের নৃত্য, যাদুকরের মঞ্চ থেকে অন্তর্ধান ও মুহূর্ত মধ্যে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে আবির্ভাব হিন্দু ল্যাভিগেশন ইত্যাদি খেলাগুলি দর্শকদের চোখে বিস্ময় সৃষ্টি করে।

৯১. *কালান্তর*, ২৫ মে ১৯৭১

৯২. কার্যবিবরণী, *ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন*

৯৩. *যুগান্তর*, ৯ মে ১৯৭১

৯৪. . তালিকাটি *বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির* ১৯৭১ এর সহায়তার তালিকা ও *দৈনিক যুগান্তরে* একাত্তরে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদের ওপর ভিত্তি করে তৈরি।

এছাড়া সেসময়ে অর্থ সংগ্রহে গৃহীত আরো কিছু কর্মসূচি ও পদক্ষেপের সংবাদ তুলে ধরা হল।

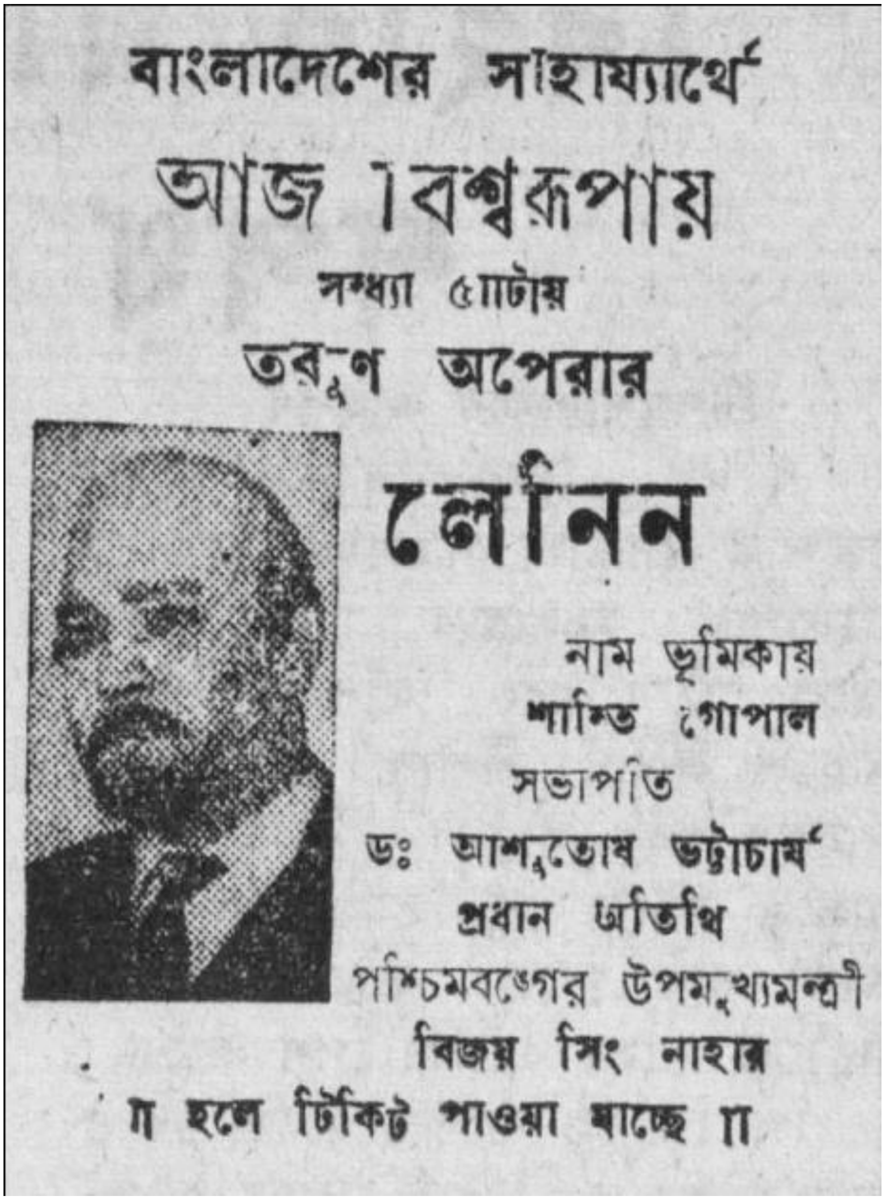

বাংলা দেশের সাহায্যে দান

ব্যানার্জী চক্রবর্তী এণ্ড কোং শ্রমিক ইউনিয়ন-এর সদস্যগণ বাংলাদেশ-এর মুক্তি সংগ্রামে সাহায্যকল্পে তাদের এক-দিনের মজুরী 'সাতশত এক টাকা' পশ্চিম-বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জীর হাতে দিয়েছেন।

ষ্টেটবাসের কর্মীদের দান

ক্যালকাটা ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সধারণ সম্পাদক নারায়ণ সাহা বাংলাদেশের সংগ্রামের সমর্থনে উক্ত সংস্থার কর্মীদের নিকট হইতে সংগৃহীত সমুদয় অর্থ প্রথম দফায় ২৩,২১৮-০০ টাকা বাংলাদেশ সাহায্য ও সংহতি কমিটির সদস্য হরেকৃষ্ণ কোঙ্গারের নিকট এক শ্রমিক সমাবেশের মাধ্যমে অর্পণ করেন।

বঙ্গীয় ক্যাথলিক সমিতির দান

বঙ্গীয় ক্যাথলিক সমিতির দিল্লীর সভ্যবৃন্দ বাংলাদেশের ত্রাণ তহবিলের জন্য শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর হাতে ১৫৮৭, টাকা দিয়েছে।

মুক্তিফৌজের সাহায্যে সিগারেট দান

গোল্ডেন টোবাকো কোম্পানী কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ মুক্তি সহায়ক সংগ্রাম সমিতিকে তিন লক্ষ পানামা সিগারেট বৃহস্পতিবার সকাল ১১-৩০ মিঃএ রাইটার্স বিল্ডিংএ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের হাতে দেবেন।

ই আই এম পি এসোঃ

শরণার্থী ত্রাণে পোনে ৩ লক্ষাধিক টাকা দান

কলকাতা, ১০ই জুন (ইউ, এন, আই)—ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া মোশন পিকচার্স এসোসিয়েশন বাংলা দেশের শরণার্থীদের ত্রাণের জন্য আজ ২,৭৮,৪৯১ টাকা দান করেছে।

পশ্চিম বাংলার ২৮২টি সিনেমা গৃহের ৬ই জুন তারিখের টিকিট বিক্রয়ের টাকা দিয়ে উল্লিখিত অর্থ সংগৃহীত হয়েছে। বাংলা দেশ মুক্তি-সংগ্রাম সহায়ক সমিতির সভাপতি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জির হাতে উল্লিখিত অর্থের চেক দেওয়া হয়েছে।

বিদেশী চিত্র দেখানো হয়, এমন সাতটি সিনেমা গৃহের মালিকরা ইতি-পূর্বে সমিতিকে ২৪,৫৪৬ টাকা দিয়েছেন। আরও ৮৯টি সিনেমা গৃহের সংগ্রহ এখনও এসোসিয়েশনের হাতে এসে পৌঁছয় নি।

বিহার, ওড়িশা, আসাম ও মেঘালয়ের সিনেমা গৃহগুলির ৬ই জুন তারিখের টিকিট বিক্রয়ের টাকা ঐ সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে পাঠান হচ্ছে। ইম্ফলের পাঁচটি সিনেমা গৃহের সংগৃহীত ৫,৩৩৬ টাকা মণিপুরের রাজ্যপালের হাতে দেওয়া হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে দান

দক্ষিণ কলিকাতার দোকান কর্মচারীদের সংগঠন সাউথ ক্যালকাটা শপ এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন তাদের সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে বাংলাদেশের সরকার ও সংগ্রামী জনগণের সাহায্যার্থে প্রত্যেকটি দোকান-কর্মচারী তাদের একদিনর বেতনদান করবেন।

৯৫. ব্যারাকপুরের চায়ের দোকানে একাত্তরের স্মৃতিচারণ করছিলেন কয়েকজন, তাদের স্মৃতিতে একাত্তরের সেই মিছিলের স্মৃতি, সাক্ষাৎকার, দীপঙ্কর মন্ডল, ১৬ জুন ২০১৬ এই বিষয়ে আরো তথ্য পাওয়া যায়, রীতা রায় মিঠু, *ঠাকুরবাড়ির আঁতুড়ঘরে*, ইউনিসন, কলকাতা, ২০১৪ গ্রন্থে

৯৬. *দৈনিক যুগান্তর*, ১৪ এপ্রিল ১৯৭১

মুজিব সরকারকে স্বীকৃতি দাও

বাঙালীর জনমানস থেকে পূর্ব পাকিস্তান মুছে গেছে। তার জায়গায় জন্ম নিয়েছে গণতন্ত্রী বাংলাদেশ। এই সার্বভৌম রাষ্ট্রের যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভার সদস্যের নাম ঘোষণা করেছেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। ইসলামাবাদের সামরিক শাসকরা এই নবীন রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধরত। ওদের ভাড়াটিয়া বাহিনী মুজিবুরের বাংলাদেশকে গলা টিপে মারার সর্বাত্মক অভিযান চালাচ্ছে। আগামী ক'দিনের মধ্যেই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটবে। কারণ পশ্চিমারা এখন বেপরোয়া। তাদের অস্ত্রশস্ত্র অত্যাধুনিক। যারা এগুলো ব্যবহার করছে তারা সুশিক্ষিত সৈন্যদল। এদের প্রতিপক্ষ গণতান্ত্রিক মুক্তিফৌজ। সংখ্যায় বেশি কিন্তু অস্ত্র শক্তিতে দুর্বল। একমাত্র সম্বল মনোবল এবং সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর অকুণ্ঠ সমর্থন। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল মুজিব বাহিনীর দখলে। বড় বড় শহরের প্রায় সর কটিই পশ্চিমাদের করতলগত। ওরা এখন মরণ কামড় দিতে উদ্যত। ইতিমধ্যেই স্ট্রটেজিক ঘাটিগুলোতে নিজেদের অধিকার কায়েম করতে উৎসুক। লড়াই সহজে শেষ হবে না। মুজিববাহিনী অবশ্যই গেরিলা লড়াই চালাবে। যতদিন যাবে দখলদার সৈন্যরা ততই হীনবল হয়ে পড়বে। ওদের সরবরাহে দেখা দেবে বিপর্যয়। আসন্ন বর্ষাকাল পশ্চিমাদের মৃত্যু ফাঁদ। গ্রামাঞ্চলে ইয়াহিয়ার শাসন অসম্ভব। যে শহরগুলো আজ তাঁর হাতে আছে কাল তা নাও থাকতে পারে। একটা যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর হতবদল সাধারণ ঘটনা। অনেক ক্ষেত্রেই তার বাস্তব মূল্য সাময়িক।

ভারতের সামনে এসে পড়েছে যুগান্তরকারী সিদ্ধান্তের দিন। স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার দাবি উঠেছে দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে। সংসদ সর্বসম্মতিক্রমে জানিয়েছেন বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামীদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি। এখন দরকার নব রাষ্ট্রের কূটনৈতিক স্বীকৃতী। তা হলেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর হবে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা। এতদিন এ পথে যেসব বাধা ছিল তা এখন নেই। মুজিবর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান এবং অন্যান্য মন্ত্রীও পেয়েছেন বিভিন্ন দপ্তর। প্রায় গোটা গ্রামাঞ্চলে চলছে তাঁদের শাসন। মুজিবর পশ্চিম পাকিস্তানের ইয়াহিয়ার মত ভূইফোড় ডিকটেটর নন। তাঁর সরকারের পিছনে রয়েছে জনসাধারণ এবং তাদের নির্বাচিত সদস্যদের পূর্ণ সহযোগিতা। ভুট্টো-ইয়াহিয়া বিশ্বাসঘাতকতা না করলে মুজিবর রহমান এবং তাঁর মনোনীত মন্ত্রীসভাই হতেন গোটা পাকিস্তানের সরকার। পশ্চিমের সামরিক দাপট এবং পাঞ্জাবী স্বার্থচক্র শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। ফলে জন্ম নিয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ। একদিকে গণতন্ত্রী মুজিবর সরকার এবং অপরদিকে স্বৈরাচারী

ইয়াহিয়া সরকার। এই বিপরীত ধর্মী দুই সরকারের বাহিনীর মধ্যে শুরু হয়েছে লড়াই। ভারত চায় বাংলাদেশে পশ্চিমাদের গণহত্যার অবসান। বাঞ্ছিত অবসানের একমাত্র উপায় অবিলম্বে মুজিব সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতিদান। তা হলেই বাংলাদেশে অস্ত্র পাঠাতে থাকবে না কোন আন্তর্জাতিক বাধা। দখলদার বাহিনীর পরাজয় হবে ত্বরাণিত। রক্ষা পাবে লক্ষ লক্ষ নরনারী।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত সাফল্যের সঙ্গে জড়িত ভারতের নিরাপত্তার প্রশ্ন। পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বহু চেষ্টা করেছেন নয়াদিল্লী। প্রতিদানে পেয়েছেন পশ্চিমা ডিকটেটরদের কাছে গলা ধাক্কা। ভারত বিদ্বেষী ভুট্টো-ইয়াহিয়া কবলিত পশ্চিম পাকিস্তান, বিশেষ করে শক্তিশালী পাঞ্জাবী চক্র কোনদিনই নয়াদিল্লীকে স্বস্তি দেয় নি, দেবেও না। বাংলাদেশের একছত্র নায়ক মুজিবর ভারতের বন্ধুত্ব প্রয়াসী। বর্তমান সঙ্কট সৃষ্টির ক'বছর আগে থেকেই জোরাল ভাষায় প্রচার করে এসেছেন তার যৌক্তিকতা। বাংলাদেশের স্বাধীন সরকার নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই সৌহার্দ্যের রাখী পরাবেন ভারতের হাতে। আর যদি ভুট্টো-ইয়াহিয়া আবার দখলে নিতে পারে বাংলাদেশ তবে ভারত উত্তর-পশ্চিমে পাবে চিরশত্রু পশ্চিম পাকিস্তানকে এবং পূর্বে পাবে নূতন শত্রু পূর্ব পাকিস্তানকে। ইসলামাবাদের স্বৈরাচারীদের বাধা দেবার কেউ থাকবেন না গোটা পাকিস্তানে। সুযোগ সন্ধানী চীন নেবে সম্ভাব্য অবস্থার পূর্ণ সুযোগ। গণতন্ত্র মানবতা এবং নিরাপত্তার প্রশ্নের একমাত্র সমাধান বাংলাদেশের স্বাধীন সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতদান এবং তাঁদের সংগ্রাম জয়যুক্ত করার জন্য সবরকমের সাহায্যের আশু ব্যবস্থ। সোভিয়েট রাশিয়ারও আর বসে থাকার সময় নেই। গণহত্যা বন্ধের প্রাথমিক চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছেন প্রেসিডেন্ট পদগোর্ণি। দ্বিতীয় পর্যায়ের পথ খুলে দিয়েছেন বাংলাদেশের স্বাধীন সরকার। ভারত এবং সোভিয়েট রাশিয়া একযোগে এ সরকারকে আপাততঃ ডি ফ্যাক্টো স্বীকৃতি দিলে বিশ্বের অন্যান্য আদর্শনিষ্ঠ রাষ্ট্র তাদের অনুসরণ করবে। ইতিহাসের পাতায় সংযোজিত হবে লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তপূত একটি নবীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাম। আর দেরী নয়। মুক্তিকামী বাংলাদেশ ডাকছে। তার আহ্বানে সাড়া দিতেই হবে। এটা ন্যায়ের দাবি, এটা মনুষ্যত্বের দাবি এবং এটা গণতন্ত্রের দাবি। ভারতের মর্মস্থল নবযাত্রার পদধ্বনিতে আন্দোলিত। নয়াদিল্লী জেগে উঠুন। ইয়াহিয়ার বুটের ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত বাংলাদেশকে বলুন–আমরা আছি। ভয় নেই। তোমরা জীবন-মরণ সংগ্রাম আমাদের সংগ্রাম। আমাদের কূটনৈতিক স্বীকৃতি তোমাদের জয় টিকা। এ টিকা আমরা তোমাদের ললাটে পড়ব। তোমাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইব–আমার সোনার বাংলা। আমি তোমায় ভালবাসি।

৯৭. *গণশক্তি (সান্ধ্য সংকলন)*, ২৮ মার্চ ১৯৭১

৯৮. যুগান্তর, ৩১ মার্চ ১৯৭১

বাংলাদেশে গণহত্যার প্রতিবাদে ডাক্তারদের মিছিল

কলকাতা, ৩০শে মার্চ, -বাংলাদেশের মানুষদের নৃশংসভাবে হত্যা করিবার প্রতিবাদে আজ পাঁচশতাধিক ডাক্তার ও মেডিকেল ছাত্র মৌন মিছিল করে কলকাতাস্থ পাকিস্তান হাইকমিশন অফিসে যান।

পৌরসভার স্ট্যান্ডিং হেলথ কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ নরেশ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে একদল প্রতিনিধি পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশনারের হাতে এক স্মারকলিপি দেন। স্মারকলিপিতে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য নিরস্ত্র মানুষদের বর্বোরোচিতভাবে হত্যা করায় ধিক্কার জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে যে, পাকিস্ড়নী সৈন্যরা হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অনেক সম্পত্তি নষ্ট করেছে। এতে সমগ্র বিশ্বের মানুষের মনে ঘৃণা জেগে উঠেছে। অবিলম্বে নিরীহ মানুষদের উপর আক্রমণ বন্ধ করতে হবে।

ডাক্তারও ছাত্ররা বাংলাদেশের নিপীড়িত মানুষদের সেবা ও সাহায্য করতে সর্বসময়ে প্রস্তুত আছে বলে স্মারকলিপিতে উল্লেখ আছে।

৯৯. *গণশক্তি* (সান্ধ্য দৈনিক), ১ এপ্রিল ১৯৭১

১০০. সাক্ষাৎকার, সৌমেন আচার্য, বনগাঁ, ১৬ আগস্ট ২০১৭

১০১. *যুগান্তর*, ১ এপ্রিল ১৯৭১

১০২. সাক্ষাৎকার, হিরন্ময় কার্লেকার, ঢাকা, ২৩ নভেম্বর ২০১৭

১০৩. *যুগান্তর*, ২৯ মার্চ ১৯৭১

১০৪. কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ও সাপ্তাহিকের তথ্য

১০৫. দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা মিলে মোট ১৬টি পত্রিকা আমি সংগ্রহ করেছি। এর মধ্যে অধিকাংশই মার্চ থেকে ডিসেম্বর সব সংখ্যা পাওয়া গেছে। কয়েকটির শুধু বিশেষ কিছু সংখ্যা সংগ্রহ সম্ভব হয়েছে।

১০৬. অশ্রু হল বারুদ, পৃ ৪৯

১০৭. *গণশক্তি* (সান্ধ্য দৈনিক), ১৬ এপ্রিল ১৯৭১

১০৮. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *একাত্তরের দশমাস*, কাকলী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ ৩২৩

১০৯. *যুগান্তর*, ৯ এপ্রিল ১৯৭১

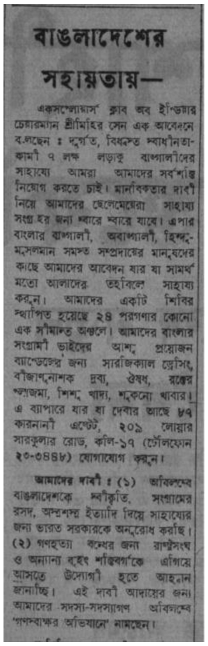

বাঙলাদেশের সহায়তায়—

এক্সপ্লোরার্স ক্লাব অব ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান শ্রীমিহির সেন এক আবেদনে বলেছেন : দুর্গত, বিধ্বস্ত স্বাধীনতাকামী ৭ লক্ষ লড়াকু বাঙ্গালীদের সাহায্যে আমরা আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে চাই। মানবিকতার দাবী নিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েরা সাহায্য সংগ্রহের জন্য দ্বারে দ্বারে যাবে। এপার বাংলার বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী, হিন্দু-মুসলমান সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষদের কাছে আমাদের আবেদন যার যা সামর্থ মতো আমাদের তহবিলে সাহায্য করুন। আমাদের একটি শিবির স্থাপিত হয়েছে ২৪ পরগণার কোনো এক সীমান্ত অঞ্চলে। আমাদের বাংলার সংগ্রামী ভাইদের আশু প্রয়োজন ব্যাণ্ডেজের জন্য সারজিক্যাল ড্রেসিং, বীজাণুনাশক দ্রব্য, ঔষধ, রক্তের প্লাজমা, শিশু খাদ্য, শুকনো খাবার। এ ব্যাপারে যার যা দেবার আছে ৮৭ কারনানী এস্টেট, ২০৯ লোয়ার সারকুলার রোড, কলি-১৭ (টেলিফোন ২৩-৩৪৪৮) যোগাযোগ করুন।

আমাদের দাবী : (১) অবিলম্বে বাঙলাদেশকে স্বীকৃতি, সংগ্রামের রসদ, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে সাহায্যের জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করছি। (২) গণহত্যা বন্ধের জন্য রাষ্ট্রসংঘ ও অন্যান্য বৃহৎ শক্তিবর্গকে এগিয়ে আসতে উদ্যোগী হতে আহ্বান জানাচ্ছি। এই দাবী আদায়ের জন্য আমাদের সদস্য-সদস্যাগণ অবিলম্বে 'গণস্বাক্ষর অভিযানে' নামছেন।

১১০. *অমৃতবাজার*, ১৭ এপ্রিল ১৯৭১

১১১. আশীষ কুমার দাস, পৃ. ১৭৬

১১২.*গণশক্তি* (সান্ধ্য দৈনিক), ১৯ এপ্রিল ১৯৭১

১১৩. *প্রাগুক্ত*

এই কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন-যতীন চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন রায়, কে.জি. বসু, আবদুল্লাহ রসুল, জ্যোতি চক্রবর্তী, হরেকৃষ্ণ কোঙার, হরপ্রসাদ চ্যাটার্জি, সুকুমার রায়, জ্যোতি ভট্টাচার্য, রাম চ্যাটার্জি, নেপাল ভট্টাচার্য, প্রদ্যোৎ ঘোষ, বিমান বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, হেমেন্দ্র মুখার্জি. অশোক দত্ত, কানাই ভট্টাচার্য, সুদীপ্ত মন্ডল।

১১৪.প্রাগুক্ত, ৩ এপ্রিল ১৯৭১

১১৫.সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সিপিআইএম ও গণশক্তি*, মাওলা, ঢাকা, ২০০১, পৃ ১৩৮

১১৬.সাক্ষাৎকার, *পূর্ণিমা দাশগুপ্ত*, বহরমপুরের বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, মুর্শিদাবাদ, ৬ মার্চ ২০১৬

১১৭.রাজধানী কলকাতায় সহায়ক সমিতি, বিভিন্ন সংগঠনের ব্যানারে বাংলাদেশকে সহায়তা দেয়ার দাবিতে, স্বীকৃতির দাবিতে, মুজিবের মুক্তির দাবিতে, রেশন বৃদ্ধির দাবিতে অনশন হয়েছে। কলকাতার বাইরে বনগাঁ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, বারাসাতে অনশনের সংবাদ একাত্তরের পত্রিকায় দেখা যায়। সবগুলো অনশনের সময়সীমা কিংবা অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা বিভিন্ন ছিল। কিন্তু লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশ। অনেক স্কুল কলেজ অনশন কর্মসূচি পালনের সংবাদ গণমাধ্যমে উঠে এসেছে।

১১৮. স্মরণিকা, *নবারুণ ক্লাবের সূবর্ণ জয়ন্তী*, কৃষ্ণনগর, ২০০৭

১১৯. *গণশক্তি* (সান্ধ্য দৈনিক), ৪ এপ্রিল ১৯৭১ ও যুগান্তর, ৪ এপ্রিল ১৯৭১

১২০. প্রাগুক্ত

১২১.*কালান্তর*, ৪ এপ্রিল ১৯৭১

১২২. *গণশক্তি* (সান্ধ্য দৈনিক), ৫ এপ্রিল ১৯৭১

১২৩. *অশ্রু হল বারুদ*, পৃ ৬৭

১২৪. *যুগান্তর*, ১৮ মে ১৯৭১

১২৫. সুবোধ মুখার্জি, *একাত্তরে কলকাতার মুক্তিসংগ্রাম সহায়ক সমিতি*, পৃ. ৭

১২৬. *আনন্দবাজার*, ৮ এপ্রিল ১৯৭১

১২৭. *যুগান্তর*, ৮ এপ্রিল ১৯৭১

১২৮. সাক্ষাৎকার, কমরেড শ্যামলী গুপ্ত, গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি (সদ্য প্রয়াত)

১২৯. *যুগান্তর*, ১ জুন ১৯৭১

১৩০. *যুগান্তর*, ১৩ জুলাই ১৯৭১

১৩১.*আনন্দবাজার*, ১০ এপ্রিল ১৯৭১

১৩২. আশীষ কুমার দাস, পৃ. ১৭৫

১৩৩. সাক্ষাৎকার, *বিমান বসু ও যুগান্তর*, ১১ এপ্রিল ১৯৭১

১৩৪. প্রাগুক্ত ও *গণশক্তি*, ১২ এপ্রিল ১৯৭১

১৩৫. *গণশক্তি*, ২৩ এপ্রিল ১৯৭১

১৩৬. *যুগান্তর*, ২২ এপ্রিল ১৯৭১

১৩৭. আশীষ কুমার দাস, পৃ.১৭৯

১৩৮. *গণশক্তি*, ২৭ এপ্রিল ১৯৭১

১৩৯. আশীষ কুমার দাস, পৃ.১৭৯, *গণশক্তি*, ২৭ এপ্রিল ১৯৭১

১৪০. *বসুমতি*, ১০ এপ্রিল ১৯৭১

১৪১. *কালান্তর*, ৪ নভেম্বর ১৯৭১

১৪২. ঈপ্সিতা গুপ্ত, স্মরণিকা, পৃ. ১৬

১৪৩. রাজধানী কলকাতাসহ সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে কয়েকশ প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এগুলোর উদ্যেক্তা অনেক সময় রাজনৈতিক সংগঠনগুলো হলেও সাধারণের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। এছাড়াও সহায়ক সংঠনগুলো অনেকগুলি প্রতিবাদ সমাবেশ, মিছিলের আয়োজন করে।

১৪৪. *যুগান্তর*, ৯ আগস্ট ১৯৭১

১৪৫. *অমৃতবাজার*, ১৯ এপ্রিল ১৯৭১

১৪৬. *দৈনিক স্টেটসম্যান*, ১ মে ১৯৭১

১৪৭. দলিলপত্র , দ্বাদশ খণ্ড, পৃ ৩৩৪-৩৩৯

১৪৮. *আনন্দবাজার*, ৬ মে ১৯৭১, *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৮

১৪৯. প্রাগুক্ত

১৫০. *যুগান্তর*, ৩ এপ্রিল

১৫১. *গণশক্তি*, ১১ মে ১৯৭১

১৫২. *কালান্তর*, ২১ মে ১৯৭১, *গণশক্তি*, ২১ মে ১৯৭১

১৫৩. *অমৃতবাজার*, ২৩ মে

১৫৪. অশ্রু হল বারুদ, পৃ ৩৪

১৫৫. *গণশক্তি*, ৮ মে ১৯৭১

১৫৬. *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, চতুর্বিংশ খণ্ড, পৃ. ১১৭

স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন

আজ শনিবার পাঁচই জুন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আসবেন কলকাতায়। কি দেখবেন তিনি? গীমান্তে নেই তিল ধারণের স্থান। কলকাতার উপকণ্ঠে এসে পৌঁছেছে শরণার্থীর ঢেউ। পাক লুঠেরা রাস্তায় কেড়ে নিয়েছে তাদের সর্বস্ব। প্রাণে মরেছে অনেকে। নিখোঁজ হয়েছে স্ত্রী-কণ্যা। এপারে এসেও স্বস্তি নেই। মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে কলেরা। রাজ্য সরকার দিশাহারা। শরণার্থীর সংখ্যা চর লক্ষ ছাপিয়ে উঠেছে। অন্যান্য রাজ্যে না পাঠালে বাঁচবে না এই হতভাগ্যের দল। দু'মাস অপেক্ষা করছেন কেন্দ্রীয় সরকার। কি পেয়েছেন তাঁরা? বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর চরম ঔদাসীন্য এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের অসহনীয় নীরবতা। ইয়াহিয়া আগের চেয়ে বেশি বেপরোয়া। বাংলাদেশে জ্বালাচ্ছেন তিনি সাম্প্রদায়িকতার আগুন। পুড়ছে অনেকে। যারা কোনমতে বেঁচেছে তারা আশ্রয় নিচ্ছে ভারতে। যত দিন যাবে শরণার্থীর সংখ্যা তত বাড়বে। ওদের ফেরার পথ বন্ধ। বন্দুক উঁচিয়ে আছে ইয়াহিয়ার বাহিনী। তাদের ইন্ধন জোগাচ্ছে স্থানীয় ধর্মান্ধের দল। গোড়ার দিকে বাংলাদেশ সরকারকে যদি স্বীকৃতি দিতেন নয়াদিল্লী তবে ঘটত না অবস্থার এমনিতর অবনতি। মুক্তিযোদ্ধারা পেতেন দ্বিগুণ মানসিক বল। বাড়ত সংগ্রামের তীব্রতা। গ্রামাঞ্চলে গড়ে উঠত প্রতিরোধ ব্যূহ। সাম্প্রদায়িক নেতাদের মধ্যে দেখা দিত সন্ত্রাস। কমত লুঠপাটের ব্যাপকতা। বিপুল সংখ্যায় শরণার্থীরা হয়ত ভিড় করত না। ভারতের সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে। কেন্দ্রীয় সরকারের 'দেখি কি হয় নীতি' এনেছে নৈরাশ্য। বারিয়েছে ইয়াহিয়ার স্পর্ধা এবং ভারতকে নিয়েছে আর্থিক সঙ্কটের মুখে। বন্ধ হবে না শরণার্থীর স্রোত। পূর্ব বাংলায় থাকতে পারবে না অসাম্প্রদায়িক সাধারণ মানুষ। কিসের আশায় দিন গুণছেন প্রধানমন্ত্রী? বৃহৎ শক্তিগুলো কি লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর হাত ধরে তাদের নিজেদের বাড়ি-ঘরে বসিয়ে দিয়ে

আসবে? তারা কি এদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেবে? আর্থিক চাপে ইয়াহিয়র নাকে খত আদায় করবে? গত দু'মাসের আন্তর্জাতিক প্রতিকিয়ায় তিনি কি বুঝতে পারেন নি জল কোথায় গড়াচ্ছে? জিইয়ে রাখবে তার ইসলামাবাদকে। শক্তিসাম্য ভাঙতে দেবে না। এশিয়ার এ অঞ্চলে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশ বাস্তব। অখণ্ড পাকিস্তানের অপমৃত্যু ঘটেছে। পূব এবং পশ্চিমের বোঝাপড়া অসম্ভব। স্বাধীন বাংলাদেশ ছাড়া শরণার্থীরা ফিরতে পারবে না। নিজেদের বাড়ি-ঘরে। এই সহজ সত্য মেনে নিতে কর্তৃপক্ষের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবই সৃষ্টি করছে যত জটিলতা। শ্রীমতী গান্ধী আশায় আশায় অনর্থক সময় কাটাচ্ছেন। এখন যে অবস্থা চলছে তার ব্যাতিক্রম না ঘটলে ছ'মাসে কেন, ছ'বছরেও শরণার্থীরা ছাড়বেন না ভারতের মাটি। পূর্ব বাংলায় শক্তি সংহত করবেন ইসলামাবাদ। মুক্তিসংগ্রামীরা পাবেন প্রচন্ড বাধা। আর ক্রমবর্ধমান শরণার্থীর বোঝা নিয়ে ভারত খাবে হাবুডুবু। সমূহ বিপদ সামনে দেখেও মন স্থির করতে পারছেন না কেন্দ্রীয় সরকার। গোটা জাতিকে কোন অন্ধকার গুহায় টেনে নিচ্ছেন তাঁরা।

বিভিন্ন রাজ্যে শরণার্থীদের অবিলম্বে সরিয়ে দেওয়া খুবই দরকার–সন্দেহ নেই। এ ব্যবস্থা অবশ্যই সাময়িক। তাতে পাওয়া যাবে না সমস্যার স্থায়ী সমাধান। গোঁজামিল দিয়ে সময় কাটাবার পালা শেষ হয়েছে। দেশবাসীর ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। জবাব দিন নয়াদিল্লী–শরণার্থীদের নিয়ে তাঁরা কি করবেন? কি করে থামাবেন বন্যার স্রোত? কিভাবে পাঠাবেন তাঁদের বাংলাদেশে? বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর কাছে নয়াদিল্লীর আকুতি-মিনতি ব্যর্থ। প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত পত্রে এবং কূটনৈতিক তৎপরতায় যাঁদের টনক নড়ে নি পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিংহের সম্ভাব্য সফরে তাঁদের ঘুমের নেশা কাটবে না। লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে বুকে ধরে অনন্তকাল বসে থাকতে পারে না ভারত। নিরাপত্তা এবং বাঁচার তাগিদেই কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে নিজস্ব পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার প্রাথমিক অঙ্গ–স্বাধীন বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দান। বাড়ান দরকার তাঁদের সংগ্রামী শক্তি। ও'দের জয় ত্বরান্বিত হলেই স্বদেশে ফিরবেন শরণার্থীরা। নইলে তাঁরা থাকবেন ভারতে। একথা সত্য, কোন শান্তিবাদী রাষ্ট্র সহজে বলপ্রয়োগ করতে চায় না। ইয়াহিয়া খান নয়াদিল্লীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করছেন না। বাংলাদেশের সমস্যার সঙ্গে অশান্তির দুর্লক্ষণ। মুখ বুজে থাকলেই বিপদ এড়ান যাবে না। বাস্তব অবস্থার মোকাবিল করুন কর্তৃপক্ষ। অবিলম্বে স্বীকৃতি দিন স্বাধীন বাংলাদেশকে। প্রশস্ত করুন ইয়াহিয়ার চরম পরাজয়ের পথ। এতেই আসবে পূর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ শান্তি। শরণার্থীরা পাবেন স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের প্রেরণা।

১৫৭. *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সিপিআইএম ও গণশক্তি*, পৃ. ১১২

১৫৮. *যুগান্তর*, ৪ এপ্রিল ১৯৭১

১৫৯. *সপ্তাহ*, ১৭ এপ্রিল ১৯৭১

১৬০. *কালান্তর*, ৩ জুলাই

১৬১. *আনন্দবাজার*, ৫ আগস্ট

১৬২. বিমল প্রামানিক, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা*, পত্রলেখা, কলকাতা, ২০১০, পৃ.২৪

১৬৩. *আনন্দবাজার*, ৯ এপ্রিল ১৯৭১

১৬৪. *অমৃতবাজার*, ৫ এপ্রিল ১৯৭১

১৬৫. *বসুমতি*, ৩১ মার্চ ১৯৭১

১৬৬. পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কার্যবিবরণী , ৮ মে ১৯৭১

১৬৭. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৭৬৫-৭৬৮ *আনন্দবাজার*, ৯ মে ১৯৭১

১৬৮. মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধের ১৩ নম্বর সেক্টর*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ ৭

১৬৯. প্রাগুক্ত

১৭০. *কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির রিপোর্ট*, ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত

১৭১. প্রাগুক্ত

১৭২. প্রাগুক্ত

১৭৩. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র*, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৫০৪

১৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২-৩৪৪

১৭৫. আশীষ কুমার দাস, পৃ. ১০৮

১৭৬. *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, চতুর্বিংশ খণ্ড*, পৃ. ৩১-৩২

সোভিয়েট রাশিয়া কি সক্রিয় হবে?

ঘুমন্ত বিশ্ববিবেক আস্তে আস্তে জেগে উঠছে। বাংলাদেশের রক্ত নদীর ঢেউ সাগরের পারের রাষ্ট্রগুলোকে দোলা দিচ্ছে। আগামী ক'দিনের মধ্যেই হয়ত সর্বাত্মক নিন্দার ভাষা রাজনৈতিক রূপ নেবে। ইয়াহিয়ার গণহত্যার অভিযান থামে নি। আসন্ন পরাজয়ের মুখে তাঁর ঘাতক বাহিনী হয়ত বাঙালীর উপর নির্মম প্রতিশোধ নেবে। সোভিয়েট রাশিয়া এত দিন ছিল নির্বাক। তার প্রচারযন্ত্র পায় নি লক্ষ লক্ষ ক্ষরিত শোণিতের উঞ্চ তাপ। আজ অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। বাংলাদেশের আর্তনাদ পৌঁছেছে সোভিয়েট রাশিয়ায়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে সম্পাদকীয় মন্তব্য। তাঁরা ইয়াহিয়ার নরমেধ যজ্ঞের বীভৎসতায় শিউরে উঠছেন। জানাচ্ছেন সোভিয়েট রাশিয়া আলোচনা শুরু করেছে ইসলামাবাদের জঙ্গী শাসকদের সঙ্গে। বাংলা দেশের হত্যালীলা বন্ধের জন্য চাপ সৃষ্টিই নাকি তার প্রধান উদ্দেশ্য। এর সাফল্যের সম্ভাবনা কতখানি তা নিশ্চয় করে বলা মুশকিল। বাংলা দেশের দেয় তবে রাতারাতি অবস্থা পাল্টে যাবে। ইয়াহিয়ার নিরেট মাথা নিমেষের মধ্যে মাটিতে থুবড়ে পড়বে।

বৃহৎ শক্তিগুলোর বাজনৈতিক চাল আন্তর্জাতিক প্রভাব সৃষ্টির ছকে বাঁধা। মানবতার প্রশ্ন সেখানে গৌণ।

সোভিয়েট রাশিয়ার ট্রেড ইউনিয়নগুলোর মুখপাত্র স্ট্রুড এবং যুব কমিউনিস্টদের মুখপাত্র কমসোমোলস্কারা প্রাভদায় ইয়াহিয়ার বর্বরতার কাহিনী প্রকাশ বিশ্ববিবেকের ঘুম ভাঙ্গার হয়ত প্রাথমিক ইঙ্গিত। মার্কিন নৈশব্দে আঘাত হেনেছেন সিনেটের এডোয়ার্ড কেনেডি। বাংলা দেশে ইয়াহিয়ার গণহত্যার প্রতিবাদে তার কণ্ঠ রাজনৈতিক স্বার্থদ্বন্দ্ব ছাপিয়ে উঠেছে। ইসলামাবাদের বর্বর শাসকদের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ এনেছেন তিনি। মার্কিন অস্ত্র ব্যবহারের শর্ত ভেঙ্গে ফেলেছেন ইয়াহিয়া খান। প্রতিরক্ষার অস্ত্রসম্ভার লাগন হচ্ছে বাংলাদেশের গণহত্যায়। হাজার হাজার আহত নরনারী সাহায্যের জন্য আর্ত মিনতি জানাচ্ছেন সারা বিশ্বের কাছে। আর ইসলামাবাদের নরপশুর দল আন্তর্জাতিক রেডক্রশের ত্রাণ বিমান যেতে দিচ্ছে না পাক বাহিনীর বুলেটজর্জরিত পূর্ব বাংলায়। মানবদ্রোহীদের নারকীয় তান্ডব যাতে বাইরের লোক দেখতে না পায় তার জন্যই এই শয়তানি ব্যবস্থা। সিনেটের কেনেডি বেদনায় আর্তনাদ করে উঠেছেন। তিনি চাচ্ছেন মার্কিন সরকারের কাছে প্রতিকার। তাঁদের আরোপিত অস্ত্র ব্যবহারের শর্ত মানেন নি ইয়াহিয়া খান। তা মানাবার দায়িত্ব এখন মার্কিন কর্তৃপক্ষের। কানাডায়ও গড়ে উঠেছে বাংলা বন্ধু সজ্ঘ। তাঁদেরও মানবতাবোধ আর ইসলামাবাদের ভ্রূকুটির পরোয়া করছে না।

এক দিকে সোভিয়েট রাশিয়ার এবং অপর দিকে যদি মার্কিন জনগণের অন্তরাত্মা জেগে ওঠে তবে ইয়াহিয়ার পাশবিক বাহু শিথিল হতে দেরী লাগবে না। মার্কিন জনমত সরকারি শাসন মানতে অভ্যস্ত নয়। ভিয়েৎনামে মার্কিন সৈন্য দলের নারকীয় হত্যায়ও তাঁরা প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছে। বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার গণহত্যা ইতিহাসের সাম্প্রতিক নজিরগুলোকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। রাজনৈতিক পাথর চাপা দিয়ে মানুষের বিবেককে আর কতদিন নির্বাক রাখা যাবে? সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম অধিবেশন চলাকালে ইয়াহিয়ার গণহত্যা সম্পর্কে সোভিয়েট পত্রিকার মন্তব্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সিনেটর কেনেডির স্পষ্ট বাচন বহুদিন স্মরণে রাখলেন দুনিয়ার শান্তিকামী জনসাধারণ। নিরস্ত্র বাংলা দেশের দুর্জয় সংগ্রাম অনন্য সাধারণ। বাইরের কোন অস্ত্র সাহায্য তারা পাননি। শুধুমাত্র জনবল এবং মনোবল নিয়ে দিনের পর দিন লড়ছেন তারা আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত ঘাতকের বিরুদ্ধে। দলে দলে মরছেন। তবু নতি স্বীকার করছেন না। মৃত্যুঞ্জয়ী সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর জয় অনিবার্য। বিশ্ব মানচিত্রের পৃষ্ঠায় স্বাধীন বাংলা দেশের নাম অবশ্যই সংযোজিত হবে। বিশ্ববিবেক যদি প্রারম্ভেই তাকে অভিনন্দন জানায় এবং নরঘাতী ইয়াহিয়ার গণহত্যার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে তবে নিদারুণ লজ্জা থেকে রেহাই পাবে বিশ্বমানব। দুনিয়ার শান্তিকামী মানুষ এবং সংগ্রামী জনতা শত নৈরাশ্যের মধ্যেও দেখবেন আশার আলো। জয় বাংলা এবং তার নবসূর্য তাঁদের জোগাবে অনন্ত প্রেরণা।

১৭৭. *আনন্দবাজার*, ৭ এপ্রিল ১৯৭১

১৭৮. *যুগান্তর*, ২৩ এপ্রিল ১৯৭১

১৭৯. আশীষ কুমার দাস, পৃ. ১০৬

১৮০. *যুগান্তর*, ৮ এপ্রিল ১৯৭১

১৮১. *অমৃতবাজার*, ১৯ এপ্রিল ১৯৭১

১৮২. *যুগান্তর*, ২৯ এপ্রিল ১৯৭১, আশীষ কুমার দাস, পৃ. ১০৬

১৮৩. স্মরণিকা, *কৃষ্ণনগর কলেজ ছাত্র সংসদ*, নদীয়া, ১৯৭৮

১৮৪. *দৈনিক যুগান্তর, আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, কালান্তর* কিংবা *সাপ্তাহিক সপ্তাহসহ* সব পত্রিকায় সরকার গঠন নিয়ে অচলাবস্থার সংবাদ ছাপায়। ২ মার্চ ১৯৭১ দৈনিক *যুগান্তরের* প্রধান শিরোনামটি তুলে ধরা হল।

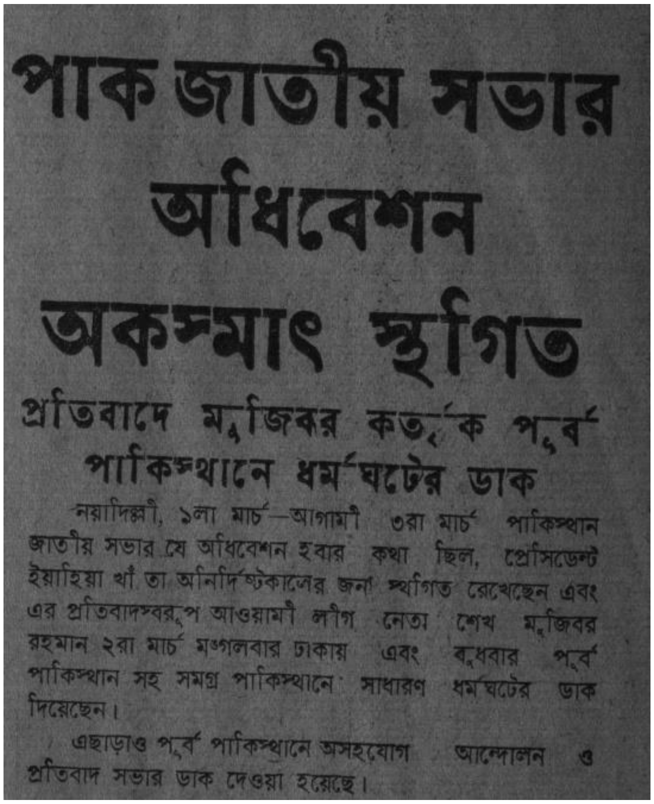

পাক জাতীয় সভার অধিবেশন অকস্মাৎ স্থগিত

প্রতিবাদে মুজিবর কর্তৃক পূর্ব পাকিস্থানে ধর্মঘটের ডাক

নয়াদিল্লী, ১লা মার্চ—আগামী ৩রা মার্চ পাকিস্থান জাতীয় সভার যে অধিবেশন হবার কথা ছিল, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রেখেছেন এবং এর প্রতিবাদস্বরূপ আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান ২রা মার্চ মঙ্গলবার ঢাকায় এবং বুধবার পূর্ব পাকিস্থান সহ সমগ্র পাকিস্থানে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন।

এছাড়াও পূর্ব পাকিস্থানে অসহযোগ আন্দোলন ও প্রতিবাদ সভার ডাক দেওয়া হয়েছে।

১৮৫. *আনন্দবাজার, অমৃতবাজার* ছবিসহ সংবাদ ছাপায়। যুগান্তর লক্ষাধিক লোকের সমবেত হওয়ার সংবাদ দেয়।

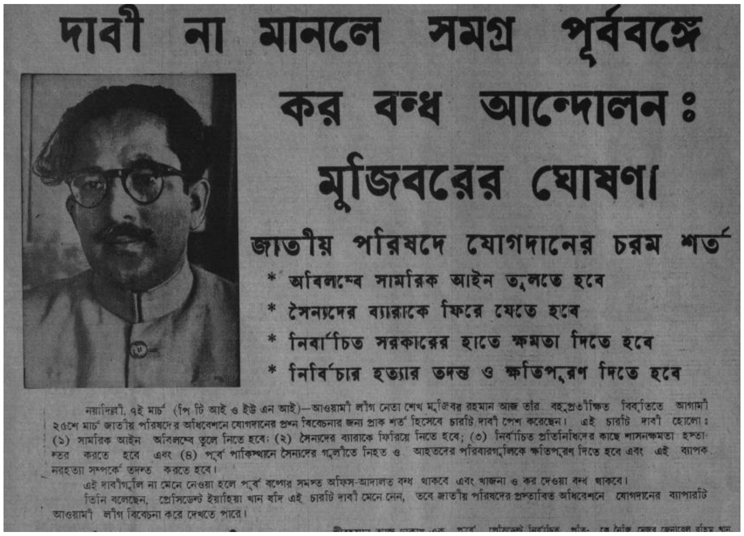

দাবী না মানলে সমগ্র পূর্ববঙ্গে কর বন্ধ আন্দোলনঃ মুজিবরের ঘোষণা

জাতীয় পরিষদে যোগদানের চরম শর্ত

* অবিলম্বে সামরিক আইন তুলতে হবে
* সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে
* নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা দিতে হবে
* নির্বিচার হত্যার তদন্ত ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে

নয়াদিল্লী, ৭ই মার্চ (পি টি আই ও ইউ এন আই)—আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান আজ তাঁর বহুপ্রতীক্ষিত বিবৃতিতে আগামী ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের প্রশ্ন বিবেচনার জন্য প্রাক শর্ত হিসেবে চারটি দাবী পেশ করেছেন। এই চারটি দাবী হোলো: (১) সামরিক আইন অবিলম্বে তুলে নিতে হবে; (২) সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে; (৩) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে এবং (৪) পূর্ব পাকিস্থানে সৈন্যদের গুলীতে নিহত ও আহতদের পরিবারগুলিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং এই ব্যাপক নরহত্যা সম্পর্কে তদন্ত করতে হবে।

এই দাবীগুলি না মেনে নেওয়া হলে পূর্ব বঙ্গের সমস্ত অফিস-আদালত বন্ধ থাকবে এবং খাজনা ও কর দেওয়া বন্ধ থাকবে।

তিনি বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যদি এই চারটি দাবী মেনে নেন, তবে জাতীয় পরিষদের প্রস্তাবিত অধিবেশনে যোগদানের ব্যাপারটি আওয়ামী লীগ বিবেচনা করে দেখতে পারে।

১৮৬. *যুগান্তর*, ৮ মার্চ ১৯৭১

পূবে সূর্যোদয় হচ্ছে!

রক্তের মধ্যেই নবজাতকের আবির্ভাব ঘটে। আবির্ভাব ঘটছে পূর্ব বাংলায় এক নতুন বলিষ্ঠ বাঙালী জাতির। অখণ্ড অভঙ্গ বাংলা দেশের চেতনা থেকে এর প্রকৃতি পৃথক, কিন্তু স্বদেশজ ঐতিহ্য-বিচ্ছিন্ন নয় সে প্রকৃতি। এতে নজরুলের নিঃশ্বাস আছে, রবীন্দ্রনাথের প্রাণ আছে, বিদ্যাসাগরের মাহাত্ম্য আছে। অনিবার্য টানে আসবে বাংলার মাটির মমতা-সিঞ্চিত আরও বঙ্গ সাহিত্য ও মনীষা-দীপ্তি; হয়তো কিছু কঠোর সমালোচনার শাসনভঙ্গিতে, কিছু সমাদর স্নেহ-সম্ভাষণে। কিন্তু আসবেই। বাদ যদি পড়েই তো পড়বে ঐ জোর করে গজানো ফ্যাসান প্যারেড টবের বিদেশী আগাছাগুলো। বাংলার মাটির সঙ্গে যার শেকড়ের যোগ ও রসের যোগান সেই বঙ্গ-সাহিত্য অবিচ্ছিন্ন।

এবং তারই মূল শেকড় বাংলা বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল। বাঙালীর আশা ও ভাষাও তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

এই নিয়েই পূর্ব বাংলার ধ্বনি—'জয় বাংলা!' পূর্ব-পশ্চিমের ভৌগোলিক খণ্ডায় বিকৃত নয় পূর্ণ চৈতন্যের বাংলা। তাই থেকেই শেখ মুজিবর রহমানের ছয়-দফা দাবী; দাবী স্বায়ত্তশাসনের—আত্মনিয়ন্ত্রণের।

সন্দেহ নেই, সদ্য অতীত ইতিহাসে মুজিবরের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী মাতৃভাষা বাংলা ভাষাকে অবলম্বন ক'রেই বর্তমান পর্যায়ে এসেছে; কিন্তু একমাত্র মাতৃ ভাষার আবেগ-প্রাবল্যই তাঁর দাবীকে এমন অপ্রতিরোধ্য দুর্জয় করে তোলে নি। এর একটা অর্থনৈতিক বনিয়াদ আছে এবং তাই পূর্ব বাংলার প্রতিটি বাঙালীর চিত্তকে সর্বজনীনতায় স্পর্শ করেছে। একই দুঃখের ভাগী, একই শোষণের শিকার। সমধর্মী বলেই কেউ কখনো শোষণের অধিকার পেতে পারে না।

বিশাল ভারতবর্ষে একদিন ক্রুদ্ধ অন্ধ সাম্প্রদায়িক তরঙ্গের মারাত্মক দোলা লেগেছিল এবং তারই সুযোগে ব্যক্তিগত ক্ষমতালোলুপ শীর্ষস্থানীয় মহাত্মাগণ দেশকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করেছেন। ইস্লামী কওম ও তমদ্দুনের পৃথক এলাকা পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা করে গান্ধীজীর আদরের দেওয়া আখ্যা-ভূষিত কায়েদ-ই-আজম মহম্মদ আলি জিন্না ঘোষণা করলেন তেপান্তরের দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও তিনি পাকিস্থানের পূর্ব ও পশ্চিম অঙ্গকে ধর্মসূত্রের সঙ্গে ভাষা সূত্রেও এক করে ফেলবেন। তিনি ঘোষণা করলেন, ইসলাম যেমন পাকিস্থানের ধর্ম, তার ভাষাও তেমনি উর্দু।

আরও ৫ম পৃঃ ৩য় কলমে

১৮৭. প্রাগুক্ত

১৮৮. সাক্ষাৎকার, দিলীপ চক্রবর্তী, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, *বসুমতি*, ১২ মার্চ ১৯৭১

১৮৯. *যুগান্তর*, ২৬ মার্চ ১৯৭১

১৯০. *আনন্দবাজার*, ২৬ মার্চ ১৯৭১

১৯১. *সাক্ষাৎকার*, মৃন্ময়ী বোস, কলকাতা, ১৮ নভেম্বর ২০১৬

১৯২. *অমৃতবাজার*, ২৯ এপ্রিল ১৯৭১

১৯৩. *কালান্তর*, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

১৯৪. *যুগান্তর*, ৩ এপ্রিল ১৯৭১ ও সাক্ষাৎকার, অমিয় দেব, বনগাঁ, ২২ আগস্ট ২০১৬, মুজিবের মুক্তির দাবিতে যে সাইকেল র‍্যালি করেছিল এক্সপ্লোরাস ক্লাব, কলকাতা সেটিতে অংশ নিয়েছিলেন।

১৯৫. সাক্ষাৎকার, আব্দুর রশিদ, ৮ মার্চ ২০১৬, কাহাড়পাড়া, মুর্শিদাবাদ

১৯৬. সাক্ষাৎকার, আবদুর রউফ, ৯ মার্চ ২০১৬, জলাঙ্গী, মুর্শিদাবাদ

১৯৭. সাক্ষাৎকার, দিলীপ দাস, ১৯ মার্চ ২০১৬, নদীয়া

১৯৮. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের কয়েকজন শিক্ষার্থী নিয়ে ২০১৬ সালের আগস্টে গিয়েছিলাম পশ্চিমবঙ্গের পেট্রোপোল বনগাঁ সীমান্তে।। সীমান্ত পাড়ের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুরো দল নিয়ে আমরা জানতে চেয়েছিলাম, একাত্তরের সেসব দিনের স্মৃতি। সীমান্ত পাড়ের গৃহস্থ বধূ কল্পনা বালা বলছিলেন একাত্তরে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য প্রার্থনার কথা।

১৯৯. সাক্ষাৎকার, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২২ মার্চ ২০১৬, পশ্চিম দিনাজপুর

২০০. *যুগান্তর*, ৯ আগস্ট ১৯৭১

২০১. *যুগান্তর*, ১৪ আগস্ট ১৯৭১

২০২. *যুগান্তর*, ১৮ আগস্ট ১৯৭১

২০৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধঃ ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান, পৃ. ৪২

২০৪. প্রাগুক্ত

২০৫. *সপ্তাহ*, ২ এপ্রিল ১৯৭১

২০৬. চিত্ত ঘোষ, *মিলুক আত্মদানে*, *সপ্তাহ*, ১৬ এপ্রিল ১৯৭১

২০৭. জাকারিয়া পিন্টু, মুক্তিযদ্ধের প্রেরণা স্বাধীনবাংলা ফুটবল দল, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৭, News 24.com

২০৮. *ইত্তেফাক*, ঢাকা, ০৬ জানুয়ারি ২০০৯ ও *উইকিপিডিয়াতে* স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল নিয়ে নিবন্ধ

২০৯. সাক্ষাৎকার, নিত্যানন্দ বন্দোপাধ্যায়, ৯ মার্চ ২০১৬, জলাঙ্গী, মুর্শিদাবাদ, ১৪ আগস্ট ও ৩০ আগস্ট *দৈনিক যুগান্তরে* এই ধরণের প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচের দুটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

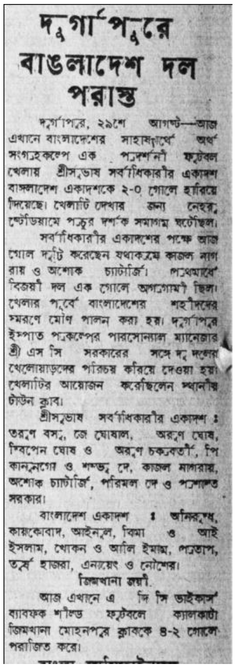

দুর্গাপুরে বাঙলাদেশ দল পরাস্ত

দুর্গাপুর, ২৯শে আগস্ট—আজ এখানে বাংলাদেশের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহকল্পে এক প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় শ্রীসুভাষ সর্বাধিকারীর একাদশ বাঙলাদেশ একাদশকে ২-০ গোলে হারিয়ে দিয়েছে। খেলাটি দেখার জন্য নেহরু স্টেডিয়ামে প্রচুর দর্শক সমাগম ঘটেছিল।

সর্বাধিকারীর একাদশের পক্ষে আজ গোল দুটি করেছেন যথাক্রমে কাজল নাগ রায় ও অশোক চ্যাটার্জি। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল এক গোলে অগ্রগামী ছিল। খেলার পূর্বে বাংলাদেশের শহীদদের স্মরণে মৌণ পালন করা হয়। দুর্গাপুর ইস্পাত প্রকল্পের পারসোন্যাল ম্যানেজার শ্রী এস সি সরকারের সঙ্গে দু দলের খেলোয়াড়দের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। খেলাটির আয়োজন করেছিলেন স্থানীয় টাউন ক্লাব।

শ্রীসুভাষ সর্বাধিকারীর একাদশ : তরুণ বসু, জে ঘোষাল, অরুণ ঘোষ, দিবপেন ঘোষ ও অরুণ চক্রবর্তী, পি কানুনগো ও শম্ভু দে, কাজল মাগরায়, অশোক চ্যাটার্জি, পরিমল দে ও প্রশান্ত সরকার।

বাংলাদেশ একাদশ : অনিরুদ্ধ, কায়কোবাদ, আইনুল, বিমা ও আই ইসলাম, খোকন ও আলি ইমাম, প্রতাপ, তর্ষ হাজরা, এনায়েৎ ও নৌশের।

জিমখানা জয়ী

আজ এখানে এ দি সি ডাইকার্স ব্যাবফক শীল্ড ফুটবলে ক্যালকাটা জিমখানা মোহনপুর ক্লাবকে ৪-২ গোলে পরাজিত করে।

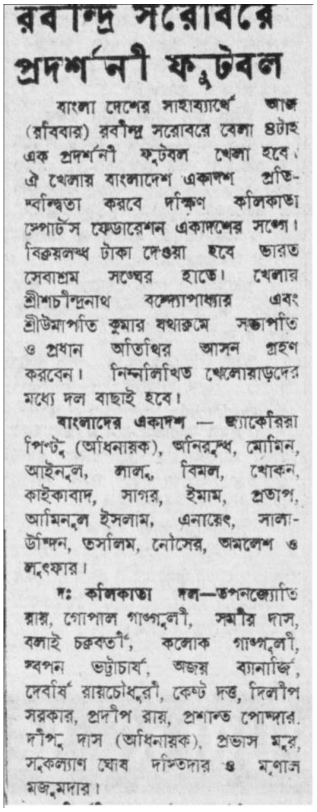

রবীন্দ্র সরোবরে প্রদর্শনী ফুটবল

বাংলা দেশের সাহায্যার্থে আজ (রবিবার) রবীন্দ্র সরোবরে বেলা ৪টায় এক প্রদর্শনী ফুটবল খেলা হবে। ঐ খেলায় বাংলাদেশ একাদশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে দক্ষিণ কলিকাতা স্পোর্টস ফেডারেশন একাদশের সঙ্গে। বিক্রয়লব্ধ টাকা দেওয়া হবে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের হাতে। খেলায় শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীউমাপতি কুমার যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করবেন। নিম্নলিখিত খেলোয়াড়দের মধ্যে দল বাছাই হবে।

বাংলাদের একাদশ — জ্যাকেরিয়া পিন্টু (অধিনায়ক), অনিরুদ্ধ, মোমিন, আইনুল, লালু, বিমল, খোকন, কাইকাবাদ, সাগর, ইমাম, প্রতাপ, আমিনুল ইসলাম, এনায়েৎ, সালাউদ্দিন, তসলিম, নৌসের, অমলেশ ও লুৎফার।

দঃ কলিকাতা দল—তপনজ্যোতি রায়, গোপাল গাঙ্গুলী, সমীর দাস, বলাই চক্রবর্তী, কল্লোক গাঙ্গুলী, স্বপন ভট্টাচার্য, অজয় ব্যানার্জি, দেবর্ষি রায়চৌধুরী, কেষ্ট দত্ত, দিলীপ সরকার, প্রদীপ রায়, প্রশান্ত পোদ্দার. দীপু দাস (অধিনায়ক), প্রভাস মুর, সুকল্যাণ ঘোষ দস্তিদার ও মৃণাল মজুমদার।

২১০. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতির রিপোর্ট

২১১. প্রাগুক্ত

২১২. প্রাগুক্ত ও সাক্ষাৎকার, মৃন্ময়ী বোস

২১৩. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতির রিপোর্ট

২১৪. *আনন্দবাজার,* ১৬ এপ্রিল ১৯৭১, *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ,* পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৮৮

২১৫. দক্ষিণারঞ্জন বসু, *আমার তোমার মায়ের নাম*, *যুগান্তর*, ২০ এপ্রিল ১৯৭১

২১৬. শংকর এর 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' বইটির বিজ্ঞাপনটি ছাপিয়েছে পরিচয় এর বাংলাদেশ সংখ্যায়, *পরিচয়, বাংলাদেশ সংখ্যা*, কলকাতা, ১৯৭১ (বর্ষ ৪০, ১৩৭৭-১৩৭৮), পৃ. ৫

২১৮. প্রাগুক্ত

২১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

২২০. অসীম রায়, *পদ্মার চরে, পরিচয়*, পৃ.

২২১. *যুগান্তর,* ১০ এপ্রিল ১৯৭১

২২২. *যুগান্তর*, ৯ এপ্রিল ১৯৭১

২২৩. *যুগান্তর*, ৪ মে ১৯৭১

২২৪. *যুগান্তর*, ২৬ এপ্রিল ১৯৭১

২২৫. *আনন্দবাজার,* ১৮ মে ১৯৭১

২২৬. *যুগান্তর,* ১২ মে ১৯৭১, *কালান্তর,* ১১ মে ১৯৭১

২২৭. প্রাগুক্ত

২২৮. পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী এলাকা মুর্শিদাবাদের জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য শামসুল হক, নদীয়ার রমেন্দ্র বিশ্বাস, বনগাঁর ত্রিলকেশ সেন স্বীকার করেছেন তারা মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে অবরুদ্ধ বাংলাদেশে প্রবেশ করে গেরিলা যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন।

২২৯. *যুগান্তর*, ১৩ এপ্রিল ১৯৭১

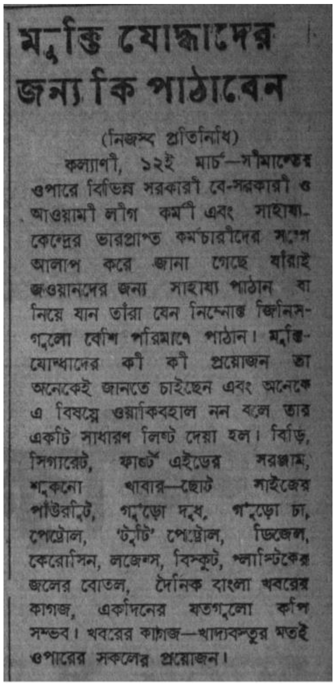

মুক্তি যোদ্ধাদের জন্য কি পাঠাবেন

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

কল্যাণী, ১২ই মার্চ—সীমান্তের ওপারে বিভিন্ন সরকারী বে-সরকারী ও আওয়ামী লীগ কর্মী এবং সাহায্য-কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের সংগে আলাপ করে জানা গেছে যাঁরাই জওয়ানদের জন্য সাহায্য পাঠান বা নিয়ে যান তাঁরা যেন নিম্নোক্ত জিনিস-গুলো বেশি পরিমাণে পাঠান। মুক্তি-যোদ্ধাদের কী কী প্রয়োজন তা অনেকেই জানতে চাইছেন এবং অনেকে এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল নন বলে তার একটি সাধারণ লিষ্ট দেয়া হল। বিড়ি, সিগারেট, ফার্স্ট এইডের সরঞ্জাম, শুকনো খাবার—ছোট সাইজের পাঁউরুটি, গুঁড়ো দুধ, গুঁড়ো চা, পেট্রোল, 'টুটি' পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, লজেন্স, বিস্কুট, প্লাস্টিকের জলের বোতল, দৈনিক বাংলা খবরের কাগজ, একদিনের যতগুলো কপি সম্ভব। খবরের কাগজ—খাদ্যবস্তুর মতই ওপারের সকলের প্রয়োজন।

২৩০. কার্যবিবরণী, *বাংলাদেশ সংগ্রাম সহায়ক সমিতি*, কলকাতা, ১৯৭১

২৩১. রঙ্গলাল সেন, দুলাল ভৌমিক, তুহিন রায় (সংকলন ও সম্পাদনা), বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধঃ ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান, পৃ. ৫৩

২৩২. *যুগান্তর*, ১২ এপ্রিল ১৯৭১

২৩৩. *যুগান্তর*, ১০ অক্টোবর ১৯৭১

২৩৪. *বসুমতি*, ১৩ আগস্ট ১৯৭১

২৩৫. *যুগান্তর*, ৩১ মার্চ ১৯৭১, সম্ভবত বাংলাদেশের সহায়তায় প্রথম কোন প্রাতিষ্ঠানিক দান

২৩৬. *যুগান্তর*, ১৮ মে ১৯৭১

২৩৭. *যুগান্তর*, ১৩ মে ১৯৭১

২৩৮. *আনন্দবাজার*, ১১ মে ১৯৭১

২৩৯. প্রাগুক্ত

২৪০. আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ১৩৪

২৪১. সাক্ষাৎকার, *সৌভিক সরকার*, কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর ২০১৭, একাত্তরে বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র ও প্রত্যক্ষদর্শী

২৪২. আহমদ ছফা, *অলাতচক্র*, খানব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৯২

২৪৩. Georges Childs Kohn, *Encyclopedia of plague and pestilence: From Ancient Times to the Present*, Infobase Publishing, New York, 2007, p. 145

২৪৪. সাক্ষাৎকার, *বিধান চন্দ্র রায়*, কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ২০১৭ (একাত্তরে কলকাতায় স্বাস্থ্যসেবায় সম্পৃক্ত চিকিৎসক)

২৪৫. *যুগান্তর*, ৪ জুন ১৯৭১

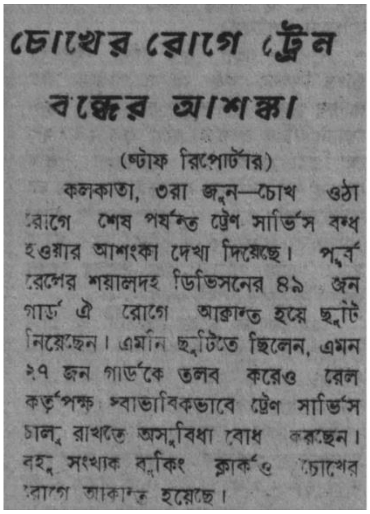

চোখের রোগে ট্রেন বন্ধের আশঙ্কা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

কলকাতা, ৩রা জুন—চোখ ওঠা রোগে শেষ পর্যন্ত ট্রেণ সার্ভিস বন্ধ হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। পূর্ব রেলের শয়ালদহ ডিভিসনের ৪৯ জন গার্ড ঐ রোগে আক্রান্ত হয়ে ছুটি নিয়েছেন। এমনি ছুটিতে ছিলেন, এমন ২৭ জন গার্ডকে তলব করেও রেল কর্তৃপক্ষ স্বাভাবিকভাবে ট্রেণ সার্ভিস চালু রাখতে অসুবিধা বোধ করছেন। বহু সংখ্যক বুকিং ক্লার্কও চোখের রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

২৪৬. *যুগান্তর*, *আন্দবাজারে* জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এ ধরণের অনেক বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়েছে, নিচে কয়েকটি তুলে ধরা হল

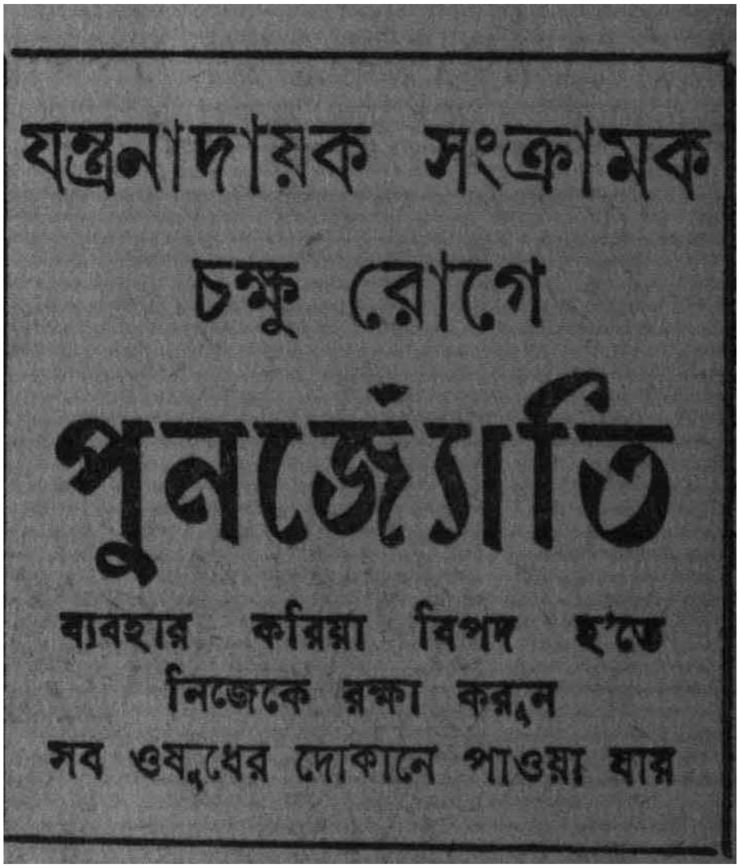

EYE DROPS

ডাঃ পি, ব্যানার্জি

৩৬বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড,
১১৪এ, আশুতোষ মুখার্জি রোড,
কলিকাতা-২৫
৫৩, গ্রে ষ্ট্রীট, কলি-৬

চোখ ওঠা

বর্তমানে এই সংক্রামক অসুখের হাত হইতে আমাদের সকলের চোখ রক্ষা করার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত অর্ধশতাব্দীর পরিচিত

আই-ড্রপস্

সাবধান !

আমরা এখন কষ্টদায়ক সংক্রামক
চক্ষুরোগের কবলে পরেছি
কার্য্যকরী প্রতিষেধকরূপে ব্যবহার করুন

ষ্ট্যানিসল্ ড্রপস্

একটা শিশি হাতের কাছেই রাখুন।

সদ্যপ্রস্তুত ঔষধ সকল বিক্রেতার কাছে দেওয়া হয়েছে।

স্মিথ্ ষ্ট্যানিষ্ট্রীট্ এণ্ড কোং লিঃ

কলিকাতা—১৪

সতর্ক হোন

চোখ লাল হওয়া, জ্বালা করা আর এঁটে যাওয়া ও জলপড়া ইত্যাদির পুনরাক্রমণ ঘটছে—নির্দোষ, কার্যকরী, প্রোফাইল্যাকটিক ও আইজোটনিক মানানুগ ঔষধ ব্যবহার করুন।

ষ্ট্যানিসল ড্রপস্ ১০%, ২০% ও ৩০%

সালফাসেটামাইড সোডিয়ামের জন্য

আপনার চিকিৎসক ও চক্ষু চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

প্রস্তুতকারক :

স্মিথ, স্ট্যানি স্ট্রীট অ্যাণ্ড কোং লিঃ

১৮, কনভেণ্ট রোড, কলিকাতা—১৪

সাবধান !

চারিদিকে সংক্রামক চক্ষুরোগ !

যদি আপনার চোখ ফুলে ওঠে, করকর করে বা চোখ দিয়ে জল পড়ে ও চোখে ভীষণ যন্ত্রণা হয় সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে 'ইকনমিক' ব্র্যাণ্ড

আইকুল ব্যবহার করুন।

প্রস্তুতকারক :—

ইকনমিক হোমিও ফার্ম্মেসী

ভারতের প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ প্রস্তুতকারক, পুস্তক প্রকাশক, আমদানীকারক।

লেবরেটরী : রবী পার্ক, হালতু, ২৪ পরগণা (ফোন : ৪৬-১৫৪০)

হেড অফিস : ৮৯, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিঃ-১ (ফোন : ২২-৪৭৩১)

ইকনমিক হোমিও ফার্ম্মেসী এণ্ড লেবঃ প্রাঃ লিঃ

১৪৭।১, বি, বি, গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিঃ-১২ (ফোন : ৩৫-০৩৫৭)

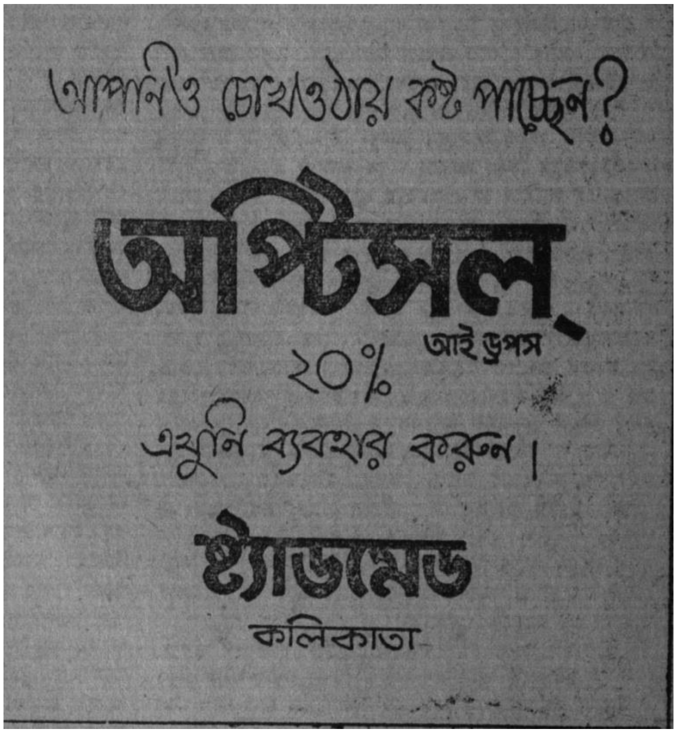

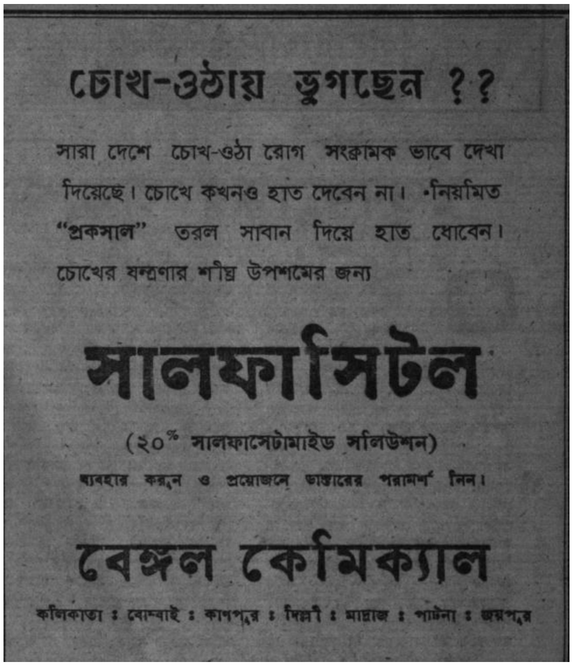

২৪৭. ১৬ জুন ১৯৭১ *দৈনিক যুগান্তরে* এ ধরণের বিজ্ঞাপন দেখা যায়, এছাড়া *আনন্দবাজার*, *কালান্তর* ও *অমৃতবাজারে* একাত্তরের নানা সময়ে তাদের বিজ্ঞাপন দেখা যায়।

২৪৮. *যুগান্তর*, ১৪ জুন ১৯৭১

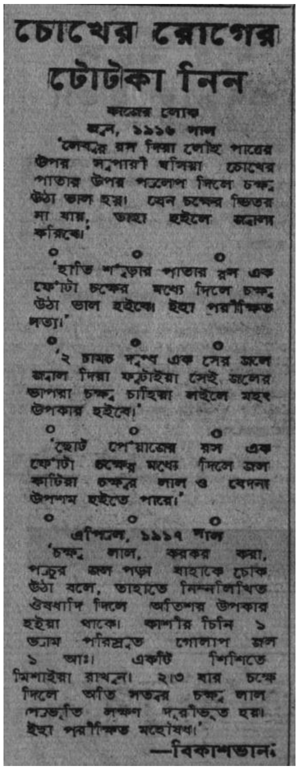

চোখের রোগের টোটকা নিন

কাজের লোক

জুন, ১৯১৬ সাল

'কেশুরের রস দিয়া লোহি পাত্রের উপর সুপারী ঘসিয়া চোখের পাতার উপর প্রলেপ দিলে চক্ষু উঠা ভাল হয়। যেন চক্ষের ভিতর না যায়, তাহা হইলে জ্বালা করিবে।'

'হাতি শুঁড়ার পাতার রস এক ফোঁটা চক্ষের মধ্যে দিলে চক্ষু উঠা ভাল হইবে। ইহা পরীক্ষিত সত্য।'

'২ চামচ দুগ্ধ এক সের জলে জ্বাল দিয়া ফুটাইয়া সেই জলের ভাপরা চক্ষু চাহিয়া লইলে মহৎ উপকার হইবে।'

'ছোট পেঁয়াজের রস এক ফোঁটা চক্ষের মধ্যে দিলে জল কাটিয়া চক্ষুর লাল ও বেদনা উপশম হইতে পারে।'

এপ্রিল, ১৯১৭ সাল

'চক্ষু লাল, করকর করা, পত্রুর জল পড়া যাহাকে চোক উঠা বলে, তাহাতে নিম্নলিখিত ঔষধাদি দিলে অতিশয় উপকার হইয়া থাকে। কাশীর চিনি ১ ড্রাম পরিস্রুত গোলাপ জল ১ আঃ। একটি শিশিতে মিশাইয়া রাখুন। ২।৩ বার চক্ষে দিলে অতি সত্বর চক্ষু লাল প্রভৃতি লক্ষণ দূরীভূত হয়। ইহা পরীক্ষিত মহৌষধ।'

—বিকাশভানঃ

২৪৯. *যুগান্তর*, ৭ জুন ১৯৭১

বহু ব্যাপক চক্ষু রোগের হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

কয়েকদিন থেকে কলকাতা এবং শহরতলী অঞ্চলে এক জাতীয় চক্ষু-রোগ বহু ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। এই রোগের আক্রমণ থেকে চিকিৎসক, বুদ্ধিজীবি, ব্যবসায়ী থেকে শিশু, বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী কেউ বাদ পড়ছেন না। চোখে অত্যধিক ব্যথা, এক-অর্ধ ঘণ্টার মধ্যেই চোখ দুটি জবা ফুলের ন্যায় লাল হয়ে অসহ্য যন্ত্রণা হতে থাকে, চোখ থেকে গরম জল পড়তে আরম্ভ করে ও চোখের পাতা ফুলে উঠে। ২।৩ ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর চোখ, নাক, মুখ থেকে অনবরত ঝরতে থাকে জল।

এই রোগের ৩টি অবস্থা। ৩টি অবস্থার জন্য **৩টি ঔষধের প্রয়োজন।** ঠিকমত ঔষধটি প্রয়োগ করতে পারলে পর ১টি ঔষধ দ্বারাই রোগটি দ্রুত আরোগ্য হয়ে থাকে। রোগের আগমন যেমন হঠাৎ, নির্গমনও তদ্রূপ হঠাৎ। রোগের প্রথম অবস্থায় **অ্যাকোনাইট ন্যাপ**-এর ৬ শক্তির ১টি বটিকা আধ ঘণ্টা অন্তর ৩ বার প্রয়োগ করলে পর সাধারণতঃ ২য় ও তৃতীয় অবস্থা আসে না। তবে স্মরণ রাখতে হবে অ্যাকোনাইটের অবস্থা চিকিৎসকগণ প্রায়ই পান না। তাই গৃহস্থদের সুবিধার্থে এই ঔষধ সম্বন্ধে বললাম। রোগের আক্রমণ হঠাৎ তৎসঙ্গে অস্থিরতা ও অদম্য জল পিপাসা থাকলে পর অ্যাকনাইট ব্যবহৃত হয়। ২নং ঔষধ **বেলাডোনা** ২০০ শক্তির ২ মাত্রা ১টি বড়ি এখন, অপরটি ২।৩ ঘণ্টা পরে। চক্ষু জবা ফুলের ন্যায় লাল হয়ে উঠে, ঐ সঙ্গে থাকে তীব্র চোখে ও মাথার দুই পাশে বেদনা, চক্ষু থেকে গরম জল পড়তে থাকে। এই লক্ষণ পেলে পর ২ মাত্রা ঔষধই যথেষ্ট।

৩নং ঔষধ **ইউফ্রেসিয়া** ২০০ শক্তি ২ মাত্রা, প্রতি মাত্রায় ১টি বড়ি। ১ম ও ২য় অবস্থার পরে উপস্থিত ২য় এই অবস্থা চোখ, নাক, মুখ থেকে অবিরত জল পড়া, যেন খেজুরের রস ঝরছে—তৎসঙ্গে থাকবে চোখ, নাক, মুখ ফোলা। ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ২টি মাত্রাই যথেষ্ট। সকলকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন প্রখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক মণীষী ডঃ নর্টন বলেন, চক্ষু রোগে ঘন ঘন ওষুধ প্রয়োগের ফলে দ্রুত চোখ খারাপ হয়ে যেতে পারে, সুতরাং সাবধান, অত্যধিক হোমিও-প্যাথিক ওষুধ কেউ প্রয়োগ না করেন। আর যাহা ঔষধের কোন প্রয়োজন হয় না, খাবার ঔষধেই রোগ দ্রুত আরোগ্য লাভ করবে। বাহ্য ঔষধ প্রয়োগ না করে গরম জলে নুন (মাত্রা ৫ গ্রেণ, ১ পেয়ালা জলে) দিয়ে তদ্দ্বারা চক্ষু ধৌত করা, প্রতিদিন ৩।৪ বার চক্ষু ঐ নিয়মে ধুলে ফল ভালই হবে।

ডাঃ এস এন রায়, সম্পাদক হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসক (মাসিক পত্রিকা)

২৫০. যুগান্তর, ২০ জুন ১৯৭১

২৫১. *আনন্দবাজার*, ১৩ জুন ১৯৭১

২৫২. *নিউইয়র্ক টাইমস*, ১৩ আগস্ট ১৯৭১

২৫৩. Georges Childs Kohn, pg. 146

২৫৪. D. D Pramanik , *Joy Bangla, An epidemic of conjunctivitis in India,* The Practitioner, 1971 Dec Issue, pg 805-6

২৫৫. Jhon Saar ও Mark Godfery *লাইফ* ম্যাগাজিনের সংবাদদাতা ও চিত্রগ্রাহক। একাত্তরের জুনে ঘুরে বেড়িয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের আনাচে কানাচে। একাত্তরের গণহত্যার, বর্বরতার কিংবা শরণার্থীদের উপর তার প্রকাশিত বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন ঝড় তুলেছিল একাত্তরে।

২৫৬. The Pakistani Refugee Disaster, *Life*, New York, Vol. 70 No 23, 18 June 1971

২৫৭. *দৈনিক কালান্তর*, ১৮ জুলাই, ১৯৭১

২৫৮. *যুগান্তর*, ৯ জুন ১৯৭১

২৫৯. প্রাগুক্ত

২৬০. The Bengali Refugees: A surfeit of woe, *New York Times*, 19 June 1971

২৬১. *আনন্দবাজার*, ১৮ জুলাই ১৯৭১ প্রকাশিত সংবাদ ও করিমপুরের স্থানীয়দের সাক্ষাৎকার

২৬২. Max Beattie, Death reaps a Young harvest, *Washington Daily News*, 14 September 1971

২৬৩. *The New York Times* , East Pakistan: In Brief , 17 December, 1971

২৬৪. *The ordinance Norway,* 27 September 1971

২৬৫. Relief work in a refugee camp for Bangladesh refugees in India শিরোনামে *The Lancet* নামক মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে দেখা যায় একাত্তরের ভারতের একটি শরণার্থী ক্যাম্পে ১,৭০,০০০ শরণার্থীর মধ্যে কলেরায় ৪০০০ শরণার্থীর মৃত্যু হয়েছে।

২৬৬. আরিফ রহমান, *ত্রিশ লক্ষ শহীদ বাহুল্য না বাস্তবতা*, নান্দনিক, ঢাকা, ২০১৫

২৬৭. সাক্ষাৎকার, উৎপলা মিশ্র, কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি ২০১৬

২৬৮. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত এক রিপোর্টে একাত্তরের শরণার্থীদের ভ্যাক্সিনেশনের তথ্যটি উল্লেখ করা হয়েছে।

২৬৯. একাত্তরে কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকাগুলোর তথ্য

২৭০. জলাঙ্গীতে একটি চায়ের দোকানে কথা হচ্ছিল আনিস রহমান, আবু বক্কর, আমির শেখ, আনোয়ার উদ্দীন মন্ডলের সাথে। যারা সবাই একাত্তরের প্রত্যক্ষদর্শী।

২৭১. সাক্ষাৎকার, আনোয়ার উদ্দীন মন্ডল, জলাঙ্গী, মুর্শিদাবাদ, ৮ মার্চ ২০১৬

২৭২. সাক্ষাৎকার, সোমেন গুহরায়, পশ্চিম দিনাজপুর, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

২৭৩. The Pakistani Refugee Disaster, *Life,* New York, Vol. 70 No 23, 18 June 1971

২৭৪. নুরুল আলম, *স্মৃতিময় একাত্তর*, সুলেখা, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৬৫

২৭৫. Richard and Helen Exley (Edited), The testimony of sixty on the crisis in Bengal, Oxfam, 1971

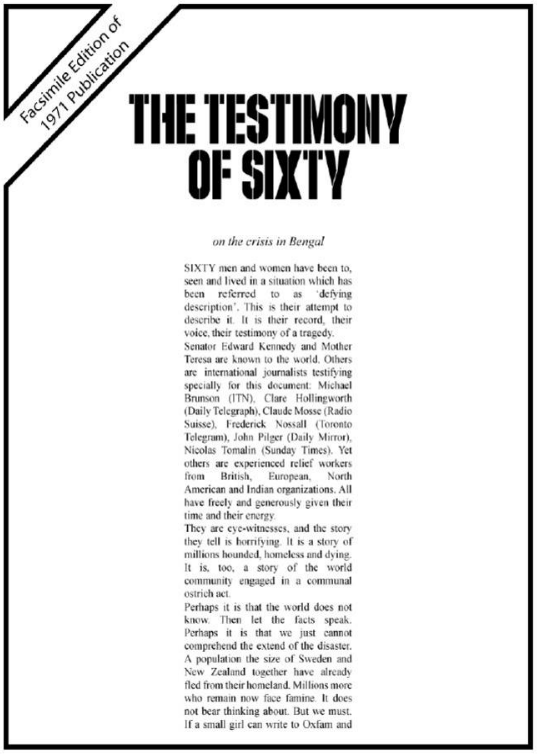

Facsimile Edition of 1971 Publication

THE TESTIMONY OF SIXTY

on the crisis in Bengal

SIXTY men and women have been to, seen and lived in a situation which has been referred to as 'defying description'. This is their attempt to describe it. It is their record, their voice, their testimony of a tragedy.

Senator Edward Kennedy and Mother Teresa are known to the world. Others are international journalists testifying specially for this document: Michael Brunson (ITN), Clare Hollingworth (Daily Telegraph), Claude Mosse (Radio Suisse), Frederick Nossall (Toronto Telegram), John Pilger (Daily Mirror), Nicolas Tomalin (Sunday Times). Yet others are experienced relief workers from British, European, North American and Indian organizations. All have freely and generously given their time and their energy.

They are eye-witnesses, and the story they tell is horrifying. It is a story of millions hounded, homeless and dying. It is, too, a story of the world community engaged in a communal ostrich act.

Perhaps it is that the world does not know. Then let the facts speak. Perhaps it is that we just cannot comprehend the extend of the disaster. A population the size of Sweden and New Zealand together have already fled from their homeland. Millions more who remain now face famine. It does not bear thinking about. But we must. If a small girl can write to Oxfam and

২৭৬. প্রাগুক্ত

২৭৭. প্রাগুক্ত

২৭৮. *The Age*, 23 September 1971

২৭৯. দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের, 'এখান থেকে এরা কোন ভবিষ্যতে পাড়ি দেবে?', *যুগান্তর*, ৩ এপ্রিল ১৯৭১

২৮০. Bangladesh Documents, Vol-1, p. 192

২৮১. *যুগান্তর*, ৯ এপ্রিল ১৯৭১

২৮২. *যুগান্তর*, ১৫ জুলাই ১৯৭১

আহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য
নেতাজী ফিল্ড হাসপাতালের উদ্বোধন

গাইঘাটা, ১৪ই জুলাই—এখান থেকে দু' মাইল দূরে এবং বনগাঁ থেকে ছ' মাইল আগে ২৪ পরগণার বাকচড়ায় আজ এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে "নেতাজী ফিল্ড হাসপাতালের" উদ্বোধন হয়। বাংলাদেশের আহত মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশে সমর্পিত এই নতুন হাসপাতালটির উদ্বোধন ঘোষণা করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেছিলেন নরেন্দ্রপুরের স্বামী লোকেশ্বরানন্দ।

পেট্রাপোল সীমান্তের বারো মাইল দূরে যশোর রোডের ওপর বিস্তারিত ভূখণ্ডের ওপর এক দোতলা বাড়িতে সন্নিবিষ্ট এই হাসপাতালে ইনডোর ও আউটডোর—দুটি বিভাগই আছে। ইনডোর বা আন্তর্বিভাগে থাকছে ২৫টি সার্জিকাল শয্যা ও একটি পূর্ণাঙ্গ অস্ত্রোপচার কক্ষ। আউটডোর বা বহির্বিভাগে রাখা হয়েছে শিশু চিকিৎসা এবং চক্ষু-কর্ণ চিকিৎসার এবং মেডিকাল ও পরিবার পরিকল্পনার ক্লিনিক। সব কটি বিশেষজ্ঞরা দেখাশুনা করবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্যোক্তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে স্থায়ী ও পৌনঃপুনিক খাতে অর্থ সাহায্যের ভরসা দিয়েছেন। বেসরকারী সংস্থা ও ব্যক্তির কাছ থেকেও সহায়তার আশ্বাস পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার যে তাঁবু দিতে চেয়েছেন তাতে আরও ৫০টি শয্যার ব্যবস্থা করা যাবে।

এই হাসপাতালটির চারদিকে দু' মাইল জুড়ে হাজার পঞ্চাশেক শরণার্থী আছেন। আপাততঃ যে হাসপাতাল আছে তা এখান থেকে আট মাইল দূরে। তাও ভারাক্রান্ত। সুতরাং, সেদিক থেকে এই হাসপাতালের নৈকট্য বিশেষ সহায়ক হবে। উদ্যোক্তারা স্থির করেছেন তাঁরা অন্যান্য সরকারী বে-সরকারী সংস্থার সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করবেন।

এই হাসপাতাল পরিচালন কমিটিতে আছেন ডাঃ শিশিরকুমার বসু (চেয়ারম্যান), ডাঃ জ্যোতির্ময় চ্যাটার্জি (কোষাধ্যক্ষ), ডাঃ এস কে হাজারী ও ডাঃ সত্যেন বসু রায় (সার্জেন-ইন-চীফ) এবং ডাঃ শচীশ রায় (পরিকল্পনা)।

হাসপাতালটি উদ্বোধন করতে গিয়ে অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রী বসু এ শতাব্দীর অন্যতম অগ্রগণ্য মুক্তিযোদ্ধা সুভাষচন্দ্রের দেশে বিদেশে সেবাধর্মের কথা স্মরণ করে বলেন, তাঁর বিশ্বাস, বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এই হাসপাতালের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পাবে এবং আধুনিকতম সরঞ্জামে সুসজ্জিত হবে। প্রধান অতিথি স্বামী লোকেশ্বরানন্দও অনুরূপ প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

অন্যান্য বক্তার মধ্যে ছিলেন ডাঃ শিশিরকুমার বসু, ডাঃ সত্যেন বসু রায় এবং ডাঃ হাজারি সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্দেশে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাপতি, প্রধান অতিথি এবং প্রত্যেক বক্তাই জনসাধারণের উদ্দেশে অকাতরে এই হাসপাতালকে সাহায্য করবার জন্য আবেদন জানান।

২৮৩. *যুগান্তর*, ৩ আগস্ট ১৯৭১

এটা একটা আধুনিক ফিল্ড হসপিটালের নমুনা। জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকের পক্ষ থেকে এটা দান করা হয়েছে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরকে। এতে অন্যান্য সব উপকরণের সঙ্গে থাকবে ৬০টি শয্যা এবং ২খানি এ্যাম্বুলেন্স।

২৮৪. *আনন্দবাজার*, ২৬ এপ্রিল ১৯৭১

২৮৫. *যুগান্তর*, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

২৮৬. *যুগান্তর*, ১২ জুন ১৯৭১

২৮৭. International Committee of Red Cross, *International Review of the Red Cross, October 1971,* no-125, The Judge Advocate General's Library, U.S. Army

২৮৮. সাক্ষাৎকার, ডাঃ গুরুদাস রায়, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

২৮৯. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতি রিপোর্ট

২৯০. *যুগান্তর*, ১৬ জুন ১৯৭১

২৯১. *যুগান্তর*, ২০ জুন ১৯৭১

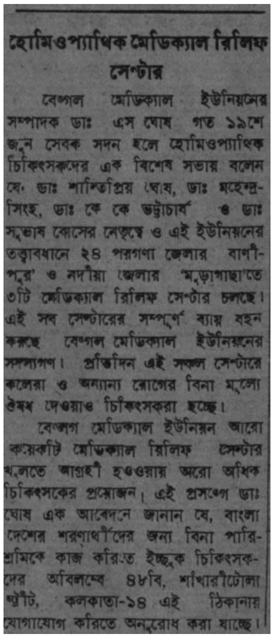

হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল রিলিফ সেণ্টার

বেঙ্গল মেডিক্যাল ইউনিয়নের সম্পাদক ডাঃ এস ঘোষ গত ১৯শে জুন সেবক সদন হলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের এক বিশেষ সভায় বলেন যে, ডাঃ শান্তিপ্রিয় ঘোষ, ডাঃ মহেন্দ্রসিংহ, ডাঃ কে কে ভট্টাচার্য ও ডাঃ সুভাষ বোসের নেতৃত্বে ও এই ইউনিয়নের তত্ত্বাবধানে ২৪ পরগণা জেলার বাণীপুর' ও নদীয়া জেলার 'মুড়াগাছা'তে ৩টি মেডিক্যাল রিলিফ সেণ্টার চলছে। এই সব সেন্টারের সম্পূর্ণ ব্যায় বহন করছে বেঙ্গল মেডিক্যাল ইউনিয়নের সদস্যগণ। প্রতিদিন এই সকল সেণ্টারে কলেরা ও অন্যান্য রোগের বিনা মূল্যে ঔষধ দেওয়াও চিকিৎসকরা হচ্ছে।

বেঙ্গল মেডিক্যাল ইউনিয়ন আরো কয়েকটি মেডিক্যাল রিলিফ সেন্টার খুলতে আগ্রহী হওয়ায় আরো অধিক চিকিৎসকের প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে ডাঃ ঘোষ এক আবেদনে জানান যে, বাংলা দেশের শরণার্থীদের জন্য বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিতে ইচ্ছুক চিকিৎসকদের অবিলম্বে ৪৮বি, শাঁখারীটোলা ষ্ট্রীট, কলকাতা-১৪ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

২৯২. *যুগান্তর*, ১৩ জুন ১৯৭১

২৯৩. *যুগান্তর*, ১৫ এপ্রিল ১৯৭১

২৯৪. স্মরণিকা, *কলকাতা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদ*, কলকাতা, ১৯৭৬

২৯৫. *Plight of Bengali Refugee During Bangladesh War 1971in Rotary Club Documents,* The Rotarian (Official Documents of Rotary Club), October 1971 to June 1972

২৯৬. *আনন্দবাজার*, ১৬ জুন ১৯৭১

২৯৭. *International Review of the Red Cross, September 1971,* no-124, The Judge Advocate General's Library, U.S. Army

২৯৮. যুগান্তর ১৬ অক্টোবর ১৯৭১, স্থানীয় অনেক স্বেচ্ছাসেবকের সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়।

২৯৯. *International Review of the Red Cross, October 1971,* no-125, The Judge Advocate General's Library, U.S. Army

৩০০. *যুগান্তর*, ২৯ অক্টোবর ১৯৭১

৩০১. বার্ষিক প্রতিবেদন, *ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, পশ্চিমবঙ্গ শাখা,* ১৯৭১-১৯৭২

৩০২. *যুগান্তর*, ২৪ মে ১৯৭১

৩০৩. *অমৃতবাজার*, ২৭ মে ১৯৭১

৩০৪. সাক্ষাৎকার, বাশার মুন্সী, জলাঙ্গী, মুর্শিদাবাদ, ৮ মার্চ ২০১৬

৩০৫. *যুগান্তর*, ২৯ মে ১৯৭১

৩০৬. বার্ষিক প্রতিবেদন, *ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, পশ্চিমবঙ্গ শাখা,* ১৯৭১-১৯৭২

৩০৭. সাক্ষাৎকার, ডাঃ বিমলেন্দু ভট্টাচার্য, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

৩০৮. *যুগান্তর*, ৮ জুন ১৯৭১

৩০৯. *যুগান্তর*, ১৬ মে ১৯৭১

৩১০. *সপ্তাহ*, ৭ মে ১৯৭১

৩১১. প্রাগুক্ত

৩১২. *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ২৮

৩১৩. মৈত্রেয়ী দেবী, পৃ ৮০

৩১৪. পূর্ণিমা দাশগুপ্ত, *আমাদের ঈপ্সিতাদি*, শ্রদ্ধাঞ্জলি (ঈপ্সিতা গুপ্ত স্মৃতি স্মারক পত্রিকা), বহরমপুর ছন্দনীড় কল্যাণ সমিতি, ২০১০, পৃ. ১৭

৩১৫. প্রমথেশ মুখার্জী, *বিপ্লবী জননেতা ত্রিদিব চৌধুরীর দৃষ্টিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৯৭১*, (মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় পরিচয়ের সূত্র ধরে বহরমপুর থেকে অপ্রকাশিত প্রবন্ধটি একটি চিঠিসহ পাঠিয়েছেন প্রমথেশ মুখার্জী)

৩১৬. শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, ওদের সংগ্রামের দিকে তাকিয়ে আমরা, ৩য় পর্ব, *আনন্দবাজার*, ৪ এপ্রিল ১৯৭১

৩১৭. চৌধুরী শহীদ কাদের, ভিন্ন এক জয়বাংলার গল্প, বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডটকম, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৭

৩১৮. *যুগান্তর*, ১৫ মে ১৯৭১

৩১৯. রবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, শুধু আশ্রয়প্রার্থীরা নয় আশ্রয়দাতারও বিপন্ন, প্রাগুক্ত

৩২০. পরিতোষ স্যানাল, *দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও জনজীবনে এর প্রভাব*, *বসুমতি*, পশ্চিমবঙ্গ, ২৩ আগস্ট ১৯৭১

৩২১. রবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, *যুগান্তর,* ১৫ মে ১৯৭১

৩২২. সাক্ষাৎকার, অম্লাণ দত্ত, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ ১৫ নভেম্বর ২০১৬

৩২৩. *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ,* সপ্তম খণ্ড, পৃ. ২৪

৩২৪. তপন বন্দোপাধ্যায়, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতার ভূমিকা,* অন্য ক্যানভাস, পশ্চিম মেদিনীপুর, এপ্রিল সংখ্যা, ২০০৪, পৃ. ১৭

৩২৫.   মৈত্রেয়ী দেবী, পৃ ৩৯

৩২৬. সাক্ষাৎকার, তরুণ স্যানাল, ১৮ জানুয়ারি ২০১৬

৩২৭. সাক্ষাৎকার, রহমত উল্লাহ্, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, বালুরঘাট

৩২৮. সাক্ষাৎকার, বিষ্ণু দে, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

৩২৯. পরিচয় (বাংলাদেশ সংখ্যা), কলকাতা, ১৯৭১ (বর্ষ ৩৯, ১৩৭৭-০১৩৭৮)

৩৩০. প্রাগুক্ত

৩৩১. বীরেন সোম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শিল্পী সমাজ*, চন্দ্রাবতী, ঢাকা, ২০১৫, পৃ ৯৫

৩৩২. *যুগান্তর,* ১৩ এপ্রিল ১৯৭১

৩৩৩. *কালান্তর,* ৭ এপ্রিল ১৯৭১

৩৩৪. *কালান্তর,*১৬ জুলাই ১৯৭১

৩৩৫. প্রাগুক্ত

৩৩৬. *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ২৪

তৃতীয় অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের ভূমিকা ছিল অনন্য। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পাশাপাশি সাধারণ জনগণও একাত্তরে সম্পৃক্ত হয়েছিল বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে। শরণার্থী সেবা, আশ্রয় প্রদান, চাঁদা সংগ্রহ, প্রতিবাদ সমাবেশ, বনধ, সহায়ক সমিতি গঠন, মুক্তিফৌজের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি নানাবিধ কর্মকান্ডের মাধ্যমে ত্রিপুরার সাধারণ জনগণ সম্পৃক্ত হয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে। সাধারণের সম্পৃক্ততায় বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম সীমান্তবর্তী এই পূর্বাঞ্চলে এসে একটি জনযুদ্ধের রুপ পেয়েছিল। ত্রিপুরার অষ্টপ্রহর কোলাহল মুখর ছিল বাঙালির অধিকার আদায়ের দাবিতে। 'এপার বাংলা ওপার বাংলা, জয় বাংলা জয় বাংলা' কিংবা 'হিন্দু মুসলিম জানি না বাঙালি ছাড়া মানি না' এই ধরনের হাজারো স্লোগানে উত্তাল হয়েছিল সীমান্তবর্তী এই রাজ্যটি। এই এক অন্য ধরনের আবেগ, অন্য ধরনের টান। এক সাংবাদিক লিখেছেন, একাত্তরে আগরতলায় ফেলে আসা দেশের টানে ঝড় ওঠেছিল।[১]

ত্রিপুরার প্রায় আশি শতাংশ লোকের শেকড় পূর্ববঙ্গে। ভাষা, চেহারা ও জাতিগত সাদৃশ্য কিংবা নিরেট মানবিকতা অভিঘাত হেনেছিল সাধারণ মানুষের আবেগে। নিজের সর্বোচ্চটুকু নিয়েই পাশে দাঁড়িয়েছিল শরণার্থী সেবায়। এমন কোন পরিবার ত্রিপুরায় খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, একাত্তরে যার বাড়িতে কেউ আশ্রয় নেয়নি। অসীম মমতা দিয়ে সেই চরম দুর্দিনে স্নেহ-ভালবাসার এক অকৃত্রিম বন্ধন গড়ে তুলেছিল তৃণমূল জনতা। ভৌগোলিক দুর্গমতা, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, পরিকাঠামোগত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস সকল ত্রিপুরাবাসী এক হয়ে কাজ করেছেন বাংলা ও বাঙালির জন্য।[২] সেই ধর্মনগর থেকে সাব্রুম ত্রিপুরার প্রতিটি মানুষের কাছে, কী জাতি কী উপজাতি 'জয়বাংলা' ছিল এক ভালবাসার নাম।[৩]

ত্রিপুরার সাথে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সম্পর্ক

ভারতের পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব অংশের সাথে বাংলাদেশের রয়েছে নৃতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক সম্পর্ক। ১৯৪৭ সালের পূর্বে টেকনাফ থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ছিল এক দেশ।[৪] এই অখণ্ড অঞ্চলের লোকজনের মধ্যে

ছিল ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক বেশ কিছু মিল। ছিল নানা ধরনের যোগাযোগ। নৃতাত্ত্বিক সাংস্কৃতিক এই অবিভক্ত অঞ্চলে ভাষা ছিল জাতীয়তাবাদের মূল মন্ত্র। চেহারার সাদৃশ্য, খাদ্যভাস, পোশাক-পরিচ্ছদের সাদৃশ্য তাদেরকে অভিন্ন করেছিল। এছাড়া এ সীমানার শাসকদের বিভিন্ন ভূখণ্ড দখল ও একত্রীকরণ প্রচেষ্টা, ধর্ম গুরুদের ধর্মপ্রচার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষকে একই সুতোয় গেঁথেছে। আবার শাসক কিংবা সামন্তদের অত্যাচারে স্থান পরিবর্তিত হয়েছে নানা সময়।[৫] জীবিকা, ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে ভারতবর্ষের এক অঞ্চলের মানুষ গিয়েছে আরেক অঞ্চলে। এক কথায় অবিভক্ত ভারতবর্ষের যে নানাবিধ মেলবন্ধন '৪৭ পরবর্তী সময়েও তা অটুট ছিল। সম্পর্কটা সবচেয়ে দৃঢ় ছিল পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তানের সাথে স্বাধীন ভারতের উত্তর-পূর্ব অংশের সাথে।

পূর্ববঙ্গ তথা বর্তমান বাংলাদেশের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের গভীর আত্মিক সম্পর্কের ভিত্তি রচিত হয়ে এসেছে এক দীর্ঘকালীন সীমান্তিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক নৈকট্যের বিবর্তন ধারা ঘিরে। এটি এক অনিবার্য মানবিক সম্পর্কের আন্তঃপ্রক্রিয়া।[৬]

রাজন্য আমলে পূর্ববঙ্গের চাকলা রোশনাবাদ ত্রিপুরা জমিদারির অংশ ছিল। বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলাও একসময় ডিসটিক্ট টিপরা নামে পরিচিত ছিল। বৃহত্তর ত্রিপুরার সাথে যুক্ত ছিল আজকের বাংলাদেশের অনেকগুলো জেলা। তাদের সংযোগ ছিল নিয়মিত। পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় সীমানায় কাঁটাতার সেই সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে। কিন্তু বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার প্রত্যাহিক সম্পর্ক আজো আবদ্ধ রেখেছে গোমতী নদী। পাহাড়ের বুক চিরে বেরিয়ে আসা গোমতীর পরিপূর্ণ বিস্তার বাংলার সমতল ভূমিতে এসে।

উপমহাদেশের দুইশত বছরের ইংরেজ শাসনের সময় প্রত্যক্ষভাবে ত্রিপুরা কখনো তাদের অধীনে আসেনি। তবে ত্রিপুরার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সবসময় বৃটিশদের হাতেই ছিল। তবে একথা স্বীকার করতে হয় পূর্ববঙ্গের অনেক বৃটিশ-বিরোধী বাঙালি, অনেক বিপ্লবী ত্রিপুরা মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল। ১৯৪৯ সালে ত্রিপুরা রাজ্য স্বাধীন ভারতের সাথে অঙ্গীভূত হয়। পূর্ববঙ্গ থেকে যাওয়া শরণার্থী বাঙালিরা হয়ে পড়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ।

ত্রিপুরা মহারাজাদের বাঙালি প্রীতি ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির সাথে ত্রিপুরার মহারাজাদের যোগসূত্র ছিল। সেই যোগসূত্রকে দৃঢ় করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন ত্রিপুরার রাজা বীরচন্দ্র মানিক্য, বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্য, বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য এবং রাধাকিশোর মানিক্য। এই চার মহারাজা এসেছিল রবীন্দ্র সান্নিধ্যে। যদিও ত্রিপুরার রাজা মহারাজারা বাঙালি ছিলেন না, এমনকি তারা বাংলা ভাষীও ছিলেন না। কিন্তু বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাদের

ছিল গভীর প্রীতি। সারা বাংলায় যখন বাংলা ভাষার সরকারি মর্যাদা ছিল না, ফার্সি এবং ইংরেজি যখন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ধন্য, ত্রিপুরার রাষ্ট্র ভাষা তখন বাংলা।[৭] ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম বাংলায় লেখা মুদ্রার প্রচলন করেছিল ত্রিপুরার মহারাজা।

বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। গবেষণার কাজে বিলেত যাবেন, প্রয়োজন প্রচুর অর্থের। রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে চেষ্টা করছিলেন বন্ধুর জন্য অর্থ সংগ্রহের। ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য শুনে মর্মাহত হলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন, 'এ বেশ আপনার সাজে না, আপনার বাঁশি বাজনাই কাজ, আমরা ভক্তবৃন্দ ভিক্ষার ঝুলি বহন করিব'। চিঠির পরের অংশটি সেকালের যেকোন প্রভাবশালী মহারাজার পক্ষে আরও গুরুত্বপূর্ণ। রাধাকিশোর লিখলেন, 'প্রজাবৃন্দের প্রদত্ত অর্থই আমার রাজভোগ জোগায় ..আমাদের অপেক্ষা জগতে কে আর বড়ো ভিক্ষুক আছে'।[৮]

মহারাজা রাধাকিশোর সেকালে পঞ্চাশ হাজার টাকা জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনায় দান করেছিলেন। সহায়তা করেছিলেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের নানা কাজে। শুধু তাই নয়, অন্ধ কবি হেমচন্দ্র এবং দীনেশচন্দ্র সেন তাঁদের জীবনের অন্যতম সঙ্কটতম মুহূর্তে ত্রিপুরার মহারাজাদের কাছ থেকে আর্থিক মাসোহারা পেয়ে সঙ্কটমুক্ত হয়েছিলেন। অন্যদিকে এই জনপদে একটি অসাম্প্রদায়িক মানস সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছে ত্রিপুরার রাজ পরিবার। হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়ার পরও শাহ সুজার স্মৃতিতে নির্মাণ করেছেন মসজিদ। মুসলমানদের অনেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রাজ পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল।[৯]

বৃটিশ শাসনের বাইরে থাকা সত্ত্বেও ত্রিপুরার মহারাজা রাধা কিশোর বিপ্লবাদীদের নানাভাবে সহযোগিতা করতেন। যে কারণে ইংরেজ সরকার তাঁর নামের আগে মহারাজা উপাধি ব্যবহারে বাদ সেধেছিলেন।

ত্রিপুরার সাথে পূর্ববঙ্গের সম্পর্কটি ঐতিহাসিক সময় থেকে আত্মার বন্ধনে আবদ্ধ, পাশাপাশি ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থানটাও অদ্ভুতভাবে গাঁথা বাংলাদেশের সাথে। ভারত যেখানে তিন দিক থেকে বেঁধে রেখেছে বাংলাদেশকে, বাংলাদেশ সেখানে তিন দিক থেকে আলিঙ্গন করে আছে ত্রিপুরাকে। ত্রিপুরার মোট ৯১৭ কিলোমিটার সীমান্তের মধ্যে ৮৩৯ কিলোমিটার বাংলাদেশের সাথে।

ত্রিপুরা আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি পরিচিতি পেয়েছে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দিয়ে। এই আগরতলা মামলাকে কেন্দ্র করেই উত্তাল হয়েছিল ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশ, জন্ম নিয়েছিল ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের। বাংলাদেশ সম্পর্কে ত্রিপুরার মানুষের প্রচণ্ড আবেগটিও সম্ভবত এই সময় থেকে জন্ম নেয়।

আগরতলার প্রখ্যাত সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্য উল্লেখ করেন, ১৯৬১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর শেখ মুজিব খোয়াই সীমান্ত হয়ে আগরতলা আসেন।[১০] নিরাপত্তার খাতিরে তাকে রাতে আগরতলা কেন্দ্রীয় কারাগারে রাখা হয়। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শচিন্দ্রলাল সিংহ কারাগারে প্রায় দুই ঘন্টা শেখ মুজিবের সাথে আলাপ করেন। পরের দিন ১৭ সেপ্টেম্বর শেখ মুজিব সালদা নদী পার হয়ে পূর্ব বাংলায় ফিরে যান। খোয়াইয়ের তৎকালীন সাবডিভিশনাল অফিসার স্মরজিৎ চক্রবর্তীর ডায়েরিতে দেখা যায়, ৫ ফেব্রুয়ারি সোমবার ১৯৬২ সালে শেখ মুজিব আসারামবারি তথা খোয়াই সীমান্তে পৌঁছান।[১১] শেখ মুজিবের সঙ্গী ছিলেন টি চৌধুরী ও আমীর হোসেন নামক জনৈক দু'জন লোক। জেলা প্রশাসকের নির্দেশে তাদের তেলিয়ামুড়া পাঠানো হয়, সম্ভবত ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর কাছে বিশেষ আর্জি নিয়ে শেখ মুজিব আগরতলা গিয়েছিলেন।[১২] ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুন 'বঙ্গবন্ধু কীভাবে আমাদের স্বাধীনতা এনেছিলেন' গ্রন্থে ১৯৬২ সালে বঙ্গবন্ধুর আগরতলা যাত্রার রোমাঞ্চকর কাহিনী তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, মমিনুল হকের স্মৃতিচারণ, মানস পালের প্রবন্ধ, এসডিও এর ডায়েরি পড়ে নিশ্চিত হওয়া যায় বঙ্গবন্ধু ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ আগরতলা যান। এবং এই যাত্রা ভারত সরকারের গ্রীন সিগন্যালেই হয়েছে।[১৩] যাই হোক ধারণা করা হয় বিষয়টি সাথে সাথে পাকিস্তান সরকার জানতে পারে। মুনতাসীর মামুন নিশ্চিত করে লিখেছেন, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ এই কারণে তাকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে।[১৪] কিন্তু ঘটনাটি পাকিস্তান সরকার চেপে গিয়েছিল। অনেক পরে ১৯৬৮ সালে সরকার এই বিষয়ে মামলার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিষয়টাকে জনসম্মুখে আনেন। শেখ মুজিবের পক্ষে সেই মামলা লড়েছিলেন ব্রিটেনের রাণীর আইনজীবী টমাস উইলিয়াম। আর এটা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ।[১৫]

মূলত আগরতলা মামলা ত্রিপুরা এবং পূর্ববঙ্গের জনগণকে এক আত্মার বন্ধনে জড়ায়, একাত্তরে সেই আত্মিক সম্পর্কের চূড়ান্ত প্রতিফলন ঘটিয়েছেন ত্রিপুরার আমজনতা।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ত্রিপুরা

১৯৭১ সালে ত্রিপুরা ভারতের সবচেয়ে অনুন্নত রাজ্যগুলোর একটি। ভারতের একদম প্রান্তসীমায় অবস্থান ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে ত্রিপুরা অনেকটা বিচ্ছিন্ন মূল ভারত থেকে। তবে এই বিচ্ছিন্ন ত্রিপুরায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল বাঙালিরা, যাদের অধিকাংশই দেশবিভাগের আগে-পরে ত্রিপুরায় স্থায়ী হয়েছেন। ফলে মার্চের শুরু থেকেই পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতির উপর তারা নজর রাখছিল। আগরতলা তথা

ত্রিপুরা বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের সাথে সর্বপ্রথম সম্পৃক্ত হয়েছিল ‘ষড়যন্ত্র মামলা আগরতলা’ দিয়ে। আগরতলার মানুষের কাছে রাতারাতি নায়ক হয়ে ওঠেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। ঢাকা সেনানিবাসে রাতের অন্ধকারে এই মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা করেছিল পাকিস্তানিরা। এই মামলাকে কেন্দ্র করে ফাঁসিতে ঝোলানোর চেষ্টা হয়েছিল বাঙালির স্বাধীনতার প্রাণপুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে। বিস্ময়কর হলেও সত্য সেই আগরতলা মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ডেটলাইন।[১৬]

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম শুনেছিলেন ত্রিপুরার মানুষ। শফিউল্লাহ, জিয়া, খালেদ মোশাররফ, শাফায়াত জামিল, রফিকুল ইসলাম, সুবিদ আলী ভূইয়া থেকে শুরু করে যুদ্ধের সামরিক-বেসামরিক নেতৃবৃন্দ শেখ ফজলুল হক মনি, মতিয়া চৌধুরী, আ স ম আব্দুর রব, আব্দুল কুদ্দুস মাখন, শাজাহান সিরাজ, কাজী সিরাজসহ যুব ছাত্র নেতৃবৃন্দ ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল এই ত্রিপুরাতেই। স্থানীয় পত্রিকাগুলো যেমন- *দৈনিক সংবাদ, জাগরণ, সাপ্তাহিক দেশের ডাক, সাপ্তাহিক সমাচার, ত্রিপুরা বার্তা, ত্রিপুরা দর্পণ* এর একটি বড় অংশ দখল করে নিয়েছিল বাংলার মুক্তি সংগ্রাম। কখনোবা পুরো পত্রিকাজুড়েই এই সংক্রান্ত সংবাদ, কখনোবা বিশেষ সংখ্যা। প্রায় প্রতিদিনই পত্রিকাগুলো ছেপেছে সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় কিংবা বিশেষ নিবন্ধ। আর বিপুল সংখ্যক শরণার্থী আশ্রয় দিয়ে ত্রিপুরা তো সেই সময় মানবিকতার এক অনন্য নজির স্থাপন করেছিল।

মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের শুরুতে ২ মার্চ ১৯৭১ *দৈনিক সংবাদ* শিরোনাম করে ‘মেঘনা পদ্মায় আবার জোয়ারের গর্জন’।[১৭]

বিকচ চৌধুরী ‘লক্ষ মুঠিতে ঝড়ের ঠিকানা’ গ্রন্থে লিখেছেন, ‘ত্রিপুরার জনসাধারণ যদিও ২৫/২৬ মার্চ থেকেই মুক্তিযুদ্ধের উত্তাপ অনুভব করতে শুরু করে, ত্রিপুরার পত্র পত্রিকায় এই উত্তাপ অনুভব করা শুরু হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানের নির্বাচনের সময় থেকেই’।[১৮] মূলত আগরতলা তৈরি হচ্ছিল মার্চের প্রথম দিন থেকেই।

ত্রিপুরা বিধান সভার দুটো আসনের উপনির্বাচন নিয়ে স্থানীয় প্রস্তুতির পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতি স্থান করে নিচ্ছিল পত্র পত্রিকায়। আগরতলা মামলাকে কেন্দ্র করে শেখ মুজিবর রহমানের নানা বিষয়, উত্তাল উনসত্তর, শেখ মুজিবরের কারামুক্তি, বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ঘোষণা কিংবা সত্তরের নির্বাচন গভীর মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করছিল পূর্ববঙ্গ থেকে আসা বাঙালিরা। সে আমলের স্থানীয় পত্র পত্রিকা *দৈনিক জাগরণ, সংবাদ, দেশের ডাক, ত্রিপুরা দর্পণ, জাগরণ বা সমাচারের* ফাইল দেখলে তার স্পষ্ট

প্রমাণ পাওয়া যায়। কাঠের টাইপে শিরোনাম, সীসার হরফে ছাপা অস্পষ্ট সাধারণ দেশি কালির ছাপসমেত ট্যাবলয়েড সাইজের ৪ পৃষ্ঠা কখনও ২ পৃষ্ঠা পত্রিকাগুলো যেন একেকটি বারুদের স্তুপ তৈরি করেছিল সেই সময়।[১৯]

অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছিল ত্রিপুরার সংবাদমাধ্যম, সরকার, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ও সাধারণ মানুষ। এর ফলে পূর্ব থেকেই সেখানে একটি সাধারণ প্রস্তুতি ছিল। ২৫শে মার্চের কালো রাত্রির পর যখন হাজার হাজার মানুষ উন্মুখ হয়ে ছুটেছে সীমানার দিকে, পূর্ব প্রস্তুতি থাকার ফলে সীমান্ত উন্মুক্ত করে দিল ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী।

'ভারত সরকার কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে সীমান্ত উমুক্ত করার অন্তত পাঁচদিন আগেই শচীনদার নির্দেশে আমাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের জন্য সীমান্ত খুলে দেয়। ভারত সরকারের অলিখিত নির্দেশ আসে অনেক পরে।' [২০]

৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর পল্টন ময়দানে ঐতিহাসিক ঘোষণা, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক উদ্বেলিত করেছিল ত্রিপুরাবাসীকে। আগরতলা শহরে মোটামুটি উন্মাদনার সৃষ্টি হয় ভাষণ নিয়ে। হাজার হাজার মানুষ সে রেকডকৃত ভাষণ শুনছে। এই দৃশ্য আগরতলার সর্বত্র ছিলো। নতুন প্রেরণা জেগেছিল সে ভাষণে। ৮ মার্চ *দৈনিক সংবাদ* ২ পৃষ্ঠার সাপ্লিমেন্ট বের করেন। বিশাল টাইপে শিরোনাম করা হয়, 'রক্তের উতরোল উচ্ছাসে স্বাধিকারের দুর্মর অভিযান, বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা, ঢাকার জনসভায় বাংলার সংগ্রামী নেতা মুজিবরের প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধের আহবান।' [২১]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সবচেয়ে বেশি অভিঘাত হেনেছে এই সীমান্তবর্তী ত্রিপুরার ওপর। ১৯৭১ সালে ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যা ছিল ১৫,৫৬,৮৮২ জন।[২২] আর এই রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিল তার প্রায় সমান সংখ্যক শরণার্থী। ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর *দৈনিক সংবাদে* প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীর সংখ্যা ১৪,১৫,৬১১ জন।

সারণি ১২ : এক নজরে ত্রিপুরার শরণার্থী সংখ্যা (৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ইং পর্যন্ত)

জেলার নাম	রেজিষ্ট্রিকৃত শরণার্থীর সংখ্যা

পশ্চিম ত্রিপুরা	৭,৩৯,৮১১ জন
দক্ষিণ ত্রিপুরা	৪,৩৪,৭৯৫ জন
উত্তর ত্রিপুরা	১,৮৮,০০৫ জন
রেজিষ্ট্রিবহির্ভূত শরণার্থী আনুমানিক সংখ্যা	৫৩,০০০ জন
মোট	১৪,১৫,৬১১ জন

তাদের মধ্যে ৭,৭১,৯৬১ জন শরণার্থী বিভিন্ন শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। এখানে উল্লেখ থাকে যে, ২৮,২০৩ জন শরণার্থীকে বিমানে এবং ৬,৬৩৯ জন শরণার্থীকে ট্রেনে আসামে পাঠানো হয়েছিল।[২৩]

শরণার্থী শিবিরগুলোর পাশাপাশি ত্রিপুরার এমন কোন বাড়ি ছিল না যেখানে দুই একজন করে বাংলাদেশের ছিন্নমূল মানুষ আশ্রয় নেননি।

আগরতলা, এক অর্থে ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অলিখিত রাজধানী। অবিভক্ত চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, সিলেটের বেশকিছু অংশ এবং রাজধানী ঢাকা থেকে দেশত্যাগী বিদ্রোহী বাঙালি ইপিআর, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের প্রথম আশ্রয়স্থল ছিল আগরতলা। চট্টগ্রাম-কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে ত্রিপুরার সীমান্ত ছিল মুক্তিযোদ্ধা আর মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক-পরিচালকদের প্রাথমিক ঠিকানা। রাজধানী ঢাকার সাথে ভৌগোলিক নৈকট্য যুদ্ধের কৌশলগত দিক থেকে ত্রিপুরার গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছিল বহুগুণ। মুজিবনগরে শপথ নেওয়া বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা, রুপরেখা সবকিছুর সাথেই জড়িত ছিল আগরতলা। জড়িত ছিল একাত্তরের অধিকাংশ রণ পরিকল্পনার সাথে। পদ্মা, গোমতী, তিতাস ও ব্রহ্মপুত্র নামে চারটি মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে ওঠেছিল ত্রিপুরার হাপানিয়ায়। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের চারটি সেক্টর ও ছোট বড় অনেকগুলো ক্যাম্প গড়ে ওঠেছিল ত্রিপুরায়। বলা যেতে পারে আগরতলা আমাদের মুক্তিসংগ্রামের সামরিক রাজধানী।[২৪]

সাধারণের অসাধারণ ভূমিকা

ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের এই সম্পৃক্ততা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। নিচে সেই বিশেষ দিক তুলে ধরা হল-

ক. শরণার্থীদের আশ্রয় ও সহায়তা

২৫ মার্চের কালো রাতে বর্বরোচিত গণহত্যা শুরু হলে মানুষ প্রাণ ভয়ে আশ্রয় নিতে শুরু করে সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে। রাজধানী ঢাকা, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, সিলেট, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, টাঙ্গাইল প্রভৃতি জেলার মানুষের জন্য ত্রিপুরা হয়ে উঠে মুখ্য আশ্রয় ঘাঁটি।[২৫] সাংখু, ধর্মতলা, বিলোনিয়া, আমরতলা, কৈলাস শহর, কসবা ও সোনামুড়ার প্রায় ৭০০ মাইল উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক শরণার্থী প্রবেশ করছে ত্রিপুরায়। কেউ কেউ আশ্রয় নিয়েছে শরণার্থী শিবিরগুলোতে আবার কেউবা আত্মীয়ের বাড়িতে। ত্রিপুরার গ্রাম ও শহরের এমন কোন বাড়ি ছিল না যে বাড়িতে শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়া হয়নি। 'এমন পরিবার খুবই কম আছে যেখানে ৫-১০ জন শরণার্থী আশ্রয় নেয়নি'।[২৬] বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর এই স্রোত ভারতের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া ত্রিপুরা রাজ্যে সৃষ্টি করে মানবিক বিপর্যয়ের। এপ্রিল মাস পর্যন্ত ত্রিপুরায় গড়ে উঠেনি কোন শরণার্থী শিবির, স্থানীয় স্কুল, কলেজ ও আত্মীয় বাড়িতেই ছিল তাদের অবস্থান। ঠিক এই ধরণের একটি সময়ে শরণার্থীদের সহায়তায় এগিয়ে আসে ত্রিপুরার তৃণমূল জনগণ। তৃণমূল লোকজন শরণার্থীদের আশ্রয় ও সেবা দেয়ার পাশাপাশি নানাভাবে চালাতে থাকে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা।

বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে, তরুণ সম্প্রদায় পাড়ায় পাড়ায় মুষ্ঠি ভিক্ষা সংগ্রহ করে, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে, লটারী ও প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করে, জেলখানার কয়েদিরা অভুক্ত থেকে, প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী-কর্মকর্তারা এক বা অর্ধদিনের বেতন দিয়ে, শিল্পী ছবি এঁকে ইত্যাদি নানাবিধ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ত্রিপুরার তৃণমূল জনগণ অর্থ সংগ্রহ করেছে। এসকল সংগৃহীত অর্থ শরণার্থীদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আবার অন্যদিকে এই অর্থ দ্বারা মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র, প্রশিক্ষণ ও চিকিৎসা সহায়তা দেয়া হয়েছে।

এই কাজে সবার আগে এগিয়ে আসে ত্রিপুরার ছাত্র সমাজ। তুলসীবতী স্কুল, ফটিক রায় স্কুল, বোধজং স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে সংগৃহীত অর্থ শরণার্থী শিবিরে দান করেন।

মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে দু'দিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংগৃহীত মোট ১,৫৪৬ টাকা পূর্ব বাংলা থেকে আগত শরণার্থীদের সাহায্যকল্পে দু'দফায় মুখ্যমন্ত্রী ও শ্রীমতি ডায়াসের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।[২৭]

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামীদের সাহায্যার্থে আগরতলার বোধজং স্কুলের শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীবৃন্দ তাদের এক দিনের বেতন ও ছাত্ররা প্রত্যেকে ২ টাকা করে চাঁদা দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। সংগৃহীত অর্থ দিয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনে স্বাধীন বাংলার উপযুক্ত প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়ার ঘোষণা দেন।

স্বাধীন বাংলাকে স্বীকৃতি ও সাহায্যের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে তারবার্ত্তা পাঠান বিদ্যালয়টির ছাত্র-শিক্ষকরা।[২৮]

এভাবে বোধজং স্কুলে মোট আটশ বারো টাকা চাঁদা সংগ্রহীত হয়। ১৮ জুন বোধজং উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী ব্যোমকেশানন্দ ভট্টাচার্য এই সংগৃহীত অর্থ সরকারের সাহায্য তহবিলে দান করেন। ...বোধজং উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারীদের পক্ষে মোট আটশ বারো টাকা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তাদের হাতে তুলে দেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী ব্যোমকেশানন্দ ভট্টাচার্য...[২৯]

শরণার্থীদের সহায়তায় ফটিক রায় স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারীরা একটি তহবিল গড়ে তোলেন। ৩১ মার্চ অভয়নগর উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্ররা কমপক্ষে ২৫ পয়সা করে চাঁদা প্রদান করে ১টি তহবিল গড়ার সিদ্ধান্ত নেন এভাবে তারা প্রায় ১,০০০ টাকা সংগ্রহ করে ত্রাণ তহবিলে দান করেন।[৩০] এম. বি বি কলেজের ছাত্ররা ও শরণার্থীদের সহায়তায় ত্রাণ তহবিল গড়ে তোলে। শুধু আগরতলাতে নয়, ছাত্রদের এই প্রশংসনীয় উদ্যোগ ছড়িয়ে পড়ে পুরো ত্রিপুরায়। বিলোনিয়ার বি. কে ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা শরণার্থী সহায়তায় গড়ে তোলে ত্রাণ তহবিল। তারা প্রায় ২,০০০ টাকা সংগ্রহ করে প্রদান করেন রাজ্য সরকারের তহবিলে।[৩১]

বড়দোয়ালি হাইয়ার সেকেন্ডারি স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীরা মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ শরণার্থীদের জন্য ৫০০ টাকার একটি তহবিল গড়ে তোলে।[৩২] কমলপুর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সংগ্রহ করে পুরানো কাপড়। ধর্মনগর কৃষ্ণপুর বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ত্রিপুরায় আগত শরণার্থীদের জন্য একবেলা টিফিনের টাকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে বাংলাদেশ তহবিলে দান করেন।[৩৩]

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় ছাত্রসমাজের মধ্যে। এটা শুধু নগর নয়, প্রান্তেও সমানভাবে পরিলক্ষিত হয়। এর সাক্ষ্য রয়েছে সৈয়দ আলী আহসানের স্মৃতিচারণে, পহেলা বৈশাখ তারিখে... রামগড়ের সীমানা পেরিয়ে আমরা আগরতলার দিকে রওয়ানা হলাম। ... সাব্রুমের রাস্তায় একদল ভারতীয় স্কুলের ছাত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ছাত্ররা আমাদের জীপ থামিয়ে জীপের চারদিকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গান করতে লাগল, 'আমদের সংগ্রাম চলবেই চলবে'। সিকানদার আবু জাফর এই গানটি লিখেছিলেন কিছুদিন আগে তখন এই গানটির তাৎপর্য বুঝতে পারিনি। কিন্তু অপরিচিত পরিমন্ডলে শঙ্কিত সময়ের পদক্ষেপে গানটির বাণী আমার কাছে অসাধারণ তাৎপর্যবহ মনে হলো।[৩৪]

এই স্কুলছাত্রদের দিকে তাকিয়ে ত্রিপুরার গোটা ছাত্রসমাজের মনোভঙ্গি উপলব্ধি করা যায় যে, মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে তারা কী নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হয়েছিল। স্কুল-কলেজ শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি এই সময় শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় এগিয়ে আসে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, সাধারণ মানুষ ও সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীরা। ত্রিপুরা সরকারের প্রচার অধিদপ্তরের কর্মীবৃন্দ তাদের একদিনের বেতনের টাকা দিয়ে লম্বুছড়া শিবিরের ছেলে-মেয়েদের জামা কাপড় দান করেন।[৩৫]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ত্রিপুরায় কতটা জনসম্পৃক্ত হয়েছে ১১ আগস্টের একটি ঘটনা থেকে সেটি স্পষ্ট হয়। এই দিন আগরতলা কারাগারে বন্দীরা শেখ মুজিবর রহমানের অবৈধ গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে দুপুরে অনশন পালন করেন। এবং তাদের দুপুরের খাবারের জন্য বরাদ্দকৃত ৩৫০ টাকা বাংলাদেশ ত্রাণ তহবিলে দান করেন।[৩৬] বাংলাদেশের শরণার্থীদের সহায়তায় এগিয়ে আসেন ত্রিপুরার জরিপ বিভাগ। তারা রাজবাড়িতে অবস্থানকারী শরণার্থী পরিবারগুলোকে ত্রাণ সহায়তা প্রদান করেন। ১৬ মে শ্রী রাজেন্দ্র চন্দ্র দে জি.বি. হাসপাতালে পরলোকগমন করলে তার পরিবারকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য পঁচিশ টাকা দেন জরিপ বিভাগ। এছাড়া শরণার্থী পরিবারগুলোকে নানা ধরণের শুকনো খাবার, বাচ্চাদের চকলেট ইত্যাদি সরবরাহ করেন তারা।[৩৭]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তার জন্য এপ্রিল মাসের শুরুতেই স্বাধীন বাংলা সাহায্য সমিতি গঠন করেন ত্রিপুরার মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন। পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসতে সমিতি রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন।[৩৮] ২ এপ্রিল পুরো ত্রিপুরাব্যাপী যে সর্বাত্মক বনধ পালিত হয় তার আহবায়ক ছিল এই মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন। এছাড়া তারা মোটর শ্রমিকদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে শরণার্থী শিবিরগুলোতে ঔষধ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস এই সংগঠনটি নানাভাবে বাংলাদেশের কল্যাণে কাজ করেছেন।

ত্রিপুরা মোটর ওয়াকার্স ইউনিয়ন শরণার্থীদের সহায়তায় সদস্যদের থেকে চাঁদা তুলে তহবিল গঠন করে। তহবিলে জমাকৃত অর্থে তারা বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন।

কেন্দ্রীয় বেকার সমন্বয় সমিতি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে তাদের সমুদয় কর্মসূচি স্থগিত করেন। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের ত্রাণ সরবরাহ করেন এবং রাজ্য সরকারকে শরণার্থীদের আর্থিক সহায়তা করার জন্য স্মারকলিপি দেন।

শরণার্থীদের সহায়তার জন্য এই সময় বেশ কয়েকটি সংগঠনের উদ্যোগে লটারীর আয়োজন করা হয়। লটারী থেকে সংগৃহীত অর্থ শরণার্থীদের নানা ধরণের পুনর্বাসন কাজে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের সাহায্যার্থে শ্রীমতি ডায়াস কর্তৃত আহূত মহিলা সম্মেলন এক লটারীর আয়োজন করে। শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য লটারীর মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের কার্য্যসূচী অনুযায়ী একটাকা মূল্যের তিন হাজার টিকিট বিক্রির সিদ্ধান্ত নেন মহিলা সংস্থাটি।[৩৯] বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে একটি সাইকেল, একটি ঘড়ি ও একটি রেডিও পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে। বাকী সমুদয় অর্থ শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেন সংগঠনটির আহবায়ক শ্রীমতী জোন ডায়াস। ৭ মে শুক্রবার বিকেল পাঁচটার সময় স্থানীয় মাণিক্য ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয় এই লটারির ড্র অনুষ্ঠান। লটারী খেলার ‘লাকি নাম্বার’ তোলার জন্য তিনটি বালককে নেওয়া হয়।[৪০] আবার ভি.এম. হাসপাতালের শিশু বিভাগের উন্নয়ন ও জোয়ানদের পরিবারবর্গের কল্যাণের জন্য কিছু লটারীর টিকিট বিক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া স্থানীয়ভাবে বেশ কয়েকটি লটারী অনুষ্ঠিত হয়। আগস্ট মাসের শুরুতে শরণার্থীদের সহায়তায় এই ধরণের একটি লটারী আয়োজন করা হয় মেলাঘরে। আয়োজক ছিলেন স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘মেলাঘর যুব সংঘ’।[৪১] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার যে লটারীর আয়োজন করে, সেই লটারীর বিপুল সংখ্যক টিকেট বিক্রি হয় ত্রিপুরাতে। নিচে ৮ মে *গণসংহতি* পত্রিকায় প্রকাশিত সেই লটারীর একটি বিজ্ঞাপন তুলে ধরা হল।[৪২]

লটারী

বাংলাদেশকে সাহায্য করুন

আর মাত্র ৭ দিন পরেই আপনি ও পেতে পারেন ২ লাখ টাকা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের লটারীতে। মনে রাখবেন প্রথম পুরস্কার

২ লাখ টাকা। প্রতি টীকিট ২ টাকা । মোট ১১৩ টী পুরস্কার

আজই আসুন বা ডাকে টাকা পাঠান।

নিবেদক- বি. বি. আচার্য

অর্গানাইজার, শকুন্তলা রোড, আগরতলা

অর্থ সংগ্রহের জন্য এই সময় ত্রিপুরায় বেশ কয়েকটি প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়। এই ধরনের প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচের প্রথম চিন্তাটা করেন ত্রিপুরা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন। ৪ জুলাই আসাম

রাইফেলস ময়দানে আয়োজন করা হয় রাজ্য একাদশ বনাম বাংলাদেশ একাদশের মধ্যে এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচের।[৪৩] বাংলাদেশ একাদশে অংশ নেন বেশ কয়েকজন জাতীয় পর্যায়ের খেলোয়াড়। এই খেলা দেখার জন্য আসাম রাইফেলস ময়দানে ছিল উপছে পড়া ভীড়।[৪৪] বিপুল সংখ্যক দর্শক টিকেট কেটে এই খেলা উপভোগ করেন। খেলায় বাংলাদেশ একাদশ ২-১ গোলে পরাজিত হয়। খেলা থেকে সংগৃহীত অর্থ শরণার্থী ও রণাঙ্গনের যোদ্ধাদের জন্য ব্যয় করা হয়।

...গতকাল আসাম রাইফেলস ময়দানে আয়োজিত ফুটবল ময়দানে আয়োজিত প্রদর্শনী ফুটবলে রাজ্য একাদশ ২-১ গোলে শরণার্থী একাদশকে পরাজিত করেছে।... দলে অন্যূন নয়জন তদানীন্তন পাক জাতীয় পর্যায়ের খেলোয়াড় রয়েছেন বলে মিঃ রহমান জানান।[৪৫]

এর পর ত্রিপুরাতে আরো কয়েকটি ফুটবল ম্যাচ হয়। ১৮ আগস্ট বিলোনিয়াতে স্থানীয়দের সাথে শরণার্থীদের একটি প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়। বিলোনিয়া গার্লস হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত এই খেলায় শরণার্থী একাদশ ৩-০ গোলে জয়ী হয়।[৪৬] নভেম্বর মাসের শুরুতে এই ধরণের একটি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন হয় মেলাঘরে। আয়োজক ছিলেন স্থানীয় ছাত্রনেতা শুভল রুদ্র।[৪৭] শরণার্থীদের সহায়তায় এই সময় বেশ কয়েকটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঐ সকল অনুষ্ঠান থেকে সংগৃহীত অর্থ শরণার্থীদের সেবায় ও রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে ১৫৪৬ টাকা সংগ্রহ করে।[৪৮] এই সংগৃহীত অর্থ মহিলা ত্রাণ সমন্বয় পরিষদের তহবিলে দান করা হয়।

দক্ষিণ শহরতলীর নবগঠিত সাংস্কৃতিক সংস্থা *ত্রিপুরা শিল্প সন্ধানীগোষ্ঠী* ৬ জুন সন্ধ্যায় আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শরণার্থী ত্রাণ মহিলা কমিটির সভানেত্রী শ্রীমতী ডায়াসের হাতে কিছু পরিমাণ নগদ অর্থ বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের ত্রাণ কার্যে সাহায্য হিসেবে তুলে দেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে এই সাহায্য ছাড়াও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ শিল্পীদেরও নগদ পারিতোষিক দেয়া হয়েছে। শ্রীমতী ডায়াস সংস্থার প্রদত্ত অর্থের সাথে ব্যক্তিগতভাবে আরও কুড়ি টাকা দেবার ঘোষণা করেন।[৪৯]

এছাড়াও আয়োজন করা হয়েছে বেশ কয়েকটি নাট্যানুষ্ঠানের। স্থানীয়ভাবে পাড়ায় পাড়ায় যুবক সম্প্রদায় নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে শরণার্থীদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। এসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অর্থ সংগ্রহের পাশাপাশি শরণার্থী শিবিরগুলোতে দুঃসহ জীবন কাটানো শরণার্থীদের মানসিক অবস্থার উন্নয়নে

চেষ্টা চালানো হত। বাংলাদেশ থেকে আগত নামকরা শিল্পীদের যেমন-কবরী, আব্দুল জব্বার, আপেল মাহমুদ এদেরকে আনা হত।

মেলাঘরে আয়োজন করা হয়েছে বেশ কয়েকটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের, মঞ্চস্থ হয়েছে সিরাজউদদৌলা নাটকটি। বিলোনিয়াতে নিয়মিত আয়োজন করা হত দেশের গানের আসর। যে সকল মুক্তিযোদ্ধা আগরতলার অভ্যন্তরে থেকে বিভিন্ন অপারেশনে অংশ নিত সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডগুলো তাদের মধ্যে নতুন অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করত। অধিকাংশ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উদ্দীপনামূলক দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশিত হত।

শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় এই সময় বেশ কয়েকটি সংগঠনের সৃষ্টি হয়। নতুন এই সংগঠনগুলোর পাশাপাশি স্থানীয় বেশ কিছু সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংগঠন শরণার্থীদের সেবায় এগিয়ে আসেন। ২৫ শে এপ্রিল হারাধন সংঘের পক্ষ থেকে দূর্গা বাড়ির দু'হাজার ও ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেস অফিসের শরণার্থীদের মধ্যে চিড়া ও বাতাসা বিতরণ করা হয়েছে। হারাধন সংঘের সম্পাদক জানিয়েছেন যে সংঘের সদস্যরা শরণার্থীদের ত্রাণকার্য্যে যে কোন প্রকারের শ্রম স্বীকারে প্রস্তুত আছে।[৫০] ১৮ এপ্রিল তেলিয়ামুড়া বাজারের সন্নিকটে আনন্দমার্গ ত্রাণ কমিটির উদ্যোগে যুদ্ধবিধস্ত পূর্ব বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তদের সুবিধার্থে এক সস্তা ভোজনালয় খোলা হয়েছে। উক্ত ভোজনালয়ে প্রতিদিন শত শত উদ্বাস্তুকে খাওয়ানো হচ্ছে।[৫১]

স্থানীয় ডিও রাইটার্স এসোসিয়েশন ২৫ শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত সমিতির বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসবের ব্যয় সংকোচ করে তিনশ এক টাকা মূল্যের জামা-কাপড় পূর্ব বাংলা থেকে আগত শরণার্থীদের মধ্যে (বোডিং স্কুল শিবির) বিতরণ করেছে।[৫২] ১০ মে স্থানীয় শিশু উদ্যানে শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তিজীর অর্ধশততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে স্থানীয় আনন্দমার্গরা শরণার্থীদের মধ্যে এক হাজার একটি পাউরুটি বিতরণ করছেন।[৫৩] আগরতলা শকুন্তলা রোডস্থিত শ্রী শ্রী স্বামী ধনঞ্জয় দাসজী কাঠিয়াবাবা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'স্বামী সন্তদাস নিম্বার্ক দর্শন সমিতি' বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য ৫০টি কম্বল (আনুমানিক মূল্য ৮০০ টাকা) ও নগদ ২০১ টাকা ও মসজিদ রোডের শ্রী অমর সাহা ও শ্রী প্রকাশ স্টোর্স কর্তৃক দর্শন সমিতিকে প্রদত্ত ১০০টি কম্বল যার আনুমানিক মূল্য ১৬০০ টাকা দান করেন।

৮ আগস্ট দর্শন সমিতির কেন্দ্রীয় অফিস শ্রী শ্রী রামদাস কাঠিয়াবাবা গ্রন্থাগার ভবনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রিলিফ কো-অর্ডিনেটিং কাউন্সিলের পক্ষে ক্ষীরোদ সেন উক্ত দান গ্রহণ করেন।[৫৪]

রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির সভ্যবৃন্দ বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের বিশেষ করে শিশু ও রোগীদের ত্রাণকার্য পরিচালনায় সরকার ও অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশ নিয়েছেন।[৫৫]

১২ আগস্ট বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্য সহায়তার জন্যে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দ্বারা রিলিফ কো-অর্ডিনেটিং কাউন্সিল নামে একটি সমিতি গঠিত হয়েছে। বিভিন্ন ক্যাম্পে শরণার্থীদের ত্রাণ কার্যে যোগ দিয়েছে। সর্ব সেবা সংঘ, বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি থেকে ৩ জন স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে সমিতি মোহনপুর, গোকুলনগর প্রভৃতি শিবিরে স্বাস্থ্য সেবা কার্যে যোগ দিয়েছে।

২৯ জুলাই থেকে গোকুলনগর, মোহনপুর, হরিনা প্রভৃতি ক্যাম্পে বস্ত্র বিতরণ শুরু হয়েছে। কমিটি অনতিবিলম্বে বিপুল সংখ্যক শাড়ী, লুঙ্গি, শিশুদের জামা প্রভৃতি ঐ সমস্ত ক্যাম্পে বিতরণ করবেন। কমিটি ত্রিপুরা রেডক্রস সোসাইটিকে দু হাজার টাকা, বাসনপত্র দিয়ে সাহায্য করছেন ও শিশুদের জন্যে প্রোটিনযুক্ত খাবার বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সর্বসেবা সংঘ, বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি কমিটিকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসক, স্বেচ্ছাসেবক প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করেছেন। 'অন্ন ফার্ম' থেকেও প্রয়োজনীয় অর্থ ও ত্রাণ সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করা হচ্ছে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।[৫৬]

শরণার্থীদের নানাবিধ সহায়তায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে যে সংগঠনটি তার নাম '৬ই ফেব্রুয়ারী কমিটি'। তারা বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, ব্যক্তিগত দান, সরকারি সংস্থা ও পেশাজীবী সংগঠন থেকে অর্থ সংগ্রহ করে বৃহৎ তহবিলে গড়ে তোলেন। ৩০ মার্চ ৬ ফেব্রুয়ারি কমিটির পক্ষ থেকে শরণার্থীদের সহায়তায় অর্থ, বস্ত্র, আশ্রয় ও রসদ নিয়ে আসতে রাজ্যবাসীকে আহবান জানান।

১৯ মে ১৯৭১ পর্যন্ত তাদের তহবিলে জমা হওয়া অর্থের পরিমাণ, উৎস ও ব্যয়ের হিসাব নিম্নে তুলে ধরা হল-

৬ই ফেব্রুয়ারী কমিটি পূর্ব বাংলা মুক্তি সংগ্রাম সাহায্য তহবিল **আয় ঃ**

ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট টিচার্স এসোসিয়েশন মারফৎ সংগ্রহ ১৭২.০০

ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন মরাফৎ সংগ্রহ ৯৩৪.০০

ত্রিপুরা টিচার্স এসোসিয়েশন মারফৎ সংগ্রহ ৯৮.০০

ত্রিপুরা টেকনিকেল এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন মারফৎ সংগ্রহ ১৬৮.০০

ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ৩০.০০

ত্রিপুরা মিউনিসিপ্যাল ইউনিয়ন মারফৎ সংগ্রহ ৩০০.০০

ওয়াটার সাপ্লাই ইউনিট মারফৎ সংগ্রহ ৫৫.৫০

কল্যাণপুর টি.ই.সি.সি. ১৭৩.৫০

ধর্ম্মনগর টি.ই.সি.সি. ৬৫০.০০

৬ই ফেব্রুয়ারী ডম্বুনগর কমিটি মারফৎ সংগ্রহ ১৬০১.০০

দামছড়া (ধর্ম্মনগর) ছাত্র সংসদ মারফৎ সংগ্রহ ৪০১.৮০

মেডিকেল রিপ্রেজন্টেটিটিভস মারফৎ সংগ্রহ ৮৫.০০

বীমা কর্ম্মচারী সমিতি মারফৎ সংগ্রহ ২৬৩.০০

কেন্দ্রীয় কর্ম্মচারী কো-অর্ডিনেসন কমিটি মারফৎ সংগ্রহ ৬০.০০

স্ট্রিট স্কোয়াড মারফৎ সংগ্রহ ১৪৬১.৪০

হরলাল চক্রবর্তী ব্যক্তিগত দান ৫১.০০

মোট সংগ্রহ ৬৪০৪.২০।

ব্যয় ঃ

প্রেস কুপন ছাপান বাবৎ ২৪৮.০০ টাকা

প্রচার বাবৎ ৫৭.০০ টাকা

মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য কেন্দ্রীয় কমিটি মারফৎ ঔষধ ১,০৪০.০০ টাকা

মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য কেন্দ্রীয় কমিটি মারফৎ জুতা

ঔষধ ২২৮.৮৫ টাকা

মুক্তিযোদ্ধাদের কেন্দ্রীয় কমিটি মারফৎ খাদ্য ১০০.০০ টাকা

ডম্বুনগর কমিটি মারফৎ জামা, জুতা, টর্চ্চ ৬০১.০০

শরণার্থী সাহায্য ১৩০.০০

যাতায়াত ভাড়া ও জামা, ঔষধ ও খাওয়া খরচ ১৫৩.৪৫ টাকা

মোট ব্যয় ৩৫৫৮.৩০ টাকা।[৫৭]

মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রায় ১ লক্ষ টাকার তহবিল এই সংগঠনটি গড়ে তোলে। এছাড়াও পুরনো বস্ত্র, ঔষধ ও নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে তারা বাংলাদেশ রণাঙ্গনে পাঠান। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বেসরকারিভাবে ত্রিপুরা সবচেয়ে বৃহৎ তহবিল গড়ে তোলেন বাংলাদেশ উদ্বাস্তু ত্রাণ মহিলা সমিতি। তৎকালীন ত্রিপুরার গভর্ণরের স্ত্রী শ্রীমতি ডায়াসের নেতৃত্বে এই সংগঠনের সদস্যরা নয় মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

...১৮ই জুলাই তারিখে ভারতে আগত শরণার্থীদের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক মহিলা কমিটির পক্ষ থেকে তাঁরা ষাট ডজন ফ্রক ও চল্লিশ ডজন শার্ট পেয়েছেন। শ্রীমতি ডায়াস জানান যে তিনি এবং অপর সদস্যা শ্রীমতি কালিয়া ২০ শে জুলাই তারিখে ভিএম হাসপাতাল পরিদর্শনে যান এবং রোগীদের মধ্যে ২০টি শাড়ী, ১২টি শিশুদের ফ্রক ও ন্যাপকিন ও ৩৪টি পুরোনো চাদর বিতরণ করেন। ২৩ শে জুলাই তারিখে শ্রীমতী ডায়াস, শ্রীমতী মেহতা ও স্বপ্না দত্ত বড়জলা উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শন করেন। উক্ত দুটি শিবিরে তাঁরা শিবিরবাসীদের মধ্যে ধুতী, শাড়ী, লুঙ্গী, গেঞ্জি, ফ্রক এবং তোয়ালে ইত্যাদি বিতরণ করেন।...[৫৮]

৪ অক্টোবর আমতলী শরণার্থী শিবিরে শরণার্থী ত্রাণ মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। অন্যান্য সদস্যগণের সঙ্গে সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী উমা প্রসাদ অপেক্ষমাণ শরণার্থীদের মধ্যে মোট ৫০০টি শাড়ী, ২০০টি ধুতী ও ২০০টি গেঞ্জী বিতরণ করেন।[৫৯] ১৪ জুন বাংলাদেশ শরণার্থী ত্রাণ মহিলা কমিটির পক্ষ থেকে স্থানীয় কলাবাগানস্থিত শরণার্থী শিবিরে ৪০০ নতুন জামাকাপড় বিলি করা হয়। শরণার্থীদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে তাদের সুবিধা ও অসুবিধাদি নিয়ে আলোচনার পর উক্ত কমিটির প্রেসিডেন্ট শ্রীমতি জোন ডায়াস স্বয়ং শরণার্থী বয়স্ক পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের মধ্যে ঐ বস্ত্রাদি বিতরণ করেন।[৬০]

শরণার্থীদের সেবায় সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে আগরতলার নারীরা। তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে বস্ত্র, অর্থ সংগ্রহ করেছেন। ক্যাম্পের নারীদের নানাবিধ বিষয়ে খোঁজ খবর নিয়েছেন। মুষ্ঠি ভিক্ষা সংগ্রহ করেছেন, শরণার্থীদের আশ্রয়ের বিষয়ে লোকজনকে উৎসাহিত করেছেন।[৬১] মহিলা কমিটির সভাপতি শ্রীমতি ডায়াস ছাড়াও রেণুকা চক্রবর্তী, অনু মুখার্জী, বাসনা চক্রবর্তী শরণার্থী ত্রাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।[৬২] এর মধ্যে রেণুকা চক্রবর্তী মূলত লটারি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শরণার্থীদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। শরণার্থীদের জন্য নতুন ও পুরাতন বস্ত্র সংগ্রহের যে সাব কমিটি সেটার দায়িত্বে ছিলেন অনু মুখার্জী। শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় লাভকারী শরণার্থীদের অবস্থা, শিবিরবিহীন শরণার্থীদের আশ্রয় ও আশ্রয় শিবিরগুলোর দেখ-ভাল করার দায়িত্বে ছিলেন বাসনা চক্রবর্তী। প্রায় ৯০০ পুরানো বস্ত্র, নগদ টাকা, ঔষধপত্র ও শুকনো খাবার সংগ্রহের পাশাপাশি মহিলা সমিতি পুরানো খবরের কাগজ ও শিশি বোতল সংগ্রহ করতেন। পরে এই পুরানো খবরের কাগজ ও শিশি বোতল বিক্রি করে শরণার্থীদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে ।[৬৩]

এছাড়া বাংলাদেশ সহায়ক কমিটি, সহায়ক পরিষদ এসোসিয়েশন, ত্রিপুরা লেখক সংঘ, মটর ওয়াকার্স ইউনিয়ন, স'মিল ওয়াকার্স ইউনিয়ন, সংযুক্ত দোকান কর্মচারী সমিতি, সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন, বিবেকানন্দ ক্লাব, বেসরকারি শিক্ষক সমিতি ইত্যাদি বিভিন্ন সংগঠন শরণার্থী সেবায় এগিয়ে আসেন। ত্রিপুরার সাধারণ জনগণ এতবেশি শরণার্থী অন্তঃপ্রাণ ছিল যে যা পেরেছে বয়ে এনেছে শরণার্থীদের জন্য। এমন কোন ঘর ছিল না যে ঘরে কেউ আশ্রয় পায়নি। এমনকি ত্রিপুরায় ২৭৭টি শরণার্থী ক্যাম্প ইউনিট গড়ে ওঠেছে সাধারণ মানুষের জায়গায়। যেগুলো সাধারণ ত্রিপুরাবাসী সেচ্ছায় দিয়েছে তার জন্য তাঁরা কোন পয়সা নেয়নি।[৬৪]

মূলত ২৬ মার্চ সকাল থেকেই ত্রিপুরার অরক্ষিত সীমান্ত দিয়ে শরণার্থী প্রবেশ শুরু হয়। শুরুতে এসব শরণার্থীদের জন্য সরকারি কোন ব্যবস্থাপনা ছিলনা। সাধারণ মানুষজনই তাদের আশ্রয় দিয়েছে, আহার দিয়েছে। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে সরকারি ব্যবস্থাপনায় শরণার্থী ক্যাম্প হতে, কিংবা রেশন পোঁছাতে বেশ সময় লেগেছিল। কিন্তু এর জন্য কোন শরণার্থীকে না খেয়ে থাকতে হয়নি। অদ্ভুত এক মায়ায় সীমান্ত এলাকার লোকগুলো পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু এসব মানুষকে বুকে টেনে নেন। সোনামুড়া সীমান্ত এলাকায় এখনো অনেক উন্মুক্ত সীমান্ত। একদম সীমান্ত ঘেঁষে একটি বাড়ি আউয়াল মিয়ার। কথা হচ্ছিল মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে, আশি পেরানো আউয়াল মিয়া যা বলছিলেন তার সারমর্ম, একাত্তরে সে এবং তার বাবা সাধারণ চাষী। যুদ্ধ শুরু হলে ওপার থেকে তার বাড়িতে আশ্রয় নেয় পনেরজন মানুষ, যারা পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে এসেছে, কিছুই আনতে পারেনি। তিনি এবং তার বাবা, দুই ভাই দিনমজুরের কাজ করে তাদের আহার জুটিয়েছিলেন। বলছিলেন সে সময় আমাদের পাড়ার এমন কোন বাড়ি ছিলনা যেখানে ওপার থেকে কোন লোক আশ্রয় পায়নি।[৬৫]

এসব আউয়াল মিয়ারাই আমাদের মুক্তিসংগ্রামের প্রতিকূল সময়ের অন্যতম বন্ধু ছিলেন। আর একটু সামনে গিয়ে সত্তরোর্ধ্ব এক মহিলার সাক্ষাৎ পেলাম। নাম ছমিরণ বিবি, বলছিল একাত্তরে আমার অধিকাংশ সময় কেটেছে উনুনে বসে। এমনও হয়েছে দিনে ২০ বার ভাত রান্না করেছি। আমার স্বামী ছিল বড় গৃহস্থ। ধান চালের কোন অভাব ছিলনা। এপ্রিলের শুরুতে যখন আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে শতশত অভুক্ত লোক ভারতে প্রবেশ শুরু করে, তাদের করুণ কাহিনী, পথের কষ্ট, স্বজনহারানোর বেদনা আমার স্বামী রমজান আলীকে আহত করে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন যারাই এই পাশ হয়ে ভারতে ঢুকবে তাদের তিনি ভাত আর আলু, ডাল দিয়ে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করবেন।[৬৬] এপ্রিলের শুরু থেকে পুরো

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় পর্যন্ত আমাদের ঘরটি ছিল শরণার্থীদের জন্য উন্মুক্ত। প্রতিদিন গড়ে ১০০-১৫০ লোক আহার করেছে আমাদের ঘরে। অনেকে নিয়েছে আশ্রয়।

যারা অবরুদ্ধ বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে শরণার্থী হয়েছেন তাদের পথের সেই কষ্ট বোঝা যায় একাত্তরের অন্যতম বন্ধু দীপ্তিরায় চৌধুরীর বর্ণনায়, 'আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল ওদের খাওয়াটা দেখে যে মানুষ কতোখানি ক্ষুধার্ত হলে এ রকম ভিজে চিড়ে শুধু চিনি দিয়ে খেতে পারে।[৬৭] বিলোনিয়ার বর্ডার চেকপোস্ট ঘেষে বাড়ি দুলাল মহাজনের। পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রামে আদি নিবাস। চল্লিশের দশকে বিলোনিয়া এসে বসতি গড়েছে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে দুলাল মহাজনের পূর্বপুরুষের ভিটা থেকে আত্মীয় পরিচিত ৪টি পরিবারের ২৫ জন লোক তার বাড়িতে আশ্রয় নেয়।[৬৮] সীমান্তের প্রান্তিক এই পরিবারটি সর্বস্ব নিয়ে পাশে এসে সহায়তা করে এই ৪টি পরিবারকে।

আউয়াল, রমজান কিংবা বাবুলদের মত শত শত লোক ত্রিপুরায়। যাদের হাত ধরে একাত্তরে বাংলাদেশের প্রায় পনের লক্ষ শরণার্থী ত্রিপুরায় আশ্রয় পেয়েছিল। ত্রিপুরার রাজ্য সরকার কিংবা ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার একসময় শরণার্থীদের পাশে এসেছে, সরকারি ভাবে রেশন দিয়েছে, ক্যাম্প করে দিয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের সম্মিলিত সাহায্য ছাড়া এত বেশি শরণার্থীকে সামাল দিতে পারতেন না সরকার। ১৮ জুন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ বলছিলেন, এখনো শিবির বহির্ভূত শরণার্থীর সংখ্যা ৪০ ভাগ। যারা বিভিন্ন আত্মীয় স্বজন, সাধারণ মানুষ অনেকের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে।

সরকার আগস্ট সেপ্টেম্বর মাসে এসে শিবির বহির্ভূত শরণার্থীদেরও রেশন দেয়া শুরু করে। ধর্মনগরের কৃষক যতীন বালা বলছিলেন, আমার বাড়িতে ২টি পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের আমি ক্যাম্পে উঠতে দেইনি, রেশন কার্ড নিতে বারণ করেছি। তারা আমার অতিথি। রেশন কার্ড নেয়া, ক্যাম্পে থাকা আমার আত্মসম্মানবোধে আঘাত মনে হয়েছে।[৬৯]

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম সীমান্তবর্তী ত্রিপুরায় প্রায় পনের লক্ষ জনগণের সহায়তার এক অনন্য ইতিহাস। তাদের সহমর্মিতা, সহায়তা ছাড়া একাত্তরে আমাদের প্রায় পনের লক্ষ লোকের সেখানে আশ্রয় সম্ভব ছিলনা। যে যেভাবে পেরেছে, সহায়তা করেছে। ত্রিপুরার মতো একটি ছোট, গরীব রাজ্য হাসিমুখে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের জন্য খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে। স্থানীয়রা ভাগাভাগি করে খেয়েছে শরণার্থীদের সাথে।[৭০] কেউ দিয়েছেন আশ্রয়, কেউবা অংশ নিয়েছেন শরণার্থী ত্রাণে। কেউবা পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন অসুস্থ শরণার্থীদের পাশে।

খ. রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি

ত্রিপুরার সাধারণ জনগণ একদিকে যেমন শরণার্থীদের আশ্রয় ও আহার দিয়েছেন, অন্যদিকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে নানাভাবে চাপ প্রয়োগ করেছেন স্বাধীন বাংলা সরকারকে স্বীকৃতি দান ও সর্ব প্রকার সাহায্য দানের জন্য। মূলত বাংলাদেশের সমর্থনে ১৯৭১ এর মার্চ মাসের শুরু থেকে ত্রিপুরায় মিছিল সমাবেশ শুরু হয়। ৮ মার্চ ১৯৭১ সোনামুড়া মহকুমা শহরে স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তানের গণআন্দোলনের সমর্থনে একটি মিছিল বের হয়। সেই মিছিল থেকে ১১ মার্চ সর্বদলীয় জনসভা অনুষ্ঠানের কর্মসূচি ঘোষিত হয়।[৭১]

২৫ মার্চের গণহত্যার প্রতিবাদে ২৬ মার্চ আগরতলার এম বি বি কলেজের ছাত্ররা মিছিল বের করে।[৭২] মিছিল শেষে এক প্রতিবাদ সভায় ছাত্ররা পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার বর্ণনা তুলে ধরে নির্যাতিত বাঙালির পাশে থাকার ঘোষণা দেন। স্বাধীন বাংলা সরকারকে স্বীকৃতি দান ও সব ধরণের সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের জন্য ভারত সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২ এপ্রিল সকাল ছয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত বার ঘন্টা বিভিন্ন ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনের ত্রিপুরা বনধের ডাক দেয়। ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন, জাতীয় ছাত্র পরিষদ ও ছাত্র পরিষদ এই ত্রিপুরা বনধকে সমর্থন জানিয়েছেন।

...আগামীকাল সকাল ছয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত বার ঘন্টার ত্রিপুরা বনধের ডাক দিয়েছেন বিভিন্ন ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠন। পূর্ব বাংলার মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে এবং ইয়াহিয়ার নয়া নাজী বাহিনীর নির্বিচার গণহত্যার প্রতিবাদে এই বনধ আহুত হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় জাতীয় ছাত্র পরিষদ ও ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে পৃথক পৃথক বিবৃতিতে আগামীকালের ত্রিপুরা বনধকে সমর্থন জানিয়েছেন।....[৭৩]

এই বনধে সকাল ছয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত রাজধানী আগরতলার জনজীবন ছিল সম্পূর্ণ স্তব্ধ। যানবাহন, দোকান পাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস কাছারী সর্বত্রই স্বতঃস্ফূর্ত নীরবতা। বিধানসভার সদস্যরাও বনধের সমর্থনে এই দিন বিধানসভায় আসেনি। সিনেমা হলের কর্মীরা পূর্ব বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে ও সামরিক নৃশংসতার প্রতিবাদে এই দিন বনধ পালন করেন। ফলে তিনটি ছবিঘর ছিল সম্পূর্ণ স্তব্ধ। আগরতলায় এই দিন রিক্সা পযর্ন্ত চলাচল করেনি।[৭৪] আগরতলার পাশাপাশি এই দিন ধর্মনগর, সোনামুড়া, খোয়াই ও বিশালগড়ে বনধ পালিত হয়েছে। বাংলাদেশকে সাহায্য ও স্বীকৃতি প্রদানের জন্য রাজধানী আগরতলার পাশাপাশি এই সময় ত্রিপুরার অন্য শহরগুলোতেও বনধ

পালনের খবর পাওয়া যায়। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামীদের উপর হানাদার বাহিনীর নির্বিচার হামলার প্রতিবাদের এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে ২৯ মার্চ ধর্মনগরে ১২ ঘন্টার হরতাল পালন করা হয়েছে। এই হরতালের আহবায়ক ছিলের ধর্মনগরের ছাত্রসমাজ। হরতালে সমর্থন দিয়েছে ধর্মনগর মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন, মোটর ওয়াকার্স ইউনিয়ন প্রভৃতি সংগঠন।[৭৫] ৩০ মার্চ পূর্ব বাংলায় সামরিক বাহিনীর বর্বর গণহত্যার প্রতিবাদে ও মুক্তিসংগ্রামের সমর্থনে আগরতলা শহরের কাছে চম্পকনগর, কাশীপুর, রানীবাজার, মোহনপুর, জিরানীয়া, তেলিয়ামুড়া ও কল্যাণপুরে ২৪ ঘন্টা হরতাল পালিত হয়েছে।[৭৬] ৩১ মার্চ পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামীদের সমর্থনে ও বাংলাদেশে সামরিক বাহিনীর নির্বিচার গণহত্যার প্রতিবাদে বিশালগড় বন্‌ধ পালিত হয়েছে। বিকালে একটি বিশাল জনসভাও অনুষ্ঠিত হয়। বিশালগড়ের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার বিপুল সংখ্যক মানুষ এতে যোগ দেন।[৭৭]

১১ এপ্রিল মনুভ্যালি, মাছমারা, কলসী,এলাকায় বনধ পালিত হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ ও শরণার্থীদের সেবায় রাজ্যবাসীকে সম্পৃক্ত করার জন্য ত্রিপুরায় প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন ছাত্র, শ্রমিক, পেশাজীবী সংগঠন কিংবা পাড়ার যুবকদের নেতৃত্বে মিছিল বের হয়। এসব মিছিলে এসব সংগঠনের লোকজনের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ যোগ দিতেন। ২৮ মার্চ সন্ধ্যায় 'চিত্তরঞ্জন রোডের যুবকবৃন্দের' উদ্যোগে পূর্ব বাংলার মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়ে এক মশাল মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। যুবকবৃন্দ এক বিবৃতিতে শেখ মুজিবর রহমানকে 'বিশ্বের রাজনৈতিক আকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিস্ক' ও চলমান সংগ্রামকে 'বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ' আখ্যা দিয়ে বলেছেন, কোন রাজনৈতিক দলের আদেশে নয় স্বেচ্ছায় পূর্ব বাংলার মুক্তি সংগ্রামে তাদের সমর্থন জানাতে এই মশাল মিছিল।[৭৮]

২৯ মার্চ পূর্ব বাংলার গণ মুক্তিফৌজের প্রতি সমর্থন জানিয়ে রাজধানীর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কর্মচারী, শিক্ষক, ছাত্র, যুবকসহ বিপুল জনতার এক মিছিল বের হয় পোস্টাপিস চৌমুহনী থেকে। ৬ই ফেব্রুয়ারী কমিটির আহবানে এই মিছিল আগরতলার গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে আবার পোষ্টাপিস চৌমুহনীতে গিয়ে শেষ হয়।[৭৯]

৪ এপ্রিল স্বাধীন বাংলার সমর্থনে বোধজং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ছাত্রদের এক বিরাট মিছিল শহরের প্রধান প্রধান পথগুলি প্রদক্ষিণ করেন। এই মিছিলে বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করার ও

বাংলাদেশকে সাহায্য দেবার জন্যও আবেদন জানানো হয়। উক্ত মিছিলে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ও শেখ মুজিবরের প্রতিকৃতি বহন করা হয়। এবং মিছিল শেষে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ' আমার সোনার বাংলা' গানটি গেয়ে শোনানো হয়।[৮০]

এছাড়া স্থানীয়ভাবেও বের হয়েছে বেশ কিছু মিছিল। ২৭ শে মার্চ বিশালগড়ে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে ২টি বিশাল মিছিল বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মিছিল শেষে ভুট্টো ও ইয়াহিয়ার কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। [৮১] এ সকল মিছিলে ধ্বনিত হয়েছে পূর্ববঙ্গের প্রতি ত্রিপুরার তৃণমূল মানুষের আকুণ্ঠ ভালোবাসা।এই সময় বেশ কিছু সভা-সমাবেশের আয়োজন করা হয়। যেগুলোতে শরণার্থীদের সেবায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিক সক্রিয় হতে অনুরোধ জানানো হয়। বাংলাদেশকে স্বাধীন সরকারকে স্বীকৃতির প্রশ্ন এগুলোতে উঠে আসে।

৩০ মার্চ আগরতলার অভয়নগর উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র সংসদ এক সভায় পূর্ব বাংলার মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়ে স্বাধীন বাংলা সরকারকে স্বীকৃতি দেবার জন্য ভারত সরকারের কাছে দাবি জানান।

১ এপ্রিল ত্রিপুরার কলেজ শিক্ষক সমিতি অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করেন। বাংলার মুক্তি সংগ্রামের স্বপক্ষে এই সময় স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস বর্জন শুরু করে।

৩০ মার্চ বাংলার মুক্তি সংগ্রামের স্বপক্ষে মহারাজা বীর বিক্রম সান্ধ্য কলেজের ছাত্ররা ক্লাশ বর্জন করে এবং পরে কলেজে এক বিশাল সভায় মিলিত হয়। সভায় ৩৪ জন সদস্য নিয়ে বীর বিক্রম সান্ধ্য কলেজ সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়।

.. বীর বিক্রয় সান্ধ্য কলেজের ছাত্ররা বাঙলার মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে ক্লাশ বর্জন করে এবং পরে কলেজে এক বিশাল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বীর বিক্রম সান্ধ্য কলেজ সংগ্রাম কমিটি ৩৪ জনকে নিয়ে গঠিত হয়। উক্ত সভায় যুক্ত আহবায়ক শ্রী তপন দত্ত ও প্রভাষ কান্তি রায় নির্বাচিত হয়।... বাঙলার সমর্থনে ও ২রা এপ্রিলের হরতালকে সার্থক করার জন্য ডাক দেয় এবং মিছিল করে শহর পরিক্রমা করে।[৮২]

২ আগস্ট বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের দাবিতে আগরতলার বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। মিছিল ও সমাবেশের মধ্য দিয়ে এদিন তারা বাংলাদেশ দিবস পালন করেন। বোধজং স্কুলের পক্ষে তপর কুমার রায় এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন উল্লিখিত দাবির প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন থাকায় তারা ক্লাস বর্জন করেছেন।[৮৩]

আকাশবাণীতে মুক্তিবাহিনীর আরো গুরুত্ব সহকারে সংবাদ প্রচার ও গণতন্ত্র রক্ষায় নৈতিক দায়িত্ব পালনের আহবান জানিয়ে ২৮ মার্চ ত্রিপুরার শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র ও বিভিন্ন সংগঠন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে তার বার্তা প্রেরণ করে।...ত্রিপুরার শিল্পী, সাহিত্যিক, কর্মরত সাংবাদিক, গণতান্ত্রিক সংস্থা ও ছাত্র সংস্থার পক্ষ থেকে যুক্ত এক বেতার বার্তায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আকাশবাণী থেকে বাংলার মুক্তি বাহিনীর সংবাদ ঘোষণার আরো গুরুত্ব দেবার আহবান জানানো হয়েছে।...তারবার্তায় আকাশবাণীর আগরতলা, কলকাতা, গৌহাটি, শিলিগুড়ি কেন্দ্র থেকে স্বদেশী সঙ্গীত প্রচারের সময় বাড়ানোর দাবিও করা হয়েছে।[৮৪]

২৯ মার্চ ত্রিপুরার উপজাতি যুব সমিতি, ১ এপ্রিল ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ, ৫ এপ্রিল বেসরকারি শিক্ষক সমিতি, বিবেকানন্দ ক্লাব, ৮ এপ্রিল রামঠাকুর কলেজ ছাত্র সংসদ বাংলা সরকারকে স্বীকৃতি দান ও সর্বপ্রকার সাহায্য দানের জন্য ভারত সরকারের কাছে দাবি জানান। একই দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে ৯ এপ্রিল ত্রিপুরা স'মিল শ্রমিক কল্যাণ সংস্থা, কুমারঘাট ইস্টবেঙ্গল রিলিফ সোসাইটি সারা ভারত মহিলা সংঘের কুঞ্জবন শাখা পৃথক বিবৃতি দেন। ৩০ মার্চ ধলেশ্বরের ভারত তীর্থ ক্লাব একই দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এক গণডেপুটেশন দিয়েছেন।

৩১ মার্চ ফটিক রায় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মচারিবৃন্দ এক সভায় মিলিত হয়ে বাংলাদেশের ইয়াহিয়ার বর্বরোচিত আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন। তারা ভারত সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন যে ভার সরকার বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে সর্বতোভাবে যেন এগিয়ে আসেন।[৮৫]

৬ এপ্রিল ত্রিপুরা লেখক সমিতি, ত্রিপুরা গ্রেজুয়েট অ্যাসোসিয়েশন বাংলায় বর্বরোচিত পাকিস্তানি হামলার নিন্দা জানায়। ১৬ এপ্রিল ধর্মনগর কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এক সভায় ধর্মনগর কৃষক সমাজ বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার আবেদন জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে স্মারকলিপি দেন।[৮৬]

অবিলম্বে ভারত সরকার কতৃক বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি প্রদানের দাবিতে ১১ জুন কয়েকশ রিক্সা শ্রমিক উদয়পুরে মিছিল করেন।[৮৭] মিছিল পূর্ব সমাবেশে তারা অবিলম্বে বাংলাদেশকে সব ধরনের সহযোগিতা করার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করেন।

৯ এপ্রিল আগরতলা তরুণ চিত্রশিল্পী প্রভাত সেন পাকিস্তানি সামাজ্যবাদী হামলার নিন্দা জানিয়ে ২২টি কার্টুনের একক চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করেন।[৮৮] ছাত্র-জনতা, কৃষক, শ্রমিক, মজুর, শিল্প, সাহিত্যিক ইত্যাদি নানা শ্রেণী পেশার তৃণমূল মানুষের এসব মিছিল, সমাবেশ, বক্তৃতা, বিবৃতি, নিন্দা রাজ্য সরকারকে বাধ্য করে কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ দিতে। তৃণমূল জনতার এই দাবি-দাওয়ার কারণে বিধান

সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার অনুরোধ জানান। সেই থেকে তাদের আশ্রয়সহ সর্বপ্রকার সহায়তার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে বিধান সভায় পাস হয়।[৮৯] অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের সামনেও এই তৃণমূল জনতার চাপকে অগ্রাহ্য করার সুযোগ ছিল না।

বাংলা সরকারকে স্বীকৃতি ও সর্বাত্মক সহযোগিতা উঠে আসে পত্রিকার সম্পাদকীতে। 'আমরা ভারত সরকারকে আহবান জানাব স্বীকৃতি দিন, সাহায্য করুন, মানুষকে বাঁচাবার জন্য, ভাইকে বাঁচাবার জন্য যদি অস্ত্র ঝলসে না উঠে তবে ইতিহাস ভবিষ্যতে ভারতীয় জনতাকে লজ্জিত করবে।

ভারতবর্ষের জনতার প্রতিনিধি হিসেবে সরকার যদি নাজীবাদকে ঘৃণা করেন, রোডেশিয়ার জন্য যদি জাতিসঙ্ঘে কথা বলেন, কঙ্গোর গৃহযুদ্ধে যদি হস্তক্ষেপ করেন, কোরিয়ার মুক্তিযুদ্ধে যদি এগিয়ে যেতে পারে, ইন্দোনেশিয়ার মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় জোয়ান যদি রক্ত দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারেন-তবে আজ ঐ নিরস্ত্র সংস্কৃতিবান স্বাধীনতাকামী জনতার পাশে দাঁড়াতে কিসের বাধা?

আমরা এই দাবি শুধুমাত্র বাঙালি হিসেবে করছি না, করছি একটি মহান জাতির প্রতিনিধি হিসেবে। ভারতীয় সভ্যতার সৃষ্টি লগ্ন থেকে বিপন্নের পাশে দাঁড়ানো তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব। তবু বাংলার এই ক্রান্তিলগ্নে, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রার্থনা করা হচ্ছে-স্বীকৃতি চাই-সাহায্য চাই-অস্ত্র চাই। আমরা স্বাধীন জাতির চেতনা নিয়ে ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস নিয়ে ঐ লোকসভার মন্ত্রীবর্গকে আহবান জানাব জনতার ইচ্ছাকে পূরণ করুণ স্বাধীনতার পতাকাকে সম্মান করুন, শোষণের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা করুন। নচেত সচেতন ভারতীয় জনতা অপেক্ষা না করে দায়িত্ব তুলে নেবে কেননা এটা ইতিহাসের দাবি।'[৯০]

এর পরে বাংলাদেশ স্বীকৃতি প্রদান ও সহায়তার দাবি জানিয়ে সংবাদ পত্রিকায় আরো প্রায় ৫০টি সম্পাদকীয় ছেপেছে। পাশাপাশি *জাগরণ, ত্রিপুরা দর্পণ* ও এই দাবিতে সরকার ও রাজ্য সরকার কে দৃষ্টি আকষর্ণ করে সম্পাদকীয় ছেপেছে।

৩ মে আগরতলার পোস্ট অফিস চৌমুহনীতে ত্রিপুরার শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা একত্র হয় সংহতি সমাবেশে। তড়িগড়ি করে তারা মুজিবের একটি প্রতিকৃতি তৈরি করেন।[৯১] মুজিবের মুক্তির দাবি জানিয়ে এই সভায় ইন্দিরা গান্ধীর হস্তক্ষেপ কামনা করা হয। খোয়াই লেখক শিল্পসংস্থা বাংলাদেশ সরকারের স্মীকৃতি দেয়ার দাবিতে ৮ মে শহরে মৌন মিছিল বের করে। এতে শতাধিক স্থানীয় লেখক, শিল্পী ও সাধারণ জনতা যোগ দেয়। মিছিল শেষে সংগঠনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে দ্রুত স্বীকৃতি দেয়ার দাবি জানিয়ে রাষ্ট্রপতিকে স্মারকলিপি দেয়া হয়। স্মারকলিপিটি গ্রহণ করেন স্থানীয় মহকুমা প্রশাসন। [৯২]

কেন্দ্রীয় বেকার সমন্বয় পরিষদ সরকারকে স্মারকলিপি দেয় অবিলম্বে মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক সহায়তা দিতে। শুরু থেকেই বাংলাদেশের সমর্থনে ত্রিপুরায় অন্যধরনের জাগরণের সৃষ্টি হয়। সাধারণ মানুষ পাশে এসে দাঁড়ায় বাংলা ও বাঙালির। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি, শরণার্থীদের আশ্রয়-আহার, মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা, প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে ত্রিপুরা। সাধারণের এই আবেগ স্বভাবতই প্রভাবিত করে ত্রিপুরা রাজ্য সরকারকে। ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ নিজেই ছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধের অন্যতম সমর্থক। ২৯ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান ইস্যু বিধান সভায় আলোচনায় ওঠে।

মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় ‘The present situation in East Pakistan’ শীর্ষক বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি বলেন, ‘Our heart goes out in sympathy for the people of East Pakistan at this hour of trial... I may reiterate that stand for democracy and socialism and we shall condemn any forces that stand in the way of these noble ideals in any part of the world’. সরকার ও বিরোধী দলের পনের জন বিধায়ক এই বিবৃতির ওপর আলোচনায় অংশ নেন। [৯৩]

এ-বিষয়ে সরকারি দলের সদস্যদের বক্তব্য ছিল এরূপ, পূর্ববাংলায় আজ যারা নিহত হচ্ছে, তারা আমাদেরই ভাই-বোন, আমাদেরই আত্মীয়। এই নিরস্ত্র জাতির ওপর সামরিক শক্তি বেয়নেট চালিয়েছে, এমনকি রাস্তায় রাস্তায় ট্যাঙ্ক পর্যন্ত নামিয়েছে এসব নিরস্ত্র জনসাধারণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে দমানোর জন্য। আমরা ত্রিপুরাবাসী তাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য হয়ে এসব দেখে নীরব দর্শকের ভূমিকায় বসে থাকতে পারি না। আমাদের উচিত এই হত্যালীলা ও নির্যাতন বন্ধ করার জন্য একটা ভূমিকা অবিলম্বে অবলম্বন করা। আমরা এই সভার মাধ্যমে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই অনুরোধ জানাব, পূর্ববাংলায় যা ঘটছে যে অন্যায় অবিচার, হত্যার রাজত্ব চলছে, সেখান থেকে প্রতিনিয়ত এই সব দুঃখ দুর্দশা ভোগ করে যেভাবে লোকজন তাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য চেষ্টা আমাদের রাজ্যে আসছে, সে সম্পর্কে যেন তাঁরা রাষ্ট্রসংঘকে অবহিত করেন এবং তার একটা প্রতিকরের ব্যবস্থা করেন।

বিরোধী দলের সদস্যদের বক্তব্যেও ছিল অনুরূপ, আজ গণতান্ত্রিক সাধারণ মানুষকে যেভাবে হত্যা করে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়ার যে অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে, তাকে প্রতিহত করার জন্য ত্রিপুরার জনসাধারণের তথা গোটা ভারতবর্ষ, এমনকি গোটা বিশ্বের শান্তিকামী স্বাধীনতাকামী জনগণ উঠে দাঁড়াবে এবং সবাই পূর্ব বাংলার মানুষের এই আন্দোলনকে তাদের সংগ্রামকে সমর্থন জানাবে। ত্রিপুরা বিধারসভার মাধ্যমে

এই দৃঢ় আশা ও প্রত্যয় অত্যাচারের হাত থেকে তাদের অবশ্যই জয়ের লক্ষে পৌছবে। ত্রিপুরাবাসী তথা ভারতবাসী পূর্ববাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পাশ দাঁড়িয়ে এই ঘোষণা করতে চায়, ভারত সরকার রাষ্ট্রসংঘের কাছে পূর্ব বাংলার মানুষ যে শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে তা যেন তুলে ধরেন এবং তা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এ আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট যে, বিধানসভা সেদিন মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েছিল। আর বিধানসভাকে একাত্ম হতে বাধ্য করেছিল জনমত। পূর্ববাংলার মুক্তিকামী জনগণকে তারা নিজেদের মানুষ ভাবছে এবং পূর্ববাংলায় গণহত্যা বন্ধ করার জন্য উদ্যোগী হওয়ার কথা বলছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে এই মর্মে আহবান জানানো হয়, তারা যেন জাতিসংঘের কাছে এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন। একই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন জানিয়ে তাদের পাশে দাড়ানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। বিধানসভার এই দৃষ্টিভঙ্গি মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস অক্ষুন্ন ছিল।

৩১ মার্চ বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী হাউসে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করে নবগঠিত বাংলাদেশ সরকাকে স্বীকৃতি প্রদান এবং বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনগণকে সাহায্যের জন্য ভারতে সরকারকে অনুরোধ জনান। একই সঙ্গে ইতোমধ্যে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাদের স্মরণ করেন। সরকার ও বিরোধী দলের সমস্ত বিধায়ক প্রস্তাবটির পক্ষে সমর্থনসূচক বক্তব্য রাখেন। এভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ত্রিপুরা বিধানসভা শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে।[৯৪]

শরণার্থী সমস্যার সঙ্গে ভারতীয় রাজনীতির টানাপোড়েনও চলছিল সমানতালে। শরণার্থী বিষয়ে সরকারি নীতির সমালোচনা করে সিপিএম নেতা দশরথ দেব বলেন, কেবলমাত্র রেজুলেশন গ্রহণ করে বা বাংলাদেশের নিপীড়িত জনতার প্রতি আমাদের সহানুভূতি জানিয়ে এবং ইয়াহিয়ার বর্বরতাকে নিন্দা জানিয়ে বাংলাদেশে শরণার্থীদের ফিরে যাবার মতো পরিবেশ তৈরি করা যাবে না। বাংলাদেশের মাটি থেকে পাক সেনাবাহিনীকে কার্যকরভাবে বিতাড়নের জন্য আমার আবেদন হলো মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বস্তুগত সহায়তা প্রদান করতে হবে অবশ্যই, যাতে করে তাদের আঘাতের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় বহুগুণে, নতুনবা এই সহানুভূতির বাণী কোন সমাধান দেবে না।[৯৫] শরণার্থী সমস্যা সম্পর্কে এ বক্তব্য নতুন নয়। বিরোধী দলসমূহ নয়মাস অনুরূপ বক্তব্য দিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় রাজ্য সরকার শরণার্থী সমস্যা সমাধানে আন্তরিক ভূমিকা পালন করেছে। শরণার্থীদের থাকার জন্য আগরতলাসহ সমগ্র ত্রিপুরায় প্রায় ৩৫ থেকে ৪০টির মতো শিবির গড়ে তোলা হয়। এসব শিবির প্রায় চারশ ইউনিটে ভাগ করে ত্রিপুরার ত্রাণ দপ্তরের হাতে তুলে দেয়া হল। আনুমানিক

প্রায় ৭ লক্ষ শরণার্থীর সুচিকিৎসার জন্য পদস্থ অফিসার ও সহকর্মীরা সদা ব্যস্ত ছিলেন। ব্যক্তিগত ব্যবস্থায় আরো ৮ থেকে ৯ লাখ শরণার্থী আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁদের পরিচিত আস্তানায়। আগরতলা নিকটবর্তী নরসিংগড়, মোহনপুর, মনতলা, বাবুটিয়া, বেলতলী, গকুলনগর, কোনাবন, অরুন্ধতীনগর, ব্যাপটিস্ট, মিশন, ক্র্যাফট টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, এমবিবি কলেজের ২নং হোস্টেল, বিভিন্ন বিদ্যালয় ছাড়াও মফস্বলের অনেক স্থানে এসব শরণার্থীর আশ্রয়স্থল ছিল।[৯৬]

সীমান্তবর্তী শিবিরগুলোতে উপচানো ভীড়ে শরণার্থীদের আবাসনের ব্যবস্থা করা হয় বিভিন্ন স্কুল কলেজ। পরবর্তীকালে অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আর শিক্ষার্থীদের জন্য খুলে দেয়া সম্ভব হয়নি। মাসের পর মাস বন্ধ থেকেছে স্কুল-কলেজ। কর্তৃপক্ষ খোলার উদ্যোগ নিয়েছে শরণার্থীদের সরিয়ে দিয়ে। বাধা দিয়েছে অভিবাবকরা। এই বাস্তুচ্যুত মানুষগুলোকে আশ্রয়হীন সন্তানের পড়ালেখা অব্যাহত থাকুক তাঁরা চায়নি।[৯৭]

১৪ জুন উপরাজ্যপাল এ এল ডায়েস মধুপুর, উদয়পুর মহকুমার গর্জি ও চন্দ্রপুর শরণার্থী শিবির পরিদর্শনকালে শরণার্থীদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। উপরাজ্যপাল প্রত্যেক শিবিরে শরণার্থীদের সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে এবং রেশন বন্টনে শিবির পরিচালকদের সহায়তা করতে আহ্বান জানান। উপরাজ্যপাল অনুরোধ করেন শিবিরের শিক্ষিত শরণার্থীরা যেন ক্যাম্পের শিশুদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করেন। পরিচালকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, তারা যেন নিষ্ঠার সঙ্গে শিবির পরিচালনা করেন এবং শরণার্থীদের অভাব দূরীকরণে সর্বপ্রকার সাহায্য করেন।[৯৮] ২৫ জুন বিধানসভায় বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরায় আগত শরণার্থীদের ভারতের অন্যান্য প্রদেশে স্থানান্তর ও শরণার্থীদের সমস্ত দায়-দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রহণ করার অনুরোধ জানিয়ে বেসরকারি প্রস্তাব গৃহিত হয়। আলোচনায় অংশ নিয়ে সরকার ও বিরোধী পক্ষের সকল সদস্যই এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন, শরণার্থীদের বিভিন্ন রাজ্যে পাঠিয়ে দিয়ে ত্রিপুরার দুর্বল অর্থনীতিকে বাঁচাতে হবে।[৯৯]

মূলত মার্চের শুরু থেকে পূর্ব পাকিস্তানের সমর্থনে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষজনের যে আবেগ কাজ করছিল, সেই আবেগের সম্মিলনে গড়ে ওঠে ব্যাপক জনমতের। সেই জনমত দ্বারা প্রভাবিত হয় ত্রিপুরা রাজ্য সরকার। শুরু থেকেই সীমিত সামর্থ ও সাধারণ মানুষজনকে নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে শরণার্থী ত্রাণে। রাজ্য সরকার একদিকে আগত বিপুল সংখ্যক শরণার্থীকে আশ্রয়, আহার ও সেবা দিয়েছে, আবার অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং ব্যবস্থা করেছে বাংলাদেশের সমর্থনে।

১৫ মে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আগরতলায় এসে ঘোষণা দেন, বাংলাদেশের জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই করা হবে। তিনি শরণার্থী ক্যাম্পগুলো পরিদর্শন করেন। শরণার্থীদের সেবায় সাধারণের ভূমিকার প্রশংসা

করেন। ইন্দিরা গান্ধী ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী নন্দিনী সৎপতি, ত্রিগুনা সেন, জগজীবন রাম, মৈমনুল হকসহ আরো অনেকেই ত্রিপুরা পরিদর্শন করে সতর্ক দৃষ্টি রাখছিল পূর্ববঙ্গ পরিস্থিতি ও শরণার্থী ব্যবস্থাপনা নিয়ে।

একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সম্বল ত্রিপুরার সাধারণ মানুষজনের ভালবাসা। সাধারণের অকৃত্রিম ভালবাসা, মিছিল-মিটিংয়ে ত্রিপুরা হয়ে ওঠেছিল মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম একটি রণাঙ্গনে।

ফজলুল বারী লিখেছেন, 'একাত্তরের সেই শহরের মানুষের অবদান এত বেশি, সেখানকার সহযোগিতা, ইতিহাসের ক্যানভাস এত ব্যাপক বিস্তৃত যে আমাদের স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে লিখতে হলে বারবার সেখানে যেতে হবে'।[১০০]

পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী বঙ্গবন্ধুর মুক্তি চেয়ে একাত্তরে প্রায় প্রত্যেকদিন মিছিল হয়েছে ত্রিপুরায়। সাব্রুম সীমান্তে একাত্তরে সংগঠকের ভূমিকায় ছিল রনজিৎ দাস, বলছিলেন সেই সময়ের কথা, 'আমরা যখনি শুনলাম মুজিবকে পাকিস্তানে ধরে নিয়ে গেছে, রাস্তায় নেমেছি, মুক্তি চেয়েছি মুজিবের। সাব্রুম মহকুমায় একাত্তরে নয় মাসে প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় তরুণ-যুবকরা মিছিল করেছে। স্লোগান দিয়েছে পাক জুন্টার হাত থেকে মুজিবের মুক্তি চেয়ে। আমরা ইন্দিরাজিকে চিঠি লিখেছি মুজিবকে মুক্তির আবেদন জানিয়ে'।[১০১]

সাধারণ জনগণের মনে যে ভালবাসা সঞ্চারিত হয়েছিল সেটার প্রভাবে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার ও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার একাত্তরে সর্ব্বোর্চ সেবা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল বাংলা ও বাঙালির পাশে। পরিণত হয়েছে মুক্তিসংগ্রামে আমাদের অন্যতম বন্ধুতে। শুরুতে সাধারণের দাবি ছিল সীমান্ত উন্মুক্ত করে দিয়ে শরণার্থী সেবায় রাষ্ট্রের ও রাজ্যের সম্পৃক্ততা। এরপর তারা দাবি জানাতে লাগল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়ে। একসময় জনগণ দাবি করতে শুরু করল ভারত কেন অস্ত্র সরবরাহ করছে না। সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত ভারত সরাসরি রণাঙ্গনের যুদ্ধে অংশ নিয়ে জনচাহিদা পূরণ করে।

গ. আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টির প্রয়াস

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরার তৃণমূল মানুষের সম্পৃক্ততা আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ত্রিপুরাবাসী রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ প্রয়োগের পাশাপাশি বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর গণহত্যা ও শরণার্থীদের জন্য আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টিতে সহায়তা করেন। ত্রিপুরার তৃণমূল মানুষের কল্যাণে বাংলার মুক্তিযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে।

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর গণহত্যা বন্ধ করতে জাতিসংঘ মহাসচিব উথান্টের হস্তক্ষেপ কামনা করে ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে ২৭ মার্চ একটি তার বার্তা পাঠানো হয়।

...ত্রিপুরা রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্টের কাছে এক তারবার্তায় পূর্ব বাংলার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং সামরিক বাহিনী নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের উপর ট্যাঙ্ক এবং আকাশ থেকে বোমা নিক্ষেপ করে যে গণহত্যায় মেতেছেন, অবিলম্বে তা বন্ধ করতে সেক্রেটারী জেনারেলের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন।[১০২]

১৪ এপ্রিল ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় স্বাধীন বাংলা সাহায্য সমিতির পক্ষ থেকে ভারতসহ রাশিয়া, আমেরিকা, সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুগোশ্লাভাকিয়া এই ৫টি দেশের রাষ্ট্র প্রধানের কাছে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানের দাবি জানিয়ে তার বার্তা পাঠানো হয়।[১০৩]

এই সময় ত্রিপুরার অধিকাংশ স্থানীয় সংবাদপত্র আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিবন্ধ সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ছেপেছে। আমরা সেই মহান রাশিয়া, চীন, অন্যান্য স্বাধীনতাকামী দেশগুলির দিকে তাকিয়ে আছি। আজ ঐ বাংলার একই বাতাসে নিঃশ্বাসবাহী, একই সভ্যতার অংশীদারী, একই ভাষা, ভাবনা, সংস্কৃতির ধারক বাহক হিসেবে মানবতার নামে, গণতন্ত্রের নামে সভ্যতার নামে দাবি করব ঐ দেব শিশুকে স্বীকৃতি দিন। আন্তর্জাতিক সভ্যতার নিয়ম লজ্ঘন করে পরদেশী পাকিস্তানি সেনারা নির্বিচারে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বাঙালির রক্তে হোলি খেলছে- আর আন্তর্জাতিক জাতিসংঘের প্রাসাদ সাজিয়ে বসে থাকার অর্থ কি? [১০৪]

জাতিসংঘ ও প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলোর হস্তক্ষেপ কামনার পাশাপাশি বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষের সহায়তাও চেয়েছেন ত্রিপুরার তৃণমূল জনতা। ২৭ এপ্রিল ১৯৭১ সালে ত্রিপুরার লেখক ও বুদ্ধিজীবী সমাজের পক্ষ থেকে এক আহবানে বলা হয়-

‘বাংলাদেশ আজ মানবতা বিপন্ন। সমগ্র বিশ্বাসের চেতনার ভিত্তিমূল ধরে টান দিয়েছে বর্বর পাক সরকার। এই গণহত্যাকারী সরকারের বিরুদ্ধে বিশ্বের সমস্ত কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী সমাজ এগিয়ে আসুন।’[১০৫]

লেখক সংঘের সম্পাদক শ্রী ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য বলেছেন, ‘একদিন স্পেনের গৃহযুদ্ধের মানবতার জন্য বিশ্বের বিবেক যেমন একত্রিত হয়েছিলেন আজকে তেমনি বাংলাদেশের জন্য লেখক, কবি বুদ্ধিজীবীদের আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে তুলে এই প্রাগৈতিহাসিক আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে হবে’।[১০৬]

বাংলাদেশের সংবাদ সংগ্রহের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবাদকর্মীরা ত্রিপুরায় এসে ভীড় জমান। ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা পরিণত হয় বাংলার মুক্তিসংগ্রামের মিডিয়া সেন্টারে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সাংবাদিকরা আগরতলায় এসে ভীড় করেছেন। মূলত এখান থেকেই পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার সংবাদ, শরণার্থীদের মানবেতর জীবনের বর্ণনা ছড়িয়েছে বিশ্বব্যাপী।[১০৭]

শরণার্থীদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য মার্কিন সিনেট শরণার্থী সংক্রান্ত সাব কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে ১২ আগস্ট আগরতলা আসেন এডওয়ার্ড কেনেডি।

দৈনিক সংবাদের নিজস্ব প্রতিনিধি বিকচ চৌধুরী লিখছেন, এডওয়ার্ড কেনেডির আগরতলা সফর শরণার্থী শিবিরে-হাসপাতালে-পথের প্রান্তে সবত্রই দেখলেন লাঞ্ছিত মানুষ : শুনলেন করুণ কাহিনী

... মার্কিন দেশের সিনেটর কেনেডির আকস্মিক আগমনে আজ সারা শহরে দু'দেশের মানুষ উপছে পড়েছিল... কেনেডির চোখে মুখেও বেদনার ছাপ, কিছু করতে না পারার ক্ষোভে কিছুটা উত্তেজিত।[১০৮]

জনগণ তাঁকে বিপুল আনন্দে বরণ করে। তিনি পরিদর্শন করেন জিবি হাসপাতাল, মোহনপুর, গোকুলনগর শরণার্থী শিবির। কথা বলেন শরণার্থীদের সঙ্গে, বুঝতে চেষ্টা করেন বাস্তব অবস্থা। এ সম্পর্কে বিকচ চৌধুরী *দৈনিক সংবাদ*-এর ১৩ আগস্ট লিখেন, গভীর সহানুভূতি নিয়ে তিনি শরণার্থীদের কাছে এসেছেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চেয়েছেন কেন তারা এখানে এসেছে, তাদের কি অপরাধ ছিল, জানতে চেয়েছেন পাকিস্তানি সামরিক জান্তার বর্বরতার ভয়াবহ কাহিনী। গোবিন্দবল্লভ হাসপাতালে একেকটি রোগীর পাশে যাচ্ছেন, তন্ন তন্ন করে জিজ্ঞেস করেছেন তাদের আদি নিবাস কোথায় ছিল, করে তারা এসেছে, তাদের যন্ত্রণা কোথায়, তারা বাংলাদেশে ফিরে যেতে চায় কিনা। এমনি হঠাৎ করে এক বুলেটবিধ্বস্ত শিশুর পাশে এসে দাঁড়িয়ে এডওয়ার্ড কেনেডি যেন বাস্তব পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেলেন। যখন তিনি শুনতে পেলেন শিশুটি বুলেটবিদ্ধই নয় প্রোটিন ঘাটতির জন্যে তার দৃষ্টিশক্তিও হারিয়ে গেছে- কেনেডির কণ্ঠে তখন শুধু সীমতীত দুঃখব্যঞ্জত দুটো ধ্বনি শোনা গেল- অহ্ অহ্। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন, ছেলেটি কি দৃষ্টিশক্তি আর কোনোদিন ফিরে পাবে না? ডাক্তার কি বলেছেন তা জানি না তবে কেনেডিকে বলতে শুনলাম 'ওহ্ মাই গড'। .. তাঁর ক্লান্তিহীন পরিক্রমা পরম আপনজনের মত দ্বারে সস্নেহ জিজ্ঞাসা সকলকে অভিভূত করেছে।[১০৯]

এডওয়ার্ড কেনেডির এই সফর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৃণমূল জনগণের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বড় ধরণের জনমত তৈরিতে সহায়তা করে। এবং বেশ কিছু বেসরকারি সহায়তা প্রাপ্তি সম্ভব হয়।

২৫ আগস্ট বুদাপেস্ট থেকে বিশ্বশান্তি পরিষদের দু'জন প্রতিনিধি ইতালিয়ান আইনসভার সদস্য ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা কার্লো ইভলদি এবং লেবাননের তরুণ আইনজীবী ও সমাজকর্মী মহোমোদ টেব্বা ত্রিপুরায় আসেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে সংহতি ঘোষণা এবং শরণার্থী সমস্যা পর্যবেক্ষণই এ প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্য। তারা মোহনপুর ও মধুপুর শরণার্থী শিবিরে গেলে শরণার্থীরা তাদের বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানায়।[১১০]

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে বহু খ্যাতনামা সাংবাদিক ত্রিপুরায় এসেছেন সংবাদ সংগ্রহে, বাস্তব পরিস্থিতি অবলোকন করতে। তেমনি একজন সাংবাদিক, প্রাক্তন ব্রিটিশ লর্ড জন গ্রীন। তিনি শরণার্থী শিবিরে গিয়ে প্রত্যেকের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশে, কথা বলে, বুঝার চেষ্টা করেছেন তাদের মনের অবস্থা। এ পরিস্থিতি কেন উদ্ভব হলো, এজন্য দায়ী, এখানকার অবস্থা কী রকম ইত্যাদি জানার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি কলেছিলেন মুক্তিযুদ্ধকে। এক পর্যায়ে জন গ্রীন অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়েছিলেন, ২৮ অক্টোবর *দৈনিক সংবাদ* এর প্রতিবেদনে বলা হয়,

আশি বৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধ প্রায় উন্মাদের মতো বলছিলেন- এসেছো? দেখে যাও আমাদের অবস্থা। শুনে যাও আমার তিন ছেলে বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করছে। তুমি ফিরে গিয়ে বলো সবাইকে আমরা মরছি, মরতে মরতে বাঁচার চেষ্টা করছি। আমার ছেলেরা মরে গেলেও দুঃখ নেই। আমার নাতিরা স্বাধীন দেশে বাস করবে। তারপরেই বৃদ্ধ বলছিলেন- তোমরা তো সভ্য জাতি, পার না বর্বরতা দমাতে? তোমাদের সাথে লড়াই করে স্বাধীন হয়েছিলাম কি এমনিভাবে মরতে? বিব্রত জন গ্রীন ওই বৃদ্ধের আবেগমথিত প্রশ্নের সামনে অপ্রস্তুত হয়ে ক্রমাগতই বলতে চেষ্টা করছিলেন - আমি আমার দেশের সরকারের কেউ নই। বিশ্বাস করুন আমার দেশের সাধারণ মানুষ আপনাদের প্রতি সংবেদনশীল।.. আমি দেশে ফিরে গিয়ে আমার দেশবাসীর কাছে আপনাদের মনের কথা তুলে ধরবো।[১১১]

ফিরে গিয়ে শরণার্থী জীবন নিয়ে তাঁর মর্মস্পর্শী প্রতিবেদন উঠে এসেছে বিবিসিতে।[১১২]

বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতা বন্ধে আন্তর্জাতিক সহায়তা চেয়ে রাষ্ট্রসংঘের প্রধানের কাছে আবেদন করেন আগরতলার চিত্রশিল্পীরা। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের গণহত্যাকে তুলে ধরার জন্য ১৪-১৬ অক্টোবর তারা একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেন।[১১৩] যেখানে রং-তুলিতে ফুটিয়ে তোলা হয় গণহত্যা ও নারী নির্যাতনের নানা চিত্র। বিদেশী গণমাধ্যমের কল্যাণে সেগুলো ছড়িয়ে পড়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে। মুজিরের মুক্তির জন্য আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ চেয়ে মিছিল করেছে আগরতলা এমবিবি কলেজের ছাত্ররা।

১১ মে জাতিসংঘের উদ্বাস্তু ত্রাণ দপ্তরের প্রতিনিধি দল আসেন আগরতলায়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন ডেপুটি হাই কমিশনার চার্লস সেন, ডিরেক্টর অপারেশন টি. জনসন এবং আইন উপদেষ্টা মি. স্যুইস। তাঁরা উপরাজ্যপাল এ এল ডায়াসের সঙ্গে শরণার্থী ত্রাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।[১১৪] ২৮ মে ব্রিটিশ শ্রমিকদের নেতা মাইকেল বার্নস আগরতলা এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, পাক সামরিক সরকার পূর্ববাংলা থেকে সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত বিশ্ব রাষ্ট্রগুলির উচিত পাকিস্তাকে সব রকমের সাহায্য বন্ধ করে দেয়া। প্রসঙ্গত তিনি ব্রিটিশ বৈদেশিক উন্নয়ন মন্ত্রী রিচার্ড উডের সাম্প্রতিক বিবৃতির কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশ সমস্যার সঠিক রাজনৈতিক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তার সরকার পাকিস্তান সরকারকে সাহায্য বন্ধ রাখবে। সাংবাদিক সম্মেলনে বেসরকারি ত্রাণ প্রতিষ্ঠান ওয়ান অন ওয়ান্টস-এর সভাপতি চেসওয়ার্থ উপস্থিত ছিলেন।[১১৫]

জাতিসংঘের প্রতিনিধি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুধীজন, সাংবাদিক, রাজনীতিক প্রমুখের কথার মাধ্যমে যেভাবে জনমত ওঠেছিল, তা শুধু ত্রিপুরায় নয়, পুরো মুক্তিযুদ্ধকে বিশ্বমহলের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। সবার সামনে তুলে ধরেছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা, যা মুক্তিযুদ্ধের ইতিবাচক ভাবমূর্তি সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করেছিল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে ১৯৭১ সালে বিশ্বব্যাপী যে অভূতপূর্ব জনমত সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে ত্রিপুরার তৃণমূল সম্প্রদায়। মূলত এরাই বিশ্বব্যাপী তুলে ধরেছে বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর নিমর্মতা ও শরণার্থীদের দুঃসহ জীবন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কল্যানে আগরতলা ও পেয়েছিল আন্তর্জাতিক পরিচিতি। আগরতলা শহরের নাম ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বব্যাপী।

ঘ. মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা ও ত্রাণ

একাত্তরে ত্রিপুরা প্রায় পনের লক্ষ শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে সৃষ্টি করেছে মানবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। অন্যদিকে ত্রিপুরার সাধারণ জনতা সদা উদগ্রীব ছিল রণাঙ্গণের মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায়। সীমান্ত এলাকাগুলোতে সাধারণ মানুষজন গিয়ে ভীড় জমাত। আগত শরণার্থীদের থেকে জানতে চাইত, ওপারে কি হচ্ছে, মুক্তিযোদ্ধারা কি পেরে ওঠেছে।

চট্টগ্রামের সাতকানিয়া সরকারি কলেজের শিক্ষক নির্মল দেব একাত্তরে জীবন বাঁচাতে শরণার্থী হয়ে বিলোনিয়া সীমান্ত দিয়ে ত্রিপুরা প্রবেশ করে। সেদিন অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলছিলেন, আমি

বিবিরবাজার সীমান্ত হয়ে যখন ত্রিপুরায় পা রাখলাম উৎসক জনতা জানতে চাইল ওপারে মুক্তিযোদ্ধাদের কি অবস্থা, তাদের কি সাহায্য লাগবে।[১১৬]

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক সহায়তা দিয়েছিল, আর সাধারণ জনতা দিয়েছিল মানসিক সহায়তা। পাড়ায় পাড়ায় তারা বস্ত্র সংগ্রহ করেছে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। সংগ্রহ করেছে শীত থেকে বাঁচার জন্য মোটা কাপড়, ক্যানভাস কাপড়ের জুতো, মোজাসহ নানাধিক সামগ্রী।

একাত্তরে ত্রিপুরার পত্রিকাগুলোতে নিয়মিতভাবেই একটি মানবিক আবেদন ছাপানো হতো। তখনো মুাক্তিযোদ্ধাদের জন্য সাধারণ মানুষজনকে শুকনো খাবার, চকলেট, চুইংগাম দেয়ার অনুরোধ জানানো হত। সৈনিকদের জন্য উপযুক্ত কেডস, মোটা মোজা, বর্ষাতি, অন্য আনুষাঙ্গিক উপকরণ, ট্রানজিস্টার, রেডিও, ওয়েড ব্যাটারি, জলের বোতল চেয়ে আবেদন জানানো হত।[১১৭]

রেডক্রসের পক্ষ থেকে বিজ্ঞাপন দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ঔষধ, পুরানো কাপড়-চোপড় চাওয়া হয়েছিল। এছাড়া ত্রিপুরা রিলিফ কো-ডিনেটিং সেল চেয়েছিল নগদ অর্থ সাহায্য।

এসব নিবেদনে অকাতরে দান করেছে ত্রিপুরার সাধারণ জনগণ। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য যে যা পেরেছে দিয়ে গেছে বাংলাদেশ তহবিলে। কেউবা দিয়ে গেছে নিজের জুতো, কেউবা অর্থ, কেউবা শুকনো খাবার কিংবা কাপড়-চোপড়। আগরতলার শক্তিময় দাস মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তার ট্রানজিস্টারটি দান করে এসেছিল বাংলাদেশ তহবিলের কার্যালয়ে।[১১৮]

ত্রিপুরার বিশালগড়ে একাত্তরে গড়ে ওঠেছিল শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ কমিটি। বিশালগড়ে হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক টুকু মিয়াকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। হরিপদ ভট্টাচার্য পান সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন প্রিয়লাল বণিক, বিজয় লস্কর, জয়চন্দ্র দেবনাথ, পল্টু সরকার, নীলেন্দ্র চৌধুরী, সুকুমার চৌধুরী, নুরুল ইসলাম, ডা. সিরাজ উদ্দীন।[১১৯] এই কমিটির মাধ্যমে স্কুলের বোর্ডিংয়ে আশ্রয় দেয়া শরণার্থীদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কমিটির সংগ্রহ করা টাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সাড়ে তিন হাজার লুঙ্গি ও সাড়ে তিন হাজার গেঞ্জি ক্রয় করা হয়।

এই লুঙ্গি আর গেঞ্জি অবরুদ্ধ বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ক্যাপ্টেন গাফফারের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল।

সাব্রুম ও ধর্মনগরে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় চাঁদা তোলা হয়। সাব্রুমের উদ্যোগটি নেন স্থানীয় বিবেকানন্দ ক্লাব।[১২০] মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় প্রায় পাঁচ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। এই সংগৃহীত অর্থ দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সিগারেট, বিস্কিট ও চিড়া কিনে পাঠানো হয়।

ধর্মনগরেও অনুরুপভাবে অর্থ ও কাপড়-চোপড় সংগ্রহ করা হয়। উদ্যোগটি নিয়েছিল ধর্মনগর বয়েজ ক্লাব।[১২১] সংগৃহীত অর্থ ও কাপড়-চোপড় পাঠানো হয় ট্রেনিং ক্যাম্পের মুক্তিযোদ্ধাদের দেয়ার জন্য।

মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় ত্রিপুরার সাধারণ জনগণ নানাভাবে এগিয়ে এসেছিল, টুকু মিয়া তেমনি একটি স্মৃতিচারণ তুলে ধরেছেন, ১৯৭১ সালের শেষদিকে, সম্ভবত সেপ্টেম্বর মাসে ক্যাপ্টেন আবদুল গাফ্ফার সাহেবের সাথে যোগাযোগ করার জন্য আমাদের সম্পাদককে সঙ্গে নিয়ে কমথানা ফরেস্ট বিট অফিসে গিয়েছিলাম। আবদুল গাফ্ফার সাহেব তখন সেখানে ছিলেন না। ছিলেন দু'জন মুক্তিযোদ্ধা এবং আবদুল মতিন ভঁইয়াসহ কয়েকজন বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা। বসে গল্পগুজব করছিলেন তাঁরা। পাশেই বুড়িমা নদী। ওখানে এর তীরে বসে একজন লোক মাছ ধরছিলেন। হঠাৎ দেখলাম, তার জালে একটা বড় বোয়াল মাছ ধরা পড়েছে। আমরা সবাই মাছটি দেখতে গেলাম। তখন একজন মুক্তিযোদ্ধা ভাই অন্যজনকে লক্ষ করে বলছিলেন, 'ইস! যদি সঙ্গে টাকা থাকতো, তবে মাছটি কিনে নিতাম'। কথাটা আমার কানে আসতেই আমি ২৫ টাকা দিয়ে মাছটি কিনে সঙ্গে সঙ্গে অফিসে নিয়ে এলাম। তারপর সকলের সামনে ঐ মুক্তিযোদ্ধা ভাইটিকে ডেকে এনে মাছটি নিয়ে নিতে বললাম। তিনি লজ্জায় মাছটি নিতে চাইছিলেন না। তখন মতিন সাহেব তাকে বুঝিয়ে বলায় শেষ পর্যন্ত মাছটি নিয়ে ক্যাম্পে চলে গেলেন।[১২২]

মূলত ত্রিপুরার সাধারণ জনগণ মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে ব্যতিব্যস্ত ছিল বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর আশ্রয় নিয়ে। জুনের পরে শরণার্থী প্রবাহ আস্তে আস্তে কমতে শুরু করে। শরণার্থী ব্যবস্থাপনায় সরকারি হস্তক্ষেপের ফলে এতে শৃঙ্খলা ফিরে আসে। অধিকাংশ শরণার্থী ক্যাম্পে আশ্রয়ে চলে আসতে শুরু করে। ফলে তৃণমূল জনতা এই সময় থেকে শরণার্থীদের পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়েও ভাবতে শুরু করে। বিলোনিয়া, সোনামুড়া রাজনগর, বিশ্রামগঞ্জ, বিশালগড়ে যে মুক্তিফৌজের ট্রেনিং ক্যাম্প গুলো গড়ে উঠেছিল ত্রিপুরার সাধারণ জনগণ সেখানে নানাভাবে সহায়তা করত। খাদ্য, বিশুদ্ধ খাবার জল সরবরাহের পাশাপাশি তাদের প্রশিক্ষণের সময় অস্ত্র, গোলাবারুদ বহন ইত্যাদি নানাধিক কাজ করত। কেউ কেউ মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে অংশ নিয়েছে বিভিন্ন অভিযানে। এমন অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন

সীমান্তবর্তী এলাকার অনেকেই। সোনামুড়ার জামাল শেখ, করিম শেখ মেলাঘরের ভুপেশ, রমেন কিংবা চোত্তাখোলার দুলাল মুক্তিযোদ্ধাদের গোলাবারুদ বহনে সহায়তা করেছে নিয়মিত। [১২৩]

স্কুল, কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা চাঁদা তুলে মুক্তিবহিনীর জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছে। অর্থ সংগ্রহের জন্য তারা আয়োজন করেছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছে নতুন পুরাতন কাপড়। ত্রিপুরার মানুষ যে যেভাবে পেরেছে সর্বস্ব দিয়েছে তাদের জন্য। 'প্রতিদিন ঠাকুরের কাছে বলতাম, আমার যে ভাইরা যুদ্ধ করছে ঠাকুর তুমি তাদের রক্ষা কর, তাদের জন্য মানত করতাম। উপোস রেখেছে আমাদের পাড়ার অনেক মহিলা। একটা অন্য রকমের আবেগ কাজ করত। মনে হত এরাই আমাদের ভাই, আমাদের সন্তান'।[১২৪]

সীমান্তবর্তী এলাকার কাছাকাছি অপারেশগুলোতে যাওয়ার আগে সাধারণ লোকজন তাদের জন্য খাবারের মোচা বেঁধে দিত। ঘর থেকে দিয়ে যেত নানা ধরনের শুকনো খাবার। মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে ত্রিপুরার সাধারণ জনগণ। ত্রিপুরাতে এই সময় গড়ে উঠেছিল বেশ কয়েকটি অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প। যেমন-

১. বিশালগড় মহকুমার গকুল নগরে ও চড়িলাম ছেচরীমাই গ্রামে
২. সেনামুড়া মহকুমার কলমছড়া ও বক্সনগর গ্রামে
৩. উদয়পুর মহকুমার পালটানাতে
৪. বিলোনিয়া মহকুমার শান্তির বাজার গ্রামে
৫. সাব্রুম মহকুমার শ্রীনগরে
৬. খোয়াই মহকুমার তেলিয়ামুড়িতে ও শচীন্দ্র নগরে।[১২৫]

আর পূর্ব থেকেই সাব্রুমের হরিনায় ও সোনামুড়ার মেলাঘরে বাংলাদেশ থেকে আগত বিদ্রোহী বাঙালি সেনাদের ঘাটি ছিল। এই সব ক্যাম্পগুলোতে ত্রিপুরার সাধারণ নাগরিকরা বেইস ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করতেন। গোলাবারুদ অস্ত্র-শস্ত্র আনা নেয়ার কাজ করতেন। প্রশিক্ষিত এই মুক্তিফৌজদের সাথে বিভিন্ন অপারেশনে যোগ দিতেন অনেক সাধারণ ত্রিপুরার নাগরিক।

ঙ. স্বাস্থ্য সেবা

১৯৭১ সালে ত্রিপুরার চিকিৎসক, নার্স, কম্পাউণ্ডার, স্বাস্থ্য সহকারীসহ সকল চিকিৎসাকর্মী, সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালগুলো সাধ্যের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে যোগ দিয়েছিল।

এই অঞ্চলের চিকিৎসাকর্মীদের দায়িত্ববোধ, সেবা, সহমর্মিতা ও সহানুভূতি ছিল বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম সম্বল।

যুদ্ধ মানেই সংঘাত, রক্ত। একাত্তরে সুসজ্জিত পাকিস্তান সেনাবাহিনী যখন নির্বিচারে পূর্ব পাকিস্তানের উপর আক্রমন শুরু করল, প্রাণভয়ে লোকজন পালাতে শুরু করল। শরণার্থীর প্রথম ধাক্কাটা এসে লাগল সীমান্তে। প্রতিদিনই হাজার হাজার লোক প্রবেশ করেছে পার্শ্ববর্তী ভারতে। ত্রিপুরার চিকিৎসাকর্মীরা মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় নিঃস্বার্থভাবে এই বিপুল শরণার্থী স্রোতকে সব ধরনের স্বাস্থ্য সহায়তা দিয়েছে। পালাতে গিয়ে অনেক শরণার্থী হয়েছে বুলেটবিদ্ধ, অনেকেই নানা ভাবে আহত, তাদের সর্বোচ্চ সেবা দিয়েছে ত্রিপুরা। ত্রিপুরাতেই গড়ে ওঠেছে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের একমাত্র ফিল্ড হাসপাতালের। বিপুল সংখক আহত গুলিবিদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাকে সহায়তা দিয়েছে ত্রিপুরা। ত্রিপুরার জি.বি হাসপাতাল স্বাস্থ্যসেবা দিতে গিয়ে একাত্তরে পেয়েছে আন্তর্জাতিক পরিচিতি।

জি.বি হাসপাতাল ও ভি.এম হাসপাতালের পাশাপাশি জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলো, চিকিৎসকরা, নার্সরা একাত্তরে জড়িয়ে পড়েছিল অন্যরকম এক জনযুদ্ধে। অসীম মমতা দিয়ে সেই চরম দুর্দিনে সেবার এক অকৃত্রিম বন্ধন গড়ে তুলেছিল ত্রিপুরার চিকিৎসাকর্মীরা।

ত্রিপুরার স্বাস্থ্যসেবাটা মূলত গড়ে ওঠেছিল সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়, সরকারি হাসপাতালগুলোকে কেন্দ্র করে। তখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা গড়ে ওঠেনি। সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার, নার্সসহ সকল স্বাস্থ্যকর্মী তাদের সমস্ত সামর্থ্য নিয়ে সম্পৃক্ত হয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে। সরকারকে ডাক্তার নার্স ও ওষুধপত্র দিয়ে সহায়তা করেছে বেশ কয়েকটি বেসরকারি সংগঠন। এর মধ্যে রেডক্রসের মতো আন্তর্জাতিক সংগঠন যেমন ছিল, তেমনি ছিল ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের মতো জাতীয় প্রতিষ্ঠান কিংবা স্থানীয় রাজ্যভিত্তিক সংগঠন ত্রিপুরা পিপলস রিলিফ কমিটি। স্বাস্থ্যসেবায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন স্থানীয় সিনিয়র চিকিৎসকরা। নিয়মিত ১২-১৬ ঘন্টা করে তাঁরা সেবা দিয়েছেন। যখন প্রয়োজন হয়েছে ছুটে গেছে সীমান্তে কিংবা বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতালে, কখনোবা ট্রানজিট শরণার্থী ক্যাম্পে। নার্সরাও অনন্য ভূমিকা রেখেছিল, ছুটে বেরিয়েছেন হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে কখনোবা বিভিন্ন ক্যাম্পে। এছাড়া স্থানীয় পল্লী চিকিৎসক, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স, মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী ও রেডক্রসসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের অনেকেই সেই সময় সম্পৃক্ত হয়েছিল এই স্বাস্থ্যসেবায়।

রোগীদের মধ্যে মূলত ছিল গুলিবিদ্ধ আহত মুক্তিযোদ্ধা। যারা সীমান্তবর্তী সেক্টরগুলোতে যুদ্ধ করতে গিয়ে আহত হয়েছেন কিংবা আহত শরণার্থী যারা পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার শিকার হয়েছেন। আর স্থানীয় সীমান্তবর্তী ত্রিপুরাবাসী যারা পাকিস্তানি বাহিনীর শেলিংয়ে আহত হয়েছেন কিংবা গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। এর বাইরে বিপুল সংখ্যক শরণার্থী যারা কলেরাসহ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ত্রিপুরা সরকার রাজ্যের শরণার্থীদের জন্য ৯৯ জন ডাক্তার, ৯৫ জন কম্পাউন্টার, ৭৫ জন প্যারামেডিকেল স্টাফ ও ২১ জন নার্সসহ ৭১৩ জন চিকিৎসা কর্মীকে নিয়োগ দেন।[১২৬] এর বাইরে প্রায় শতাধিক সরকারি/ বেসরকারি ডাক্তার, ২৫৪ জন কম্পাউন্টার, ৩০০ প্যারামেডিকেল স্টাফ ও শতাধিক নার্সসহ প্রায় ১,০০০ প্রশিক্ষিত চিকিৎসা কর্মী শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সেবায় নিয়োজিত ছিল।[১২৭] পাশাপাশি প্রায় ২,০০০ অপ্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সেবায় কাজ করেছে। তাদের মধ্যে বড় একটি অংশ ছিল স্থানীয় স্কুল, কলেজগুলোর ছাত্রী, যারা মূলত নার্সিং, ঔষধ সংগ্রহ, বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সাথে যোগাযোগ এসব কাজ করতেন।[১২৮]

ছাত্র-যুবকরা এসময় শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ঔষধ সংগ্রহে নামেন। ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার তাদের সেই সব দিনগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর আত্মজীবনী 'অতীত দিনের স্মৃতিতে'।[১২৯] তারা বিভিন্ন ঔষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান, ঔষধের দোকানে দোকানে ঘুরে প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করেন। এসময় তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসেন কমার্শিয়াল রিপ্রেজেনটেটিভ ইউনিয়ন বা সংক্ষেপে সিআরইউ। এরা হচ্ছেন প্রকৃত অর্থে মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভস। এছাড়া রেডক্রসের আলাদা একটি স্বেচ্ছাসেবক চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী টিম ছিল, যারা নিয়মিত বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে স্বাস্থ্যসেবা দিয়েছে। একাত্তরে ত্রিপুরার হাসপাতালগুলোতে একদিকে ছিল শরণার্থীদের ভীড়, অন্যদিকে ছিল যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা। ১৫ মে ১৯৭১ *দৈনিক সংবাদে* প্রকাশিত সংবাদ থেকে দেখা যায় ত্রিপুরায় ২১১ জন বুলেটবিদ্ধ বাংলাদেশী চিকিৎসাধীন। অথচ সার্জারী বিভাগের মোট শয্যা মাত্র ১০০। একাত্তরে ত্রিপুরার হাসপাতালে প্রায় ১০,০০০ বুলেটবিদ্ধ শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন জি.বি হাসপাতালের চিফ সার্জন ডা. রথিন দত্ত।[১৩০] এসময় ত্রিপুরার বাইরে অন্যান্য রাজ্য থেকেও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা শরণার্থীদের চিকিৎসা সেবা দেয়ার জন্য মেডিকেল টিম আসেন। নয়াদিল্লীর সফদার জং হাসপাতালের প্রাক্তন সুপারিনটেনডেন্টের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের একটি চিকিৎসক প্রতিনিধি দল আগরতলা আসে।[১৩১] তারা শরণার্থীদের মাঝে চিকিৎসা সেবা চালাল। বিদেশ থেকেও এই সময় ২টি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল এক সপ্তাহের জন্য ত্রিপুরায় আসেন।

সারণি ১৩ : শরণার্থীদের সেবায় ত্রিপুরা রাজ্য সরকার, রেডক্রস, ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন এর সমন্বয়ে যে চিকিৎসা কর্মীরা কর্মরত ছিল তাদের একটি পরিসংখ্যান। [১৩২]

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক	৩৭ জন
চিকিৎসক	২৩৫ জন
শিক্ষানবিস চিকিৎসক	২৩৫ জন
এল. এম. এফ চিকিৎসক	২৫০ জন
নার্স (প্রশিক্ষিত)	৩১৮ জন
নার্স (স্বেচ্ছাসেবী)	১৯৮ জন
কম্পাউন্টার	৪২০ জন

শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ভি.এম ও জি.বি হাসপাতালের সার্জারী ওয়ার্ডে প্রায় ১,০০০ আহত বুলেটবিদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের অপারেশন করা হয়েছে, এছাড়া প্রায় ৫০,০০০ লোককে নানা ধরনের রোগের চিকিৎসা সেবা দিয়েছে এই দুটি হাসপাতাল।[১৩৩] রেডক্রসের সহায়তায় দেয়া হয়েছে বিনামূল্যে ঔষধ, প্রতিষেধক।

শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি পাকিস্তানি গোলার আঘাতে ত্রিপুরার অনেক বেসামরিক নাগরিক আহত হয়েছে, প্রাণ হারিয়েছেন অনেকেই। তাদেরও সর্বোচ্চ সেবা দিয়েছে চিকিৎসাকর্মীরা। বহু ঘর-বাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। শত শত মানুষ বাঁচার তাগিদে গ্রাম থেকে গ্রামে পালিয়ে বেড়িয়েছেন, থেকেছেন নিজ দেশে পরবাসী হয়ে। সেই সময় পাকিস্তানি বাহিনীর ত্রিপুরার বেসমারিক নাগরিকদের উপর হামলার একটি সংবাদ নিচে তুলা ধরা হল।

...সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামে পাক বাহিনীর প্ররোচনামূলক গোলাবর্ষণ ও অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপে অন্যূন একাশিজন প্রাণ হারিয়েছেন, আহতের সংখ্যা দুই শতাধিক।[১৩৪]

অব্যাহত শরণার্থী চাপ ও সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে পাক বহিনীর ক্রমাগত শেলিং এর ফলে সীমান্ত অঞ্চলের ত্রিপুরাবাসীরা একসময় উদ্বাস্তু হতে শুরু করে । ত্রিপুরার লোকজন হয়ে উঠে নিজ দেশে পরবাসী। বিশেষ

করে সোনামুড়া, চোত্তাখোলা , সাব্রুম, ধর্মনগর, গঙ্গানগর এসব সীমান্ত গ্রামগুলোর অনেকে আহত হয়ে ভর্তি হয় স্থানীয় হাসপাতালে।

একদিকে জনসংখ্যার প্রায় সমান শরণার্থী অন্যদিকে বিপুল সংখ্যক আহত মুক্তিযোদ্ধা, আহত স্থানীয় লোক ত্রিপুরার চিকিৎসা ব্যাবস্থাকে দাঁড় করিয়ে দেয় কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। সেই প্রতিকূল সময়ে ত্রিপুরার হাসপাতাল, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও উল্লেখযোগ্য চিকিৎসাকর্মীদের সংগ্রাম নিচে তুলে ধরা হল।

হাসপাতাল

আহত মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের চিকিৎসায় ত্রিপুরার হাসপাতালগুলো শুরু থেকেই তৎপর ছিল। ত্রিপুরায় তখন হাসপাতাল বলতেই জিবি আর ভিএম হাসপাতাল। এছাড়া বিলোনিয়া, সাব্রুম, ধর্মনগর, হাপানিয়া, উদয়পুর ও খোয়াইতে ছিল খুব ক্ষুদ্র আকারের কয়েকটি সরকারি হাসপাতাল। উদয়পুর, মনুবাজার ও সোনামুড়ায় মিশনারি পরিচালিত ৩টি ছোট স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ছিল। যুদ্ধ শুরু হলে বিপুল শরণার্থী ও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের অব্যাহত চাপে ব্যস্ত হয়ে ওঠে এসকল সেবা কেন্দ্রগুলো। সীমান্ত এলাকায় জরুরী সেবা দেওয়ার জন্য আটটি ট্রানজিট মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন করা হয়।[১৩৫] শুরু হয় ত্রিপুরার হাসপাতালগুলোর অন্যরকম এক সংগ্রাম।

একটি দেশের স্বাধিকার আন্দোলনে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র একটি বেসামরিক হাসপাতাল কী ধরণের তাৎপর্যপূর্ণ ভুমিকা রাখাতে পারে তার নজির জি.বি হাসপাতাল। গোবিন্দ বল্লভ মেমোরিয়াল হাসপাতাল বা সংক্ষেপে জি.বি হাসপাতাল একাত্তরে পরিণত হয়েছিল আমাদের অন্যতম বন্ধুতে। এই হাসপাতাল একদিকে প্রায় পনের লক্ষ শরণার্থীকে দিয়েছে চিকিৎসা সেবা, দশ হাজার যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাকে দিয়েছে চিকিৎসা, নির্যাতিত শত শত নারীকে দিয়েছে সর্বোচ্চ সেবা। খুব সীমিত সামর্থ নিয়ে চিফ সার্জন ডাঃ রথীন দত্তের নেতৃত্বে সাতজন স্থানীয় চিকিৎসক, কয়েকজন মেডিকেল ছাত্র, নার্স একাত্তরে যে সেবা প্রদান করেছিল তা সারা বিশ্বে আলোড়ন তুলেছিল।

জি.বি হাসপাতাল একাত্তরে আরো ক্ষুদ্র পরিসরে ছোট শহর আগরতলা ও ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকদের চিকিৎসা দিত। এতে শয্যা সংখ্যা ছিল ৬০টি। এই সময় হাসপাতালে ২টি খালি রুম ছিল যেগুলোতে বাংলাদেশি শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা দেয়া হত। একটিতে শরণার্থীদের চিকিৎসা দেয়া হত, অন্যটিতে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের।[১৩৬] শুরুর দিকে এই দুটি ওয়ার্ডেই চিকিৎসা সেবা দেয়া হত। পরে অবশ্যই রোগির চাপে পুরো হাসপাতালটিই একটি সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে পরিণত হয়। ১৯৭১ সালে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা শাখার সভাপতি ও জি.বি হাসপাতালের সহকারি

সুপারইনটেনডেন্ট ডাঃ হেমেন্দ্রশংকর রায় চৌধুরীর মতে, এই হাসপাতালের সাড়ে তিন হাজার ওয়ার ক্যাজুয়ালিটির ট্রিটমেন্ট করা হয়। আগরতলার অতি ক্ষুদ্র একটি সিভিল হাসপাতালে এত বেশি মেজর ট্রিটমেন্ট খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। হাসপাতালের চিফ সার্জন ডাঃ রথীন দত্ত একাই আড়াই হাজার মেজর অপারেশন করেছেন।[১৩৭] তার মতে সবমিলিয়ে এই হাসপাতালে যুদ্ধের নয় মাস দশ হাজারের অধিক অপারেশন করা হয়েছে। জি.বি হাসপাতালের বর্তমানে যে জয়ন্তী ওয়ার্ড একাত্তর সালে এটি সবেমাত্র নির্মিত হয়েছে। রং- টং- তখনো ভালো করে হয়নি। যুদ্ধ শুরু হলে অতিরিক্ত রোগীর চাপের কারণে ওয়ার্ডটি খুলে দেওয়া হয়। ওয়ার্ডটির নামকরণ করা হয় মুক্তিযোদ্ধা ওয়ার্ড। কিন্তু নিরাপত্তার শঙ্কায় পরে ওয়ার্ডটির নাম রাখা হয় জয়ন্তী ওয়ার্ড। ত্রিপুরাতে শরণার্থী হিসেবে যারা এসেছিলেন তাদের মধ্য থেকে ডাক্তার, মেডিকেলের শেষ বর্ষের ছাত্র, কম্পাউন্ডার, ফার্মাসিষ্টদের এখানে নিয়োগ দেয়া হয়। দৈনিক ৩০ টাকা ভিত্তিতে তাদের সম্মানী নির্ধারণ করা হয়। এই হাসপাতালে আনার পর প্রথমেই শরণার্থীদের কলেরার ভ্যাকসিন দেয়া হত। ফলে পশ্চিমবঙ্গ কিংবা আসামে যেভাবে কলেরা মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে এখানে তেমনটি হয়নি। একটি লোকও কলেরায় মারা যায়নি।[১৩৮]

জি.বি হাসপাতালের সবচেয়ে অনন্য ভূমিকা ছিল ধর্ষিত নারীদের চিকিৎসা করানো। আর এই বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন ডাঃ রবীন দত্ত ও তাঁর স্ত্রী স্বপ্না দত্ত। রথীন দত্তের ভাষ্যানুযায়ী প্রায় পাঁচশত ধর্ষিত নারীকে তিনি চিকিৎসা করিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘প্লাস্টিক রিপেয়ারের কাজ ছিল অনেক। সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশ থেকে অনেক নারী (বিবাহিত, অবিবাহিত, স্কুল-কলেজের মেয়ে) ধর্ষণের শিকার হয়ে আসত। তাদের জননেন্দ্রিয় ছিন্নভিন্ন পাওয়া যেত। মারাত্মক জখম হয়ে আসত তারা। সন্ধ্যার পর তাদের চিকিৎসা দিতাম। তাদের লুকিয়ে রাখতাম। খাতায় কোনো নাম দিতাম না। এক্স, ওয়াই জেড ইত্যাদি নাম দিতাম। তাদের অধিকাংশই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে যেত। যুদ্ধের পর তারা আমাকে কাকা মামা এবং কেউ দাদু বলে সম্বোধন করে চিঠি দিত। তাদের কেউ কেউ এখন মা ও ঠাকুর মাও হয়েছে। তাদের অতীত কেউ জানত না। একটা ছোট শিশু ধর্ষণের শিকার হয়ে এসেছিল, মনে পড়ে। বড় শারীরিক আকৃতির এক পাকিস্তানি সেনা তাকে ধর্ষণ করেছিল। মেয়েটির জননেন্দ্রিয় ছিঁড়ে ফুলে গিয়েছিল। মারাত্মক জখম হয়েছিল।’[১৩৯]

পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের একটি ক্ষুদ্র হাসপাতাল একাত্তরে যে মানবিক সহায়তা নিয়ে এগিয়ে এসেছিল তা সত্যিই বিরল। বিশেষ করে একাত্তরে এই হাসপাতালের ডাক্তার রবীন দত্ত, মৃনাল ভৌমিক, হেমেন্দ্র শংকর যে ভূমিকা পালন করেছিল তা অভাবনীয়। এই হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মী, নার্সরা ও দিনরাত পরিশ্রম

করেছিল। সেই সময়কার একজন নার্স এর সাক্ষাৎকার নেয়ার সুযোগ হয়েছিল আমার। যিনি অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত দৈনিক ১৬ ঘন্টা ডিউটি করার কথা বলেন।[১৪০] পরবর্তীতে সেই সময়কার হাসপাতাল রেজিস্টারে তার কথার সত্যতা মিলে। এমন কর্মচারীও ছিল যারা সপ্তাহে পুরো সময় হাসপাতালে ছিল, কখনো বাড়ি যাননি।

যে তিনদিন সমানে দু'দিক থেকে বোমা বর্ষণ চলছিল এবং রাতদিন কার্ফু বলবৎ ছিল তখন হাসপাতালের স্টাফদেন বাড়িতে যাওয়ার কোন ব্যবস্থা করা যাচ্ছিল না অথবা করা সম্ভবও ছিল না, আবার কোনক্রমে পাঠাতে পারলেও অন্য শিফট এর সিস্টাররা আসতে পারবেন কি না সে নিয়ে দুচিন্তা এবং রোগীদের অসুবিধার কথা ভেবে সবাই মিলে ক্রমাগত তিনদিন হাসপাতালে থেকে নিরলসভাবে সেবাকার্য চালিয়ে গেলেন। এ এক দুর্লভ নজির। তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থার জন্য আশপাশের নার্সিং হোস্টেল এবং কারো কারো বাড়ি থেকে চাউল, ডাল ইত্যাদি এনে কোনক্রমে হাসপাতালেই রান্না করা হত। নার্সদের মধ্যে বিজয়া সেনগুপ্ত, আশালতা রায়, বীণা দেব, শিপ্রা সরকার, উমা সেন, রাণী পাল, মন্দিরা দেববর্মা, সতী সেনগুপ্তা, রিমা এদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।[১৪১] তাদের নেতৃত্বে ছিলেন মেট্রন এন.ডি. ওয়ার্ডিং।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে এই হাসপাতাল পরিদর্শনে এসেছিলেন অনেকেই। বিশেষ করে ইন্দিরা গান্ধী এই হাসপাতালে আসার পর অভাবনীয় সেবা কার্যের বিবরণ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আসতে শুরু করে ঔষধ, চিকিৎসা সরঞ্জামসহ নানাবিধ সহায়তা। মার্কিন সিনেটের জন. এফ কেনেডি হাসপাতাল পরিদর্শনে এসে আহতদের সাথে কথা বলেন। এই সময় হাসপাতাল পরিদর্শন করে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম হাসপাতালের সেবার ভূয়সী প্রশংসা করেন। ১৫ অক্টোবর ১৯৭১ হাসপাতালের ভিজিটরস বুকে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ লিখেন, 'আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতে সর্বসাধারণ যে বিপুল সহযোগিতা প্রদর্শন করে চলেছেন এখানকার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও সকল কর্মচারী তারই বাস্তব প্রতিফলন ঘটাচ্ছেন তাদের নিরলস সেবা দিয়ে।' [১৪২]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের এডওয়ার্ড কেনেডি জি.বি হাসপাতাল পরিদর্শনে আসেন। ফোরকান বেগম প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তাঁর পরিদর্শনের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, কক্ষ ভর্তি কেবল হাত, পা, মাথা, নাক, কান, চোখহীন মানুষের দেহাংশ। কেনেডী পরপর কয়েকটি বেডের কাছে গেলেন, জানতে চাইলেন তাদের জীবনে এই নৃশংশ পরিণতির কথা। অনেকেই ভাবাবেগে আপ্লুত হলেন। নাম বললেন কিন্তু

ঘটনার বর্ণনা দিতে পারলেন না। হু হু করে কেঁদে উঠছেন। মনে হল কেনেডীকে দেখে তাদের সকল উচ্ছাস আবেগ একসাথে বের হয়ে আসতে চাইছে।[১৪৩]

হাসপাতালের বেশ কয়েকজন নার্স শরণার্থী সেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। এরা আবার বেশ বড় রকমের একটি স্বেচ্ছাসেবক নার্স বাহিনী গড়ে তুলেছেন। একসময় স্থান সংকুলান না হওয়ায় ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন ও রেডক্রসের সহায়তায় হাসপাতাল চত্তরে তাঁবু খাটিয়ে, খাটিয়া বিছিয়ে রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেয়া শুরু হয়।[১৪৪] হাসপাতালের সাধারণ কর্মচারীরা এসময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। হাসপাতালের ওয়ার্ড মাস্টার সুধাংশু মজুমদার ও অজিত গুপ্ত এই সব কর্মকান্ডে অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন।[১৪৫]

চন্দ্রঘোনা কাগজ কল হাসপাতালের সাবেক উপব্যবস্থাপক মৃণাল কান্তি বড়ুয়া মুক্তিযুদ্ধের সময় আগরতলা জিবি হাসপাতালসহ বিভিন্ন চিকিৎসা শিবিরে দায়িত্ব পালন করেন। জিবি হাসপাতালে যে মর্মস্পর্শী দৃশ্য দেখেছি, তা মনে পড়লে এখনো বাকরুদ্ধ হতে হয়। ভর্তি হওয়া সাধারণ নারী-পুরুষ কিংবা মুক্তিযোদ্ধাদের কারও হাত, কারও পা নেই। কারও মাথা ফাটা, রক্তাক্ত অর্ধমৃত। শিশুসহ অনেকেই মারা গেছে চোখের সামনে। মারা যাওয়ার আগে কেউ কেউ জানতে চাইতেন, দেশ কখন স্বাধীন হবে? কখন আমরা দেশে ফিরব? বিজয়ের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত এসব প্রশ্নের সঠিক কোনো জবাব দিতে পারতাম না।

নারীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ধর্ষিতা। জেনেছি, দেশ থেকে পালিয়ে আসার সময় বিভিন্ন জায়গায় পাঞ্জাবিদের হাতে এসব মেয়ে ধরা পড়ে। পরে তাঁদের অনেককে ধর্ষণ করে রাস্তার পাশে ফেলে দেওয়া হয়। আমাদের ক্যাম্পে এ রকম বেশ কজন মেয়েকে আমি চিনতে পেরেছিলাম। প্রভাবশালী পরিবারের মেয়ে সবাই।

জিবি হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিভাগে চিকিৎসাসেবা দেওয়া ছাড়াও আমরা জিরানিয়া, হাঁপানিয়া, বক্সনগর, সালদা, রাণীবাজার প্রভৃতি এলাকার মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় সেবা দিতাম। চিকিৎসা বিভাগের লোক না হয়েও একদল নারী হাসপাতাল ও বিভিন্ন ক্যাম্পে রোগীদের সর্বোচ্চ সেবা দেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাসহ প্রায় ৩২ হাজার নারী-পুরুষ শিশুকে চিকিৎসা দেওয়া হয় হাসপাতালে।'[১৪৬]

হাসপাতাল পরিদর্শন করে মুজিবনগর সরকারের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম হাসপাতালের পরিদর্শন বইয়ে লিখেন, [১৪৭]

Hearties congratulation on behalf of my government and own behalf to Dr. R. Dutta and his colleagues for the wonderful job they are doing. The dedication sincerity and affection with which they have well- looked after our wounded and sick people will remain part of our history, the history of the people of Bangladesh in their struggle for freedom under the most difficult circumstances the hospital and its other agencies as well as the local Red Cross and Medical profession have served sufferings humanity. This is and has been our great source of courage and inspiration".

Best wishes to the doctor, surgeons and hospital staff.

Syod Nazrul Islam

Acting President, Republic of Bangladesh

১৯ জুলাই ভারতে ইউনিসেফের প্রধান হাসপাতাল পরিদর্শন করে লিখেছেন, [১৪৮]

My warmest good wishes to the dedicated staff of this hospital. My organization will assist in everyway possible with equipment & drugs particularly to the refugee children from East Bengal

Mona Albugurgur

Liaison Officer UNISEF Delhi

একাত্তরে জি.বি হাসপাতালের আউটডোরে প্রায় দেড় লক্ষাধিক শরণার্থী চিকিৎসা সেবা নিয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে প্রায় ৯,৭০০ শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধা। তার মধ্যে ৭৩২ জন বুলেটবিদ্ধ রোগীকে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়েছে, এদের মধ্যে মারা গিয়েছে ১১৪ জন।[১৪৯] এছাড়া জি.বি হাসপাতাল থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে গিয়ে চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন। ১২ জন ক্যাথলিক মিশনের নার্স সপ্তাহে দু দিন করে গোকুলনগর, মোহনপুর, হরিনা ক্যাম্পে সেবা দিয়েছে। রথীন দত্ত, হেমেন্দ্র শঙ্কর রায় চৌধুরী, ড. ভৌমিক প্রায়শ বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল, ট্রানজিট ক্যাম্পগুলোতে গিয়ে গুরুতর আহত সামরিক-বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা দিত।

এই হাসপাতালের অবদান সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিকচ চৌধুরী বলছিলেন-

‘আগরতলা বেসামরিক হাসপাতাল-গেবিন্দ বল্লভ হাসপাতাল, মুক্তিযুদ্ধে ন’ মাস ধরে যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিল- তার ইতিহাসও অনেকের অজানা। সে সময়ে প্রায় সাড়ে তিন হাজারের মতো যুদ্ধাহত সৈনিক ও সাধারণ নাগরিকদের শৈল্য চিকিৎসা করা হয় এই জি.বি হাসপাতালে- কখনো কখনো হারিকেনের আলো জ্বেলে। পৃথিবীর কোন বেসামরিক হাসপাতালের ইতিহাসে এই বিপুল সংখ্যক যুদ্ধাহতদের শল্য-চিকিৎসার কোন নজির নেই’।[১৫০]

আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে ত্রিপুরা রাজ্যের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহত্তম হাসপাতাল আই. জি. এম হাসপাতাল বা ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতাল। বৃটিশ আমলে রাজ্যের প্রথম সরকারি হাসপাতাল হিসেবে এর যাত্রা শুরু। বৃটিশরা এর নাম রেখেছিল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বা ভি.এম হাসপাতাল, পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে এই হাসপাতালের নাম পরিবর্তিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন ভি.এম হাসপাতাল শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের নিরবিচ্ছিন্ন স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে প্রশংসিত হয়েছে দেশ-বিদেশে। একাত্তরে এই হাসপাতালের পরিচিতি ছিল খুবই ছোট। তৎকালীন এই হাসপাতালের টিবি বিভাগের প্রধান নীলমনি দেববর্মা সেই সময়কার হাসপাতালের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, ‘হাসপাতালের পরিসর ছিল খুবই ক্ষুদ্র, জেনারেল ওয়ার্ড ছিল ২০০ শয্যাবিশিষ্ট, ৪৮ শয্যার গাইনি ওয়ার্ড, ৩০ শয্যার টিবি ওয়ার্ড মোট ২৭৮টি শয্যা ছিল ভি.এম হাসপাতালে।’[১৫১]

ক্ষুদ্র এই হাসপাতালে একাত্তর সালে কী পরিমাণ শরণার্থী চিকিৎসা নিয়েছে তার বিশ্লেষণ দেখলেই দেখা যাবে এই হাসপাতালটি মুক্তিযুদ্ধে কি অবদান রেখেছিল। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস এই হাসপাতালে আউটডোরে ২৬,০০০ শরণার্থী চিকিৎসা সেবা নিয়েছে। বিভিন্ন কারণে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল ২,৭৩৬ জন শরণার্থী এবং মুক্তিযোদ্ধা।[১৫২]

এছাড়া এটা ছিল একমাত্র হাসপাতাল, যেটাতে এক্সরে মেশিন ছিল, নয়মাসে প্রায় ১৩৫০টি এক্সরে করানো হয় বিনামূল্যে শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের।[১৫৩] এছাড়া ভি.এম হাসপাতাল মে মাসে শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সেবায় প্রশিক্ষিত নার্স গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিনামূল্যে নার্সিং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। বিনামূল্যে হাসপাতালটি চিকিৎসা প্রার্থীদের ঔষধ ও প্রয়োজনীয় টিকা সরবরাহ করেন।[১৫৪]

ভি.এম হাসপাতালের মেডিকেল টিম রেডক্রস ও ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সহায়তায় খোয়াই, মনুবাজার, সোনামুড়া, বিশালগড়ে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দিয়েছে। শরণার্থী শিবিরগুলোতে নিয়মিত পাঠিয়েছে বিশেষজ্ঞ মেডিকেল টিম। সহায়তা করেছে বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতালকে নানা

কাজে। বিশেষ করে প্রতি সপ্তাহেই ফিল্ড হাসপাতাল থেকে বেশ কয়েকজন রুগী এক্সরে করতে পাঠানো হত ভি.এম হাসপাতালে।

'এপ্রিলের এক সকালে পাকিস্তান আর্মির এপারে চলে আসা এক লেডী ডাক্তার ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম এক জীপ ভর্তি বাঙালি জোয়ান নিয়ে আমাদের চেষ্ট ক্লিনিকে চলে এলেন। তিনি এসে আমার চেম্বারে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন- এই ৮/৯ জন রুগী নিয়ে তিনি জি.বি হাসপাতালে গিয়েছিলেন, ওখানকার আউটডোরের ডাক্তাররা তাদের পরীক্ষা করে চেষ্ট ক্লিনিকে রেফার করে দিয়েছেন। আমি তক্ষণি তাদের সবাইকে এনে নামধাম লিখে বুকের এক্সরে করে বলে দিলাম পরের দিন সকালে আসতে। পরের দিন এক্সরে ফলাফল দেখে যাদের বুকে যক্ষা রোগ ধরা পড়েছে তাদের যথারীতি যথপোযুক্ত ঔষধ পত্র দিয়ে দিলাম। এরপর থেকে প্রতিদিন ওয়ার্কিং দিনগুলোতে এই লেডী ডাক্তার রুগী নিয়ে আউটডোরে আসতেন এবং দু'তিন জনের বুকের এক্সরে করিয়ে দরকার মত ঔষধপত্রও নিয়ে যেতেন।'[১৫৫]

এছাড়াও ডাক্তার নীলমনি দেববর্মন একাধিক বার বিভিন্ন সাময়িক কর্মকর্তাদের চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতালে গিয়েছেন বলে তাঁর সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেন। তবে ভি.এম হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগ শরণার্থী সেবায় সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। ৪৮ শয্যার এই হাসপাতালে প্রায় সময় দ্বিগুণ রুগী ভর্তি থাকত। ৩০ মে ১৯৭১- এর পত্রিকার রিপোর্টে দেখা যায় ঐদিন হাসপাতালে প্রসূতি ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ছিল ১১১ জন।[১৫৬] কখনো কখনো এটা ২০০ ছাড়িয়ে গেছে।

একাত্তরে লন্ডনে বসবাসরত এক হাজারেরও বেশি চিকিৎসক মিলে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন। ডা. এ এইচ সায়েদুর রহমানকে এর সভাপতি করা হয়, সাধারণ সম্পাদক হন ডা. জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী। একাত্তরের মে মাসে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন ও যুক্তরাজ্য সরকার যৌথভাবে ডা. এম এ মোবিন ও জাফরুল্লাহ্ চৌধুরীকে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করার জন্য ভারতে পাঠান।[১৫৭]

এই সময় অবরুদ্ধ বাংলাদেশে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতাল প্রয়োজন হচ্ছিল। সাধারনত এই ধরনের পরিস্থিতিতে সামরিক হাসপাতাল ওয়ার ক্যাজুয়ালিটিদের চিকিৎসা দিয়ে থাকে। ত্রিপুরার সীমান্ত এলাকায় এই ধরনের সুবিধা না থাকায় ডা. এম এ মোবিন ও জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী সামরিক বাহিনীর মেডিকেল কর্মকর্তা আখতার আহমেদের নেতৃত্বে ১০ মে গড়ে তোলেন 'বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল'। যেটি বাংলাদেশ ফোর্সেস হাসপাতাল নামেও পরিচিত ছিল।

হাসপাতালটি স্থাপনের পর পাকিস্তানি বাহিনীর গোলার ভয়ে কয়েকবার স্থানান্তর করতে হয়, মেলাঘর থেকে সোনামুড়া, শেষ পর্যন্ত আগরতলার কাছাকাছি বিশ্রামগঞ্জের হাবুল ব্যানার্জীর লিচু বাগানে হাসপাতালটি স্থিত হয়।

ফিল্ড হাসপাতালে ডা. মোবিন, জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী, মেজর আখতার আহমেদ, সিতারা বেগম ছাড়াও বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ছিলেন। যেমন, ডা. কিরণ সরকার দেবনাথ, ডা. ফারুক মাহমুদ, ডা. নাজিমুদ্দিন, ডা. মোর্শেদ, বেশ কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক এসেছিল সেনাবাহিনী থেকে। স্থানীয় বেশ কয়েকজন নার্স ও কম্পাউন্ডার এই হাসপাতালের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিল। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ব্যাক্তিগত দেহরক্ষী হাবলু ব্যানার্জী বাংলাদেশ হাসপাতালের জন্য ছেড়ে দিয়েছিল তাঁর শখের লিচু বাগান। হাসপাতালের অন্যতম সমন্বয়ক ডা. মেজর আখতার আহমেদ বলছিলেন যে, ‘হাবলু ব্যানার্জী বিশ্রামগঞ্জে তাঁর শখের লিচু বাগান আমাদের হাতে ছেড়ে দেবার সময় অনুরোধ করেছিলেন, বাবারা শুধু খেয়াল রেখো, যেন লিচু গাছগুলো কেউ কেটে না ফেলে।’[১৫৮]

শেষ পর্যন্ত হাসপাতালটি ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। হাসপাতালের স্বেচ্ছাকর্মী সুলতানা কামাল এর কারণ হিসেবে লিখেছেন, ওরা ভেবেছিল, যুদ্ধ যখন চরমভাবে সামনাসামনি হবে, তখন তো অনেক আহত হবে। এটা সামাল দেয়া আর্মি ছাড়া সম্ভব নয় বলে ওদের ধারণা। এই হাসপাতাল গঠনে ত্রিপুরাবাসীর ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

আগরতলা শহরের ২-৩ মাইল দূরে শাল বাগানের ভেতরে আহতদের চিকিৎসার জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল একটি অকথিত সামরিক হাসপাতালের। এই হাসপাতালের ব্যয় ভার বহন করতেন তৎকালীন হরিয়ানার মূখ্যমন্ত্রী বংশীলাল, গুলজারীলাল নন্দ, এমপি ও বিহারের মূখ্যমন্ত্রী কর্পূরী ঠাকুর।[১৫৯]

চিকিৎসক

ত্রিপুরায় একাত্তরে চিকিৎসা সেবার কথা বললে একজনের কথাই সবার আগে আসে ডা. রথীন দত্ত। এছাড়া জিবি ও ভিএম হাসপাতালের বেশ কয়েকজন চিকিৎসক একাত্তরে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখেন।

একাত্তরের সেই অগ্নিঝরা দিনে আগরতলা জি.বি হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডা. রথীন দত্ত দাঁড়িয়েছিলেন বাংলার মুক্তিকামী জনগণের পক্ষে। লন্ডন থেকে এফআরসিএস করেছেন তিনি। স্বাস্থ্যসেবায় ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবে ভারত সরকার তাকে পদ্মশ্রী পদবিতে ভূষিত করেছে।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন জি.বি হাসপাতালের চিফ সার্জন ও রেডক্রসের সেক্রেটারি। শরণার্থীদের স্বাস্থ্যসেবার জন্য সরকার তাকে দায়িত্ব দেয়। স্ত্রী শিশু বিশেষজ্ঞ স্বপ্না দত্ত ও আরো কয়েকজনকে নিয়ে গড়ে তোলে একটি মেডিকেল টিম।[১৬০] তিন বছরের মেয়েকে শিলংয়ে তার দাদুর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে শরণার্থীদের সেবায় মনোনিবেশ করে দত্ত পরিবার। একাত্তরে রথীন দত্তের ভূমিকা তাঁর সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট। 'ত্রিপুরার স্বাস্থ্য বিষয়ে সদর দফতর ছাড়াও অর্থোপেডিকসহ তিনটি সার্জিক্যাল ইউনিট ছিল। আমরা প্রথমেই শরণর্থীদের ভ্যাকসিনেশন দিতাম। ফলে ডায়রিয়া কলেরা ইত্যাদি রোগে মৃত্যুর হার কম ছিল। প্লাস্টিক রিপেয়ারের কাজ ছিল অনেক। সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশ থেকে অনেক নারী (বিবাহিত, অবিবাহিত, স্কুল-কলেজের মেয়ে) ধর্ষণের শিকার হয়ে আসত। তাদের জননেন্দ্রিয় ছিন্নভিন্ন পাওয়া যেত। মারাত্মক যখম হয়ে আসত তারা। সন্ধ্যার পর তাদের চিকিৎসা দিতাম। তাদের লুকিয়ে রাখতাম। খাতায় কোনো নাম দিতাম না। এক্স, ওয়াই, জেড ইত্যাদি নাম দিতাম। তাদের অধিকাংশই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে যেত। যুদ্ধের পর তারা আমাকে বলতো কাকা, মামা এবং কেউ দাদু বলে সম্বোধন করে চিঠি দিত। তাদের কেউ কেউ এখন মা ও ঠাকুরমাও হয়েছে। তাদের অতীত কেউ জানত না। একটা ছোঠ শিশু ধর্ষণের শিকার হয়ে এসেছিল, মনে পড়ে। বড় শারীরিক আকৃতির এক পাকিস্তানি সেনা তাকে ধর্ষণ করেছিল। মেয়েটির জননেন্দ্রিয় ছিঁড়ে ফুলে গিয়েছিল। মারাত্মক যখম হয়েছিল। এখন সে ঠাকুরমা হয়েছে। আমি একা ২ হাজার ২৫০টি মেজর অপারেশন করেছি। সব মিলিয়ে ১০ হাজারের অধিক অপারেশন হয়েছে।'[১৬১]

ডা. দত্তের বাবা ও কাকা ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করা ডাক্তার। আদি বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। মামাবাড়ি কুমিল্লায়।

হেমেন্দ্রশঙ্কর রায় চৌধুরী সংক্ষেপে ত্রিপুরা বাসীর কাছে এইচ এস রায় চৌধুরী নামে পরিচিত। একাত্তরে ছিলেন ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের ত্রিপুরা রাজ্য শাখার সভাপতি ও জি.বি হাসপাতালের সার্জারী বিভাগের চিকিৎসক। একাত্তরে শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবায় ডা. রায় চৌধুরী রেখেছিলেন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের চিকিৎসা সেবা দেয়ার জন্য বাংলাদেশের বাইরে প্রথম উদ্যোগটি নিয়েছিলেন ডা. রায় চৌধুরী। ১৯৭১ সালের ২৮ শে মার্চ ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা শাখার সভাপতি হিসেবে আমি একটা মিটিং করলাম। সেই মিটিং-এ ২৮-৩০ জনের মতো ডক্তার উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে, ওখানে (পূর্ব পাকিস্তান) যখন এতো লোক আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে, জখম হচ্ছে, তখন ওরা নিশ্চয় চিকিৎসার জন্য

আগরতলা জি.বি হাসপাতালে আসবে। তার কারণ হচ্ছে তখন বর্ডার এলাকায় জি. বি হাসপাতাল ছাড়া সার্জারী ডিপার্টমেন্টসহ এত বড় হাসপাতাল খুব একটা ছিল না। যাহোক, ঐ সভায় সিদ্ধান্ত হলো যে আমরা এ বিষয়ে সার্ভে করতে যাব। পরের দিন সকালে আমি আর ডাক্তার রথীন দত্ত দু'জনে মিলে সোনামুড়ায় গেলাম।[১৬২]

তিনি ছিলেন রথীন দত্তের অন্যতম সহকারি, দু'জনে মিলে রেডক্রসের সহায়তায় জি.বি হাসপাতালের সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের সক্ষমতা বাড়ান। যুদ্ধের শুরুতে শরণার্থী ও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা দিতে ডা. রায় চৌধুরী ঘুরিয়ে বেরিয়েছন সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে। জনগণকে করেছেন সচেতন, চিকিৎসা কর্মীদের করেছেন উদ্বুদ্ধ।

বলছিলেন তিনি, আমার সাড়ে তিন হাজার ওয়ার ক্যাজুয়ালিটির ট্রিটমেন্ট করিয়েছি, এটা কোন সহজ সাধ্য বিষয় ছিল না। একদিকে ছিলেন নিবেদিত প্রাণ চিকিৎসক, অন্যদিকে বড় সাংবাদিক, মুক্তিযুদ্ধে নিজ বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন অনেককেই। স্ত্রী দীপ্তি রায় চৌধুরীও শরণার্থীদের সেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। মূলত রায় চৌধুরী, রথিন দত্তদের প্রচেষ্টায় ত্রিপুরা একাত্তরে স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে এগিয়ে এসেছিল বাংলাদেশের পাশে। বলছিলেন তিনি, ১৯৭১ সালে ভারতবর্ষে শরণার্থী যারা এসেছিলেন বিশেষত আসাম, মেঘালয়, এবং পশ্চিমবঙ্গে সেসব স্থানে কিন্তু কলেরায় প্রচুর লোক মারা গিয়েছিল। কিন্তু ত্রিপুরায় কলেরায় কোনো লোককে আমরা মরতে দেখিনি। ২৫ মার্চ তারিখে পূর্ব পাকিস্তানে ঘটনা ঘটল মানে আর্মি ক্র্যাকডাউন করলে আর আমরা ২৮ মার্চ তারিখ থেকেই কাজ শুরু করে দিয়েছিলাম। ফলে, আমাদের এখানে মহামারী দেখা দেইনি।[১৬৩]

বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতালের সাথে ভারত সরকারের সমন্বয় ও রিলিফের বিষয়টিও দেখা শোনা করেন ডা. রায় চৌধুরী।

ডা. মৃণাল কান্তি ভৌমিক ছিলেন ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক। এছাড়া তিনি জি.বি হাসপাতালের সার্জারী বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস পালন করেছিলেন সিভিল ডিফেন্সের পরিচালকের দায়িত্ব। বেশকিছুদিন পালন করেছিলেন রেডক্রসের ত্রিপুরা পশ্চিম জেলার দায়িত্ব। একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এই চিকিৎসক। বিশেষ করে সীমান্ত এলাকায় তিনি ট্রানজিট ক্যাম্পগুলোতে শরণার্থীদের প্রাথমিক চিকিৎসা করা, বাংলাদেশ থেকে আগত ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে যোগাযোগসহ নানাধিক কর্মকান্ডে শুরু থেকে শেষ নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছিলেন।

ডা. ভৌমিকের তত্ত্বাবধানে জি.বি হাসপাতালে শরণার্থীদের সেবায় জরুরীভিত্তিতে একটি নার্সিং প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়।[১৬৪] কিছু সংখ্যক বাংলাদেশী মহিলা শরণার্থীকে প্রাথমিক চিকিৎসার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল। পরে তাদেরকে বিশ্রামগঞ্জের বাংলাদেশ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

নীলমনি দেববর্মা একাত্তরে ভি.এম হাসপাতালে অর্থাৎ বর্তমান ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালের (আইজিএম) টিবি বিভাগে কর্মরত ছিলেন। একাত্তরে তিনি শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সহায়তায় রেখেছিলেন অনন্য ভূমিকা।

ডা. দেববর্মা মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে রেডক্রসের তত্বাবধানে সীমান্ত এলাকার ট্রানজিট ক্যাম্পগুলোতে আগত শরণার্থীদের চিকিৎসা সেবা দিতে সীমান্ত অঞ্চলে চলে যান। বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতালের ডাক্তার সিতারা বেগমের সাথে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। নানা সময় তিনি ফিল্ড হাসপাতালে গিয়ে রোগী দেখেছেন। ডা. দেববর্মা ও তাঁর স্ত্রী করবী দেববর্মা স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার পাশাপাশি শরণার্থীদের ত্রাণ ও অর্থ সহায়তার জন্য নানাভাবে কার্যকরী উদ্যোগ নিয়েছিলেন।[১৬৫] তাঁর স্ত্রী কুঞ্জবন মহিলা সমিতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল।

ডা. দেববর্মা একাত্তরে বিপুল সংখ্যক শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের যক্ষা রোগের চিকিৎসাসহ নানাধিক চিকিৎসা সহায়তা দিয়ে আমাদের অকৃত্রিম বন্ধুতে পরিণত হয়েছেন।

ডা. গোবিন্দ ছিলেন জি.বি হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে কর্মরত। একাত্তরে তিনি লোকাল মেডিসিন টিমের চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর দায়িত্ব পড়ে স্থানীয় চিকিৎসকদের সমন্বয় করে শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধদের চিকিৎসা সহায়তা দেয়ার। তাঁর কর্মস্থান নির্ধারণ করা হয় আগরতলা শহর। তিনি এবং তাঁর টিম প্রতিদিন প্রায় বারোটি শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন এবং প্রায় ৪০০ এর মত রুগী দেখেন।[১৬৬]

তিনি ছিলেন ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। তিনি জি.বি হাসপাতালের সার্জারী বিভাগের সিনিয়র বিশেষজ্ঞ ছিলেন। একাত্তরে দায়িত্ব পান সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সহায়তা দেয়ার। রেডক্রস ও ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সহায়তায় তিনি যুদ্ধে আহতদের চিকিৎসা দিতে সীমান্ত এলাকায় ৮টি ক্যাম্প স্থাপন করেন। তিনি শান্তির বাজারে তাঁর ঘাঁটি স্থাপন করেন।[১৬৭]

একাত্তরে জি.বি ও ভি.এম হাসপাতালের বেশ কয়েকজন সিনিয়র ডাক্তার সেসময় শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবায় কাজ করেন। যেমন-

১. বিভাস পাল চৌধুরী- সার্জারী

২. রণেন চৌধুরী- সার্জারী

৩. এস. কে কর- সার্জারী

৪. বিকাশ ভট্টোচার্য- সার্জারী

৫. এল. ডি কুন্ডু- সার্জারী

৬. এস. বি দত্ত- অর্থপেডিক

৭. কৃষ্ণমোহন চ্যাটার্জি- অর্থপেডিক

৮. মনোজ চক্রবর্তী- অর্থপেডিক

৯. মিস্টার লাহিড়ী- এনেস্থেসিয়া

১০. পি. এল রায়- মেডিসিন

১১. ডি. এল চৌধুরী- মেডিসিন

১২. সোমেন চক্রবর্তী- মেডিসিন

১৩. এস. আর দেব- মেডিসিন

১৪. সুখেন্দ ভট্টাচার্য- মেডিসিন [১৬৮]

এছাড়া আরো বেশ কিছু জুনিয়র ডাক্তার শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সেবায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন।

দাতব্য সংগঠন

সরকারি হাসপাতাল ও চিকিৎসাকর্মীদের পাশাপাশি একাত্তরে স্বাস্থ্যসেবায় সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে দাতব্য সংগঠনগুলো। বিশেষ করে রেডক্রসের ত্রিপুরা রাজ্য শাখা ও ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশান। এছাড়া স্থানীয় আরো অনেকগুলো সংগঠন স্বাস্থ্যসেবায় এগিয়ে আসেন।

একাত্তরে ত্রিপুরায় স্বাস্থ্যসেবার পথ প্রদর্শকের ভূমিকা নিয়েছিল রেডক্রসের ত্রিপুরা শাখা। মূলত মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ত্রিপুরার স্থানীয় মেডিকেল কলেজের ছাত্র, স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা ও সরকারি বেসরকারি স্বাস্থ্যকর্মীরা শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় এগিয়ে আসেন। কিন্তু তাদের কাছে পর্যাপ্ত সরঞ্জাম, ঔষধপত্র ও টাকা পয়সা ছিল না, ছিল না পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ। রেডক্রস এসব বিষয়ে সহায়তা করেন। এপ্রিলের শুরুতে আগরতলা শহরে প্রায় ২,০০০ স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক চিকিৎসার ট্রেনিং দেয়া হয় রেডক্রসের উদ্যেগে।[১৬৯]

বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে চিকিৎসা সেবা দেয়ার জন্য রেডক্রস অস্থায়ী প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলে দেন। শিক্ষানবিস ও স্বেচ্ছাসেবক ডাক্তারদের তত্ত্বাবধান ও সহায়তার জন্য রেডক্রস ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সহায়তা নিয়ে তাদের সাথে প্রশিক্ষিত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ব্যবস্থা করেন। রেডক্রসের উদ্যেগে ৫ লক্ষ শরণার্থীকে কলেরার টীকা দেয়া হয়। এছাড়া প্রায় ১০,০০০ শিশুকে ট্রিপল এনিটজেন ইনজেকশন দেয়া হয়। [১৭০]

রাজ্যের তিনটি জেলায় ১৫টি ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়। এছাড়া অপুষ্টিজনিত বিভিন্ন রোগের আক্রমণ রোধের জন্য সপ্তাহে একদিন করে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মালটি ভিটামিন ট্যাবলেট দেয়া হয়। প্রায় তিন লক্ষ শিশু, প্রসূতি ও বৃদ্ধাকে রেডক্রস দুগ্ধ বিতরণ প্রকল্পের আওতায় এনে বিনামূল্যে দুগ্ধ সরবরাহ করেন। [১৭১]

রেডক্রসের উদ্যোগে রাজ্যের ৭৬টি ত্রাণ শিবিরে চিকিৎসক নিয়োগ দেয়া হয়। শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসাকর্মীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়।[১৭২]

রেডক্রসের উদ্যোগে আগরতলা জি.বি হাসপাতাল মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের চিকিৎসা সেবায় উপযোগী করতে বেশ কয়েকটি উদ্যেগ নেয়া হয়। জি.বি হাসপাতালে মেটারনিটি ওয়ার্ড ও একটি অতিরিক্ত মেডিকেল ওয়ার্ড খোলার জন্য অধিক সহায়তা দেয়া হয়। জি.বি হাসপাতাল ও ভি.এম হাসপাতালকে বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ করা হয়। [১৭৩]

আগস্ট মাসে ভি.এম হাসপাতালকে একটি এক্সরে মেশিন ও জি.বি হাসপাতাল ও ভি. এম হাসপাতালকে আটটি গাড়ি প্রদান করে রেডক্রস।[১৭৪]

প্রশিক্ষিত মেডিকেল কম্পাউন্টার উদ্যোগ নেন রেডক্রস। এজন্য বিলোনিয়া, বিশলগড়, ধর্মনগর, উদয়পুর ও সাবুমে কম্পাউন্টার প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্যোগ নেয়। একাত্তরে ভারতের শরণার্থী শিবিরগুলোতে কলেরা মহামারী আকার ধারণ করে, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে কলেরার প্রকোপ ঘটেনি। ত্রিপুরা রাজ্য রেডক্রস প্রতিনিধি রথীন দত্ত স্পষ্ট করে বলেছিলেন, ‘‘আগরতলা তথা ত্রিপুরায় কলেরার প্রকোপ হ্রাসে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিল রেডক্রস রাজ্য কমিটি, মূলত তাদের তৎপরতা, প্রতিষেধক ও সচেতনতা কর্মসূচি কলেরা মহামারী, শরণার্থী ও ত্রিপুরাকে বাঁচিয়েছিল”।[১৭৫]

এছাড়া রেডক্রস গর্ভবতী ও শরণার্থী মহিলাদের স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টিকর খাবার প্রদানসহ নানাধিক স্বেচ্ছামূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত ছিল।

রেডক্রসের ত্রিপুরা রাজ্য শাখা বেশ কয়েকবার মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় নানা ধরনের ঔষধপত্র, প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম পূর্ব বাংলায় প্রেরণ করেছিল। এককথায় রেডক্রসের ভূমিকা ছিল অনন্য।

পূর্ববঙ্গ থেকে আগত দুর্গতদের এবং আহত মুক্তিযোদ্ধাদের ও সাধারণ মানুষদের চিকিৎসা সহায়তা দেয়ার জন্য ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের ত্রিপুরা শাখা ২টি আলাদা মেডিকেল টিম গঠন করেন। যার একটির দায়িত্বে ছিলেন ডা. গোবিন্দ চক্রবর্তী এবং অপরটির দায়িত্বে ছিলেন ডা. সুনীল রঞ্জন চৌধুরী। ডা. সুনীল রঞ্জন মূলত আগরতলা শহরের বাইরে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন, ডা. চক্রবর্তী পান আগরতলা শহরের দায়িত্ব।[১৭৬] ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সীমান্তবর্তী এলাকার দ্রুত স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার জন্য আটটি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। শান্তির বাজার এলাকায় তাঁর মূল ক্যাম্প স্থাপন করেন। সাধারণ জনগণকে শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবায় এগিয়ে আসার জন্য আহবান জানিয়ে তারা পত্রিকায় সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শরণার্থীদের জন্য ঔষধ, টাকা-পয়সা, চিকিৎসা সরঞ্জাম ও শুকনো খাবার দান করার জন্য এবং যেকোন প্রয়োজনে চিকিৎসা সহায়তায় নিম্নোক্ত ব্যাক্তিদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য-[১৭৭]

১. ডা. এইচ. এস. রায় চৌধুরী, ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, ত্রিপুরা রাজ্য শাখার সভাপতি, ফোন নং ১৩৮।
২. ডা. এম. কে. ভৌমিক, ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, ত্রিপুরা রাজ্য শাখার সম্পাদক, ফোন নং জি, বি, অটো ৪৫।৪২।
৩. ডা. জি. চক্রবর্তী, চেয়ারম্যান, লোকাল মেডিকেল টিম, ফোন নং ৪৪০।
৪. এস. আর. চৌধুরী, সহসভাপতি ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, ত্রিপুরা রাজ্য শাখা, চেয়ারম্যান, মোবাইল মেডিকেল টিম, ফোন নং ৫৯১।

ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন একাত্তরে মূলত রেডক্রসের সহায়তায় শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে চিকিৎসা সেবা দিয়েছে। রেডক্রসসহ অন্যান্য সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ডাক্তার, নার্স, কম্পাউন্ডার ও প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী সরবরাহ করেছে। আবার অন্যদিকে ত্রিপুরার সাধারন জনগণকে শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবায় সম্পৃক্ত করেছে। ত্রিপুরার তরুণ সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করেছে শরণার্থী সেবায়। গড়ে তুলেছে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, যে স্বেচ্ছাসেবকরা বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে, সীমান্ত এলাকায় স্থাপিত ৮টি শরণার্থী ট্রানজিট ক্যাম্পে চিকিৎসা সেবা দিয়েছে। অন্যদিকে গড়ে তুলেছে ত্রাণ তহবিল।

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এনেছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। সমন্বয় করেছে ত্রিপুরা সফররত আন্তর্জাতিক চিকিৎসক দলগুলোর কর্মকান্ড।

ত্রিপুরা পিপলস্ রিলিফ কমিটি সংক্ষেপে যারা পি.আর.সি নামে পরিচিত। একাত্তরে শরণার্থী চিকিৎসা সেবায় ভূমিকা রেখেছিল। পি আর সি তৈকুম্বা ও কলাচড়ায় একটি মেডিকেল স্কোয়াড প্রেরণ করেন। যেখানে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র, একজন এমবিবিএস ডাক্তার, দুইজন সহকারী, দুইজন নার্স রয়েছে। উল্লেখ্য এই দুটি ক্যাম্পে ১১,০০০ শরণার্থী রয়েছে। যাদের মধ্যে প্রায় ৩,০০০ শরণার্থী আমাশয়, ম্যালেরিয়া, ডিপথেরিয়া, নেফ্রাটাটিস, বেরিবেরি ও নানা রকম ব্যাধিতে আক্রান্ত। [১৭৮]

পি.আর.সি ভারতের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজগুলোর শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে ইন্টার্ন শেষ করা ডাক্তারদের শরণার্থী সেবায় এগিয়ে আসার অনুরোধ জানান, আর ত্রিপুরার সাধারণ জনগণকে ঔষধপত্র ও টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করার আহবান জানান।[১৭৯] পি.আর.সি-র পক্ষ থেকে সর্বসাধারণের কাছে আবেদন রাখা হয়েছে যাতে তারা ঔষধ পত্র ও টাকা পয়সা দিয়ে তাদের উদ্দেশ্য সফল করে তোলেন।

সাহায্য পাঠাবার ঠিকানা:

শ্যামল চক্রবর্তী

কনভেনর, পিপলস্ রিলিফ কমিটি

বনমালীপুর, আগরতলা।[১৮০]

এছাড়া পি.আর.সি কাকড়াবন, চড়িলাম, বিশালগড়, সাব্রম, কাঠালিয়া, ফটিকছড়া, মনুবংকুল, কামালপুর, খোয়াই, তেলিয়ামুড়া ও বিলোনিয়াসহ বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে তাদের মেডিকেল টিম প্রেরণ করেন। এই টিমগুলো শরণার্থীদের পাশাপাশি আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা দিয়েছে। শরণার্থী শিবিরগুলোতে কলেরার প্রকোপ বিস্তারে কাজ করেছে। রেডক্রসের সহায়তায় কলেরার টীকা দিয়েছেন। পি.আর.সি-র অধীনে প্রায় দুই হাজার স্বেচ্ছাসেবক বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে স্বাস্থ্যসেবার কাজে নিয়োজিত ছিল।

রিলিফ কো-অর্ডিনেটিং কাউন্সিল, সর্বসেবা সংঘ, বাংলাদেশ সহায়তা সমিতি বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে স্বাস্থ্যোন্নয়নে কাজ করেছে।[১৮১] রাজধানী আগরতলা, খোয়াই, কমলপুরে ঐসময়, গেস্টো-এনট্রাইটিজ রোগ মহামারী আকার ধারণ করলে এই তিনটি সংস্থা কার্যকরী পদক্ষেপ নেই। মেডিকেল টিমও ঔষধপত্র নিয়ে এসব ক্যাম্পে জরুরী চিকিৎসাসেবার ব্যবস্থা করেন।

ত্রিপুরার স্বাস্থ্যবিভাগ, সরকারি হাসপাতাল, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসক, নার্স, কম্পাউন্ডারসহ সকল স্বাস্থ্যকর্মী একাত্ম হয়েছিল বাংলাদেশের সেবায়। প্রতিবেশি যুদ্ধাক্রান্ত একটি রাষ্ট্রের জন্য এই এক অন্য

রকম সহমর্মিতা। এই সহমর্মিতা রণাঙ্গনের যোদ্ধাদের দিয়েছিল আত্মবিশ্বাস, শরণার্থীদের দিয়েছে সর্বোচ্চ সেবা। এতসবের মধ্যেও ত্রিপুরায় প্রকাশিত একাত্তরের কয়েকটি পত্রিকায় শরণার্থী সেবায় চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের অবহেলার চিত্র পাওয়া যায়।

মেলাঘর শরণার্থী শিবিরে বিনা চিকিৎসায় চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচটি শিশুর মৃত্যু : আরও ২০০ রক্ত আমাশয়ে আক্রান্ত

(নিজস্ব প্রতিনিধি) আগরতলা ১৫ ই জুন: আজ অধিক রাতে মেলাঘর থেকে আমাদের সংবাদ প্রতিনিধি ট্রাঙ্ক টেলিফোনে জানিয়েছেন গত চব্বিশ ঘন্টায় মেলাঘরের সাহেবের জুম স্থায়ী ক্যাম্পে অন্যূন পাঁচটি শিশু রক্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। তাছাড়া আরও দু'শ শরণার্থী শিশু এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকটি শিশুর অবস্থা আশঙ্কাজনক।[১৮২]

বিশালগড়ের কোনাবন ব্রজপুর শরণার্থী ক্যাম্পে ১৩ই জুন ৫ জন শিশু মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। অভিযোগে বলা হয় এখানে কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। [১৮৩]

গোকুলনগর ক্যাম্পে চিকিৎসকের ঠিকমত দায়িত্ব পালন না করার অভিযোগ আনা হয়। একই অভিযোগ আসে সাব্রম এর শরণার্থী ক্যাম্পের চিকিৎসার বিরুদ্ধে।[১৮৪]

কয়েকটি অভিযোগ সত্ত্বেও একাত্তরে ত্রিপুরার চিকিৎসা কর্মীদের যে সহযোগিতা সেটা মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অর্জন।

ত্রিপুরার প্রত্যেকটি নাগরিক কোন না কোন ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল এই জনযুদ্ধে। নানা শ্রেনপেশার মানুষ স্ব স্ব অবস্থানে থেকে পালন করেছে যথোচিত ভূমিকা। তারা মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে গেছে চুড়ান্ত লক্ষ্যে। এই সংকটকে মনে করেছে নিজেদের সংকট বলে। তবে এই জনসংগ্রামে সবচেয়ে সরব উপস্থিতি ছিল ত্রিপুরার স্বাস্থ্যকর্মীদের। বিশেষ করে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার থেকে শুরু করে মেডিকেল পড়ুয়া ছাত্রটি পর্যন্ত শামিল হয়েছিল এই সহায়তা কার্যক্রমে। ত্রিপুরার স্বাস্থ্যকর্মীদের অনবদ্য এই সহায়তা সেবা ও ত্যাগের ইতিহাসে ভাস্বর থাকবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ।

চ. মনোবল বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ

শরণার্থীজীবন সবসময় আতঙ্ক আর অস্থিরতার। একদিকে ভিটেমাটি ছেড়ে উদ্বাস্তু জীবন অন্যদিকে পাকিস্তান বাহিনীর বীভৎসতা সাথে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। একাত্তরে বাংলাদেশ থেকে আশ্রয় লাভকারী ত্রিপুরার ১৫ লক্ষ শরণার্থীর জীবনও ছিল এইরকম হাজারো অনিশ্চয়তায় ভরা। ত্রিপুরা এসময়ে

সৌভ্রাতৃত্বের সচেতনাবোধ থেকে অকৃপণ সহায়তা ও সহযোগিতার হাত প্রশস্ত করেছিলেন। সীমান্তের দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন মুক্তিফৌজের প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন এবং নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। সকল দুঃখবোধ ভুলে গিয়ে প্রসারিত করেছিলেন সহযোদ্ধার হৃদয়। ত্রিপুরাবাসীর অভাবিতপূর্ণ ত্যাগ ও অমূল্য অবদান যুদ্ধরত সেনাদলকে যুগিয়েছিল শক্তি ও সাহস।[১৮৫]

ত্রিপুরার স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা, লেখক, কবি, শিল্পী তথা সাংস্কৃতিক কর্মীরা চেষ্টা করেছিল শরণার্থীদের এই হারানো মনোবল ফিরিয়ে আনতে। তাদের আবার স্বাভাবিক করতে। তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে উদ্বদ্ধ করতে নেয়া হয়েছিল বেশ কিছু পদক্ষেপ। বিশেষ করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেমন- নাটক, যাত্রা, কবিতার আসর ইত্যাদির মাধ্যমে চেষ্টা করা হয়েছে তাদের স্বাভাবিক রাখতে। এই কাজটি পুরোপুরিই করেছে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ। এসব সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে কখনোবা ত্রিপুরার নিজস্ব সাংস্কৃতিক কর্মীরা অংশ নিয়েছে, কখনোবা শরণার্থী সাংস্কৃতিক কর্মীরা, আবার কখনো ছিল সম্মিলিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।

১৫ নভেম্বর সূর্য্যমনি নগর শরণার্থী শিবিরে গণসঙ্গীতের আয়োজন করা হয়। আকাশবানী আগরতলার শিল্পী সমির দাস, তাপসী দত্ত, মিহির ভট্টাচার্য্য, দত্তময় দেববর্মণ এতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। নৃত্যে অংশ নেন পাপড়ি ধর, রিক্তা চৌধুরী, কাউছার পারভীন, রুমা, রুপশ্রী ও ঢাকা টেলিভিশনের নৃত্যশিল্পী সঞ্জিত রায়। এছাড়া গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন ঢাকা বেতার শিল্পী ফজলে রাব্বি, রাজমোহন রায়, রিক্তা সাহা, রিক্তা চৌধুরী, শামীমা বেগম ও মৃণাল। [১৮৬]

শরণার্থী জীবনের দুর্বিষহ স্মৃতিকে ভুলিয়ে রাখতে আগরতলার বাইরে নানা ক্যাম্পে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তেলিয়ামুড়ার তোতাবাড়ি ক্যাম্পে আয়োজন করা হয় যাত্রা উৎসবের।[১৮৭] ক্যাম্পের শরণার্থীরা সেটায় বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

শরণার্থীদের মনোবল ফিরিয়ে আনতে, তাদের বিনোদনের জন্য খোয়াই ও মনুবাজার শরণার্থী ক্যাম্পে আয়োজন করা হয় বিচিত্রানুষ্ঠান।[১৮৮] অনুষ্ঠানের আয়োজক স্থানীয় কয়েকজন যুবক। তবে অংশগ্রহনকারীদের অধিকাংশই ছিল ক্যাম্পের শরণার্থী।

নানা ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে ক্যাম্পের তরুণদের যুদ্ধে সক্রিয় অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করা হত। তাদের মনোবল বৃদ্ধিতে ক্যাম্পগুলোতে বক্তৃতার-আলোচনা সভার আয়োজন করা হত। এগুলো দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেকে যোগ দিয়েছে মুক্তিফৌজের ট্রেনিং-এ।

মুক্তিফৌজের ট্রেনিং ক্যাম্পগুলোতেও এই ধরনের উদ্দীপনামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত। বিশেষ করে দেশাত্মবোধক গান, বিপ্লবীদের জীবনী পাঠ করে তাদের উদ্দীপ্ত করা হত।

মেলাঘরের শুভল রুদ্র বলছিলেন, আমরা কয়েকজন রাতে ক্যাম্পে গিয়ে যারা যুদ্ধে যোগ দিবে তাদের সাহস দিতাম। দুলাল তাদের সূর্যসেন, বাঘা যতীন ও ক্ষুদিরামের গল্প শুনাত। শংকর খুব ভাল গান করতে পারত। ফিরার সময় প্রতিদিনই সে একটি গান করত, 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি, মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে অস্ত্র ধরি।' [১৮৯] এছাড়া আগরতলা, ত্রিপুরার অন্যান্য মুক্তিফৌজের ক্যাম্পগুলোতে সাধারণ জনগণ নিয়মিত উদ্দীপনামূলক কার্যক্রম চালাতেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে নিরাপত্তার কারণে তারা বাধাগ্রস্থ হতেন। বড় বড় অপারেশনের আগে যারা অপারেশনে যাবে তাদের উদ্দীপ্ত করতে গণসঙ্গীত কবিতার আসরের আয়োজন করা হত। এটি অন্যদিকে ছিল তাদের সম্ভাব্য বিপদ থেকে মনকে অন্যদিকে সরানোর চেষ্টা। আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একটি অপারেশনে যাব, খুব গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন। যাব সাতজন, একসপ্তাহ ধরে আমাদের সব বুঝিয়ে দেয়া হল, খুব ভয় পাচ্ছিলাম, চার বছরের ছেলের মুখটাই বার বার ভেসে আসছিল চোখের সামনে। অপারেশনের দিন রাতে ক্যাম্পে স্থানীয় এক ছেলে সূর্যসেনের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কাহিনী বলছিলেন, শরীরের রক্তে আগুন ধরে গেল। নিজেকে বুঝালাম পারতে হবে।[১৯০]

ক্যাম্পের শরণার্থীদের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে সাব্রুম নাট্য সংঘের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় তিনদিন ব্যাপী এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। প্রথম দিন মঞ্চস্থ হয় যাত্রা 'মহুয়া সুন্দরীর পালা', দ্বিতীয় দিন হয় নাটক 'সাজাহান', সর্বশেষ দিনে আয়োজন করা হয় গানের আসরের। স্থানীয় শিল্পী প্রতিভা, কংকন, রাজীব, যতীন এতে অংশ নেন। আশেপাশের ক্যাম্পগুলো থেকে অনেকে এসব সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশ নেয়। অংশ নেয় স্থানীয়রাও।[১৯১]

শরণার্থী ক্যাম্পে স্কুল পড়ুয়া ছেলে মেয়েরাও যাতে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, এজন্য নেয়া হয়েছিল কয়েকটি উদ্যোগ। আগরতলার কয়েকজন যুবক ক্যাম্পগুলোতে গিয়ে নিয়মিত স্কুল পড়ুয়াদের পড়াশোনার খোঁজ খবর নিতেন। তাদের জন্য কাগজ পেন্সিল সরবরাহ করতেন। সাব্রুম, বিশালগড় ও বিশ্রামগঞ্জ শরণার্থী ক্যাম্পে স্থানীয় তরুণ স্বেচ্ছাকর্মীদের উদ্যোগে চালু করা হয় ক্যাম্প স্কুল। উদয়পুরে কলেজ পড়ুয়া এক ছাত্রীর উদ্যোগে ক্যাম্পের বাচ্চাদের পড়ার জন্য একটি পাঠশালা খোলা হয়। এই পাঠশালায় এই কলেজছাত্রীটি ছাড়াও বেশ কয়েকটি স্থানীয় মেয়ে পাঠদান করতেন। ক্যাম্পের কয়েকজন শরণার্থী মেয়েও তাতে পরবর্তীতে সেবা দিয়েছিল।[১৯২]

মূলত প্রথমদিকে শিক্ষাটাকে খুব একটা গুরুত্ব দেয়া হয়নি। কিন্তু জুলাইয়ের পরে শরণার্থীরা যখন একটু স্থিত অবস্থায় আসে, যুদ্ধ যখন দীর্ঘমেয়াদি হবে এমন ধারণার জন্ম হয় তখন থেকে স্কুলিং কার্যক্রম শুরু হয়। অনেকে আবার স্থানীয় স্কুলগুলোতে ভর্তি হয়। অনেকে ভর্তি না হয়েও এসব স্কুলে পাঠ কার্যক্রমে অংশ নিতে শুরু করে।

মূল্যায়ন

একাত্তরে ত্রিপুরায় বাঙালির জন্য বাংলাদেশের জন্য যে ঝড় ওঠেছিল, সেই ঝড়ের প্রেক্ষিত বিবেচনায় অনেককেই প্রশ্ন করেছিলাম, কেন সেদিন বাংলাদেশের জন্য একাত্ম হয়েছিলেন। ত্রিপুরার চিত্র সাংবাদিক রবীন সেনগুপ্ত বলছিলেন, এটা আমার পূর্ব পুরুষের ভূমি। ভাষা ও ঐতিহ্যগত মিল আমাদেরকে এই জনযুদ্ধে জড়াতে বাধ্য করেছিল।[১৯৩] একাত্তরে সাড়া জাগানো ভারতীয় সাংবাদিক বিকচ চৌধুরী বলছিলেন, দেশবিভাগ জনিত যে ক্ষোভ ও গ্লানিকে আমরা দীর্ঘকাল লালন করে আসছি, এপারে ওপারে যে অবিশ্বাসের পাহাড় গড়ে তুলেছি, আজ সর্বাগ্রে প্রয়োজন সেই বিভেদের কলঙ্কিত ইতিহাসকে চিরতরে মাটিচাপা দিয়ে এপার ওপারের সীমানা মন থেকে বিসর্জন দিয়ে প্রত্যাশার সবুজ প্রান্তরে নতুন দিনের দুর্জয় প্রতীতিকে ঘরে ঘরে জাগিয়ে তোলা।[১৯৪] সাংবাদিক ও সিপিআইএমের রাজ্য কমিটির সম্পাদক গৌতম দাস বলছিলেন, আমাদের জন্ম বাংলাদেশে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আমরা ত্রিপুরায় এসেছি। স্বভাবতই যখন পূর্ব বাংলায় প্রতিরোধ যুদ্ধ হল, আমরা একজন সৈনিক হিসেবে সে প্রতিরোধে শামিল হই।[১৯৫] আগরতলা জি.বি. হাসপাতালের সিনিয়র সার্জন ডা. রথীন দত্ত বলছিলেন, এই একান্তই মানবিক বিষয়।[১৯৬] সোনামুড়ার সিপিএম নেতা জনার্ধন সেন বলছিলেন, এটা বাঙালির প্রতি বাঙালির সহমর্মিতার বিষয়। মেলাঘরে একাত্তরে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের এম.এল. এ দেবেন্দ্র প্রসাদ চৌধুরীর মতে, ত্রিপুরার সহযোগিতার এই ক্ষেত্রটি তৈরি করেছিল মুজিবের প্রতি ত্রিপুরাবাসীর ভালোবাসা।[১৯৭]

এমবিবি কলেজের অধ্যাপক ও *দৈনিক সংবাদের* তৎকালীন সাংবাদিক মিহির দেব বলছিলেন, অনেকটা অবচেতনভাবেই ত্রিপুরার জনগণ পূর্ব বাংলার সমর্থনে এগিয়ে আসে, এটা তাদের সামনে পূর্বপুরুষদের ঋণশোধের দায়বদ্ধতা থেকে জন্ম নেয়।[১৯৮]

আগরতলার সবচেয়ে পরিচিত কবি কল্যাণব্রত চক্রবর্তী একাত্তরে লিখেছিলেন,

বাংলাদেশ কেঁপে উঠছে আমাদের রক্তের ভিতর

যখন বিপুল রক্তের পদ্মায় তিতাসে ভাসে বান

জখম বিধস্ত চিত্রে আকাশ শয়িত খরসান

যখন চক্রান্ত ভাংগে সাত কোটি মুষ্ঠিতে জর্জর

বাংলাদেশ দৌড়ে আসে আমাদের আত্মার ভেতর।...[১৯৯]

সত্যি বাংলাদেশ সেদিন ত্রিপুরার মানুষের আত্মায় অভিঘাত হেনেছিল। তাইতো নিজ জনসংখ্যার প্রায় সমান শরণার্থীকে সে বুকে টেনে নিয়েছিল। রাজনগর গ্রামের সীমান্তের প্রায় কাছাকাছি কথা হচ্ছিল স্থানীয় কৃষক যতীন সেনের সাথে। একাত্তরের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলছিলেন, আমার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল ২৫ জন লোক। প্রশ্ন করেছিলাম, তারা কি আপনার আত্মীয় ছিল? কৃষক যতীন না সূচক উত্তর দেয়ার পর জানতে চাচ্ছিলাম, তাহলে কেন এই ঝামেলা মাথায় নিলেন। ওরা তো বাঙালি ছিল, জয় বাংলার লোক ছিল।[২০০] একাত্তরে হাজার সাধারণ গৃহস্থ, কৃষক, মজুর একাত্ম হয়েছিল জয় বাংলার জন্য। সোনামুড়ার প্রবীণ সিপিএম নেতা জনার্ধন সেন একাত্তরের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলছিলেন, 'আমাদের বাড়ির সামনে শরণার্থীদের সহায়তা করার জন্য আমি একদিন কিছু চাল, সবজি, ডাল ও আলু রেখে আসি। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম, সেখানে গ্রামের বিভিন্ন মানুষজন চাল, ডাল, সবজি রেখে যাচ্ছে। ঘটনাটি এপ্রিলের শেষের দিকের। এরপর নিয়মিতই গ্রামের লোকজন প্রতিদিন সকালে এই জায়গায় শরণার্থীদের জন্য সাহায্য দিয়ে গেছে। যার কিছু ছিলনা, সেই নিদেনপক্ষে পাশের জঙ্গল থেকে কিছু কচু শাক এনে সেখানে রাখছে'।[২০১] শরণার্থীদের জন্য এই এক অন্যরকম মমত্ব। *দৈনিক সংবাদের* ৪ এপ্রিল প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে সম্পাদক লিখছেন- আমরা দেখতে পাচ্ছি বহুদিনের বদ্ধ নদীর বাঁধ হঠাৎ উন্মুক্ত হওয়ায় সে আজ প্লাবিত হয়ে অগ্রসর হচ্ছে। ...একই চেতনা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য লালিত সমগ্র বঙ্গ ভাষা-ভাষি সমাজ একটি জাতি হিসেবে আজ এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিকতার সম্মুখীন হয়েছে।[২০২]

প্রতি মুহূর্তে পাকিস্তানি বাহিনীর গোলাবর্ষণের বিভীষিকা, ক্যাম্প স্থানান্তরের যাতনা সত্বেও স্থানীয় জনগণ ছিল সহায়ক ভূমিকায়। একজন কিশোর শরণার্থী স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন, 'আমাদের প্রতি স্থানীয় বাসিন্দাদের সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত ছিল বহু দূর পর্যন্ত। ওদের জমি, সম্পদ, অর্থ ও সার্বিক সহায়তা না পেলে আমরা ভারতে থাকতে পারতাম না। তখন অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিসহ এলাকার সার্বিক পরিবেশের ব্যাপক অবনতি হয়েছিল। তাছাড়া আইন শৃঙ্খলাও নষ্ট হয়েছে অনেক। তাদের এসব উদারতা কখনো ভোলার নয়'। আরো লিখেছেন, 'ক্যাম্পবাসীরা স্থানীয় জনগণের উপর কম জুলুম করেনি। তাদের ক্ষেতের ফসল চুরি, ডালপালা ভাঙ্গা, ছোট পুকুরে শত শত লোকের গোসল

করা, সময়ে অসময়ে তাদের বাড়িতে যেয়ে এটা সেটা চেয়েও বিরক্ত করেছে। তবে স্থানীয় জনগণ যে উদারতার পরিচয় দিয়েছে, সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে তা অকল্পনীয়।'[২০৩]

মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরাবাসী এগিয়ে এসেছিল বিপুলভাবে। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ভূমিকা ছিল বহুমুখী। মেজর কামরুল হাসান সেদিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখছেন, 'আমাদের বেশ-ভূষা, হাতের অস্ত্র আর বাচন ভঙ্গিতেই ত্রিপুরাবাসী আমাদের চিনে ফেলত। বক্সনগর বা মতিনগর থেকে ছোট জিপ বা ট্যাক্সিতে গাদাগাদি করে কখনও উঠতে গেলে দেখেছি বয়স্ক লোকজনও গাড়ি থেকে নেমে জায়গা করে দিয়েছেন, দরিদ্র দোকানি জিনিষপত্রের দাম নিতে রাজি হয়নি। মেলাঘর বাজারে শ্রী শ্রী কুন্ডেশ্বরী হোটেলে ভাত খেতে বসেছি। পৈতাপরা ব্রাক্ষ্মণ মালিক কাছে এস কানে কানে বলল, দাদা জয় বাংলার লোক? প্রশ্ন শুনে চমকে উঠেছি। পরমুহূত্বেই বললেন, ভয় নেই চুপচাপ খেয়ে যান।। সত্যিকারের জাত গেছে কিনা জানি না তবে মনুষ্যত্ব জিতেছে।'[২০৪]

ত্রিপুরার জাতি-উপজাতি-সংখ্যালঘু নির্বিশেষে মুক্তিসংগ্রামীদের পাশে সকল অংশের মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হেটেছেন একাত্তরের অস্থির টালমাটাল দিনগুলিতে। কে ভূমিপুত্র, কে বহিরাগত, এসব বিতর্ক মনেই আসেনি সে সময়।[২০৫] এভাবে মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ঘটে। সাধারণ মানুষ, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী-সাহিত্যিক একাত্তরে রাস্তায় নেমেছিল বাংলাদেশের স্বপক্ষে। তাদের সম্মিলিত প্রয়াস ছাড়া আমাদের মুক্তি মিলত না।[২০৬] তখন রাজ্যের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জায়গা করে নেয় দেশত্যাগী মানুষ। ঠিক এমনি সমস্যাসঙ্কুল অবস্থায় পড়ে শিক্ষা বিভাগ জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে স্কুল খোলার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু সে উদ্যোগ সফল হয়নি স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধের মুখে। ত্রিপুরাসমাজের বিবেকবান অংশ নিজেদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার চরম ক্ষতি স্বীকার করেও শরণার্থীদের ঠাঁইহীন করতে চাইনি।[২০৭]

সত্যব্রত চক্রবর্তী ত্রিপুরাবাসীর ধৈর্য্যের প্রশংসা করে লিখেছেন, সীমান্তে গ্রামের পর গ্রাম ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে পালিয়ে গেছে ত্রিপুরার নরনারী, শিশুবৃদ্ধ। পাকিস্তানি বাহিনীর ক্রমাগত গোলা, মর্টার নিক্ষেপে বিধ্বস্ত হয়েছে ত্রিপুরা গ্রাম। গোলায় প্রাণ হরিয়েছে বহু মানুষ। বহু পরিবার হয়েছে নিঃস্ব। এতো প্রতিকুলতা সত্ত্বেও ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ পরম সহিষ্ণুতা এবং সাহস নিয়ে গোটা পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছেন শুধু বাংলাদেশ স্বাধীন হবে আজ হোক, কাল হোক এই আশায়।[২০৮] এসব ভাষ্য থেকে উপলব্ধি করা যায়, মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ কী অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিল। রাজনীতিবিদ, সুধীজন ও বুদ্ধিজীবী সমাজের জন্য সামাজিক অবস্থানের জন্য রাজনৈতিক সচেতনতার

মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে কাজ করা ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ। সাধারণ মানুষের কাছে তা সমস্যা ছাড়া কিছু ছিল না। কিন্তু একান্ত মানবিক দিক বিবেচনায় তারা শত কষ্ট ও যাতনাকে অস্বীকার করে মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছে। সার্বিক কার্যক্রমকে তারা নিয়েছিল একান্ত অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবে।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ত্রিপুরার সাধারণের সমর্থন ও সক্রিয়তা ছাড়া সাফল্য পেত না। বিপুল শরণার্থীর সমাগম, অর্থনৈতিক চাপ, পরিবেশগত বিপর্যয় সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ তাদের গ্রহণ করেছিল প্রসন্ন মনে। ছিল তাদের ওপর নানাবিধ চাপ। তা সত্ত্বেও সারওয়ার আলী লিখেছেন, আগরতলার অধিবাসীদের মধ্যে কোনো বিরক্তি লক্ষ করিনি বরং যার যেটুকু সম্ভব তা নিয়ে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছে।[২০৯]

সরকার সমাজের প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ সামর্থ্য ও শক্তি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সুদৃঢ় অবস্থান নিয়েছিল। কেন্দ্রের প্রভূত সমর্থন ও সাহায্য ছিল। কিন্তু স্থানীয় জনগণের আন্তরিক ভূমিকা ছাড়া শুধু অর্থনৈতিক সাহায্য ও নির্দেশনা দিয়ে এ ঘোর অমানিশা কাটানো সম্ভব ছিল না। নানা শ্রেণিপেশার মানুষ স্ব স্ব অবস্থান থেকে পালন করেছে যথোচিত ভূমিকা। তারা মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে গেছেন চূড়ান্ত লক্ষে। এজন্য শত সমস্যা ও যন্ত্রণাকে তারা মাথা পেতে নিয়েছিল। এ সঙ্কটকে মনে করেছিলেন নিজেদের সঙ্কট হিসেবে। ত্রিপুরা রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ সেই অসাধারণ সম্প্রীতির দিনগুলি স্মরণ করে বলেছেন, '১৬ লাখ ত্রিপুরাবাসীর আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠেছিলেন বাংলাদেশের ১৫ লাখ শরণার্থী। তখন হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে কোন ভেদ ছিল না। ভেদ ছিল না জাত-পাতের, ভারত বা বাংলাদেশের। তাদের সবারই তখন একটি মাত্র পরিচয় ছিলঃ আমরা বাঙালি। শুধু ত্রিপুরার স্থায়ী বাসিন্দাদের কথাই বলি কেন, পাহাড় বন্দরের অধিবাসীরাও তাদের বাড়িঘরে সাদরে আশ্রয় দিয়েছিলেন বাংলাদেশের বিপন্ন-বিপদগ্রস্ত শরণার্থীদের। এইভাবে ১৯৭১-এর পুরো ন'মাস ত্রিপুরা হয়ে ওঠেছিল মহামানবের মিলন বা তীর্থস্থান। এই আত্মিক মেলবন্ধনই বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের বিষয়টিকে প্রভূত সাহায্য করেছিল। যুগিয়েছিল বাঙালি জাতিকে প্রেরণা, দিয়েছিল সাহস। বিপদের দিনের সেই বন্ধুত্ব আজ ইতিহাস।'[২১০]

১ এপ্রিল ১৯৭১ *দৈনিক সংবাদ* 'ওপারের রক্তস্রোতঃ এপারে প্রতিক্রিয়া' শীর্ষক উপ-সম্পাদকীয় এর লেখক অরুনোদয় সাহা তুলে ধরেছেন একজন সাধারণ পথচারী, তরুণ কবি, চিত্রশিল্পী, দিনমজুর, ব্যবসায়ী, অধ্যাপক, পুলিশের দারোগা কিংবা একজন নকশালপন্থী কেন এই জনযুদ্ধে শামিল হলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তাদের প্রত্যাশাইবা কি থাকবে।

পেশায় ড্রাইভার শ্রমিক নেতা বাবুল সেনগুপ্ত বলছিলেন সরকার সাহায্য না করলে আমরাই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে যাব। অধ্যাপক কার্তিক লাহিড়ী বলছিলেন, ওপার বাংলার যুদ্ধ আসলে মুক্তিযুদ্ধ; অন্যায় অসাম্যের বিরুদ্ধে বাঙালির যুদ্ধ বলে কথা নয়, মুক্তির যুদ্ধ বলেই তিনি তাকে সমর্থন করেন। চিত্রশিল্পী অসিত পাল বলেন, প্রয়োজনে তিনি তুলি ছেড়ে রাইফেল তুলে নিতেও কুণ্ঠিত হবে না।[২১১]

একাত্তরে ত্রিপুরায় শরণার্থী ছিলেন এমন একজন পরবর্তী সময়ে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখছেন, ‘ আগরতলার সাধারণ মানুষ কোন বাংলাদেশীকে দুস্থ কিংবা উদ্বাস্তু মনে করেননি। অতিথির আগমনে বাড়ির লোকজন যেমনি আনন্দবোধ করে, ত্রিপুরার জনগণ বাংলাদেশীদেরকে তেমন ভাবেই গ্রহন করেছিল’।[২১২]

একাত্তরে ত্রিপুরার বিপুল সংখ্যক শরণার্থী প্রবেশের ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় ভয়াবহভাবে। একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে জনসংখ্যার সমান শরণার্থী আশ্রয় নিলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়াটাই স্বাভাবিক। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ত্রিপুরার জনজীবনে ভয়াবহ প্রভাব পড়ে। শরণার্থীদেরও এর জন্য প্রতিকূলতা পোহাতে হয়। এপ্রিলের শুরুতে ত্রিপুরায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যে মূল্য দেখা যায় আগস্ট-সেপ্টেম্বরে গিয়ে সেটি দ্বিগুণ হয়ে যায়। বিশেষ কয়েকটি পন্যের দাম বেড়ে যায় ভয়াবহভাবে। বেড়ে যায় কালোবাজারি ও মুনাফাখোরদের দৌরাত্ম্য।

এপ্রিলের ১৯ তারিখে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার শরণার্থী সহায়তায় শরণার্থী পিছু আর্থিক সহায়তা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। জনপ্রতি শরণার্থীর জন্য বরাদ্দ রাখা হয় ৪৫ পয়সা। সেই বরাদ্দ তালিকায় সেই সময়কার বাজারমূল্যের ধারণা পাওয়া যায়।[২১৩]

চাল- প্রতি কেজি ৩০ পয়সা

আলু- প্রতি কেজি ৪৫ পয়সা

ডিম- প্রতি হালি ৫০ পয়সা

লবন- প্রতি কেজি ৫০ পয়সা

আটা- প্রতি কেজি ৮০ পয়সা

কেরোসিন- প্রতি লিটার ৭০ পয়সা

চিনি- প্রতি কেজি ৯০ পয়সা

সয়াবিন- প্রতি লিটার ২ পয়সা

ডাল- প্রতি কেজি ১ টাকা

যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় প্রায় দ্বিগুণ। ১৯ আগস্ট *দৈনিক সংবাদ* পত্রিকায় 'সোনামুড়া অঞ্চলে জনজীবনে দুর্ভোগ' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দর উল্লেখিত হয়।[২১৪]

লবণ-৮০ পয়সা (কেজি)

কেরোসিন- ১-১.২৫ টাকা

ডাল- ২-২.৫০ টাকা

সয়াবিন- ৬-৬.২৫ টাকা

চিনি প্রায় দুষ্প্রাপ্য, প্রতি কেজি তিন টাকা ধরে বিক্রি হওয়ার সংবাদ পত্রিকায় পাওয়া যায়।

নভেম্বরে সাব্রুম এলাকার দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতির বিবরণ পাওয়া যায় স্থানীয় এসডিওর এর রিপোর্টে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় জনজীবনে দুর্ভোগের কথা পত্র মারফত তিনি জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে। দ্রব্যমূল্য এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, তিনি আশঙ্কা করছিলেন স্থানীয় খাদ্য গুদামের নিরাপত্তা নিয়ে। সরকারের কাছে আবেদন করেছেন এর নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য।[২১৫] মহকুমা প্রশাসকের কাছে জানা যায় সয়াবিন তেলের দাম এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে সাব্রুমের কোন দোকানে তেল নেই। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে কেরোসিন, চিনি ও আটার দাম বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েকগুণ। তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। কিন্তু এত বেশি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার পরও ত্রিপুরার লোকজন বিষয়টাকে মেনে নিয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে। বলছিলেন সোনামুড়ার সাধারণ গৃহস্থ যোগেশ মহাজন, 'আমরা শরণার্থীদের কখনো বোঝা মনে করিনি।'[২১৬]

শরণার্থীদের অনেকে কম টাকায় শ্রম দেয়ায় শ্রম বাজরে সৃষ্টি হয় সংকটের। স্থানীয় শ্রমিকরা কোন কাজ পাচ্ছিলেন না। এসব নিয়ে স্থানীয়দের সাথে ছোট-খাট কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা যে ঘটেনি তেমনটি নয়। শরণার্থী পুনর্বাসনের কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অধিকাংশ স্কুল কলেজ। শিক্ষা কার্যক্রম হয়েছে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত। তদুপরি অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীরই এই সময়ে নানাবিধ স্বেচ্ছাশ্রমে শরণার্থী শিবিরগুলোতে নিয়োজিত ছিল। বিশেষ করে পুরো এপ্রিল মাস জুড়ে স্কুল কলেজগুলোই ছিল প্রাথমিক আশ্রয়স্থল। শরণার্থীদের চাপে সোনামুড়া, বিলোনিয়া, উদয়পুরে সমস্ত স্কুলের সাধারণ বৃত্তি পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়।[২১৭]

শরণার্থীরা বয়ে এনেছেন বেশ কিছু ছোঁয়াচে রোগ। কলেরায় শরণার্থী শিবিরগুলোতে অনেকে মারা যাওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় অনেক লোক এতে আক্রান্ত হন। আগরতলার জিবি হাসপাতাল ও ভি এম

হাসপাতালে স্থানীয় অনেকেই কলেরা আক্রান্ত হয়ে এই সময় ভর্তি হন। মারা যান অনেকেই। এছাড়া জয় বাংলা (চোখ ওঠা) রোগ তো ছিলই।

পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে এই ধরণের বৈপরীত্যে স্থানীয়দের সাথে শরণার্থীদের সংঘর্ষ হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু অপার বিস্ময়ে আমরা লক্ষ্য করেছি ত্রিপুরার ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটেনি। শরণার্থী চাপে আগরতলার স্যানেটিশন, জল সরবরাহ, স্বাস্থ্য পরিসেবা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু এখানকার মানুষ নিজেরা কষ্ট সহ্য করে ও শরণার্থীদের দিল আশ্রয়, খাদ্য ও আশ্বাস।[২১৮] কিন্তু কেন? মানবিকতা কি এর একমাত্র কারণ ছিল? এই প্রশ্নটি করেছি অনেককেই। সাব্রুম, বিলোনিয়া, মেলাঘর, চোত্তাখোলা, বিশালগড়, উদয়পুর, আগরতলার সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী সবার একই উত্তর। পূর্বপুরুষদের দেশ, বাংলা ভাষা তাদের আবেগে অভিঘাত হেনেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালিদের সমর্থনে ত্রিপুরায় যে মিছিলগুলো বের হত, তার একটি জনপ্রিয় স্লোগান ছিল-

‘এপার বাংলা ওপার বাংলা, জয় বাংলা জয় বাংলা।’

এই একটি মাত্র স্লোগানেই বাংলা ও বাঙালিদের প্রতি ত্রিপুরাবাসীর আবেগ বোঝা যায়। বোধ করি শুধু বাঙালিত্বের টানেই কষ্টকে কষ্ট ভাবেনি ত্রিপুরাবাসী। ত্রিপুরায় অবস্থিত বৃহৎ বাঙালি জনগোষ্ঠীর (প্রায় ৯৫ শতাংশের) পূর্ব নিবাস পূর্ববঙ্গ তথা আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ। তাদের ভাষা যেমন এক ও অভিন্ন তেমনি কৃষ্টি ও সভ্যতা, কেবল কিছুটা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ছাড়া প্রায় সবই এক, তাই ভারত ভাগ হলেও এই সৃজনশীল মানসিকতার দায়বদ্ধতার জন্যই জয় বাংলার মুক্তি সংগ্রামে ত্রিপুরার তৃণমূল মানুষ পাশে দাঁড়িয়েছিল।

ত্রিপুরার রাজপথে মিছিলে স্লোগান উঠত- ‘হিন্দু মুসলমান জানি না- বাঙালি ছাড়া মানি না।’

সত্যিকার অর্থে জাতি-উপজাতি, ধর্ম, দেশ সবকিছু ভুলে ত্রিপুরার তৃণমূল শুধুমাত্র পূর্ব পুরুষদের রক্তের জন্য একত্র হয়েছিল। ড. সিরাজউদ্দীন আমেদের লেখায় উঠে এসেছে সেই একত্র হওয়ার বর্ণনা। ‘এ বাড়িতেও সীমান্তপারের খবরগুলো আমাদের উত্তেজিত করতে লাগল। কাজের ফাঁকে কলেজে এবং বাড়িতে সেইসব খবর আমাদের বেশ ভাবিয়ে তুলল। আমাদের মধ্যে অনেকে দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গবাসী। তাদের অনেক আত্মীয় স্বজন পূর্ববঙ্গে। তাদের উৎকণ্ঠা ছিল সবচেয়ে বেশি।’[২১৯]

ভৌগোলিক দিক থেকে গুরুত্ববহ ত্রিপুরা রাজ্যের তিন দিকেই রয়েছে বর্তমান বাংলাদেশ। উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্বাংশের কিছু অংশ দ্বারা পরিবেষ্টিত এই রাজ্য পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর আক্রমণের

লক্ষ্যবস্তু যেমন ছিলো, তেমনি মুক্তিবাহিনী বা ভারতীয় বাহিনীর কাছেও সমান গুরুত্ববহ ছিলো পাকিস্তানিদের আঘাত হানার জন্য।

পাকিস্তানি গোলার আঘাতে ত্রিপুরার অনেক বেসামরিক নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন। পঙ্গুত্ব বরণ করেছিলেন অনেকেই। বহু ঘর-বাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। শত শত মানুষ বাঁচার তাগিদে গ্রাম থেকে গ্রামে পালিয়ে বেড়িয়েছেন, থেকেছেন নিজ দেশে পরবাসী হয়ে। সেই সময় পাকিস্তানি বাহিনীর ত্রিপুরার বেসমারিক নাগরিকদের উপর হামলার কয়েকটি সংবাদ নিচে তুলা ধরা হল। যেগুলো ১৯৭১ সালে ত্রিপুরার স্থানীয় পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হয়েছিল।

... পাক সেনাদের গুলী বর্ষণের ফলে সোনামুড়ায় দুর্গানগর গ্রামে জনৈকা ভারতীয় মহিলা আজ গুলীবিদ্ধ হয়েছে।গতকাল পাক সেনাবাহিনীর গুলীতে আহত ভারতীয় নাগরিক আমাদ আলী আজকে আগরতলায় মারা গেছে। ...[২২০]

... আজ মধ্যাহ্নে পাক বাহিনী আখাউড়া সীমানা চৌকির উপর প্রচন্ড আক্রমণ চালিয়ে চৌকির প্রান্ত দখল করে নিয়েছে। ... গুলীতে নিহত হয়েছে ১ জন, আহত ৫ জন, তার মধ্যে একটি শিশু... রামনগর, জয়নগর, জয়পুর, রাজনগর, পুরান রিজার্ভ চৌমুহনী, আইজি'র অফিস, সচিবালয় প্রাঙ্গণ, নেতাজী সুভাষ চৌমুহনী, কামান চৌমুহনীর টেলিফোন একচেঞ্জ প্রভৃতি স্থানে পাক সেনা বাহিনীর মেশিনগানের অবিশ্রাম গুলী এসে পড়ে....[২২১]

...সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামে পাক বাহিনীর প্ররোচনামূলক গোলাবর্ষণ ও অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপে অন্যূন একাশিজন প্রাণ হারিয়েছেন, আহতের সংখ্যা দুই শতাধিক।[২২২]

... পাক সামরিক বাহিনী আগরতলা থেকে ৮ মাইল দূরবর্তী বামুটিয়ার জলিলপুর শরণার্থী শিবিরে ও পার্শ্ববর্তী গ্রামে প্রায় আধমাইল ভিতর থেকে ১৩ জনকে বেয়নেট চার্জ ও গুলি করে হত্যা করে এবং ৯ জন আহত হয়। প্রায় ঘন্টা দেড়েক পাক বাহিনী বিনা বাধায় লুণ্ঠন, অত্যাচার চালাবার পর ফিরে যাওয়ার সময় ৪ জন তরুণীকে নিয়ে যায়। প্রায় ঘন্টা তিনেক পরে এই তরুণীদের ফেরৎ দিয়ে যায়...যারা নিহত হয়েছেন- ওসমান, নাজীমুদ্দিন, মৈতুন বিবি, কাচন দাস, আড়াই দাস, ছাক্কু বিবি, আবু তাহের, জ্ঞান বৈশ্য, আবদুল হাই, আজিমুদ্দিন, শকুন্তলা, রহমানের স্ত্রী ও নুরুল ইসলাম।[২২৩]

অব্যাহত শরণার্থী চাপ ও সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে পাকিস্তানি বহিনীর ক্রমাগত শেলিংয়ের ফলে সীমান্ত অঞ্চলের ত্রিপুরাবাসীরা একসময় উদ্বাস্তু হতে শুরু করে। ত্রিপুরার লোকজন হয়ে উঠে নিজ দেশে

পরবাসী। বিশেষ করে সোনামুড়া, চোত্তাখোলা, সাব্রুম, ধর্মনগর, গঙ্গানগর এসব সীমান্ত গ্রামগুলোর অধিকাংশ ভারতীয় পরিবার পাকিস্তানি আক্রমনের ভয়ে ভিটে-মাটি ছেড়ে অন্য জায়গায় আশ্রয় নেন। কোন কোন গ্রামে পুরুষরা থাকলে ও মহিলা ও শিশুদের অন্য জায়গায় নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ত্রিপুরার লোকজন কিভাবে নিজ দেশে পরবাসী হয়েছে সেটা ফুটে উঠেছে নিচের প্রতিবেদনে।

... পাক চমুদের গোলাবর্ষণের ফলে এই গ্রামের সমস্ত অধিবাসী আজ গৃহহারা হয়ে আজ আমরা অনাহারে দিন কাটাইতেছি। কল্পনা করিতে পারি নাই যে, ভারতে বসবাস করিয়া ভারতের নাগরিক হইয়া গৃহহারা ও অন্নাভাবে দিন কাটাইতে হইবে...[২২৪]

২৫ অক্টোবর ১৯৭১ পর্যন্ত সরকারি হিসেবে ত্রিপুরায় ১৫১ জন বেসামরিক ভারতীয় নাগরিক নিহত হন।[২২৫] যেটা একসময় ২০০ জন ছাড়িয়ে যায়। আহত হয়েছেন প্রায় ৭০০০, যাদের মধ্যে পঙ্গত্ব বরণ করেছে প্রায় ১৫০০ বেসামরিক ভারতীয় নাগরিক।

উপসংহার

একাত্তরের মুক্তিসংগ্রাম ত্রিপুরার মতো একটি সীমান্তবর্তী জনপদে পনেরো লক্ষাধিক বিপন্ন নর-নারী-শিশু আশ্রয় নিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ এ রাজ্যের মানুষের প্রাত্যহিক জীবন, আর্থ-সামাজিক স্থিতি ও বসবাসকে বিপন্ন করেছিল। রক্তে রনন, চেতনায় দ্রোহ ঢেলে ফেলে আসা জীবনের কথা মনে করিয়েছিল অনেককেই। একাত্তরের মুক্তিসংগ্রাম এখানে এসে সত্যিকার জনযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করেছে। সভা, সমিতি, বিক্ষোভ মিছিল, শোভাযাত্রায় ত্রিপুরার জীবন যাত্রার অষ্টপ্রহর ছিল কোলাহলমুখর। কত শতবার যে ইয়াহিয়া ভুট্টোর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ত্রিপুরার প্রত্যেকটি নাগরিক কোন না কোন ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল এই জনযুদ্ধে। প্রধানমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিং থেকে শুরু করে সাব্রুমের কোন সাধারণ গৃহস্থ বধূ সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিল এই জনসংগ্রামে। গ্রামের খুব সাধারণ গৃহস্থ নিজের আহার যোগানোটা যার কাছে অনেক কঠিন, আশ্রয় দিয়েছেন কোন উদ্বাস্তু পরিবারকে। যার পক্ষে আশ্রয় দেয়া সম্ভব হয়নি সেই হয়তো পুকুরের একটি মাছ, কিংবা একটি কচু, শাক বা দু'মুঠো চাল দিয়ে সহায়তা

করেছেন কোন এক শরণার্থীকে। ড. সারওয়ার আলী লিখেছেন, তিনি তাঁর কয়েকমাসের শিশুসন্তানের জন্য রাস্তার মোড়ের দোকান থেকে বোতলের দুধ নিয়ে আসতেন। তাঁর চেক লুঙ্গি দেখে দোকানি তাকে শরণার্থী হিসেবে সনাক্ত করে এবং এরপর থেকে দুধের দাম নিতে অসম্মতি জানায়।[২২৬]

এই ঐতিহাসিক সাফল্যের পেছনে ওপারের বাঙালির বুকের তাজা খুনের সঙ্গে এপারের বাঙালির মর্মছেঁড়া আবেগ ও সক্রিয় সেবাও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে ছিল। এই লড়াইয়ে সীমান্তের দুই পারের বাঙালিই তাই আনন্দের সমান অংশীদার।[২২৭] পাড়ার যুবক থেকে শুরু করে, স্কুল পড়ুয়া ছেলেটি, বয়স্ক প্রোঢ় লোকটি, স্কুল কিংবা কলেজ পড়ুয়া তরুণীটি কখনোবা শরণার্থী ক্যাম্পে, কখনোবা ত্রাণ সংগ্রহে, কখনোবা মিছিলে দীর্ঘ নয়মাস জড়িয়ে পড়েছিল এক অন্যরকম জনযুদ্ধে।

তথ্য নির্দেশ

১. ফজলুল বারী, *একাত্তরের আগরতলা*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৯

২. মুহাম্মদ সামাদ (সম্পা.), *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ উৎসব স্মরণিকা*, আগরতলা, ১১-১৩ জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ৫

৩. হারুন হাবীব, *মুক্তিযুদ্ধ ডেটলাইন আগরতলা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ২৬

৪. মুনতাসীর মামুন, *ইতিহাসের খেরোখাতা*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১০৩

৫. প্রাগুক্ত

৬. রাজু ভৌমিক, *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরা (প্রামাণ্যচিত্র)*, আগরতলা, ২০১৬

৭. হারুন হাবীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

৯. সাক্ষাৎকার, ত্রিপুরার মহারাণী বিভু কুমারী দেবী, ১৭ নভেম্বর ২০১৬, কলকাতা

১০. কল্যাণব্রত চক্রবর্তী (সম্পা.), *এপারে একাত্তর*, অক্ষর, ত্রিপুরা, ১৯৯৭, পৃ. ১২

১১. অমিতাভ ভট্টশালী, শেখ মুজিবুর রহমান কবে গিয়েছিলেন আগরতলায়?, *বিবিসি বাংলা*, লন্ডন, ১৭ ডিসেম্বর ২০১৫

১২. প্রাগুক্ত

১৩. মুনতাসীর মামুন, *বঙ্গবন্ধু কীভাবে আমাদের স্বাধীনতা এনেছিলেন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৪২

১৪. প্রাগুক্ত

১৫. রাজু ভৌমিক, প্রাগুক্ত

১৬. হারুন হাবীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

১৭. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ২ মার্চ ১৯৭১

১৮. বিকচ চৌধুরী, *লক্ষ মুঠিতে ঝড়ের ঠিকানা*, ত্রিপুরা দর্পণ, আগরতলা, ২০০৩, পৃ. ৭

১৯. আবুল আজাদ, *মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরার সংবাদপত্রের ভূমিকা*, রাইটার্স ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ২০০৪

২০. সাক্ষাৎকার, ক্যাপ্টেন বি. আর. চ্যাটার্জি, আগরতলা, ২৭ মার্চ ২০১৪

২১. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ৮ মার্চ ১৯৭১

২২. ভারত সরকার, *রাজ্যভিত্তিক জনসংখ্যার খতিয়ান*, কলকাতা, ১৯৭১, পৃ. ৭৩

২৩. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১

২৪. বিমল প্রামাণিক, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা*, পত্রলেখা, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৬৩

২৫. হারুন হাবীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

২৬. অনিল ভট্টাচার্য, ত্রিপুরার সংহতি, *কাগজ*, বর্ষ ২, সংখ্যা ১, কলকাতা, ১৯৯১

২৭. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল ১৯৭১

২৮. রমেশ দাস, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বোধজং স্কুল, *স্কুল স্মরণিকা*, আগরতলা, ১৯৯৬, পৃ. ২৫

২৯. সংবাদটি নিম্নরূপঃ

মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে বিদ্যালয়ের অর্থ প্রদান

আগরতলা ১৯ শে জুন ঃ স্বাধীন বাংলার সত্যিকারের ইতিহাস যেদিন লেখা হবে সেদিন ভারতবাসীর সহৃদয়তার কথা স্বর্ণাক্ষরে না লিখলে সেটা হবে মিথ্যা ইতিহাস। আজ বোধজং স্কুলে এক ভাষণে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে শ্রী লুৎফল হাই সাচ্চু একথা বলেন।বোধজং উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারীদের পক্ষে মোট আটশ বারো টাকা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তাদের হাতে তুলে দেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী ব্যোমকেশানন্দ ভট্টাচার্য।এই অনুষ্ঠানে ছাত্ররা বিদায়ী প্রধান শিক্ষক শ্রী বীরবল্লভ সাহাকে বিদায় অভ্যর্থনা জানায়। শ্রী সাহা ছাত্রদের কাছে বাংলাদেশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র শৃঙ্খলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। স্কুলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমান রাণা বলবীর জংও ভাষণ দেন।

দৈনিক সংবাদ, আগরতলা, ১ এপ্রিল ১৯৭১

৩০. *দৈনিক জাগরণ*, আগরতলা, ২ এপ্রিল ১৯৭১

৩১. *দৈনিক জাগরণ*, আগরতলা, ২৪ জুলাই ১৯৭১

৩২. *সাপ্তাহিক সমাচার*, আগরতলা, ৯ মে ১৯৭১

৩৩. *দৈনিক জাগরণ*, আগরতলা, ১৬ মে ১৯৭১

৩৪. হাসান হাফিজুর রহমান(সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, পঞ্চদশ খণ্ড, পৃ. ৪৪৪*

৩৫. ফজলুল বারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

৩৬. আবুল আজাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

৩৭. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ২১ মে ১৯৭১

৩৮. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ৫ এপ্রিল ১৯৭১

৩৯. *সাপ্তাহিক সমাচার*, আগরতলা, ৫ এপ্রিল ১৯৭১ [সুকুমার বিশ্বাস(সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে আগরতলা ত্রিপুরা দলিলপত্র*, ইত্যাদি, ঢাকা, ২০০৭]

৪০. *সাপ্তাহিক সমাচার*, আগরতলা, ২ মে ১৯৭১ [সুকুমার বিশ্বাস(সম্পা.), প্রাগুক্ত]

৪১. সাক্ষাৎকার, গৌরাঙ্গ ঠাকুর, মেলাঘর, ২৩ জুলাই ২০১৪

৪২. *সাপ্তাহিক গণসংহতি*, আগরতলা, ৮ মে ১৯৭১

৪৩. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ২৩ জুন ১৯৭১

৪৪. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ৩ জুলাই ১৯৭১

৪৫. সংবাদটি নিম্নরূপঃ

প্রদর্শনী ম্যাচে রাজ্য দল ২-১ গোলে জয়ী

(নিজস্ব প্রতিনিধি) আগরতলা ৫ই জুলাই ঃ গতকাল আসাম রাইফেলস ময়দানে আয়োজিত ফুটবল ময়দানে আয়োজিত প্রদর্শনী ফুটবলে রাজ্য একাদশ ২-১ গোলে শরণার্থী একাদশকে পরাজিত করেছে।

প্রথমার্দ্ধে রাজ্য দলের ডি ঘোষ গোল করে এগিয়ে গেলেও মিনিট দুয়েক বাদেই বিজিত দলের অধিনায়ক কে আবাদ গোলটি পরিশোধ করে দেন। রাজ্য দলের পক্ষে জয়সূচক গোলটি করেচেন হারাধন দাশ দ্বিতীয়ার্দ্ধের মাঝামাঝি সময়ে। খেলা শুরু হওয়ার আগে বাংলাদেশ ক্রীড়া সমিতির সাধারণ সম্পাদক মিঃ লুৎফুর রহমানের সাথে দু'দলের খেলোয়াড়দের পরিচয় করানো হয়েছে। মিঃ রহমান আমাদের সংবাদদাতাকে এক সাক্ষাৎকারে

বলেছেন যে, প্রদর্শনী ম্যাচে অংশগ্রহণকারী দলটি 'বাংলাদেশ একাদশ' নয়। তাঁর মতে দলটিকে 'শরণার্থী একাদশ' বলা সঙ্গত। তিনি অভিযোগ করেছেন প্রদর্শনী ম্যাচটি নির্দ্ধারিত সময়ের চেয়ে পনের মিনিট কম খেলানো হয়েছে।এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান বাংলদেশ একাদশ আগামী ১৮ই জুলাই কলকাতায় মোহনবাগান দলের সাথে প্রদর্শনী খেলায় প্রথম অংশ নেবে, পরে কলকাতায় আরও কয়েকটি খেলা শেষ করে ত্রিপুরায় আসবে। দলে অন্যূন নয়জন তদানীন্তন পাক জাতীয় পর্যায়ের খেলোয়াড় রয়েছেন বলে মিঃ রহমান জানান।

দৈনিক সংবাদ, আগরতলা, ৬ জুলাই ১৯৭১

৪৬. মন্টু দাশ, জনপদ বিলোনিয়া, *স্মরণিকা*, উত্তরণ ক্লাব, ১৯৯৬, পৃ. ১৭

৪৭. সাক্ষাৎকার, শুভল রুদ্র, মেলাঘর, ২৪ জুলাই ২০১৪

৪৮. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল ১৯৭১

৪৯. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ১০ জুন ১৯৭১

৫০. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল ১৯৭১

৫১. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল ১৯৭১

৫২. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল ১৯৭১

৫৩. *দৈনিক জাগরণ*, আগরতলা, ১২ মে ১৯৭১

৫৪. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ১৪ আগস্ট ১৯৭১

৫৫. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ২০ আগস্ট ১৯৭১

৫৬. সংবাদটি নিম্নরূপঃ

বাংলাদেশ উদ্বাস্তু ত্রাণ মহিলা কমিটির সভা

আগরতলা ২৭ শে জুলাই ঃ গতকাল স্থানীয় মহাকরণ ভবনের কাউন্সিল হলে বাংলাদেশ উদ্বাস্তু ত্রাণ মহিলা কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। আজকের সভায় শ্রীমতি জেনি ডায়াস উপস্থিত সদস্যদের জনান যে তাঁদের কর্মসূচী অনুযায়ী শিবিরসমূহের শরণার্থীদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হচ্ছে।

তিনি জানান বিগত ১৮ই জুলাই তারিখে ভারতে আগত শরণার্থীদের জন্য গঠিত আন্তর্জাতি মহিলা কমিটির পক্ষ থেকে তাঁরা ষাট ডজন ফ্রক ও চল্লিশ ডজন শার্ট পেয়েছেন। শ্রীমতি ডায়াস জানান যে তিনি এবং অপর সদস্যা শ্রীমতি কালিয়া ২০ শে জুলাই তারিখে ভিএম হাসপাতাল পরিদর্শনে যান এবং রোগীদের মধ্যে ২০টি শাড়ী, ১২টি শিশুদের ফ্রক ও ন্যাপকিন ও ৩৪টি পুরোনো চাদর বিতরণ করেন।

২১ শে জুলাই তারিখে সভানেত্রী শ্রীমতি ডায়াস, সদস্যা শ্রীমতী সুশীলা গুপ্তা ও শ্রীমতী রেণুকা চক্রবর্তী বিলোনীয়ার কাঞ্চন নগর শিবির পরিদর্শন করেন।তাছাড়া ২৩ শে জুলাই তারিখে শ্রীমতী ডায়াস, শ্রীমতী মেহতা

ও স্বপ্না দত্ত বড়জলা উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শন করেন। উক্ত দুটি শিবিরে তাঁরা শিবিরবাসীদের মধ্যে ধুতী, শাড়ী, লুঙ্গী, গেঞ্জি, ফ্রক এবং তোয়ালে ইত্যাদি বিতরণ করেন।

দৈনিক সংবাদ, আগরতলা, ১৫ আগস্ট ১৯৭১

৫৭. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ৪ জুন ১৯৭১

৫৮. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ২৯ জুলাই ১৯৭১

৫৯. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ৬ অক্টোবর ১৯৭১

৬০. *সাপ্তাহিক সমাচার*, আগরতলা, ২০জুন ১৯৭১ [সুকুমার বিশ্বাস(সম্পা.), প্রাগুক্ত]

৬১. Mahadev Chakravarti, The Role of Tripura in the Liberation War of Bangladesh, *Souvenir 2nd International Conference,* Bangladesh Itihas Sammilani, Dhaka, 2014, p-25

৬২. *সাপ্তাহিক সমাচার*, আগরতলা, ৩ মে ১৯৭১

৬৩. প্রাগুপ্ত

৬৪. সাক্ষাৎকার, রবীন সেনগুপ্ত , আগরতলা, ২৬ মে ২০১৫

৬৫. সাক্ষাৎকার, আউয়াল মিয়া, সোনামুড়া, ২০ জুলাই ২০১৪

৬৬. সাক্ষাৎকার, ছমিরণ বিবি, সোনামুড়া, ২০ জুলাই ২০১৪

৬৭. আফসান চৌধুরী, *বাংলাদেশ ১৯৭১, ৩য় খণ্ড*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ২২৫

৬৮. সাক্ষাৎকার, দুলাল মহাজন, বিলোনিয়া, ২১ জুলাই ২০১৪

৬৯. সাক্ষাৎকার, যতীন বালা, ধর্মনগর, ৬ আগস্ট ২০১৫

৭০. সালাম আজাদ (আশিস কুমার চক্রবর্তী অনুদিত), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান*, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়াদিল্লী, ২০১৪, পৃ. ১৮৯

৭১. ফজলুল বারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

৭২. প্রাগুক্ত

৭৩. সংবাদটি নিম্নরূপ:

আজ বার ঘন্টার ত্রিপুরা বন্ধ

আগরতলা ১লা এপ্রিল ঃ আগামীকাল সকাল ছয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত বার ঘন্টার ত্রিপুরা বন্ধের ডাক দিয়েছেন বিভিন্ন ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠন।পূর্ব বাংলার মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে এবং ইয়াহিয়ার নয়া নাজী বাহিনীর নির্বিচার গণহত্যার প্রতিবাদে এই বন্ধ আহুত হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় জাতীয় ছাত্র পরিষদ ও ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে পৃথক পৃথক বিবৃতিতে আগামীকালের ত্রিপুরা বন্ধকে সমর্থন জানিয়েছেন।

আজ রাতে ত্রিপুরা বন্ধের আহবায়ক সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করে জানা গেছে সংবাদপত্র ও সংবাদপত্র মুদ্রণালয় ডাক ও তার বিভাগের সমস্ত দপ্তর বন্ধ এর আওতাভুক্ত থাকবে। ফলে সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। পরের দিন পত্রিকা প্রকাশও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। এই সর্বাত্মক বন্ধের ফলে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামীদের জন্য আকস্মিক সাহায্য দ্রুত পাঠানোও কঠিন হয়ে পড়বে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বোম বর্ষণের পরে মুক্তিফৌজের পক্ষ থেকে আবেদন রাখা হয়েছিল যাতে করে আগরতলায় অন্তত স্বাভাবিকতা বজায় রাখা হয়।আমরা তাদের আবেদনের কথা যথাস্থানে নিবেদনও করেছি। বনধ চলাকালেও যদি উদ্যোক্তাগণ কতগুলি প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় ক্ষেত্রে নির্দেশ শিথিল করেন তা হলেও বনধের মূখ্য উদ্দেশ্য সফল হবে বলেই মুক্তি সংগ্রামী পরিষদ মনে করেন।

দৈনিক সংবাদ, আগরতলা, ২ এপ্রিল ১৯৭১

৭৪. সংবাদটি নিম্নরূপঃ

পূর্ব বাংলার মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে স্বতঃস্ফূর্ত ত্রিপুরা বনধ পালিত

(নিজস্ব প্রতিনিধি), আগরতলা ২রা এপ্রিল ঃ পূর্ব বাংলায় পশ্চিমী হানাদারদের নির্বিচার গণহত্যার প্রতিবাদে ও স্বাধীন বাংলা সরকারকে ভারত সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি দানের দাবিতে আজ সারা রাজ্যে স্বতঃস্ফূর্ত বন্ধ পালিত হয়েছে।

আজকের এই বন্ধ-এর ডাকে দিয়েছিলেন বিভিন্ন ছাত্র ও গণ সংগঠন।সকাল ছয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত আজ রাজধানী আগরতলার জনজীবন ছিল সম্পূর্ণ স্তব্ধ। যানবাহন, দোকান পাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস কাছারী সর্বত্রই স্বতঃস্ফূর্ত নীরবতা। আজ বিধানসভার সদস্যরাও সভায় আসেনি। বনধ সন্ধ্যা ছয়টায় শেষ হয়ে যাবার পর রাজধানীর জনজীবনে আবার স্বাভাবিকতা ফিলে আসে। সিনেমা হলের কর্মীরা ও পূর্ব বাংলার সমর্থনে বন্ধ পালন করেন। স্থানীয়ভাবেও বেশ কয়েকটি বন্ধ পালনের খবর পাওয়া যায়। তবে সিনেমা কর্মীরা পূর্ব বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে ও সামরিক নৃশংসতার প্রতিবাদে আজ বন্ধ পালন করেন। ফলে তিনটি ছবিঘরও আজ ছিল সম্পূর্ণ স্তব্ধ।

দৈনিক সংবাদ, আগরতলা, ৩ এপ্রিল ১৯৭১

৭৫. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ৫ এপ্রিল ১৯৭১

৭৬. কল্যাণব্রত চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৭৭. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ৪ এপ্রিল ১৯৭১

৭৮. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ৬ এপ্রিল ১৯৭১

৭৯. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ৩০ মার্চ ১৯৭১

৮০. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ৭ এপ্রিল ১৯৭১

৮১. *দেশের ডাক,* আগরতলা, ১ এপ্রিল ১৯৭১

৮২. সংবাদটি নিম্নরূপঃ

বাংলার মুক্তি সংগ্রামের স্বপক্ষে বীর বিক্রয় সান্ধ্য কলেজের ছাত্রদের ক্লাশ বর্জন মিছিল

আগরতলা ১লা এপ্রিল : বীর বিক্রয় সান্ধ্য কলেজের ছাত্ররা বাঙ্গলার মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে ক্লাশ বর্জন করে এবং পরে কলেজে এক বিশাল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বীর বিক্রয় সান্ধ্য কলেজ সংগ্রাম কমিটি ৩৪ জনকে নিয়া গঠিত হয়। উক্ত সভায় যুক্ত আহবায়ক শ্রী তপন দত্ত ও প্রভাষ কান্তি রায় নির্বাচিত হয়।সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অবিলম্বে ভারত সরকারকে বাঙ্গলার বিপ্লবী সরকারকে স্বীকৃতি দেবার এবং ভারত সরকারকে বাঙ্গলার মুক্তি সংগ্রামে সর্বপ্রকার সাহায্য করার দাবি গৃহীত হয় এবং সান্ধ্য কলেজের ছাত্ররা বাঙ্গলার সমর্থনে ও ২রা এপ্রিলের হরতালকে সার্থক করার জন্য ডাক দেয় এবং মিছিল করে শহর পরিক্রমা করে।

দৈনিক সংবাদ, আগরতলা, ২ এপ্রিল ১৯৭১

৮৩. বিকচ চৌধুরি, প্রাগুক্ত

৮৪. সংবাদটি নিম্নরূপঃ

ত্রিপুরাবাসীর দাবি

আগরতলা ২৮ শে মার্চ : ত্রিপুরার শিল্পী, সাহিত্যিক, কর্মরত সাংবাদিক, গণতান্ত্রিক সংস্থা ও ছাত্র সংস্থার পক্ষ থেকে যুক্ত এক বেতার বার্তায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আকাশবাণী থেকে বাংলার মুক্তি বাহিনীর সংবাদ ঘোষণার আরো গুরুত্ব দেবার আহবান জানানো হয়েছে। তারবাতায় বাংলার ও বাঙালি জাতির অস্তিত্বের এই সংকট মুহূর্তে প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসাব গণতন্ত্র রক্ষার নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণের আহবান জানানো হয়। তারবার্তায় আকাশবাণীর আগরতলা, কলিকাতা, গৌহাটি, শিলিগুড়ি কেন্দ্র থেকে স্বদেশী সঙ্গীত প্রচারের সময় বাড়ানোর দাবিও করা হয়েছে।

দৈনিক সংবাদ, আগরতলা, ৩০ মার্চ ১৯৭১

৮৫. *দৈনিক সংবাদ,* আগরতলা, ১ এপ্রিল ১৯৭১

৮৬. সংবাদটি নিম্নরূপঃ

বাংলাদেশের স্বীকৃতি চাই কৃষক সমাজের দাবি

ধর্মনগর : শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে ভারত সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি দেওয়ার আবেদন জানিয়ে ধর্মনগর কৃষক সমাজের আহবানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। গত ১৬ই এপ্রিল ধর্মনগরের কংগ্রেস ভবনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতি ছিলেন প্রাক্তন বিধানসভা সদস্য শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী।ঐ সভায় আরো আলোচনা করা হয় যে ত্রিপুরার উত্ত সীমান্ত অঞ্চলে সুবিধাজনক স্থানে আশ্রয় শিবির স্থাপন করে বর্তমানে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববাংলা

থেকে আগত আশ্রয় প্রার্থীদের আশ্রয়দান করা ব্যবস্থা হওয়া; তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করার উপর গুরুত্ব দিতেও তাঁরা আহবান জানান।ধর্মনগরের প্রতি গাঁওসভা থেকে শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য সাহায্য সংগ্রহের জন্য কমিটি গঠনের প্রস্তাবও এই সভায় লওয়া হয়।

দৈনিক সংবাদ, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল ১৯৭১

৮৭. *দেশের ডাক*, আগরতলা, ১১ জুন ১৯৭১

৮৮. রবীন সেনগুপ্ত, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরা: কিছু স্মৃতি কিছু কথা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩

৮৯. Tripura Legislative Assembly Proceedings Series xx Vol 11 dt. 29.03.1971 p 17

৯০. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ২৯ মার্চ ১৯৭১

৯১. রবীন সেনগুপ্ত, *চিত্র-সাংবাদিকের ক্যামেরায় মুক্তিযুদ্ধ*, *সাহিত্য প্রকাশ*, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৫

৯২. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ৯ মে ১৯৭১

৯৩. বেনীমাধব মজুমদার, ত্রিপুরা বিধান সভায় একাত্তরের মুক্তিসংগ্রাম, *স্মরণিকা মুক্তিযুদ্ধ উৎসব*, আগরতলা, ১১-১২ জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ২৩

৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৯৫. মোহাম্মদ সেলিম, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারতের রাজনৈতিক দল*, বাংলাদেশ চর্চা, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৪৩

৯৬. রবীন সেনগুপ্ত, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরা: কিছু স্মৃতি কিছু কথা*, পৃ. ১৯-২০

৯৭. মোহাম্মদ সেলিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

৯৮. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ১৪ জুন ১৯৭১

৯৯. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ২৬ জুন ১৯৭১

১০০. ফজলুল বারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

১০১. সাক্ষাৎকার, *রণজিৎ দাস*, সাব্রুম, ১০ জানুয়ারি ২০১৫

১০২. সংবাদটি নিম্নরূপ:

উথান্টের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে ত্রিপুরাবাসীর তার

আগরতলা ২৮ শে মার্চ : ত্রিপুরা রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্টের কাছে এক তারবার্তায় পূর্ব বাংলার সম্প্রতিক ঘটনাবলীর প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং সামরিক বাহিনী নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের উপর ট্যাঙ্ক এবং আকাশ থেকে বোমা নিক্ষেপ করে যে গণহত্যায় মেতেছেন। অবিলম্বে বন্ধ করতে সেক্রেটারী জেনারেলের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন

দৈনিক সংবাদ, আগরতলা, ৩০ মার্চ ১৯৭১

১০৩. সংবাদটি নিম্নরূপ:

বাংলাদেশের সরকারের স্বীকৃতি দানের দাবিতে পাঁচটি রাষ্ট্র প্রধানের কাছে তার

আগরতলা ১৪ এপ্রিল : ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় স্বাধীন বাংলা সাহায্য সমিতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী সহ রুম, আমেরিকা, সংযুক্ত আবর প্রজাতন্ত্র ও যুগোশ্লেভিকিয়ার রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে প্রেরীত পৃথক পৃথক তারবার্তায় অবিলম্বে বাংলাদেশের স্বাধীন সাবর্ক্ষভৌম সরকারকে স্বীকৃতি দানের দাবি জানিয়েছেন।

দৈনিক সংবাদ, আগরতলা, ১৫ এপ্রিল ১৯৭১

১০৪. আর অপেক্ষা নয় (সম্পাদকীয়), *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ৩০ মার্চ ১৯৭১

১০৫. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল ১৯৭১

১০৬. *সাপ্তাহিক সমাচার*, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল ১৯৭১ [সুকুমার বিশ্বাস(সম্পা.), *প্রাগুক্ত*]

১০৭. শ্যামল চৌধুরী (সম্পা.), *স্মরণ*' ৭১(স্মরণিকা বাংলাদেশের বিজয় দিবস ও ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী উৎসব উদযাপন, ২০১৪) , বিলোনিয়া, ২০১৪, পৃ. ৪

১০৮. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ১৩ আগস্ট ১৯৭১

১০৯. *প্রাগুক্ত*

১১০. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ২৬ আগস্ট ১৯৭১

১১১. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ২৮আগস্ট ১৯৭১

১১২. তরুণ স্যানাল, 'আর্ন্তজাতিক গণমাধ্যমে জয় বাংলার সংগ্রাম', *সমকালীন*, সংখ্যা ৭, বর্ষ ১৯, কলকাতা, ১৩৭৮, পৃ. ৩৬০

১১৩. *দৈনিক জাগরণ*, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর ১৯৭১

১১৪. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ১২ মে ১৯৭১

১১৫. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ২৯ মে ১৯৭১

১১৬. *সাক্ষাৎকার*, নির্মল দেব

১১৭. *দেশের ডাক, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল* ১৯৭১

১১৮. শ্যামল চৌধুরী (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

১১৯. ফজলুল বারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

১২০. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ১১ জুলাই ১৯৭১

১২১. *সাপ্তাহিক ত্রিপুরা*, আগরতলা, ২৮জুন ১৯৭১

১২২. হারুন হাবীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

১২৩. ইদরিস আলম, *আমরা এখন যুদ্ধে*, প্রজ্ঞালোক, চট্টগ্রাম, ২০১৩, পৃ. ১৪৪-১৬৫

১২৪. সমীরণ বৈদ্য ও জীবন শীল (সম্পা.), *৬ ডিসেম্বর সংহতি মেলা স্মরণিকা*, দক্ষিণ ত্রিপুরা, ২০১১, পৃ. ১৪

১২৫. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

১২৬. *সাপ্তাহিক সমাচার*, আগরতলা, ১৮ জুলাই ১৯৭১ [সুকুমার বিশ্বাস(সম্পা.), *প্রাগুক্ত*]

১২৭. সাক্ষাৎকার, রথীন দত্ত, ডা., কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫

১২৮. প্রাগুক্ত

১২৯. মানিক সরকার, *অতীত দিনের স্মৃতি*, জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, আগরতলা, ২০১৪, পৃ. ৬৬

১৩০. প্রাগুক্ত

১৩১. *সাপ্তাহিক সপ্তাহ*, কলকাতা, ২০ আগস্ট ১৯৭১

১৩২. মৃণাল কান্তি ভৌমিক, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আমরা', *সুভাষ*, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ২৮

১৩৩. প্রাগুক্ত

১৩৪. সংবাদটি নিম্নরূপঃ

এ পর্যন্ত পাক গোলায় ৮১ জন ত্রিপুরাবাসী নিহত ঃ আহত ২০০

(নিজস্ব প্রতিনিধি) আগরতলা ৭ই সেপ্টেম্বর : রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্তে পাক সৈন্য বাহিনীর গোলাবর্ষণ এবং অনুপ্রবেশ ও হামলাবাজী অব্যাহত রয়েছে। গত ৩রা সেপ্টেম্বর সীমান্ত মহকুমা বিলোনীয়ার অভয়নগর গ্রামের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে একদল সশস্ত্র পাক সৈন্য তিনজন ভারতীয় নাগরিককে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। ওই দিন সীমান্ত গ্রাম ভারতচন্দ্র নগরে আরেক দল সশস্ত্র পাক অনুপ্রবেশকারী আরও একজন ভারতীয়কে অপরহণ করে নিয়ে গেছে। একই দিনে বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকা থেকে পাক হানাদাররা সাব্রুম শহর লক্ষ করে বিনা প্ররোচনায় গোলাবর্ষণ করে। তাছাড়া কমলপুর শহরের উপরও পাক বাহিনীর নিক্ষিপ্ত গোলাগুলী এসে পড়েছে।

পাক সেনারা আমাদের বিভিন্ন সীমান্ত গ্রাম থেকে কয়েকটি গবাদিপশু অপহরণ করে নিয়ে গেছে। পাক গোলায় গত সপ্তাহে অন্যূন পনেরজন ভারতীয় এলাকায় হতাহত হয়েছেন। সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামে পাক বাহিনীর প্ররোচনামূলক গোলাবর্ষণ ও অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপে অন্যূন একাশীজন প্রাণ হারিয়েছেন, আহতের সংখ্যা দুই শতাধিক।

দৈনিক সংবাদ, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

১৩৫. শ্যামল চৌধুরী(সম্পা.), *স্মরণ'৭১ (স্মরণিকা বাংলাদেশের বিজয় দিবস ও ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী উৎসব উদযাপন, ২০১৪)* , বিলোনিয়া, ২০১৪, পৃ. ৬

১৩৬. মৃণাল কান্তি ভৌমিক, মুক্তিযুদ্ধে জি.বি. হাসপাতালের ভূমিকা, (অপ্রকাশিত প্রবন্ধ)

১৩৭. সাক্ষাৎকার, হেমেন্দ্রশঙ্কর রায় চৌধুরী, ৪ মার্চ ২০০১, [সুকুমার বিশ্বাস(সম্পা.), প্রাগুক্ত], পৃ. ৬৫

১৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

১৩৯. রথীন দত্ত, প্রাগুক্ত

১৪০. সাক্ষাৎকার, শিপ্রা সরকার, আগরতলা, ২৩ জুলাই ২০১৪

১৪১. মৃণাল কান্তি ভৌমিক, 'মুক্তিযুদ্ধে জি.বি. হাসপাতালের ভূমিকা'

১৪২. *ভিজিটরস বুক*, গোবিন্দ বল্লভ মেমোরিয়াল হাসপাতাল, আগরতলা, ১৯৭১

১৪৩. ফোরকান বেগম, *স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে নারী*, সাইফ মুহাম্মদ আশরাফ আল সাদী ও অন্যান্য, নারায়ণগঞ্জ, ১৯৯৮, পৃ. ৬৪

১৪৪. মৃণাল কান্তি ভৌমিক, 'মুক্তিযুদ্ধে জি.বি. হাসপাতালের ভূমিকা'

১৪৫. প্রাগুক্ত

১৪৬. *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ২২ ডিসেম্বর ২০১১

১৪৭. *ভিজিটরস বুক*, গোবিন্দ বল্লভ মেমোরিয়াল হাসপাতাল

১৪৮. প্রাগুক্ত

১৪৯. সাক্ষাৎকার, মৃণাল কান্তি ভৌমিক, আগরতলা, ২৯ জুলাই ২০১৪

১৫০. বিকচ চৌধুরি, *প্রাগুক্ত*

১৫১. সাক্ষাৎকার, নীলমনি দেববর্মা, আগরতলা, ২৮ জুলাই ২০১৪

১৫২. *পেশেন্ট রেজিস্টার বুক*, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হাসপাতাল, আগরতলা, ১৯৭১

১৫৩. প্রাগুক্ত

১৫৪. *নীলমনি দেববর্মা*, প্রাগুক্ত

১৫৫. নীলমনি দেববর্মা, ডা., বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-স্মৃতির মণিকাঞ্চন, মুহাম্মদ সামাদ (সম্পা.), *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ উৎসব স্মরণিকা*, আগরতলা, ১১-১৩ জানুয়ারি ২০০১

১৫৬. *সাপ্তাহিক সমাচার*, আগরতলা, ৩০ মে ১৯৭১ [সুকুমার বিশ্বাস(সম্পা.), প্রাগুক্ত]

১৫৭. গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, *বাংলাপিডিয়া*, (অনলাইন ভার্সন: http://bn.banglapedia.org/index.php?title= গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র)

১৫৮. আখতার আহমেদ, ডা., ত্রিপুরার সাথে লেনদেন, *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ উৎসব*, ১১-১৩ জানুয়ারি ২০০১, আগরতলা, পৃ. ২৭

১৫৯. রবীন সেনগুপ্ত, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরা: কিছু স্মৃতি কিছু কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ.২২

১৬০. মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা পুস্তিকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২৭ মার্চ ২০১২

১৬১. *দৈনিক সমকাল*, ঢাকা, ২৬ মার্চ ২০১২

১৬২. সুকুমার বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

১৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

১৬৪. মৃণাল কান্তি ভৌমিক, 'মুক্তিযুদ্ধে জি.বি. হাসপাতালের ভূমিকা'

১৬৫. সাক্ষাৎকার, করবী দেববর্মা, আগরতলা, ২৯ জুলাই ২০১৪

১৬৬. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ৩ মে ১৯৭১

১৬৭. প্রাগুক্ত

১৬৮. মৃণাল কান্তি ভৌমিক, 'মুক্তিযুদ্ধে জি.বি. হাসপাতালের ভূমিকা'

১৬৯. মৃণাল কান্তি ভৌমিক, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সিভিল ডিফেন্স', *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ২০০৯

১৭০. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ২৯ আগস্ট ১৯৭১

১৭১. প্রাগুক্ত

১৭২. *সাপ্তাহিক সমাচার*, আগরতলা, ২ মে ১৯৭১ [সুকুমার বিশ্বাস(সম্পা.), প্রাগুক্ত]

১৭৩. প্রাগুক্ত

১৭৪. সাক্ষাৎকার, উৎপলা মিশ্র (একাত্তর সালে রেডক্রসে কর্মরত), কলকাতা, ১৬ মার্চ ২০১৬

১৭৫. রথীন দত্ত, প্রাগুক্ত

১৭৬. সুকুমার বিশ্বাস(সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৪৪

১৭৭. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ৩ মে ১৯৭১

১৭৮. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ৮ জুলাই ১৯৭১

১৭৯. মৃণাল কান্তি ভৌমিক, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সিভিল ডিফেন্স', *প্রাগুক্ত*

১৮০. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ৮ জুলাই ১৯৭১

১৮১. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ১৪ আগস্ট ১৯৭১

১৮২. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ১৬ জুন ১৯৭১

১৮৩. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ১৭ জুন ১৯৭১

১৮৪. প্রাগুক্ত

১৮৫. কামাল লোহানী, *ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী উৎসব স্মরণিকা*, ঢাকা, ৩-৫ মে ২০০২, পৃ. ৪

১৮৬. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ২৩ নভেম্বর ১৯৭১

১৮৭. সুকুমার বিশ্বাস(সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭১৮

১৮৮. প্রাগুক্ত

১৮৯. সাক্ষাৎকার, শুভল রুদ্র

১৯০. সাক্ষাৎকার, জামাল হোসেন (গেরিলা যোদ্ধা), চট্টগ্রাম, ২২ মার্চ ২০১৬

১৯১. সাক্রুম নাট্য সংসদ, *স্মরণিকা: প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর*, সাক্রুম, ২০০৭

১৯২. সাক্ষাৎকার, রিক্তা সেন, উদয়পুর, ২ জানুয়ারি ২০১৫

১৯৩. সাক্ষাৎকার, রবীন সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত

১৯৪. বিকচ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

১৯৫. সাক্ষাৎকার, গৌতম দাস, প্রাগুক্ত

১৯৬. রথীন দত্ত, প্রাগুক্ত

১৯৭. জনার্ধন সেন, প্রাগুক্ত

১৯৮. সাক্ষাৎকার, মিহির দেব, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি ২০১৪

১৯৯. বিমল চৌধুরী, নরম নদীর দেশে উত্তাল সমুদ্রের স্বর, (কল্যাণব্রত চক্রবর্তী সম্পা., *এপারে একাত্তর)*, অক্ষর, ত্রিপুরা, ১৯৯৭, পৃ. ১৩২

২০০. সাক্ষাৎকার, যতীন সেন, প্রাগুক্ত

২০১. জনার্ধন সেন, প্রাগুক্ত

২০২. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ৪ এপ্রিল ১৯৭১

২০৩. মো. মিজানুর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধ ও ভারতের শরণার্থী ক্যাম্পের স্মৃতি*, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৪৪, ৪৫

২০৪. মেজর (অব.) কামরুল হাসান, *সাহসী ঠিকানা*, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ উৎসব স্মরণিকা, আগরতলা, ১১-১৩ জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ২২

২০৫. সত্যব্রত চক্রবর্তী, *চেতনায় জেগে আছো বাংলাদেশ*, সুকুমার বিশ্বাস (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১৮

২০৬. শাহরিয়ার কবির, *অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী স্মারক বক্তৃতা, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান এবং বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক*, মহাজাতি সদন, কলকাতা, ১৮ জুন ২০১১

২০৭. হারুন হাবীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

২০৮. সত্যব্রত চক্রবর্তী, *চেতনায় জেগে আছো বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২২

২০৯. সারওয়ার আলী, *পেরিয়ে এলাম অন্তবিহীন পথ*, মাখদুমা নার্গিস, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৯৩

২১০. সাক্ষাৎকার, শচীন্দ্রলাল সিংহ, হারুণ হাবীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

২১১. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ১ এপ্রিল ১৯৭১

২১২. মোঃ জাকির হোসেন, মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরার স্মৃতি, *মুক্তিবার্তা*, ঢাকা, ১৯৯৭, ঢাকা, পৃ. ২৫

২১৩. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ৪ এপ্রিল ১৯৭১

২১৪. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ১৯ আগস্ট ১৯৭১

২১৫. *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ৮ নভেম্বর ১৯৭১

২১৬. সাক্ষাৎকার, যোগেশ মহাজন, সোনামুড়া, ১৯ জুলাই ২০১৪

২১৭. বি কে ইনস্টিটিউট, *শতবর্ষ পূর্তি উৎসব স্মরণিকা*, বিলোনিয়া, ১৯৯৫, পৃ. ১৬

২১৮. সিরাজউদ্দীন আমেদ, কিছু স্মৃতি, প্রসঙ্গ একাত্তর, *স্মরণিকা*, মুক্তিযুদ্ধ উৎসব আগরতলা, ১১-১৩ জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ৩৩

২১৯. প্রাগুক্ত ৩৪

২২০. সংবাদটি নিম্নরূপঃ

পাক গুলীতে আহত আরো একজন ভারতীয়

আগরতলা ১ লা মে ঃ পাক সেনাদের গুলী বর্ষণের ফলে সোনামুড়ায় দুর্গানগর গ্রামে জনৈকা ভারতীয় মহিলা আজ গুলীবদ্ধ হয়েছে।গতকাল পাক সেনাবাহিনীর গুলীতে আহত ভারতীয় নাগরিক আমাদ আলি আজকে আগরতলায় মারা গেছে। সীমান্ত এলাকায় পাক সেনাদলের গুলী বর্ষণের ফলে সেখানে নাগরিক জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

দৈনিক সংবাদ, আগরতলা, ২ মে ১৯৭১

২২১. সংবাদটি নিম্নরূপঃ

আগরতলার পঃ প্রান্তসীমা ঘিরে কয়েক সহস্র পাক সেনা সন্নিবেশ রাজধানীতে গুলী বর্ষণ : হতাহত

আজ ১১ই মে তারিখে এই পত্রিকায় প্রকাশিত পুর্বাভাষকে অক্ষরে অক্ষরে সত্যে প্রমাণ করে দিয়ে আজ মধ্যাহ্নে পাক বাহিনী আখাউড়া সীমানা চৌকির উপর প্রচন্ড আক্রমণ চালিয়ে চৌকির প্রান্ত দখল করে নিয়েছে। আর খোদ রাজধানী আগরতলার পশ্চিম প্রান্তের জনসাধারণের উপর চালিয়েছে নির্বিচার গুলী। গুলীতে নিহত হয়েছে ১ জন, আহত ৫ জন, তার মধ্যে একটি শিশু। নিহতের তালিকায় গবাদি পশুও রয়েছে।সীমান্তের তিন দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী আসতে থাকে, সময় তখন বেলা বারোটা। গুলীর শব্দে আর মানুষের আর্ত চিৎকারে রাজধানী শহরের পশ্চিমাংশে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। গুলী রামনগর, জয়নগর, জয়পুর, রাজনগর, পুরান রিজার্ভ চৌমুহনী, আইজি'র অফিস, সচিবালয় প্রাঙ্গণ, নেতাজী সুভাষ চৌমুহনী, কামান চৌমুহনীর টেলিফোন একচেঞ্জ

প্রভৃতি স্থানে পাক সেনা বাহিনীর মেশিনগানের অবিশ্রাম গুলী এসে পড়ে। জয়নগরের কয়েকটি বাড়ি গুলীবিদ্ধ হয়, একটি ভারতীয় গাড়িও গুলী বিদ্ধ হয়েছে।

দৈনিক সংবাদ, আগরতলা, ১২ মে ১৯৭১

২২২. সংবাদটি নিম্নরূপঃ

এ পর্যন্ত পাক গোলায় ৮১ জন ত্রিপুরাবাসী নিহত : আহত ২০০

(নিজস্ব প্রতিনিধি) আগরতলা ৭ই সেপ্টেম্বর : রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্তে পাক সৈন্য বাহিনীর গোলাবর্ষণ এবং অনুপ্রবেশ ও হামলাবাজী অব্যাহত রয়েছে। গত ৩রা সেপ্টেম্বর সীমান্ত মহকুমা বিলোনীয়ার অভয়নগর গ্রামের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে একদল সশস্ত্র পাক সৈন্য তিনজন ভারতীয় নাগরিককে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। ওই দিন সীমান্ত গ্রাম ভারতচন্দ্র নগরে আরেক দল সশস্ত্র পাক অনুপ্রবেশকারী আরও একজন ভারতীয়কে অপরহণ করে নিয়ে গেছে। একই দিনে বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকা থেকে পাক হানাদাররা সাব্রুম শহর লক্ষ করে বিনা প্ররোচনায় গোলাবর্ষণ করে। তাছাড়া কমলপুর শহরের উপরও পাক বাহিনীর নিক্ষিপ্ত গোলাগুলী এসে পড়েছে। পাক সেনারা আমাদের বিভিন্ন সীমান্ত গ্রাম থেকে কয়েকটি গবাদিপশু অপহরণ করে নিয়ে গেছে। পাক গোলায় গত সপ্তাহে অন্যূন পনেরজন ভারতীয় এলাকায় হতাহত হয়েছেন। সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামে পাক বাহিনীর প্ররোচনামূলক গোলাবর্ষণ ও অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপে অন্যূন একাশীজন প্রাণ হারিয়েছেন, আহতের সংখ্যা দুই শতাধিক।

দৈনিক সংবাদ, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

২২৩. সংবাদটি নিম্নরূপঃ

ত্রিপুরার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পাক বাহিনীর আক্রমণ : নিহত ১৩ : আহত ৯:৪ জন তরুণী অপহরণ

আগরতলা ১৪ই আগস্ট : আজ বিকেল সাড়ে চারটায় পাক সামরিক বাহিনী আগরতলা থেকে ৮ মাইল দূরবর্তী বামুটিয়ার জলিলপুর শরণার্থী শিবিরে ও পার্শ্ববর্তী গ্রামে প্রায় আধমাইল ভিতর থেকে ১৩জনকে বেয়নেট চার্জ ও গুলি করে হত্যা করে এবং ৯ জন আহত হয়। প্রায় ঘন্টা দেড়েক পাক বাহিনী বিনা বাধায় লুন্ঠন, অত্যাচার চালাবার পর ফিলে যাওয়ার সময় ৪ জন তরুণীকে নিয়ে যায়। প্রায় ঘন্টা তিনেক পরে এই তরুণীদের ফেরৎ দিয়ে যায়। জলিলপুরে ১,১০০ শরণার্থীর একটি ক্যাম্প আছে।১৪ই আগস্ট বেলা ৩ টায় পাক সামরিক বাহিনী ভারতীয় এলাকায় জলিলপুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম লক্ষ্য করে মেশিনগান থেকে গোলা বর্ষণ শুরু করে। পরে বিকেল সাড়ে চারটায় রাজ্যকারসহ প্রায় ৪০/৫০ জনের এক পাক সামরিক দল ভারতীয় এলাকায় বিনা বাধায় প্রবেশ

করে অত্যাচার, হত্যা, লুন্ঠন ও অপহরণ করে চলে গেছে। পাক বাহিনীর গোলার টুকরো বামুটিয়া তহশীল অফিস এবং কোয়ার্টারেও এসে পড়ে বলে জানা যায়।

পাক বাহিনী ফিলে গিয়ে আরও কয়েকবার এই এলাকা লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করে বলে জানা যায়। পরের দিন থেকে থেকে কয়েকবার ভারতীয় এলাকায় গুলি বর্ষণ করে। পরে ভারতীয় সীমান্ত বাহিনী পাল্টা গুলি নিক্ষেপ করতে বাধ্য হয় বলে জানা যায়। জলিলপুর ও বামুটিয়া বাজারের জনসাধারণ প্রাণভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে আত্মরক্ষায় অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে।এই এলাকার পাশেই একটি সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ক্যাম্প আছে বলে গ্রামবাসী জানায়। কিন্তু সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে এই পাক হানাদারদের আক্রমণের বা অত্যাচার বন্ধ করার কোনও প্রকার চেষ্টা করতে দেখা যায়নি। গ্রামবাসী সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগও প্রকাশ করেন।ত্রিপুরা সরকার অনেক চিন্তা ভাবনা করে গুলিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে ঘটনাটি জানিয়েছেন বলে জানা গেছে।যারা নিহত হয়েছেন- ওসমান, নাজীমুদ্দিন, মৈতুন বিবি, কাচন দাস, আড়াই দাস, ছাক্কু বিবি, আবু তাহের, জ্ঞান বৈশ্য, আবদুল হাই, আজিমুদ্দিন, শকুন্তলা, রহমানের স্ত্রী ও নুরুল ইসলাম।

দৈনিক সংবাদ, আগরতলা, ১৫ আগস্ট ১৯৭১

২২৪. সংবাদটি নিম্নরূপঃ

ভারতীয় শরণার্থী

আমরা গঙ্গানগর (কমলপুর) গ্রামের অধিবাসী। পাক চমুদের গোলাবর্ষণের ফলে এই গ্রামের সমস্ত অধিবাসী আজ গৃহহারা হয়ে আজ আমরা অনাহারে দিন কাটাইতেছি। কল্পনা করিতে পারি নাই যে, ভারতে বসবাস করিয়া ভারতের নাগরিক হইয়া গৃহহারা ও অন্নাভাবে দিন কাটাইতে হইবে। বাংলাদেশের শরণার্থীর জন্য সরকার যথাসাধ্য করিতেছেন। কিন্তু আমরা আজ যারা ভারতীয় শরণার্থী তাদের প্রতি আমাদের সরকারের কি কোন কর্তব্য নাই? যদি বা আমরা স্থানীয় শাসক মহাশয়ের নিকট আমাদের দাবি জানাইয়াছি তখন সেখান হইতে অকথ্য কথা ছাড়া আর কিছু পাই নাই। আমরা কি সীমান্তে বাস করায় অপরাধী? কর্তৃপক্ষের সানুগ্রহ বিবেচনার জন্য। ইতি গঙ্গানগর গ্রামের অধিবাসী।

দৈনিক সংবাদ, আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

২২৫. চির চেনার খোঁজে, *ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী উৎসব স্মরণিকা*, আগরতলা, ৯-১১ ফেব্রুয়ারি ২০১১

২২৬. সারওয়ার আলী, প্রাগুক্ত

২২৭. শিশির ভট্টাচার্য, *অন্যদিন (ত্রৈমাসিক)*, শীত সংখ্যা, অষ্টম সংকলন, ১৩৭৮, কলকাতা

পঞ্চম অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধে আসামের সাধারণ মানুষ

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী আসামের করিমগঞ্জ হয়ে একাত্তরে তিন লক্ষ উদ্বাস্তু আশ্রয় খুঁজে নিয়েছিল বরাক উপত্যকায়। সবচেয়ে বেশি শরণার্থী আশ্রয় পেয়েছিল সীমান্তবর্তী করিমগঞ্জে। জনসংখ্যার বেশি শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে করিমগঞ্জসহ সমগ্র বরাক উপত্যকা একাত্তরে মানবিকতা ও সহমর্মিতার এক

অনবদ্য ইতিহাসের জন্ম দিয়েছিল। বিপুল শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়ার পাশাপাশি রণাঙ্গনের গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্টিং বেস হিসেবে কাজ করেছিল ভারতের এই প্রান্তিক জনপদটি। রাতের পর রাত গুলির শব্দ, মর্টার শেলের আওয়াজ, ব্ল্যাক আউট, ট্রেঞ্চবাস প্রকৃতঅর্থে বরাকের মানুষ সেদিন জ্বালামুখীর ওপরেই বসেছিলেন। কিন্তু তারা এই শহর ছেড়ে পালিয়ে যাননি। বরঞ্চ বিভিন্নভাবে অকুতোভয় বরাকবাসীরা এই মুক্তিসংগ্রামে যুক্ত হয়েছিলেন।[১] অজানা, অচেনা অসংখ্য সাধারণ মানুষ সেদিন একাত্ম হয়েছিলেন জয় বাংলার টানে।

বরাক উপত্যকার পাশাপাশি আন্দোলিত হয়েছিল আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাও। ভারতের সীমান্তবর্তী এই জনপদে একাত্তর আঘাত হেনেছিল ভিন্ন এক আবেগে। পরিণত হয়েছিল জনযুদ্ধের অন্যতম এক রণাঙ্গনে। সেই জনযুদ্ধে প্রত্যেকেই শরিক হয়েছিল যার যার অবাস্থান থেকে। ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকেল স্টাফ, মেডিকেল, নার্সিং কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা স্বাস্থ্যসেবায়, তরুণ সম্প্রদায় মিছিল মিটিং ও ত্রাণে, রাজনৈতিক কর্মীরা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে, প্রশাসন, রাজনৈতিক, সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনগুলোসহ সমগ্র আসাম একাত্ম হয়েছিল জয় বাংলার স্বাধীনতার সংগ্রামে। মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও বরাক উপত্যকার সিভিল সোসাইটির অন্যতম প্রতিনিধি অতীন দাশ বলেছিলেন, ‘এই এক অন্য রকম টান, বরাকের ইতিহাসে এই একাত্ম, এই জোয়ার আর কখনো দেখা যায়নি।’[২]

সেই আবেগের অভিঘাত কম বেশি সবাইকে আক্রান্ত করেছিল। আসামের সাংস্কৃতিক জনমতও আন্দোলিত হয়েছিল একাত্তরে। শরণার্থীদের সহায়তায় শিল্পী, সাহিত্যিক, নাট্যকর্মী থেকে শুরু করে পুরো সাংস্কৃতিক অঙ্গন, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক থেকে শুরু করে গৃহস্থ বধু নেমেছিল রাজপথে। আশ্রয়, সেবা, সহায়তা আর মানবিকতার এক অপ্রতিরোধ্য গল্পের জন্ম দিয়েছিল আসামের তৃণমূল জনতা।

তবে শরণার্থী প্রবাহের প্রায় পুরোটাই হয়েছে বরাক উপত্যকা হয়ে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার খুব বেশি ভূমিকা কিংবা সম্পৃক্ততা ছিল না। এখানে মূলত বরাকের সেইসব দিনগুলোকে তুলে আনা হয়েছে ইতিহাসের আলোয়।

সাধারণের সম্পৃক্ততা

যুদ্ধ মানেই সংঘাত, রক্ত। একাত্তরে সুসজ্জিত পাকিস্তান সেনাবাহিনী যখন নির্বিচারে পূর্ব পাকিস্তানের উপর আক্রমন শুরু করল, প্রাণভয়ে লোকজন পালাতে শুরু করল। শরণার্থীর প্রথম ধাক্কাটা এসে লাগল সীমান্তে। প্রতিদিনই হাজার হাজার লোক প্রবেশ করেছে পার্শ্ববর্তী ভারতে। ভারতের আসাম রাজ্যের সীমান্তবর্তী বরাক উপত্যকা হয়ে এপ্রিলের শুরু থেকে শরণার্থী প্রবেশ শুরু হয়। নয় মাসে এখানে আশ্রয় নিয়েছে তিন লক্ষাধিক শরণার্থী। শুরুতে শরণার্থীরা করিমগঞ্জে সীমাবদ্ধ ছিল। একসময় শিলচর, হাইলাকান্দি, বদরপুরে শরণার্থীরা আশ্রয় নিতে শুরু করেন। স্থানীয় স্কুল-কলেজগুলো ছিল শরণার্থীদের প্রাথমিক ঠিকানা। সরকারি সহায়তাও শুরুতে ছিল অপ্রতুল । বরাকের সাধারণ জনতা কোন ধরণের সরকারি সহায়তা কিংবা সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না করে, নিজেদের দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের জন্য। স্কুল-কলেজের পাশাপাশি স্থানীয় বাড়িগুলোতে আশ্রয় নিতে শুরু করে শরণার্থীরা। স্থানীয়রা সীমান্ত পাড়ে ট্রানজিট ক্যাম্প বসিয়ে আগত লোকদের সহায়তায় এগিয়ে আসেন।

'বিপদগ্রস্থ করিমগঞ্জ। বাতাসে ওপার থেকে ভেসে আসা বারুদের গন্ধ-বিষ–ওপারের আত্মজনের ভেসে আসা আর্তনাদের মর্মবিষ। কুশিয়ারার জল বিষাক্ত ক্লেদাক্ত, মাছ বিষাক্ত। দারুন অভাব– বাজারে খাদ্য সামগ্রীর অভাব– যা পাওয়া যাচ্ছে তাতেও বীজাণু জীবাণুর ভয়।

মানুষ আসছে কাতারে কাতারে। কলেরা নাচছে দুয়ারে দুয়ারে। ওপারে বর্বর দস্যুদের কাটামারা জুতোয় পদশব্দ তাই সীমান্ত শহর করিমগঞ্জ আজ সদা সন্ত্রস্ত-অতন্দ্র।'[৩]

শুধু করিমগঞ্জ নয় একাত্তরে শিলচর, হাইলাকান্দি, বদরপুর, একইরকম আতঙ্ক আর উৎকণ্ঠার নগরীতে পরিণত হয়েছিল। সেই আতঙ্ক আর উৎকণ্ঠকে সঙ্গে নিয়ে বরাকের সাধারণ নাগরিকরা উদ্বাস্তু অসহায়দের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। একাত্তরে করিমগঞ্জে প্রায় লক্ষাধিক শরণার্থী আশ্রয় খুঁজে নিয়েছিল। করিমগঞ্জ মহকুমা শহরের স্থানীয় বাসিন্দাদের চেয়ে শরণার্থী সংখ্যা বেশি ছিল। করিমগঞ্জের নিলামবাজার, কালিগঞ্জ, আচিমগঞ্জ, লাতু, মহিশাসন কিংবা সুতারকান্দি একাত্তরে উদ্বাস্তুতে লোকারণ্য ছিল। একাত্তরের সেই উত্তাল সময় ওঠে এসেছে ১৯ মে *দৃষ্টিপাত* পত্রিকায়।

'শরণার্থীর চাপ, রোগের চাপ, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবের চাপ সর্বোপরি এ সমস্ত পরিস্থিতির জন্য উদ্ভুত মানসিক চাপে আজ করিমগঞ্জ ভারাক্রান্ত। সারা কাছাড়ের দৃষ্টি কেন্দ্র আজ করিমগঞ্জ। করিমগঞ্জের খবরই আজ কাছাড়ের সেরা খবর।

এখন এই পরিস্থিতিতে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে করিমগঞ্জবাসীর অসীম মনোবল। এক হাতে রোগ শোক অভাবকে রুখে আরেক হাতে শরণার্থীদেরকে বুকে টেনে নিতে হচ্ছে তাদের। আর তা তারা করে চলেছেন অসীম মনোবলে আর যোগ্যতার সঙ্গে।'[৪]

বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের সহায়তা, ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা, সর্বোপরি রাজ্য ও কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে পূর্ববঙ্গের আন্দোলনের যৌক্তিকতা তুলে ধরার জন্য বরাকে একাত্তরে বেশ কয়েকটি সহায়ক কমিটি গঠিত হয়েছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ও প্রভাবশালী প্লাটফর্মটি গড়ে তুলেছিলেন শিলচর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন। শিলচরের বিশিষ্টজনদের নিয়ে গঠন করা হয় 'বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি'।[৫] শিলচর পৌরসভার পৌরপিতা দ্বিজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে প্রধান করে তারাপদ ভট্টাচার্যকে সম্পাদক করে এই কমিটি গঠন করা হয়। মৃনালকান্তি দত্ত বিশ্বাস ওরফে পলু বিশ্বাস ছিলেন সহ-সম্পাদক। প্রায় ৪০ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটিতে অঞ্জলী লাহিড়ীর বোনের জামাই বীরেশ মিশ্র, তাঁর স্ত্রী ডাক্তার কল্যানী মিশ্র, ডাঃ দিলীপ দে, সুভাষ চৌধুরী, বিপ্লবী অনন্ত দেব সম্পৃক্ত ছিলেন।[৬] পৌরসভার কর্মীরা বাংলাদেশের শরণার্থীদের সহায়তার একদিনের বেতন দান করেন। এই সহায়ক সমিতির উদ্যোগে শিলচরে আগত শরণার্থীদের আশ্রয় ও খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণ মানুষজনকে সমন্বিত করে পূর্ব বাংলার সহায়তায় ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। শুরুতে সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, নর্মাল স্কুল, জি.সি কলেজ, কাচার কলেজ, নরসিংহ বয়েজ স্কুলও কাচার হাইস্কুলে গড়ে তোলা হয় অস্থায়ী শরণার্থী ক্যাম্প। রেডক্রসের উদ্যোগে শুরু হয় শরণার্থীদের জন্য চিকিৎসা সহায়তা কার্যক্রম। স্বদেশি স্কুল বা দীননাথ নবকিশোর বালিকা বিদ্যালয়ে গড়ে ওঠে বিশাল ক্যাম্প। যেটাতে রাজনৈতিক শরণার্থীদের থাকতে দেয়া হত। পৌর কতৃপক্ষের পাশাপাশি রাজনৈতিক দল, নারী সংগঠন পাড়ায় ক্লাব ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্ত হয় শরণার্থী সহায়ক কার্যক্রমে। প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক সম্মিলনী, সিআরইউ, ইণ্ডিয়া মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, শিলচর শাখা, কাচাড় ক্লাব, কাচাড় ল ইয়র্স অ্যাসোসিয়েশনসহ শতাধিক সংস্থা সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। শুরুর দিকে শরণার্থী কিছুটা কম ছিল, তখন শিলচরকেন্দ্রিক সংগঠনগুলো করিমগঞ্জে গিয়ে তাদের কর্মতৎপরতা চালাত। বিশেষ করে লাতু, পাথারকান্দি, সুতারকান্দি, মহিষাসনে শরণার্থী প্রবেশের ট্রানজিট ক্যাম্পাগুলোতে তারা সাহায্য পাঠাত।[৭] মে মাস হতে শিলচরেও বিপুল শরণার্থী আগমন শুরু হয়। শিলচরের পাশাপাশি করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, বদরপুরে শুরু হয় শরণার্থীদের আশ্রয় ও সহায়তার নানা কার্যক্রম।

১ এপ্রিল ১৯৭১ করিমগঞ্জের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠন করা হয় *করিমগঞ্জ বাংলাদেশ ত্রাণ কমিটি*।

কমিটিটি নিম্নরুপ[৮]

সভাপতি- সুরেন্দ্র চন্দ্র দেব

সহ-সভাপতি- নলিনী কান্ত দাস, প্রমোদ রঞ্জন চৌধুরি, আবু মোহাম্মদ আবদুর নূর

সম্পাদক- মন্মথ নাথ দত্ত

যুগ্ম-সম্পাদক- ভূপেন্দ্র কুমার সিংহ ও দক্ষিণারঞ্জন দেব

কোষাধ্যক্ষ- রাজেন্দ্রলাল রায়

ত্রাণ কমিটির পক্ষ থেকে আগত শরণার্থীদের নানাভাবে সহায়তা দেয়া হত। এছাড়া বরাক উপত্যকার সাধারণ জনগণকে বাংলাদেশের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার আহব্বান জানানো হয়। করিমগঞ্জ ত্রাণ কমিটি শরণার্থী সেবায় করিমগঞ্জের সাধারণ জনগণকে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়ে প্রচারপত্র বিলি করেন।[৯] সদ্য প্রয়াত করিমগঞ্জ সরকারি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক কামালুদ্দীন আহমেদের সৌজন্যে ত্রাণ কমিটির একটি লিফলেট সংগ্রহ করতে সমর্থ হই। নিচে সেটি তুলে ধরা হল।

করিমগঞ্জবাসী সহৃদয় জনদরদী জনসাধারণের প্রতি

নিবেদন

রাজনৈতিক এবং সামাজিক মর্য্যাদাবোধে অনুপ্রাণিত করিমগঞ্জবাসী জনসাধারণ, বিশেষভাবে ছাত্র ও যুবসমাজের অকৃত্রিম দেশপ্রেম এবং মানবতাবোধ সম্বন্ধে আমাদের অপরিসীম শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সাম্প্রতিক মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় আমরা বাংলাদেশ সীমান্তীক সর্বশ্রেণী এবং সর্বধর্ম্মীয় দেশবাসীর কাছে বিনীত আবেদন জানাইতেছি সর্বপ্রযত্নে সংযম, আত্মীয় দৃঢ়তা এবং মানবতাবোধ রক্ষা করিয়া আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী বাংলাদেশের জনগণের চরম সংকট মুহূর্তে যেন উপযুক্ত মনুষ্যত্বের পরিচয় দেই।

পাকিস্তানের দুর্দ্ধর্ষ জঙ্গীশাহী বাংলাদেশে নিধনযজ্ঞে বার বার মুক্তিকামী দুর্বার শক্তির কাছে পরাভূত হইয়া এখন আমাদের এলাকায় ওদের চর-অনুচরদের অনুপ্রবেশ ঘটাইয়া আমাদের অঞ্চলে হিন্দু মুসলমাদের সম্প্রীতি বিনষ্ট করিতে অগ্রসর হইয়াছে। এই অশুভ চক্রান্ত আমাদের সমবেত চেষ্টায় ব্যর্থ করিতে আমরা সর্বসাধারণকে আহবান জানাইতেছি। প্ররোচনা যত তীব্রই হউক না কেন আমরা যেন আমাদের চিরন্তন ঐতিহ্য অনুযায়ী সংযম রক্ষা করি।

বর্তমান অবস্থায় আমাদের একমাত্র কর্তব্য- বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামীদের এই পরমমানবিক আত্মবলিদানে সর্ব্বতো প্রযত্নে তাহাদের নূন্যতম জীবনধারণ সমস্যা দূরীকরণে সহায়তা প্রদান।

উৎপীড়ন কারীর বিরুদ্ধে উৎপীড়িতের সংগ্রামই ধর্মযুদ্ধ-। এই সংগ্রামে মুক্তিসেনাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।

জয়বাংলা-

বিনীত

শ্রী সুরেশচন্দ্র দেব, সভাপতি, বাংলাদেশ ত্রাণ কমিটি

শ্রী মইনুল ইছলাম চৌধুরী, সভাপতি, উত্তর করিমগঞ্জ আঞ্চলিক পঞ্চায়েত

শ্রী রথীন্দ্রনাথ সেন, এম, এল, এ

শ্রী আবদুলবারী এম, এল, এ

শ্রী মঈন উদ্দিন চৌধুরী

শ্রী মমথনাথ দত্ত, সাধারণ সম্পাদক, করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস

শ্রী নলিনী কান্ত দাস, সহ সভাপতি, বাংলাদেশ ত্রাণ কমিটি

শ্রী দক্ষিণারঞ্জন দেব, চেয়্যারম্যান, ভারত সেবক সমাজ

শ্রী ছিদ্দিক আহমদ চৌধুরী

শ্রী ভূপেন্দ্র কুমার সিংহ, সম্পাদক, *দৃষ্টিপাত*

একাত্তরে বরাকের সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততা কতটা ছিল? সেটা খুব সহজে বোঝা যায় করিমগঞ্জের বাংলাদেশ ত্রাণ কমিটির ত্রাণ দাতাদের তালিকা দেখলে। হাজী দানেশ আলী এন্ড সন্স করিমগঞ্জ শহরের সাধারণ এক মুদি দোকান একাত্তরে শরণার্থীদের জন্য ত্রাণ তহবিলে দান করছেন এক বস্তা আলু ও দুই বস্তা পিঁয়াজ, করিমগঞ্জ শহরের এক সাধারণ গৃহস্থ সূর্য কুমার দে ত্রাণ তহবিলে দান করলেন এক বস্তা লবণ। কেউ দিচ্ছেন লুঙ্গি, কেউবা দিয়াশলাই, চা পাতা, কাপড় থেকে কেরোসিন নিজের সাধ্যের সর্বোচ্চটুকু নিয়ে তৃণমূল জনতা এক হলেন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে।[১০]

একাত্তরে করিমগঞ্জের সবচেয়ে প্রচারিত সাপ্তাহিক *দৃষ্টিপাত* এর সবগুলো সংখ্যা সংগ্রহ করতে সমর্থ হই। ভূপেন্দ্রকুমার সিংহ সম্পাদিত সেই পত্রিকায়ও সেই সময়কার সাধারণ জনগণের সাহায্য সহযোগিতার কিছু তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। করিমগঞ্জের সাধারণ জনগণ বাঙালির এই মুক্তিসংগ্রামে কতটা আবেগ নিয়ে সহায়তার হাত বাড়িয়েছিল সেটি এই দানের তালিকা দেখলে স্পষ্ট হয়। করিমগঞ্জের মতো

শিলচরের দোকানদার, ব্যবসায়ী ও সাধারণ জনগণও সাধ্যমত সাহায্য করেছে বাংলাদেশ সহায়ক কমিটিতে। কোন দোকানদার শরণার্থীদের জন্য দিচ্ছে পিঁয়াজ, কেউ বা এক ব্যাগ লবণ, কেউ গরম কাপড়, চিনি, তেল, চাল, ডিম বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় সব আনুষাঙ্গিক সরবরাহ করছে সাধারণ জনতা। গ্রামের সাধারণ কৃষক সুরমান আলী, মুক্তিযুদ্ধে একাত্ম জানানোর উপায় খুঁজে নিয়েছিল ত্রাণ তহবিলে নগদ টাকা সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে। সুরমান আলীর মত শত শত লোক এক টাকা, পঞ্চাশ পয়সা, পচিঁশ পয়সা, পাঁচ টাকা সাধ্যমত সহায়তা করেছে। একাত্তরে তাদের সহায়তায় বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে অবিভক্ত কাছাড়ে পেয়েছিল ভিন্ন এক মাত্রা।

শরণার্থীদের সর্বপ্রকারের সহযোগিতার জন্য নিলাম বাজারে সর্বদলীয় স্বাধীন বাংলা সহায়ক সমিতি গড়ে তোলা হয়। আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের সভাপতি নিখিল কান্তি দাসকে সভাপতি করে গঠিত কমিটিতে নিলাম বাজারের নানা শ্রেণীপেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করা হয়। জ্যেতিষ সেনকে সম্পাদক ও প্রদ্যুৎ রায়কে কোষাধ্যক্ষ করে গঠিত ৩৫ সদস্যের কমিটি একাত্তরে নিলাম বাজারে শরণার্থী সহায়তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।[১১]

সুধাংশু বিমল করকে সভাপতি, মাধবেন্দ্র দত্ত চৌধুরীকে সম্পাদক, সঙ্গীন সেনগুপ্ত ও গোপাল দাসকে সহ-সভাপতি করে একাত্তরে রামকৃষ্ণনগরে গড়ে ওঠেছিল শরণার্থী সহায়তা কমিটি। এই কমিটির উদ্যেগে শরণার্থী সহায়তায় বিপুল ত্রাণ সংগ্রহ করা হয়।[১২]

হাইলাকান্দিতে শরণার্থীদের সহায়তা ও আশ্রয় প্রদানের জন্য গড়ে ওঠে পূর্ব্ববঙ্গ ত্রাণ সমিতি, হাইলাকান্দি। একাত্তরে এই ত্রাণ সমিতির সহায়তায় হাইলাকান্দি থেকে বিপুল সংখ্যক অর্থ সংগৃহীত হয়। এই সমিতির উদ্যোগে হাইলাকান্দিতে আগত শরণার্থীদের আশ্রয়, সহায়তা ও প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি এই সমিতি একাত্তরে হাইলাকান্দিতে বাংলাদেশের সপক্ষে বড় ধরণের জনমত তৈরিতে সহায়তা করেন।[১৩] শরণার্থীদের সহায়তায় পূর্ব্ববঙ্গ কেন্দ্রীয় ত্রাণ কমিটিকে সহায়তার জন্য রাতাবাড়িতে একটি ত্রাণ কমিটি গঠন করা হয়। এর সভাপতি করা হয় সুরঞ্জন নন্দীকে। আক্রম আলী পান সম্পাদকের দায়িত্ব।[১৪]

বরাকের বিভিন্ন প্রান্তের অধিবাসী কাছাড় কলেজের শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে একাত্তরে গড়ে উঠেছিল *বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি*। শংকর রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে কাটিগড়ার তরুণ ছাত্রনেতা ইমাদ উদ্দিন বুলবুল ছিলেন এর সম্পাদক। জুলাই মাসে এই সহায়ক সমিতি ‘বাংলাদেশের জনগণকে আমরা কেন

সাহায্য করিতেছি’ শীর্ষক একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করেন।[১৫] যেখানে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানের আহবান, যৌক্তিকতা ও পূর্ববঙ্গের সংগ্রামের প্রেক্ষিত আলোচিত হয়।

কালিগঞ্জ, আচিমগঞ্জ, লাতুতে গড়ে ওঠে বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি। ৩০ মে ১৯৭১ কাছাড় মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় ১৯৭১-৭২ সালের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়। পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের সহায়তায় এই বার্ষিক অধিবেশনে ৪ সদস্যের একটি সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক হলেন যথাক্রমে রামচাঁদ সারদা, নির্মল কুমার গুহ, অরবিন্দ দত্ত চৌধুরী, মনোরঞ্জন দে। সমন্বয় কমিটি একাত্তরে ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ী ও তাদের অন্যান্য গিল্ডগুলোকে শরণার্থী ত্রাণে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

একাত্তরে তৃণমূল বরাকবাসী নানাভাবে সম্পৃক্ত হয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামে। সাধারণের অসাধারণ সেই সম্পৃক্ততা নিম্নে তুলে ধরা হল।

ক. শরণার্থীদের আশ্রয় ও সহায়তা

একাত্তরে বরাক উপত্যকায় মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ছিলেন অতীন দাশ। মুক্তিযুদ্ধে তৃণমূলের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, ‘সরকারি স্তরে সাহায্য সহযোগিতা ছাড়াও নাগরিক পর্যায়ে এই মুক্তিযুদ্ধে ভারতের জনগণ যেভাবে সহায়তার হাত নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন তা-ও অভূতপূর্ব। নিজেদের নানাধিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সেই দায় তাঁরা বহন করেছেন, সারা দেশের মানুষকেই বাংলাদেশ সহায়তা কোষে বাধ্যতামূলক সাহায্য দিতে হয়েছে, কিন্তু সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার নাগরিকদের দায়িত্ব ছিল একটু ভিন্ন মাত্রার। এক কোটির অধিক শরণার্থীর আশ্রয় প্রদানই শুধু নয়, মুক্তিযোদ্ধাদের নানা ধরনের লজিস্টিক সাপোর্ট দিতে হয়েছে বেসরকারি পর্যায়েও।’[১৬]

বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে সরকারি পর্যায়ের সহযোগিতা ছিল সীমাবদ্ধ। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই বরাক উপত্যকাসহ আসামের সাধারণ লোকজন পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থীদের সহায়তায় এগিয়ে আসে। সীমান্তের কাছাকাছি জায়গাগুলোতে গিয়ে আগত শরণার্থীদের নানাভাবে সহায়তা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। শরণার্থী আগমনটা ছিল করিমগঞ্জের বিভিন্ন সীমান্ত হয়ে, কিন্তু শরণার্থীদের জন্য আবেগ-ভালোবাসা কোন অংশে কম ছিল না শিলচর, হাইলাকান্দির লোকজনের।

একাত্তরে বাংলাদেশের জন্য কিছু করার প্রথম তাগিদটা অনুভব করেছিলেন শিলচরের প্রখ্যাত আইনজীবী ব্যারিষ্টার গোলাম ওসমানি। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম ছাত্র সংগঠক, কাছাড় কলেজকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির সম্পাদক ইমাদ উদ্দিন বুলবুল সেই সম্পর্কে লিখছেন, 'শিলচরে বাংলাদেশকে সহায়তা করার জন্য বেশ ক'টি গোষ্ঠী (গ্রুপ) এগিয়ে এসেছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় গোষ্ঠী ছিল এএফ গোলাম ওসমানির তত্ত্বাবধানে। ওসমানি একজন স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তি ছিলেন। রবীন্দ্রদর্শনের দ্বারা লালিত ও প্রভাবিত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তাঁর তনু-মন-প্রাণে ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তিনি সংগঠনের শীর্ষে থাকলেও তা পরিচালনার জন্য তাঁর দুটি হাত ছিল তারামণি চৌধুরী আর অতীন দাশ। এদের বাদ দিয়ে ওই সময়ের গোলাম ওসমানিকে চিন্তা করা যায় না। এ ছাড়া, ওসমানির অনুগামীদের সংখ্যা অনেক ছিল। শহর এবং গ্রামে ছড়িয়ে ছিল।[১৭]

মাঠপর্যায়ের গবেষণায় কাছাড়ে মুক্তিযুদ্ধে সাধারণের অবদান অনুসন্ধানে যাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি প্রত্যেকেই গোলাম ওসমানির নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। গোলাম ওসমানি কাছাড়ের প্রথম ব্যাক্তি যিনি পূর্ববঙ্গের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। বিষয়টির একটি বড় মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব রয়েছে। এর ফলে কাছাড়ের মুসলমানদের বড় একটি অংশ এই কার্যক্রমের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করেন। করিমগঞ্জ কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক কামালউদ্দিন আহমেদ বলছিলেন, 'ওসমানির এগিয়ে আসা আমাদের দ্বিধান্বিত মনোজগতে প্রভাব ফেলেছিল। ইসলামের লেবাসের কারণে এতদিন যারা পাকিস্তানের ঘোর সমর্থক ছিল, ঘটনা প্রবাহে তারা সবাই পূর্ববঙ্গের সহায়তা এগিয়ে আসল। ওসমানি সীমান্তপাড়ের মুসলমানদের এটা বুঝাতে পেরেছিলেন ধর্মের চেয়ে মানবিকতা অনেক বড় বিষয়।'[১৮]

গোলাম ওসমানি মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় শরণার্থীদের সহায়তায় ঘুরে বেড়িয়েছেন সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে, সংঘটিত করার চেষ্টা করেছেন নানা শ্রেণী পেশার মানুষ। নিজের বাড়িটি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের জন্য।

শরণার্থীদের জন্য সর্বাত্মক সহায়তা নিয়ে কাছাড়ে সবার আগে এগিয়ে আসেন করিমগঞ্জ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন। এপ্রিলের শুরুতে যখন লাতু, মহিশাসন, সুতারকান্দি হয়ে শত শত লোক করিমগঞ্জে প্রবেশ শুরু করে, মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন সুতারকান্দি সীমান্তে অস্থায়ী ক্যাম্প করে আগত লোকজনকে খাবারের ব্যবস্থা করেন। বাংলাদেশের জনগণের চরমতম দুঃখ দুর্দশার প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে করিমগঞ্জের ব্যবসায়ীবৃন্দ পহেলা বৈশাখ, অক্ষয় তৃতীয়া ও রথ যাত্রার দিন হালখাতার সময় চিরাচরিত মিষ্টিমুখ করানো বন্ধ রেখে ঐ অর্থ পূর্ববাংলার আর্তদের সাহায্যে দান করার সিদ্ধান্ত নেন।[১৯] মার্চেন্ট

অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তুলারাম ভুঁরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে করিমগঞ্জ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এই সিদ্ধান্ত জানান।

শিলচর মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট অরবিন্দ দত্ত চৌধুরী ব্যবসায়ী মহল থেকে সংগ্রহ করতেন গেঞ্জি, লুঙ্গি, কাপড়ের সুতা, মাথার তেল, সাবন, বিস্কুট ও ঔষধ। এগুলো লাতু সীমান্তের শরণার্থীদের মাঝে বিলি করা হত।[২০] এছাড়া মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের মনোরঞ্জন দেব, নলিনী কান্ত দাস, ভানু গুহ, টুকু ব্যানার্জি শরণার্থী ত্রাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

করিমগঞ্জ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন তাদের অধিভুক্ত সমস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে শরণার্থী ত্রাণে সম্পৃক্ত হওয়ার অনুরোধ জানায়। এর ফলে শহরের প্রত্যেকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সাধ্যমত ত্রাণ তহবিলে দান করেন। কাপড়ের দোকান কাপড়, কেরোসিনের দোকান কেরোসিন, মুদির দোকান চাল, ডাল, ঔষধের দোকান ঔষধ কিংবা কখনো নগদ অর্থ সাহায্য। এইসব মিলে একাত্তরে করিমগঞ্জে হৃদত্যার এক অপূর্ব সম্মিলন সৃষ্টি হয়েছিল। যার প্রেক্ষিত রচনা করেছিলেন করিমগঞ্জ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন।

কাছাড় মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন আগস্ট মাসে ১০৬২ টাকা প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করেন শরণার্থীদের সেবায়।[২১] একাত্তরে বরাকে আশ্রয় নেওয়া নারী ও শিশুদের কল্যাণে কাজ করেছিলেন হাইলাকান্দির একটি সংগঠন 'মৈত্রী', বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই সংগঠন ৩৬৮ টাকা সংগ্রহ করেন। যেগুলো দিয়ে বাচ্চাদের খাবার কিনে হাইলাকান্দিতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থী পরিবারের শিশুদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।[২২]

রাজ্যিক বিদ্যুৎ পর্ষদ, করিমগঞ্জ শাখার পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাদের একদিনের বেতন পূর্ববঙ্গের জনগণের সাহায্যার্থে ব্যয় করা হবে। সেই অনুযায়ী করিমগঞ্জে কর্মরত বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীরা জুলাই মাসের একদিনের বেতন সংগ্রহ করে ৪২৫ টাকার একটি ব্যাংক ড্রাফট প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর করিমগঞ্জ সফরের সময় তাঁর হাতে তুলে দেয়া হয়।[২৩]

হাইলাকান্দি রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদও তাদের কর্মীদের একদিনের বেতন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য দান করেন। পাশাপাশি তারা পূর্ববঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর সক্রিয় হস্তক্ষেপ কামনা করেন। সভায় প্রস্তাব নেয়া হয়, 'বাংলাদেশের মহান জনগণ তাদের পবিত্র স্বাধীনতার জন্য যে ঐতিহাসিক সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন তার প্রতি একাত্মবোধ ঘোষণা করে নূন্যতম কর্তব্য হিসেবে প্রত্যেক কর্ম্মচারীর একদিনের শ্রমমূল্য প্রদান করা হবে।'[২৪]

সংগৃহীত অর্থ শিলং এর কেন্দ্রীয় ভান্ডারের মাধ্যমে মুক্তিসংগ্রামের সহায়তায় ব্যয় করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্ম্মীদের একদিনের বেতন দান

গত ২৭শে এপ্রিল স্থানীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত স্থানীয় রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্ম্মচারীদের একটি সভায় বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে জঙ্গী শাসক কর্তৃক বাংলাদেশে গণহত্যা ও বর্ব্বরোচিত অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করা হয়। সভা বাংলাদেশে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সক্রিয় হস্তক্ষেপ ও বিশ্ব বিবেকের কাছে আবেদন জানায়। সভা অন্য একটি প্রস্তাবে, বাংলাদেশের মহান জনগণ তাদের পবিত্র স্বাধীনতার জন্য যে ঐতিহাসিক সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন তার প্রতি একাত্মবোধ ঘোষণা নূন্যতম কর্তব্য হিসেবে প্রত্যেক কর্ম্মচারীর একদিনের শ্রমমূল্য দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এভাবে সংগৃহীত সমস্ত অর্থ শিলং এর কেন্দ্রীয় ভান্ডারের মাধ্যমে মুক্তি সংগ্রামের সহায়তায় ব্যয় করা হবে বলে জানা গেছে।[২৫]

শরণার্থী সেবায় কাছাড়ের সাধারণ মানুষের পাশাপাশি স্থানীয় চা বাগানের শ্রমিরাও সোচ্চার ছিল সবসময়। কাছাড়ের চা শ্রমিকরা একাত্তরে ত্রিশ হাজার টাকা বাংলাদেশের ত্রাণ তহবিলে দান করেন। চা শ্রমিকদের ইউনিয়ন একাত্তরের শুরুতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাদের সমস্ত শ্রমিকদের একদিনের বেতন পূর্ববঙ্গের শরণার্থী সেবায় দান করবেন।[২৬] এরই অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর করিমগঞ্জ সফরের সময় তারা ১০,০০০ টাকা প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। ২৫ জুলাই কাছাড় চা শ্রমিকদের পক্ষে রাষ্ট্রমন্ত্রী জগন্নাথ সিং মুখ্যমন্ত্রী মহেন্দ্র মোহন চৌধুরীর হাতে ১০,০০১ টাকা দান করেন।

শরণার্থীদের জন্য কাছাড় চা শ্রমিক ইউনিয়নের দান

২৫ শে জুলাই আসামের শিল্প প্রতিমন্ত্রী শ্রীজগন্নাথ সিংহ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহেন্দ্র মোহন চৌধুরীর হাতে আরো দশ হাজার টাকার এক খানা চেক কাছাড় চা শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষে অর্পন করেন। বাংলাদেশাগত শরণার্থীদের সেবায় এই টাকা ব্যয়িত হবে। চা শ্রমিক ইউনিয়ন ইতপূর্ব্বে আরো দশ হাজার টাকা এই উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর হাতে দিয়েছেন। চা শ্রমিকদের একদিনের বেতন শরণার্থীদের সেবায় দানের যে সিদ্ধান্ত ইতিপূর্ব্বে নেওয়া হয়েছিল, এই দান তারই কিস্তি।[২৭]

কাছাড় পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের একদিনের বেতনের ২৮০০ টাকা মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে দান করেন।[২৮] কাছাড় ক্লাবের উদ্যোগে বাংলাদেশের শরণার্থীদের সহায়তায় একটি তহবিল গড়ে তোলা

হয়। এতে কাছাড় ক্লাবের সদস্যদের পাশাশাশি স্থানীয় বিত্তশালী ও সাধারণ লোকজনকে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। কাছাড় ক্লাবের উদ্যেগে একাত্তরে শিলচর, করিমগঞ্জে আশ্রয় প্রার্থী বিপুল শরণার্থীকে নগদ অর্থ সাহায্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনে দেয়া হয়। পাথারকান্দি ও সোনাক্ষিরা ক্যাম্পে তাদের উদ্যেগে পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা হয়।[২৯]

করিমগঞ্জের রাতাবাড়ির সাধারণ লোকজন সম্পৃক্ত হয়েছিল উদ্বাস্তুদের সহায়তায়। রাতাবাড়ি থানা শাখা, রাজ্যিক বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য তহবিল গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে অর্থসংগ্রহের পাশাপাশি ৩০ মে আয়োজন করা হয় বিচিত্রানুষ্ঠানের। রাতাবাড়ি রামকৃষ্ণনগরে আয়োজিত এই বিচিত্রানুষ্ঠানে নাচ, গানের পাশাপাশি কবিগানের আসরের আয়োজন করা হয়।[৩০] স্থানীয় কবিয়াল রাইমোহন দেব তার *জয়বাংলার হত্যাকাণ্ডের কবিতা* শিরোনামে কবিগান পরিবেশন করেন। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১৫০০ টাকা সংগ্রহ করা হয়। ১১ জুন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর হাতে রাজ্যিক বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি রাতাবাড়ি থানা শাখার পক্ষে সুরঞ্জন নন্দী এই টাকা তুলে দেন।[৩১] এছাড়া এই সমিতির উদ্যেগে বেশ কিছু শীতবস্ত্র কেনা হয়। যেগুলো রাতাবাড়ি শরণার্থী ক্যাম্পে বিলি করা হয়। হাইলাকান্দি মহিলা সমিতির উদ্যোগে শরণার্থীদের সহযোগিতায় ১০০০ টাকা সংগ্রহ করা হয়। এই টাকা সমিতির পক্ষে রীতা ভৌমিক মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করেন।[৩২]

একাত্তরে শরণার্থী ত্রাণে প্রথম সংঘবদ্ধ উদ্যোগ দেন কাছাড় প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনী। প্রাইমারী শিক্ষক আবদুল কুদ্দুস লস্কর এতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখেন। সম্মিলনীর সদস্যদের প্রত্যেকের একদিনের বেতন প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। হায়ার সেকেন্ডারি কাছাড় শিক্ষক সম্মিলন ও কলেজ শিক্ষক সমিতিও আলাদাভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করেন। করিমগঞ্জ মহকুমা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনীর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্র কুমার দেব বাংলাদেশ ত্রাণ তহবিলে দানের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত ১০০১ টাকা (এক হাজার এক টাকা) আসামের মুখ্যমন্ত্রী মহেন্দ্র মোহন চৌধুরীর কাছে পাঠান। ৫ অক্টোবর উক্ত টাকার প্রাপ্তি স্বীকার করে মুখ্যমন্ত্রী সম্মিলনীর সম্পাদকের কাছে এক শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন।[৩৩]

বাংলাদেশ ত্রাণকার্যে সহায়তার জন্যে মহকুমার দরিদ্র প্রাথমিক শিক্ষকরা চাঁদা দিয়ে ঐ ১০০১ টাকা সংগ্রহ করেন। করিমগঞ্জ মহকুমার এম. ই. শিক্ষকরা বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের সাহায্যকল্পে তাহাদের একদিনের বেতন দান করার সিদ্ধান্ত নেন। এম. ই. শিক্ষক সমিতির সম্পাদক আক্রাম আলী এই টাকা ত্রাণ তহবিলে প্রদান করেন।[৩৪] করিমগঞ্জ জেলা সাহায্য প্রাপ্ত উচ্চ এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক

সংস্থা প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ ত্রাণ তহবিলে ১৫০১ টাকা দান করেন।[৩৫] করিমগঞ্জ জেলা এইডেড হাই ও হাইয়ার সেকেন্ডারী স্কুল শিক্ষক সমিতি প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ রিলিফ ফান্ডে দেড় হাজার টাকা দান করেন।[৩৬]

বদরপুর নবীনচন্দ্র কলেজের ছাত্ররা শরণার্থীদের সাহায্যকল্পে ২৬টি শাড়ি, ৯২টি প্যান্ট, ৯২টি ফ্রগ, ৪৬টি ব্লাউজ, ৩টি শায়া, ৬টি ট্রাউজার, ২৪টি গেঞ্জী, ৬টি সুয়েটার, ৫টি কোট ও ১টি টুপি বদরপুরস্থিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধির হাতে প্রদান করেন। কলেজের ছাত্র নেতা মনিরুজ্জামান, মানিকালাল দে, সত্যকাপ্রসাদ চক্রবর্তী ও রত্না পোদ্দারের নেতৃত্বে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এই সমস্ত বস্ত্র সংগ্রহ করেন। বাংলাদেশ সরকারের বদরপুরস্থ লিয়াসন অফিসার ঐ সকল সামগ্রী ধন্যবাদের সঙ্গে সংগ্রহ করেন। বদরপুর কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ নিশীথ রঞ্জন দাস ছাত্রছাত্রীদের এই ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন।[৩৭]

শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, বদরপুরের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের সহায়তা, মুক্তিসংগ্রামে সাধারণের সম্পৃক্ততার অন্যতম নজির। ধুবড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ধুবড়ি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, কাছাড় কলেজ, শিলচর হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, নর্মাল স্কুল, জি. সি. কলেজ, নরসিংহ বয়েজ স্কুল, সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, দীননাথ নব কিশোর বালিকা বিদ্যালয়, হাইলাকান্দি হাই স্কুল, বদরপুর কলেজের শিক্ষকরা বাংলাদেশের শরণার্থীদের কল্যাণে একদিনের বেতন দান করেন।[৩৮] শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের জন্য ত্রাণ তহবিল সংগ্রহ করেন। জি.সি. কলেজের শিক্ষার্থীরা শিলচর শহরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে শরণার্থীদের জন্য পুরানো কাপড় সংগ্রহ করেন। আবার নরসিংহ বয়েজ স্কুলের শিক্ষার্থীরা টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে ৩০০ টাকা দান করেন মুখ্যমন্ত্রীর বাংলাদেশ শরণার্থী কল্যাণ তহবিলে।[৩৯] হাইলাকান্দির একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২০ জন শিক্ষার্থী নিজেদের পুরানো বইপত্র, খাতা, কলম, স্কুল ব্যাগ দান করেন স্থানীয় শরণার্থী ক্যাম্পের বিশজন শিক্ষার্থীকে।[৪০] সবমিলিয়ে স্কুল, কলেজের শিক্ষক, শিক্ষার্থীরা মিলে একাত্তরে অন্য রকম এক সহমর্মিতার জন্ম দিয়েছিল। পিছিয়ে ছিল না অশিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও। কাছাড় কলেজ, বদরপুর কলেজ, করিমগঞ্জ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, করিমগঞ্জ কলেজ, শিলচর নর্মাল স্কুলের অশিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা একাত্তরে তাদের একদিনের বেতন দান করেছিলেন শরণার্থীদের কল্যাণে। বাংলাদেশের শিল্পী ও শরণার্থীদের সাহায্যার্থে করিমগঞ্জ জেলা মহিলা সমিতি রবীন্দ্রনাথের *চন্ডালিকা* নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। এর মাধ্যমে আয়কৃত ৩০০ টাকা দিয়ে শরণার্থী শিল্পীদের সহায়তা করা হয়।[৪১]

১১ নভেম্বর করিমগঞ্জ কলেজ অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যার্থে এক বিচিত্রানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে সমিতির সভানেত্রী মিলনশশী মজুমদার এই বিচিত্রানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে বাংলাদেশের শিল্পী আরতি ধরের পরিচালনায় 'সোনার বাংলা' সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। বিচিত্রানুষ্ঠানে শিব তাণ্ডব নৃত্য, ভারত নাট্যম্ নৃত্য ও ময়ুর নৃত্য দর্শকদের প্রচুর প্রশংসা লাভ করেন। বাংলাদেশের শিল্পী সাইফুল মুহাম্মদ, আরতি ধর ও স্থানীয় কতিপয় শিল্পী কণ্ঠ সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন। জয় বাংলার বিভিন্ন সঙ্গীত অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়। বাংলাদেশ ও ভারতের জাতীয় সঙ্গীত দ্বারা অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।[৪২]

স্বাধীন বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি (শিলচর) এর উদ্যোগে ১৩ ও ১৪ নভেম্বর শিলচরে আয়োজন করা হয় বিচিত্রানুষ্ঠানের। শিলচর ডিএসএ (জেলা ক্রীড়া সংস্থা) এর মাঠে শরণার্থীদের সহায়তায় পিন্টু দত্ত ও অরুণ ব্যানার্জির পরিচালনায় যাত্রিক এই বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে শিল্পী মান্না দে অংশ নেন। এছাড়াও তরুণ ব্যানার্জী, মঞ্জু ব্যানার্জী, কমল সেন, নীল কান্ত নন্দী, নিমু মুখার্জি, প্রদীপ গাঙ্গুলি, খোকন মুখার্জি, অমর দত্ত সহ অনেকেই অংশ নেন।[৪৩] পাশাপাশি শরণার্থী শিল্পী আরতি রায়সহ বাংলাদেশ বেতারের দুইজন শিল্পী এতে অংশ নেন। টিকেট কেটে বিপুল সংখ্যক স্থানীয় দর্শক এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

শরণার্থীদের সহায়তায় রামকৃষ্ণনগর আঞ্চলিক পঞ্চায়েত ১৪ জুন ১৯৭১ এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে সংগৃহীত হয় ১৫০১ টাকা। শ্রীসুরঞ্জন নন্দীর উদ্যোগে এই অর্থ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হাতে তুলে দেয়া হয়।[৪৪]

ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনেকেই সাহায্য করেছেন। করিমগঞ্জের *দৃষ্টিপাত* পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন্দ্রকুমার সিনহার উদ্যোগে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনেকেই সাহায্য করেছেন। এ ব্যাপারে করিমগঞ্জ ছিল অগ্রণী। *দৃষ্টিপাত* পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন্দ্রকুমার সিংহের উদ্যোগে মহকুমা পরিষদের কার্যবাহী সদস্য রেনু মিয়া, বিনোদ সোম, সত্য আচার্য প্রমুখ যেমন সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিলেন, তেমনি নলিনীকান্ত দাস প্রমুখের নেতৃত্বে করিমগঞ্জ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন যথেষ্ট দায়িত্ব পালন করেন। অগ্রণী ব্যবসায়ী মনোরঞ্জন বণিক, তুলারাম ভোঁরাসহ অনেকেই নানারকম সাহায্য করেন। কিছু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থাও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসে। সিলেটের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য (বাবুল) এর উদ্যোগে শিলচর সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সহায়তায় এখানে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আরতি ধর, হিমাংশু বিশ্বাস, বিদিতলাল দাস প্রমুখ অংশ নিয়েছিলেন।[৪৫]

হাইলাকান্দি জেলায় শরণার্থী সহায়তায় সাধারণ সম্পৃক্তকরণ ও ত্রাণ সরবারাহের উদ্দেশ্যে সেপ্টেম্বর মাসে একটি নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। 'রক্তে রাঙ্গা জয়বাংলা' নামক নাটকটিতে স্থানীয় শিল্পীরা অংশ নেয়। ১২ সেপ্টেম্বর স্থানীয় টাউন হলে, ১৮ সেপ্টেম্বর ইএন্ডডি অফিস চত্বরে, ২০ সেপ্টেম্বর হাইলাকান্দি মহিলা সমিতির উদ্যোগে লক্ষীনগর ক্যাম্পেও নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।[৪৬]

লাতু সীমান্তের সাধারণ গৃহস্থ বনমালি দত্ত। একাত্তরে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন বাংলাদেশ থেকে আগত ২টি পরিবারের দশ জন শরণার্থীকে। সীমান্ত পারের গৃহবধু রেণুকা, একাত্তরে সদ্য বিবাহিতা, শরণার্থীদের জন্য নিয়মিত রান্না করতেন। রান্না করা খাবার সীমান্ত দিয়ে আগত শরণার্থীদের খেতে দেয়া হত। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আসা শরণার্থীরা তৃপ্তি নিয়ে সে খাবার খেত। বলছিলেন রেণুকা, 'মানুষের ক্ষুধার কষ্ট কত অবর্ণনীয় হতে পারে, জয় বাংলার লোকগুলোকে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।'[৪৭]

করিমগঞ্জ কালিবাড়ি ঘাটের নদীর পাড়ের এক সাধারণ দোকানি, একাত্তরের নয় মাস একটি ছোট নৌকা নিয়ে বিনামূল্যে সীমান্ত পার হতে সহায়তা করেছে শত শত শরণার্থীকে।[৪৮] করিমগঞ্জের নিলামবাজার আঞ্চলিক পঞ্চায়েত ও দক্ষিণ করিমগঞ্জ উন্নয়ন সংস্থা তাদের একদিনের বেতন বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্যে ব্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৪৯]

খ. রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ প্রয়োগ

৩১ মার্চ সাপ্তাহিক *পূর্ব্বায়ন* তাদের সম্পাদকীয়তে স্বাধীনরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের আবেদন জানিয়ে লিখেন, 'এসময় ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে অবিলম্বে তাদের সহায়তায় এগিয়ে না গেলে তা শুধু মানবতাবিরোধী কাজই হবে না, তাদের রাজনৈতিক দেউলীয়াপনাই প্রমাণিত হবে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামীদের প্রতি আমাদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানাই।'[৫০]

২৯ মার্চ হাইলাকান্দিতে বাংলাদেশে পাকিস্তানের বর্বর গণহত্যার প্রতিবাদে হরতাল পালিত হয়। এই হরতালে হাইলাকান্দিতে সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত সমস্ত স্কুল-কলেজ, বাজার-দোকানপাট, সিনেমাহল বন্ধ রেখে সাধারণ লোকজন পূর্ববাংলার সংগ্রামী জনগণের প্রতি একাত্মতা জানায়। বিকাল সাড়ে চারটায় স্থানীয় টাউনহলে প্রায় ১৫০০ লোকের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তারা পূর্ব বাংলাকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান। সভাশেষে ইয়াহিয়া খাঁর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।[৫১]

বাংলাদেশে গণহত্যার প্রতিবাদে হাইলাকান্দিতে হরতাল

সমগ্র পূর্ববাংলায় আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলছে তার সমর্থনে বিশ্ববাসীর সঙ্গে হাইলাকান্দিবাসীও যে পেছনে নয় তারই প্রমান গত ২৯ শে মার্চ এর স্বতঃস্ফুর্ত হরতাল।

এ শহরের ছাত্র-ও যুব সমাজের যৌথ উদ্যোগে ঐ দিন সকাল ৮ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪ ঘটিকা পর্যন্ত শহরের সমস্ত স্কুল কলেজ, বাজার দোকানপাট, সিনেমাহল প্রভৃতি বন্ধ রেখে পূর্ববাংলার ৭ কোটি সংগ্রামী মানুষের প্রতি আন্তরিক সমর্থন ও অভিনন্দন জানায়।

বিকাল সাড়ে চার ঘটিকায় স্থানীয় টাউন হল প্রাঙ্গণে জেলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসন্তোষ কুমার রায়ের সভাপতিত্বে প্রায় সহস্রাধিক লোকের সমাবেশ অনুষ্ঠিত সভায় বিভিন্ন বক্তা পূর্ব্ববাংলার জনসাধারণের দুর্জয় সংগ্রামে সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং পাকিস্তানের জঙ্গী শাসক ইয়াহিয়া খানের নিষ্ঠুরতম অত্যাচার ও গণহত্যার তীব্র নিন্দা করেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবুরের প্রতি সমর্থন জানিয়ে এবং জঙ্গী শাসকদের অত্যাচারের তীব্র নিন্দা প্রকাশ করে এবং ভারত সরকার ও বিশ্বের স্বাধীনতাকামী মানুষের প্রতি বাংলাদেশের স্বাধীকারের সংগ্রামে সক্রিয় সহযোগিতা করার জন্য আবেদন জানায়। সভাশেষে ইয়াহিয়া খাঁর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।[৫২]

একইদিনে করিমগঞ্জেও হরতাল পালন করা হয়। হরতালে করিমগঞ্জের সমস্ত স্কুল, কলেজ, দোকানপাট, সিনেমাহল, যানবাহন বন্ধ ছিল। বিকালে হাই মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে কলেজ ইউনিয়নের সহসভাপতি নির্মল ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ মার্চ হরতাল পূর্ববর্তী একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে পরের দিন হরতাল সফল করে পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানি বর্বরতার প্রতি বরাকের জনগণকে সহমর্মিতা জানানোর অনুরোধ জানানো হয়। সভায় করিমগঞ্জ ত্রাণ কমিটির সভাপতি সুরেশচন্দ্র দেব, এম পি, রামকৃষ্ণ বণিক, যাদব সাহা, আবদুর নূর চৌধুরী, সতু রায়, কায়ুম চৌধুরী, আবদুর রউফ চৌধুরী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সবাই অবিলম্বে বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য সীমান্ত খুলে দেওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি ভারত কৃর্তক পূর্ববঙ্গের স্বীকৃতি প্রদানের দাবি জানানো হয়। করিমগঞ্জ ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টুডেন্ডস সোসাইটি, ছাত্র ফেডারেশন, কলেজ ইউনিয়ন এতে অংশ নেয়। ৩০ মার্চ ১৯৭১ স্বাধীন বাংলার মুক্তিকামী যোদ্ধাদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে পাথারকান্দিতে হরতাল পালন করা হয়। বিকালে বিধায়ক মতিলাল কালুর সভাপতিত্বে এক জনসভায় পাকিস্তানি সৈন্যদের অত্যাচারের প্রতিবাদ জানানো হয় এবং এর প্রতিকার দাবি করা হয়।[৫৩]

২৮ মার্চ রবিবার করিমগঞ্জ জেলা যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে হাই মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় পূর্ববঙ্গের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন জানানো হয়। নলিনীকান্ত দাস উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। সুরেশচন্দ দেব এম. পি, নৃপতি চৌধুরী, আবদুল রউফ চৌধুরী, আবদুল বাছিত চৌধুরী, সতু রায় প্রমুখ বক্তারা পূর্ববঙ্গের জঙ্গী শাসকদের বর্বরতার তীব্র নিন্দা করেন। শেখ মুজিবুরের নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আন্তরিক সমর্থন জানানো হয়। ২৯ মার্চ করিমগঞ্জে সর্বাত্মক হরতাল পালন করা হয়। ঐদিন বিকালে ছাত্র ফেডারেশন, কলেজ ইউনিয়ন প্রভৃতির উদ্যোগে আয়োজিত এক সভায়ও পূর্ববঙ্গের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানানো হয়। স্থানীয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টুডেন্টস সোসাইটি এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামীদের প্রতি তাহাদের আন্তরিক সমর্থন জ্ঞাপন করেন।[৫৪]

৩০ মার্চ কালিগঞ্জ ও আচিমগঞ্জেও হরতাল পালিত হয়। ২৯ মার্চ শিলচরে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। হরতালের সমর্থনে কাছাড় কলেজ ও জি. সি কলেজ থেকে দুটি বিশাল ছাত্র মিছিল বের হয়। এতে স্থানীয় স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়।[৫৫] ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি শিক্ষার্থীরা দাবি জানায়, ভারত যেন বাংলার মুক্তি সংগ্রামে পাশে এসে দাঁড়ায়। কাছাড় ছাত্র ইউনিয়ন, শিক্ষক সমিতি, শ্রমিক গিল্ড হরতালে সমর্থন দেন। শিলচর শহরে এইদিন একটি রিক্সা পর্যন্ত বের হয়নি। পরের দিন স্থানীয় *অরুণোদয়* পত্রিকা শিরোনাম করে ‘আমরা তোমাদের পাশে আছি’। পূর্ববঙ্গকে সর্বাত্মক সাহায্যের আহ্বান, সীমান্ত খুলে দেওয়ার দাবি ছাত্রসমাজের।[৫৬]

৫ এপ্রিল ভোর ৫টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত করিমগঞ্জের নিলামবাজারে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। হরতাল শেষে বিকালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরোচিত হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সভাপতি লিখনকান্তি দাস পৌরহিত্য করেন। সভায় জ্যোতির্ময় দাস, জ্যোতিষ সেন, পরিমল রায়, রাসবিহারী শর্মা, নবকৃষ্ণ পাল প্রমুখ বক্তাগণ পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্য বাহিনীর বর্বরোচিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জ্ঞাপন করেন। সভায় স্বাধীন বাংলা সরকারকে স্বীকৃতি ও সার্বিক সাহায্য দানের জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করা হয়।[৫৭]

পূর্ববাংলায় নারকীয় অত্যাচারের প্রতিবাদে ৮ এপ্রিল করিমগঞ্জ মহকুমার সুতারকান্দি, ফকিরের বাজার, জরেরবাজার এবং নয়াবাজারে সম্পূর্ণ দিন হরতাল পালন করা হয়। এবং আবদুল বাছিত চৌধুরীর আহ্বানে একটা জনসভাও অনুষ্ঠিত হয়। আবদুল হক চৌধুরী সভায় সভাপতিত্ব করেন। আবুল কালাম হাই স্কুল ও পাথু মহিষাশন হাইস্কুলের প্রায় চারশত ছাত্র এক শোভাযাত্রা সহকারে সভায় যোগদান করে। সভার প্রস্তাবে পশ্চিম পাকিস্তানি সশস্ত্র সৈন্য বাহিনীর অকথ্য অত্যাচার ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র

প্রতিবাদ জানান হয় এবং মুক্তি সংগ্রামীদের প্রতি সক্রিয় ও বাস্তব সমর্থন জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়। নৃপতি চৌধুরী, আবদুল বাছিত চৌধুরী, গোলাম ওসমানী, আবদুল জফির, সুখেন্দু বিকাশ পাল, আবদুল মুনিম, মুছলে উদ্দিন প্রমুখ বক্তাগণ ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। এবং সাধারণ জনগণকে শরণার্থীদের সহায়তায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

১০ এপ্রিল পূর্ববঙ্গের দুর্গত ও নির্যাতিত জনগণের প্রতি সমবেদনা জানানোর উদ্দেশ্যে বাটইয়া বাজারে হরতাল পালন করা হয়। স্বাধীন ঈদগাহ সিনিয়র মাদ্রাসার ছাত্ররা এদিন ধর্মঘট পালন করেন। একটি বিরাট মিছিল করে বাংলাদেশে গণহত্যার প্রতিবাদ জানানো হয়। বিকাল ৪ টায় বাজারে এক বিরাট জনসভায় স্বাধীন বাংলা সরকারকে স্বীকৃতির অনুরোধ জানান হয়। [৫৮]

২৯ মার্চ লাতুতে স্কুল ও দোকানপাট বন্ধ রেখে হরতাল পালন করা হয়। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা শোভাযাত্রা সহকারে এক সভায় মিলিত হয়।[৫৯] বদরপুর, নিলামবাজার, কাটিগড়ায়ও অনুরূপ হরতাল পালিত হয়। এসব হরতাল ও সভা থেকে অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতির জোর দাবি উঠে।

৩১ মার্চ করিমগঞ্জের *সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত* তাদের সম্পাদকীয়তে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের করণীয় বিষয়ে আলোকপাত করেন। সম্পাদকীয়তে স্পষ্টভাবে সাধারণ মানুষের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে। ‘উদ্বেলিত এই বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশী হচ্ছে ভারত। স্বাধীন বাংলার অত্যাচারের তাণ্ডব নৃত্যে প্রত্যেকটি ভারতীয় আজ উদ্বিগ্ন, উত্তেজিত। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মরণ পণে যারা লিপ্ত তাদের স্বাগত জানানো একটি রাজনৈতিক অবশ্য কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনে কোন বাধা মানবেনা সীমান্তের সাধারণ মানুষ। উপরন্তু স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য দেশের সর্বত্র দাবি সোচ্ছার হয়ে উঠেছে।’[৬০]

বরাক উপত্যকার সাধারণ জনগণের অব্যক্ত ইচ্ছে একাত্তরের শুরু থেকে প্রতিফলিত হতে শুরু করে পত্রিকার পাতায়। ২৮ এপ্রিল *সাপ্তাহিক পূর্ব্বায়ন* তাদের সম্পাদকীয়তে লিখেন, ‘জোট পাকান, কূটনৈতিক প্রহসন চালিয়ে যাওয়া প্রচুর হয়েছে। উন্মাদকে মানুষের স্বাভাবিক ভাষায় বোঝানোর অপচেষ্টা যথেষ্ট হয়েছে। এবার সময় হয়েছে সেই ভাষা প্রয়োগের, যা ইতর প্রাণীর ভাষা প্রয়োগ করে তুলতে হয়। লক্ষাধিক প্রাণের জন্যে দায়ী ইয়াহিয়ার আজ এবং এখনি বিচারের প্রয়োজন। সমগ্র সভ্যতার মুক্তাঙ্গনে ইয়াহিয়া আর তার দোসর ভুট্টোর জন্যে অবিলম্বে বিচার সভা বসানো উচিত আর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে তা কার্যকর করা উচিত। ভারতের দেহে কাণ্ডজ্ঞানহীন গোলাবর্ষণ করে ইয়াহিয়া প্রকৃতপক্ষে ভারতকেই সেই বিচারকের আসনে বসিয়াছে। আর সময় নেই, ভারত সরকার স্বাধীন বাংলার বৈধ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে জঙ্গী শাহীর শাস্তি বিধানে অগ্রসর হোন, জাতি তাই কামনা করে।’[৬১]

সাপ্তাহিক অরুণোদয় আরো স্পষ্ট করে লিখেছেন, 'প্রয়োজন হলে সামরিক সহায়তা দিতে হবে। স্বাধীন নবজাতক বাংলাদেশকে দিতে হবে সব ধরনের কূটনৈতিক সহায়তা। ভারত সরকারকে বুঝতে হবে ভারতের সাধারণ জনগণ এটা চায়।'[৬২]

দৃষ্টিপাত লিখেছেন, 'এটা পররাজ্যের অভ্যন্তরীণ সমস্যায় হস্তক্ষেপ নয়। এটা মানবতা রক্ষার চিরন্তন দায়িত্ব। প্রয়োজন হলে ভারতকে সেই দায়িত্ব রক্ষায় এগিয়ে যেতে হবে।'[৬৩]

একাত্তরে শিলচর থেকে প্রকাশিত *সাপ্তাহিক অরুণোদয়, আজাদ*, করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত *যুগশক্তি, দৃষ্টিপাত*, হাইলাকান্দি থেকে প্রকাশিত *পূর্ব্বায়ন* এর সবগুলো সংখ্যা দেখেছি। এই সব সাপ্তাহিক পত্রিকার অধিকাংশ সম্পাদকীয় বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে। এসব সম্পাদকীয়তে বরাক উপত্যকার সাধারণের চাওয়া প্রকাশিত হয়েছে। *দৈনিক গতি* একাত্তরের ২৯ এপ্রিল সুস্পষ্টভাবে লিখেছে, 'আমরা চাই ভারত অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করুক, কাছাড়ে পাকিস্তানি বাহিনীর যে আক্রমণ তার জবাব দিক। বাংলাদেশের পাশে না দাঁড়ালে একদিন ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।'[৬৪]

স্বাধীন বাংলাকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে ২৮ জুন করিমগঞ্জ কলেজের ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিল এসে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেয়, অবিলম্বে শরণার্থী শিবিরগুলোতে রাজ্য সরকার যাতে আরো মনোযোগী হয়, শরণার্থীদের সমস্যা দূর করে, বিনামূল্যে কলেরার টীকা সরবরাহ করে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানানো হয়, বিধান সভা যাতে শরণার্থী সমস্যা প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন এবং প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশে হস্তক্ষেপে বাধ্য করানোর কথা বলা হয়।[৬৫]

১৪ এপ্রিল করিমগঞ্জের কালিগঞ্জে এক জনসভায় পাকিস্তানের বর্বরোচিত গণহত্যার নিন্দা জানানো হয়। কালিগঞ্জ, বুনিয়াদি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সভায় প্রাক্তন বিধায়ক মৌলানা আবদুল মুনিম চৌধুরী পৌরহিত্য করেন। সভায় স্থানীয় যুবনেতা কামাল উদ্দিন আহমেদ, বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ মোঃ এম. এ. লস্কর বক্তব্য রাখেন। সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। যথা–

১. নবগঠিত স্বাধীন বাংলা সরকারকে স্বীকৃতি দান।

২. অবিলম্বে পূর্ববঙ্গে নরহত্যা বন্ধ করার ব্যাপারে কার্যকরি ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করা হয়।

৩. পূর্ব বাংলা রিলিফ কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন।[৬৬]

৫ এপ্রিল কালিগঞ্জ ইয়াং ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সভায় গণহত্যার তীব্র নিন্দা জানানো হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বরাবর দাবি জানানো হয় পূর্ব বাংলাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য।[৬৭]

করিমগঞ্জ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বানে করিমগঞ্জের ব্যবসায়ীদের এক সভায় বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানি বর্বরতা ও পৈশাচিক নির্যাতনে গণতন্ত্রের সমাধি রচনার পরিপ্রেক্ষিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দানের জন্য সভায় কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হয়।[৬৮]

করিমগঞ্জের রাতাবাড়িতে পাকিস্তানের বর্তমান অস্বাভাবিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র ফেডারেশন, প্রগ্রেসিভ যুবক সংঘ ও শিক্ষকগণের আহ্বানে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। রাতাবাড়ি হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত সভায় শিক্ষক শ্রীমদন মোহন মুখার্জি সভাপতিত্ব করেন। সভায় পূর্ববাংলায় জঙ্গী অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং অবিলম্বে আওয়ামীলীগের গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান হয়। স্বাধীন বাংলা সরকারের অনতিবিলম্বে স্বীকৃতি দানের জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করা হয়। পূর্ব বাংলায় নৃশংস হত্যাকান্ডের ব্যাপারে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করার জন্য আন্তর্জাতিক শান্তি কমিটির কাছে আবেদন জানানো হয়।[৬৯]

করিমগঞ্জ কলেজ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন ২৯ মার্চ এক প্রতিবাদ সভা করেন, সভায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবে বাংলাদেশের মুক্তিকামী যোদ্ধাদের সমর্থন করা হয় এবং মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রতিহত করার পশ্চিম পাকিস্তানি সাম্রাজ্যবাদীদের এই অপচেষ্টার তীব্র নিন্দা করা হয়। প্রস্তাবে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান ও মুক্তিযুদ্ধে সর্ব্ব প্রকারের সাহায্য দানের জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করা হয়।[৭০]

করিমগঞ্জ মহকুমার এংলার বাজার গাঁওসভায় এক প্রতিবাদ সমাবেশে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জোর দাবি জানানো হয়। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শওকত আলী লস্করের সভাপতিত্বে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবটিতে বলা হয়েছে পূর্ববঙ্গের সাড়ে সাতকোটি নিরীহ বাঙালির ভাষ্য দাবিকে ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়া সরকার ইসলামী রাষ্ট্রের ভাওতা দিয়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করে, সহস্র সহস্র মা-বোনদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে একটা ত্রাসের সঞ্চার করেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়।[৭১] ১৮ এপ্রিল করিমগঞ্জ মহকুমা প্রাইমারি শিক্ষক সম্মিলনীর কার্য নির্বাহক সমিতির অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশনে বাংলাদেশের নিরীহ জনগনের ওপর পাকিস্তানি জুলুম বন্ধে ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়। সভায় হস্তক্ষেপের পাশাপাশি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানানো হয়।[৭২]

২৩ এপ্রিল করিমগঞ্জ জেলা মুক্তিসংগ্রামী সংঘের সভায় বাংলাদেশের সংগ্রামকে সমর্থন ও স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানানো হয়। আসামের প্রাক্তন মূখ্যমন্ত্রী শ্রী বিমলা প্রাসাদ চালিহা সভায় ভারত সরকারের সরাসরি যুদ্ধে যোগ না দেওয়ার সমালোচনা করেন।[৭৩]

১ এপ্রিল সকালে নিলামবাজারে পূর্ববঙ্গে ইয়াহিয়া খানের জঙ্গীশাহী অত্যাচারের প্রতিবাদে এক জনসভা অনষ্ঠিত হয়। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে পূর্ববঙ্গের আন্দোলনকে সমর্থন জানন হয় এবং মুজিবুর রহমানের সরকারকে স্বীকৃতি দানের জন্য ভারত সরকারের নিকট অনুরোধ করা হয়। প্রস্তাবটা উত্থাপন করেন শ্রীরতিরাজ রায় এবং প্রস্তাবটা সমর্থন করেন শ্রীবাবুলাল বর্দ্ধন।[৭৪]

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানে ভারতের বিলম্ব, কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগের অংশ হিসেবে *দৃষ্টিপাত* মে মাসে একটি সম্পাদকীয় ছাপে। *স্বীকৃতি বিলম্বিত কেন* শিরোনামের সম্পাদকীয়তে করিমগঞ্জের সাধারণ মানুষের আকুতি ওঠে এসেছে। 'করিমগঞ্জবাসীকে শুনতে হচ্ছে নিত্য নতুন ফাস্টহ্যান্ড সব নির্যাতনের কাহিনী দেখতে হচ্ছে অত্যাচারের শিকারদের অসহায় স্বরূপ। তাই জেলার অন্যান্য অংশ অপেক্ষা করিমগঞ্জের মন আজ বিক্ষুব্ধ বহুলাংশে। পূর্ববাংলার স্বকীয়তায় বিশ্বের তথা ভারতের স্বীকৃতি দেওয়ায় যে টাল বাহানা চলেছে তা নিয়ে করিমগঞ্জ আজ বোধ হয় সবচেয়ে বেশি বিরক্ত আর ক্ষুব্ধ। কারণ, কুশিয়ারার ওপারের চিৎকার মারণাস্ত্রের শব্দ দিল্লী না পৌঁছলেও করিমগঞ্জ কানে তালা লাগিয়ে দেয়। কাতারে কাতারে শরণার্থীর ফটো রাজদরবারে তাদের দুঃখের কান্না পৌঁছাতে পারে না অথচ সে কান্নায় আজ করিমগঞ্জের পথঘাট মুখরিত। মন্ত্রীরা ঘন ঘন আসছেন– 'পর্যবেক্ষণ' নামক কাজটি করেই চলে যাচ্ছেন। করিমগঞ্জ তার নানা চাহিদার ফিরিস্তি যথারীতি মন্ত্রীদের ব্যাগে গুঁজে দিচ্ছে। তবে সব চাহিদার সেরা চাহিদা–সব কলোরোলের মূল ধারা আজ বোধ হয় 'স্বীকৃতি'। ভারত সরকার সর্ব্বাগ্রে স্বাধীন বাংলাকে স্বীকৃতি দাও।[৭৫] **২৮ মার্চ ১৯৭১** পূর্ব বাংলার আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে রামকৃষ্ণনগরে জনসভার আয়োজন করা হয়। সভায় অবিলম্বে ভারত সরকারের প্রতি বাংলাকে স্বীকৃতি প্রদান, সামরিক সহায়তা ও শরণার্থীদের জন্য সীমান্ত উন্মুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়।[৭৬]

গ. আর্ন্তজাতিক জনমত সৃষ্টির প্রয়াস

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বরাকের তৃণমূল মানুষের সম্পৃক্ততা আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। বরাকবাসী রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ প্রয়োগের পাশাপাশি বাংলাদেশে পাকিস্তানি

বাহিনীর বর্বর গণহত্যা ও শরণার্থীদের জন্য আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টিতে সহায়তা করেন। বরাকের তৃণমূল মানুষের কল্যাণে বাংলার মুক্তিযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল আন্তজাতিক পরিমণ্ডলে।

বরাকের সাধারণ জনগণ বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতা বন্ধে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরী গান্ধীকে স্মারকলিপি প্রদান করেন। এই স্মারকলিপিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করা হয়, যাতে তিনি পূর্ববঙ্গ সমস্যা নিয়ে পরাশক্তিগুলোর সাথে কথা বলেন এবং বিষয়টি রাষ্ট্রসংঘে উপস্থাপন করেন।

শিলচরের ১৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ২৪ জুন *সাপ্তাহিক অরুণোদয়ে* পূর্ববঙ্গে গণহত্যা বন্ধে রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপ চেয়ে বিবৃতি দেন।[৭৭] একাত্তরে বরাকে আশ্রয়লাভকারী শরণার্থীদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য আমেরিকান সাংবাদিক পিটার শেফার্ড-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল করিমগঞ্জ শহর ও সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশের স্বপক্ষে একাত্তরে জনমত সৃষ্টিতে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন বরাকের সংবাদপত্রগুলো। *সাপ্তাহিক অরুণোদয়*, *গতি*, *যুগশক্তি*, *পূর্ব্বায়ন*, *আজাদ* মুক্তিযুদ্ধে আন্তর্জাতিক সহায়তা ও হস্তক্ষেপ চেয়ে নিয়মিত সম্পাদকীয় ও নিবন্ধ ছেপেছে। এছাড়াও ভারতের জাতীয় দৈনিকগুলোতেও ফলাও করে বরাকের উদ্বাস্তু সমস্যা ও পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের যৌক্তিকতা স্পষ্ট হয়েছে।

করিমগঞ্জ কলেজের শিক্ষকরা মুক্তিযুদ্ধে চীন ও মার্কিন জোটের বিরোধিতার প্রতিবাদে ১৮ আগষ্ট মানববন্ধনে মিলিত হয়। মানববন্ধন শেষে পথসভায় সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তানের পক্ষ নেওয়ার নিন্দা জানানো হয়।[৭৮]

২০ জুন শিলচরে অনুষ্ঠিত হয় সর্ব্বোদয় সভা। সর্ব্বোদয় নেতা সিদ্ধরাজ ডেডার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে পূর্ববঙ্গের সমর্থনে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সম্মেলনে গৃহীত কয়েকটি প্রস্তাবের মধ্যে আছে,

- বাংলাদেশের সমর্থনে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলা
- স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলা রাষ্ট্রকে অবিলম্বে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য জনমতের চাপে ভারত সরকারকে সুদৃঢ় শক্তিশালী করে তোলা
- শান্তি পদযাত্রা
- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং দেশকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী রাখার বিষয়ে সজাগ থাকা
- বাংলাদেশের যুবকদের নিয়ে সীমান্তে কয়েকটি আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধমূলক তরুণ শান্তিসেনা প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন ও

- অন্যান্য সহায়তা।

প্রথম দিন ভাষণদানের পর জয়প্রকাশ নারায়ণ বোম্বে রওয়ানা হন। তিনি বাংলাদেশের প্রতি জনমত গঠনে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন।[৭৯]

এছাড়াও করিমগঞ্জে শরণার্থী সমস্যা ও সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনে যান *আসাম ট্রিবিউন*-এর সম্পাদক সতীশচন্দ্র বাকাত, গোয়াহাটি থেকে প্রকাশিত *নীলাচলের* সম্পাদক হোমেন বরগোয়া, *শিলং টাইমস* এর পর্শ্বনাথ চৌধুরী, *নবভারত* সম্পাদক প্রদোষ চৌধুরী।[৮০] তাদের সাথে বিদেশি অনেক সাংবাদিক ছিলেন। বরাকে দায়িত্বরত দেশি-বিদেশি সংবাদ সংস্থাগুলোর প্রতিনিধি ও স্থানীয় পত্রিকাগুলোর সম্পাদকরা ছিলেন। এই সফরের পর উদ্বাস্তু সমস্যা ও পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা নিয়ে গণমাধ্যমগুলোতে বেশ কিছু প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। হাইলাকান্দির নিবেদিতা ক্লাব ও রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি পূর্ববঙ্গে নির্যাতিত নারী ও শিশুদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহবান জানান।

রামকৃষ্ণগড়ে শরণার্থী সহায়তা কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় পূর্ববঙ্গের গণহত্যার বিষয়টি বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার জন্য ভারত সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[৮১]

রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি ও ক্যাম্পের তরুণদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট করতে *জয় বাংলা* নামক একটি পত্রিকা বের করা হয় করিমগঞ্জ থেকে। মূলত *জয় বাংলা* নামক একাধিক পত্রিকা একাত্তরে বের হয়েছিল। *দৃষ্টিপাত* সম্পাদক ভুপেন্দ্র কুমার সিনহার পৃষ্ঠপোষকতায় দৃষ্টিপাত প্রেস থেকে পত্রিকার ৬টি সংখ্যা বের হয়।[৮২] এছাড়াও *দৃষ্টিপাত* থেকে *বাংলাদেশ* নামক একটি সাহিত্য সংকলন বের করা হয়। যেখানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি আলোচনা করা হয়।[৮৩]

ঘ. মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা ও প্রশিক্ষণ

মুক্তিযুদ্ধে করিমগঞ্জে একজন সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে ভূমিকা রেখেছিলেন তরুণ দাস। ২০১৭ সালের এক শীতের সকালে গিয়ে হাজির হই করিমগঞ্জ শহরে তাঁর বাড়িতে। সাক্ষাৎকারের এক পর্যায়ে তিনি মুক্তিসংগ্রামে করিমগঞ্জের সাধারণ মানুষের ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে মহিষাসন সীমান্তের বারপুঞ্জি গ্রামের রামেন্দ্র শুক্লবৈদ্যের কথা উল্লেখ করেন। যিনি একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং এর জন্য আম-কাঁঠালের বাগানসহ ৩৫ বিঘা জমি ছেড়ে দিয়েছিলেন। ত্রিপুরার হাবলু ব্যানার্জীর কথা আমাদের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল করার জন্য যিনি বিশাল বাগান ছেড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু ইতিহাসে বিস্মৃত নাম রামেন্দ্র শুক্লবৈদ্য। তরুণ দাসের ভাষ্যে, ১৯

নভেম্বর ২০১৩ সালে *দৈনিক যুগশঙ্খে* 'প্রসঙ্গঃ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ– কিছু স্মৃতি, কিছু কথা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখি। আমার প্রবন্ধ পড়ে সীতু শুক্লবৈদ্য নামক এক ভদ্রলোক মুক্তিসংগ্রামে তাঁর বাবার অবদান জানিয়ে আমার কাছে একটি পত্র লিখেন।[৮৪]

তরুণ দাসের কাছে সীতুর যোগাযোগের কোন নম্বর ছিল না। বারপুঞ্জি যাওয়ার আগ্রহ দেখালে তরুণ দাস আমাকে দূরত্ব ও দুর্গমতার ভয় দেখিয়ে নিবৃত্ত করলেন। কিন্তু আমি খুঁজে বের করতে চাচ্ছিলাম একাত্তরের সেই অকৃত্রিম বন্ধুকে। তরুণ দাসের বাড়ি থেকে বের হয়ে মোটর স্টেশনে চলে আসি। এক তরুণ অটো চালকের সাথে চুক্তি করি মহিষাসন নিয়ে যাওয়ার। যাত্রাপথেই চালকের সাথে বন্ধুত্ব হয়ে যায়। প্রায় দু'ঘন্টার পথ পেরিয়ে আমরা পৌঁছে যাই মহিষাসন। বারপুঞ্জি আরো চার কিলোমিটার। অটো যাবে না। হেঁটে যেতে হবে। স্থানীয় এক প্রবীণ লোককে সাথে নিয়ে হাঁটা ধরি বারপুঞ্জির উদ্দেশ্যে। ভারতের সর্বশেষ স্টেশন এই মহিষাসন। প্রায় দু'ঘন্টা খোঁজার পর বিকালে পৌঁছায় রামেন্দ্র শুক্লবৈদ্যের বাড়িতে। প্রতিবেশি প্রায় শতবর্ষী রাধারমনের কাছে শুনলাম একাত্তরের সেই উত্তাল দিনে রামেন্দ্র আসলে কি করেছিলেন বাংলাদেশের জন্য।[৮৫] 'মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এপ্রিলের মাঝামাঝি মুক্তিফৌজের কমাণ্ডার আব্দুর রব আসেন রামেন্দ্র'দার কাছে। আমিও সাথে ছিলাম। তিনি মুক্তিফৌজের ট্রেনিং ক্যাম্প করার জন্য রামেন্দ্র'দার সাহায্য চান। সীমান্ত সংলগ্ন তাঁর কাঁঠালবাগানে আব্দুর রব সাহেব ট্রেনিং ক্যাম্প গড়ে তোলার আগ্রহ দেখান। রামেন্দ্র'দা সাথে সাথে রাজি হয়ে যান। প্রায় কয়েকশ কাঁঠাল গাছ কেটে ফেলতে হয়। ফেলা হয় তাঁবু। বেশ কয়েকটি অস্থায়ী ঘর নির্মাণ করা হয়। এখানে ভীষণ পানীয় জলের সমস্যা ছিল। রামেন্দ্র শুক্লবৈদ্য তাদের পানীয় জলের ব্যবস্থা করেন। নিজের বাড়ি ছেড়ে দেন মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিতে গিয়ে।'

রামেন্দ্র শুক্লবৈদ্য গত হয়েছে দুই দশক আগে। সেই ক্যাম্পের স্মৃতি আজো রয়ে গেছে বারপুঞ্জি গ্রামের এই সীমান্ত পাড়ে। অনেকটা পরিত্যক্ত সেই বাড়ি। গিয়ে শুনলাম সীতু শুক্লবৈদ্য থাকেন করিমগঞ্জ শহরে। তার স্ত্রী মহিষাসন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। থাকেন মহিষাসনে। আবার ফিরে আসলাম মহিষাসনে, শুনলাম একাত্তরে এই বাংলাদেশপ্রেমী লোকটির নানা গল্প। একাত্তরে এসব সাধারণ মানুষদের অসাধারণ ভালোবাসা আর সহযোগিতার গল্প আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় গাঁথা।

৭ এপ্রিল *সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত* তাদের শিরোনাম করে, 'আমাদের অস্ত্র দিন জয় আমাদের হবেই'। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে, আওয়ামী লীগের গুপ্ত ঘাঁটিতে গিয়ে *দৃষ্টিপাতের* এই রিপোর্টে বরাকবাসীর সহায়তা চাওয়ার সংবাদ সাধারণ বরাকবাসীকে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আবেগী করেছিল।[৮৬] ফলে বরাকের

তৃণমূল জনগণ রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য শুকনো খাবার, কাপড়, জুতা, মোজা, প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ শুরু করেন। 'শুধু ত্রাণ এবং সাহায্য নয়, মুক্তিযোদ্ধাদের কীভাবে সাহায্য করা যায় সে নিয়ে অনেকেই চিন্তা ভাবনা করছিলেন। এর মধ্যে সবচেয়ে অগ্রণী ছিলেন আশিস দত্ত।'[৮৭]

এছাড়াও *অরুণোদয়* সম্পাদক সুনীল দত্ত রায়, তারামনি চৌধুরী, ব্যারিস্টার গোলাম ওসমানী ভাবছিলেন কীভাবে রণাঙ্গনের যোদ্ধাদের পাশে দাঁড়ানো যায়। বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন শরণার্থীদের পাশে দাঁড়ানোর পদক্ষেপ নেয়া হয়। করিমগঞ্জ থেকে একটি পত্রিকা বের করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পত্রিকার নাম স্থির হয় 'বাংলাদেশ'। প্রকাশনার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব পড়ে *দৃষ্টিপাত* সম্পাদক ভুপেন্দ্র কুমার সিনহার ওপর। প্রবীণ জননেতা নন্দকিশোর সিংহের 'কো-অপারেটিভ প্রেস' থেকে মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হয়।[৮৮] একদিন তারামণি চৌধুরীই এসে খবর দিলেন আনিস মিয়ার ওখানে বসতে হবে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে একটা কিছু করা যায় কিনা তা নিয়ে আলোচনা করতে। তখন বাংলাদেশ থেকে কিছু সাংগঠনিক লোকও এসে পৌঁছে গেছেন শিলচরে। আনিস আহমেদ থাকতেন নাগাপট্টির মোড়ে গোপালগঞ্জের একটি ঘরে। বেতের তৈরি জিনিস বিক্রি করতেন, কুমিল্লার লোক, নাগা মহিলা বিয়ে করায় সামাজিক দিক দিয়ে একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়ায় সব আগ্রহীরাই হাজির হলেন, ওসমানি সাহেবও এসেছিলেন। বাংলাদেশ সহায়তা সমিতি নামে একটি সংগঠন তৈরি হয়। সিদ্ধান্ত হয় একটি পত্রিকা প্রকাশেরও।[৮৯]

রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তার বর্ণনা উঠে এসেছে অতীন দাশের বর্ণনায়। পান্নাবাবু কিছু টাকা দিয়েছিলেন, মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের মনোরঞ্জন দেব, অরবিন্দ দত্ত চৌধুরী, নলিনী কান্ত দাস, ভানু গুহ, টুকু ব্যানার্জি প্রমুখের সাহায্যে আমরা কিছু রসদ সামগ্রী নিয়ে মুক্তিফৌজের নাতানপুর শিবিরে উপস্থিত হই। তারাপদবাবুও সম্ভবত আমাদের সঙ্গে ছিলেন। ওখানে আমাদের উপস্থিতিতে মেজর কুমারের নেতৃত্বে লুঙ্গিপড়া মুক্তিফৌজ কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে অপারেশনে রওনা হয়েছিল। মেজর কুমার আমার পূর্ব পরিচিত। অরুণাচল ক্যান্টনমেন্টে অনেক রাতেই আমি আর শান্তনু ঘোষ উপস্থিত হতাম খবরের সন্ধানে। ব্রিগেডিয়ার ওয়াডকে, মেজর মুখার্জি, মেজর কুমার প্রমুখের সঙ্গে সখ্য গড়ে উঠেছিল। একাত্তরে শরণার্থীদের আওতায়ও সেবা দেওয়ার পাশাপাশি অবিভক্ত কাছাড়ের সাধারণ জনগণ রণাঙ্গনের যোদ্ধাদের সহায়তায় এগিয়ে আসেন। বরাকে প্রশাসনের সহায়তায় গড়ে ওঠা মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং ক্যাম্পগুলোতে লোকজন নানাভাবে সহায়তা করত, অতীন দাশের বর্ণনায় ওঠে এসেছে সে চিত্র।

এছাড়া শরণার্থী ক্যাম্পগুলো থেকে তরুণ যুদ্ধাদের উৎসাহী করে এসব ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ দেয়া হত। নির্মল বিকাশ দাসগুপ্ত, প্রবীর কুমার সিনহা, প্রণবকুমার সিনহা, বন্ধু গোপাল দাস ও বিদিতচন্দ্র গোস্বামী ছিলেন এই দায়িত্বে।[৯০]

বরাকের অনেক সাধারণ স্থানীয় মুক্তিফৌজের সাথে অবরুদ্ধ বাংলাদেশে ঢুকে যুদ্ধ করার স্মৃতি বর্ণনা করেছেন, অনেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ বহনে সহায়তা করেছেন। এককথায় বরাক একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সাপোর্টিং বেসে পরিণত হয়েছে।

এটা ঠিক যে, শিলচর থেকে এই যুদ্ধের আঁচ খুব প্রখর ঠেকলেও ন'টি মাস ধরে পাথারিয়া থেকে ভাঙা শ্রীগোরি পর্যন্ত গোটা করিমগঞ্জই ছিল এক বর্ধিত রণাঙ্গন। দু'পার মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। করিমগঞ্জে বসে পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা। কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছেন স্থানীয়রা।[৯১]

ঙ. মনোবল বৃদ্ধি ও উদ্বদ্ধকরণ

করিমগঞ্জের সুতারকান্দি চেকপোস্ট ঘেঁষে প্রথম যে বাড়ি সেটি আবদুল বাসিতের। মুক্তিযুদ্ধ, শরণার্থীদের আগমন কিংবা প্রত্যাবর্তন, পাকিস্তান বাহিনীর নৃশংসতা, মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতা অনেকটা নিরবেই প্রত্যক্ষ করেছেন আবদুল বাসিত। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলছিলেন, 'প্রথম দিকে রিফিউজিদের আগমনকে আমরা ভালো চোখে দেখিনি, তাদেরকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতাম। প্রায় রাতে সীমান্ত রাস্তা দিয়ে প্রচুর লোকজন আসত। বড় একটি অংশ ছিল শিশু এবং মহিলা। তাদের মুখে পাকিস্তান বাহিনী, রাজাকারদের বর্বরতার বর্ণনা শুনে বাড়ির মহিলারা শরণার্থীদের জন্য সবসময় আকুল থাকতেন। একসময় আমি ও আমার পুরো পরিবার জড়িয়ে পড়ি শরণার্থীদের সহায়তায়। ওপার থেকে যারা আসত তাদের চেহারা দেখলে মায়া লাগত, কতদিন অভুক্ত, আশ্রয়হীন মানুষের উদভ্রান্ত চোখগুলো একাত্তরে আমাদের মানবিকতার চোখ খুলে দিয়েছিল।'[৯২]

সত্যি সেদিন দুর্বিষহ স্মৃতি পেরিয়ে শত শত মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল সীমান্তবর্তী বরাক উপত্যকায়। আশ্রয়হীনদের কেউ ছিল স্বজনহারা। কেউবা নির্যাতিত, ভিটে-মাটি ছেড়ে সহায় সম্বলহীন জীবন। সে অনিশ্চিত জীবনে বরাকের সাধারণ মানুষ পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। চেষ্টা করেছে শরণার্থীদের হারানো মনোবল ফিরিয়ে আনতে।

একাত্তরের শিলচর, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দির শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে আয়োজন করা হয়েছে বেশ কয়েকটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। সে সব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে একদিকে শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে অর্থ, অন্যদিকে এসব অনুষ্ঠান শরণার্থীদের বিনোদনের সুযোগ করে দিয়েছিল। চেষ্টা করা হয়েছিল তাদের হারানো মনোবল ফিরিয়ে আনার।

করিমগঞ্জে আশ্রয় নেয়া শরণার্থী শিল্পীদের নিয়ে স্থানীয় যুবকদের একটি দল ১৮ মে করিমগঞ্জ সরকারি স্কুল মাঠে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। যেখানে বাংলাদেশ থেকে আগত ১০ জন শরণার্থী শিল্পী গান পরিবেশন করেন। শরণার্থীদের পাশাপাশি প্রায় ১০০০ স্থানীয় লোক এতে উপস্থিত ছিল।[৯৩]

১২ নভেম্বর করিমগঞ্জ কলেজ অডিটোরিয়ামে একটি বিচিত্রনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেখানে শরণার্থী শিল্পী আরতি ধর ও সাইফুল মুহম্মদ গান পরিবেশন করেন।[৯৪] করিমগঞ্জ মহিলা সমিতির উদ্যোগে এই আয়োজন করা হয়।

হাইলাকান্দিতে স্থানীয় নিবেদিতা সংঘের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের। শরণার্থীদের উদ্বদ্ধ করতে এই বিচিত্রানুষ্ঠানে শিলচর ও করিমগঞ্জের শিল্পীদের পাশাপাশি হাইলাকান্দির শিল্পীরা অংশ নেয়। অনুষ্ঠান শেষে রবীন্দ্রনাথের *রাজা* নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।[৯৫] এছাড়া করিমগঞ্জে রবীন্দ্রনাথের *চণ্ডালিকা* নাটকটি একাধিকবার মঞ্চস্থ হয়।

শরণার্থীদের হারানো মনোবল ফেরাতে, তাদের নিরানন্দ জীবনে সবচেয়ে বেশি উদ্দিপনা যুগিয়েছিল স্থানীয় বাসিন্দারা। একাত্তরে বরাক উপত্যকায় প্রায় পনেরজন কবিয়াল শরণার্থীদের নিয়ে গান বেঁধেছিলেন, বের করেছিলেন পুস্তিকা। এসব কবিগান শরণার্থীদের উদ্দীপনা যোগাত। শরণার্থী শিবিরগুলোতে কবিয়ালরা নিয়মিত কবিগান পরিবেশন করতেন। অনেক সময় স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে কবিগানের আয়োজন হত। এসব আসরে শরণার্থীদের পাশাপাশি অনেক মুক্তিযোদ্ধাও অংশ নিত।

করিমগঞ্জের কাটিগড়ার আবু বকর, রাইমোহন দেব কিংবা পাথারকান্দির দিগেন্দ্র নাথ, লাতু সীমান্তের সত্যনারায়ণ কিংবা অতুল চন্দ্র একাত্তরে বিনিন্দ্র রজনী কাটিয়েছে শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে। কবিগানের সুর আর ছন্দে, গায়কীতে চেষ্টা করেছে উদ্বাস্তু হাজার হাজার লোকের মনোবল চাঙ্গা রাখতে। বলছিলেন সত্য নারায়ন, 'আমরা ঝিমিয়ে পড়া মানুষগুলোকে জাগাতে চেষ্টা করতাম, যুবকদের ক্যাম্প থেকে প্রশিক্ষণ শিখিয়ে ট্রেনিং নিয়ে গেরিলা হওয়ার উদ্দীপনা দিতাম।'[৯৬]

'সুরমা কুশিয়ারায় ঝড় উঠেছে

মাঝি সব সাবধান

মুজিবের নাও এসেছে

চলো করি জয়গান।'

স্থানীয় পল্লী কবি সত্য নারায়ণ একাত্তরে সুরমা কুশিয়ারা উপত্যকার সাধারণ মানুষদের অন্তরে সত্যিই ঝড় তুলেছিল এসব কবিতা ও ছন্দে।

একাত্তরের জনযুদ্ধের অন্যতম যোদ্ধা এই অঞ্চলের কবিয়ালরা। নিজেদের অর্থে তারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে ছাপিয়েছেন কবিগান, কবিতা। হাটে, মাঠে, ঘাটে গলা ফাটিয়ে চেষ্টা করেছেন তাদের ছন্দে ও গায়কীতে সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করতে। একাত্তরে লাতু সীমান্তে কবিগান গেয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন সত্য নারায়ণ। অসাধারণ গায়কী আর চেহারায় হাটে- বাজারে সহজে লোক জামাতে পারতেন সত্য বাবু। লাতুর মহিষাসনে গিয়েছিলাম তাঁর বাড়িতে। একাত্তরের সেই সব দিনের স্মৃতিচারণ করছিলেন তিনি। জানতে চেয়েছিলাম, একাত্তরে কেন এই পথ বেছে নিয়েছিলেন? শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের আবেগকে পুঁজি করে অর্থ উপার্জন কি আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল? আবেগ তাড়িত হয়েছিলেন সত্য নারায়ণ। ভারতের সর্বশেষ গ্রাম মহিষাসনের এক ভাঙ্গা চায়ের দোকানে বসে নব্বই উর্ধ্ব সত্য নারায়ণ বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তাঁর খোঁজে বাংলাদেশের থেকে এতদূর এসেছি। একাত্তরে কতটা আবেগ দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে কবিগান আর ভাটিয়ালি গানের ছন্দে জনগণের মনকে আন্দোলিত করেছিলেন সেই বর্ণনা দিচ্ছিলেন তিনি।

একাত্তরে লাতু বাজারে প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি কবিগানের আসর বসাতেন। বলছিলেন সেই সময়ের নানা স্মৃতি, তার সবচেয়ে বিখ্যাত গান ছিল 'টিক্কা খান হুক্কা খেয়ে, অক্কা গেল', 'ভয় পেয় না নৌকার মাঝি আমরা তোমার সাথে আছি', 'এপার বাংলা-ওপার বাংলা, মিলে হয়েছে জয় বাংলা' এই ধরনের নানা চমৎকার ছন্দে বাজার ভর্তি লোকজনকে মোহিত করতেন সত্য নারায়ণ। নানা যন্ত্রণাময় স্মৃতি ফেলে যারা শরণার্থী হয়েছেন তারাও ভীড় জমাত একটু স্বস্তির জন্য সত্যের গানের আসরে। রাত গভীর হলে করুণ কাহিনীতে জয় বাংলার ভাটিয়ালি গান ধরত। সত্য নারায়ণ বলেছেন, প্রচুর আয় হত আমার, এমনকি একদিনে একশ টাকাও আয় হয়েছে। সেই টাকাগুলো জমিয়ে রাখতাম। কিছু টাকা হলে পূর্ববঙ্গ ত্রাণ কমিটিকে দিতাম শরণার্থীদের ঔষধ ক্রয়ের জন্য।

শ্রীহট্ট-কাছাড় এলাকায় এই রকম অনেক সত্য নারায়ণ একাত্তরে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছিল। বাড়িয়েছিল বন্ধুর সহমর্মী হাত। বরাক উপত্যকায় এই রকম পনের জন কবিয়ালের পরিচয় সনাক্ত করতে সক্ষম হই।

শিলচরের পাথারকান্দির বাউল কবি রাইমোহন দেব নাথ। একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে উপজীব্য করে লিখেছেন দুইটি কবিতা। যদিও কবি এগুলোর শিরোনাম দিয়েছেন, 'জয় বাংলার হত্যাকাণ্ডের কবিতা'।[৯৭] তবে মূলত এগুলো কবিগান। বাউল কবি রাইমোহনকে খুঁজতে গিয়েছিলাম পাথারকান্দির হাটখোলা গ্রামে। কবি মারা গিয়েছেন নব্বইয়ের দশকে। কবি গানের লেখক হিসেবে স্থানীয়ভাবে তিনি বেশ পরিচিত ছিলেন। বিশেষ করে সাপে কাটার কবিতা ও জয় বাংলার কবিতা শিরোনামে কবিগান লিখে তিনি পরিচিতি পেয়েছিলেন। তবে সেই সব কবিগানের কোন সংগ্রহই তাঁর পরিজনের কাছে নেই। একাত্তরে রাইমোহন 'জয় বাংলার হত্যাকাণ্ডের কবিতা' ছাড়াও শরণার্থীদের সহায়তা দেওয়ার মিনতি জানিয়ে একটি কবিগান লিখেছিলেন। স্বতঃস্ফূর্ত, অলৌকিক প্রতিভাপ্রাপ্ত কবিত্ব শক্তির নেশায় রাইমোহন হলো ব্যতিক্রমধর্মী। কথায় কথায় হৃদয় থেকে উৎসারিত কবিতার চরণ মুখ থেকে বের হয়ে পড়ে। অসাধারণ তার ব্যঞ্জনা, লালিত্য সুর, ছন্দ। জীবনবাদী রাইমোহনের সমাজের কতিপয় দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ এবং উপলব্ধির বাস্তবতা ফুটে উঠেছে। তাঁর প্রথম কবিগানটির মূল্য ছিল ২০ পয়সা। কবিগানটি ছিল ৩ পৃষ্ঠার। কাভার পৃষ্ঠাসহ চার পৃষ্ঠায় নিউজপ্রিন্ট কাগজে এটা ছাপা হয়েছিল। পরের কবিগানটিও ২০ পয়সায় বিক্রি করতেন।

একাত্তরে শ্রীহট্ট-কাছাড়ের অন্যতম একজন কবিয়াল ছিলেন দিগেন্দ্র কুমার দাস। করিমগঞ্জের বৈঠাখানের ছগলইয়ে জন্ম দিগেন্দ্রের। কবিয়ালের চেয়ে গানের শিল্পী হিসেবে বেশি পরিচিতি তাঁর। একাত্তরে শরণার্থীদের দুঃখ গাথা, মুজিবের মুক্তি, টিক্কা খানের মৃত্যু ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় নিয়ে লিখেছেন বেশ কয়েকটি গান। 'মুক্তি সংগ্রামে জয় বাংলার কবিতা' শিরোনামে তাঁর একটি কবিগান পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছিল একাত্তরে। সম্ভবত এর একাধিক খণ্ড ছিল। আমি প্রথম খণ্ডটি উদ্ধার করতে সমর্থ হই।[৯৮] করিমগঞ্জের মুকুল প্রেস থেকে এটা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশক ছিলেন উদারবন্দের শ্রী রণজিৎ কুমার চন্দ, যিনি করিমগঞ্জ বাংলাদেশ ত্রাণ কমিটির সদস্য ছিলেন। কবিগানের প্রচ্ছদে লিখা আছে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ'। ত্রাণ কমিটির অনুমোদনক্রমে এটি প্রকাশিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ৮ পৃষ্ঠার এই কবিগানের দাম ধরা হয়েছে ৪০ পয়সা।

'বিংশ শতাব্দীর এজিদ ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টোর বর্বরতায় লক্ষ লক্ষ শহীদের কবিগান' শিরোনামে একাত্তরে ৪টি কবিগান লিখেছিলেন মোঃ আবু বক্কর। শিলচরের ধুমকর গ্রামের এই কবির চারটি কবিগান থেকে আমি মাত্র একটি কবিগান উদ্ধারে সমর্থ হই। এটি তাঁর তৃতীয় কবিগান। মোঃ আবু বক্কর কবিয়াল হিসেবে বরাক উপত্যকার দীর্ঘদিন জনপ্রিয় ছিলেন। বক্কর কবিয়াল হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছিল। বক্কর ছিল মূলত ছন্দের জাদুকর।[৯৯] ছন্দ মিলিয়ে নানভাবে নায়কী ঢঙে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য।

ভুট্টো শালা গরু চুর, ইয়াহিয়া পাগলা কুকুর ইত্যাদি নানাবিধ অভিধায় পাকিস্তানি শোষকদের তিনি জনগণের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তুলে ধরেছেন সেই সময়ের পরাশক্তিগুলোর ভূমিকা। বিশেষ করে সৌদি আরব, মিশরের মতো মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ন্যাক্কারজনক ভূমিকা তিনি তুলে ধরেছেন কবিতার ছন্দে।

একাত্তরে পাকিস্তান বাহিনীর গণহত্যা-নির্যাতনের নানা বর্ণনা, অধ্যাপক-বুদ্ধিজীবীদের নির্বিচারে হত্যা, তরুণী মেয়েদের ধর্ষণ আবু বক্কর তার কবিগানে বর্ণনা করেছেন। যদিও তিনি সুফিয়া কামাল, নীলিমা ইব্রাহীমকে হত্যার কথা বলেছেন। একাত্তরের সেই গুজব শ্রীহট্ট-কাছাড় এলাকায়ও যে ছড়িয়ে পড়েছিল, আবু বক্করের কবিতা থেকে সেটাই বুঝা যাচ্ছে।

পাকিস্তানি শাসক শ্রেণী কীভাবে ধর্মের দোহাই দিয়ে পূর্ব বাংলায় নৃশংসতা চালিয়েছে, সেটাই মূর্ত হয়েছে বক্করের গানে, 'মক্কার বন্ধু জাতে পাঠান, কামে নাই নামে মুসলমান, ধর্ম যার নাই ইমান নাই সব শাস্ত্রে বলে'। বক্কর তাঁর কবিগান শেষ করেছেন জয় বাংলা, জয় মুজিবর বলে। এই কবিগানটি প্রকাশিত হয়েছিল একাত্তরের ১৭ জুন। কবিয়াল তাঁর গান নকল না করার অনুরোধ জানিয়ে লিখেছেন, 'আমার গান কেহ নকল করিবেন না নতুবা বিপদ হবে'।

পাকিস্তানি বাহিনীর নির্বিচারে গণহত্যা, লুটতরাজের ছন্দময় বর্ণনায় একাত্তরে আবেগময় হয়েছিল পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের তৃণমূল জনতা। উঠে এসেছে প্রতিবেশি ভারতের অনন্য ভূমিকা।[১০০]

'ভারত সরকারের হল দয়া
বাংলার লোককে আশ্রয় দিয়া।
এ পর্যন্ত বাঁচাইলেন
বিশ লক্ষের প্রাণ'

অতুল চন্দ্র দাস করিমগঞ্জের মোটামুটি পরিচিত কবি। একাত্তরে *জয় বাংলার কবিতা* শিরোনামে তিনি কবিগান লিখেছেন। কবিগানের উপরে লেখা আছে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে সম্পূর্ণ। তবে কোনটা প্রথম খণ্ড কিংবা কোনটা দ্বিতীয় খণ্ড সেটা বুঝা দুস্কর। কবিগানটি কাভার পৃষ্ঠা সহ চার পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। প্রচ্ছদে করিমগঞ্জের মিনার্ভা প্রেস থেকে প্রকাশিত হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। প্রকাশনার সন হিসেবে ১৩৭৮ বাং তথা ১৯৭১ সালের কথা উল্লেখিত। অতুল আলাউদ্দিন খাঁর ভক্ত ছিলেন, প্রচ্ছদে ইংরেজিতে তাঁর লেখা রয়েছে রেজিট্রেশন নং। কবির ঠিকানায় তাঁর বাড়ি করিমগঞ্জের বাটিগড়া থানা পশ্চিম গোবিন্দপুরে বলে জানা যায়।[১০১]

একাত্তরে শ্রীহট্ট-কাছাড় এলাকায় শেখ জমির আলী কবিয়াল হিসেবে জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। যদিও তাঁর প্রকাশিত পুস্তিকা থেকে বাড়ি সিলেটের কমলগঞ্জের গুলের হাওর গ্রামে বলে জানা যায়। তার কবিগানটি সিলেটের আল-আমিন ইলেকট্রিক প্রিন্টিং প্রেস থেকে প্রকাশিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

শেখ জমির আলী কাছাড় সীমান্তের পূর্ব বাংলার অধিবাসী। কমলগঞ্জে কবিয়াল হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছিল। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর জমির আলী কিছুদিন কমলগঞ্জে ছিলেন, পরে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে করিমগঞ্জ শহরে চলে যান। করিমগঞ্জের বিভিন্ন হাটে-বাজারে তিনি জয় বাংলার কবিগান শুনিয়ে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করতেন। পূর্ব বাংলার কবিয়াল হিসেবে অন্যান্য কবিয়ালদের চেয়ে তিনি আলাদা গুরুত্ব পেতেন। সাধারণ লোকজন আগ্রহী হয়ে ২৫ পয়সার বিনিময়ে তাঁর কবিগান কিনে নিতেন।[১০২]

শিলচরের লোকগীতি সংগ্রাহক ও বাংলার অধ্যাপক অমলেন্দু দের কাছে আমি পাঁচটি লোকগীতির সন্ধান পাই। যেটি একাত্তরের একটি ডায়েরির পাতায় তিনি লিখে রেখেছিলেন। এই কবিগানের পঙক্তিতে কবিয়াল নিজের পরিচয় তুলে ধরেছেন।[১০৩]

‘পাগল অশ্বিনী কয়

মুজিবের নাও লাগল কিনারায়’।

অশ্বিনী সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। তবে সংগ্রাহক অমলেন্দু দে’র মতে, এই কবিগানগুলো একাত্তরের অবরুদ্ধ সময়ে তিনি করিমগঞ্জের বাজারে শুনেছেন। এত বেশি কবিগানগুলো তিনি শুনেছেন গানগুলোর কথা তার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। জয় বাংলার এই কবিগানগুলো তার তরুণ মনকে নাড়া দিয়েছিল।

অধ্যাপক দে এর মতে, 'অশ্বিনী নামে এক শরণার্থী একাত্তরে করিমগঞ্জের বাজারে গান গেয়ে সাধারণকে বুঝানোর চেষ্টা করতেন, বাংলাদেশে কি ঘটছে। বাজারে আগত সাধারণ মানুষজন ভীড় জমাত তাঁর গান শুনতে। আমিও খুব উৎসুক হয়ে শুনতাম অশ্বিনীর সেই সুরেলা বর্ণনা। ডায়েরি লিখার অভ্যাস ছিল আমার। বেশ কয়েকবার শুনে শুনে লিখে ফেলি গানগুলো ডায়েরিতে'।[১০৪] অশ্বিনী সম্পর্কে আর বেশি কিছু জানা যায় না। তার বয়স ছিল পঞ্চাশের মতো। তবে অশ্বিনী যে শরণার্থী কবি ছিলেন, সেটা স্পষ্ট হয় তার কবিতার ছন্দে,

আমরা পূর্ববাংলার ভাইদের নিও
তোমারই নৌকায়।
মাগো বাড়ি আমার জয় বাংলায়
এখন আশ্রয় দিলেন ভারত মাতায়
নামটি যে হয় অশ্বিনী।

এই কবিয়ালদের বাইরে শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি ও বদরপুরে অনেক কবিয়াল ছিলেন যারা নিজেরা কোন কবিগান রচনা করেননি, কিন্তু অন্য কবিয়ালের গান গাইত। বিশেষ করে রাইমোহন ও অশ্বিনী বাবুর কবিগান খুব জনপ্রিয় ছিল।

কবিয়ালেদের অধিকাংশই ছিলেন সমাজের নিচুতলার মানুষ। কবিয়ালগণ তাৎক্ষণিকভাবে মুখে মুখে কবিতা রচনা করে গেয়েছেন বটে, তবে দুঃখের বিষয় তাঁরা কখনোই এগুলো লিখে রাখেননি বা এসব গান সংরক্ষণের প্রয়োজনীতার দিকটি উপলব্ধি করতে পারেননি। ছাপাখানা থাকলেও তা অনেক ব্যয়সাধ্য ছিল ফলে অধিকাংশ কবিগান ও কবিয়াল সময়ের স্রোতে হারিয়ে গেছেন।

আমি প্রায় পনের জন পল্লী কবির সন্ধান পেয়েছি যারা একাত্তরে নিয়মিত ভাবে কবিগান রচনা করতেন। তবে এদের অনেকের কাজই মৌলিক নয়। অধিকাংশই পলাশী কিংবা মহাবিদ্রোহের কালে রচিত বিভিন্ন কবিগানকে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নতুন করে রুপায়ন করেছেন। এসব কবিতা কবিগান একাত্তরে এই জনপদে শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একটি আবেগের জায়গা তৈরি করেছিল। বিশেষ করে রাইমোহন, শরণার্থী কবি অশ্বিনী কিংবা অতুল চন্দ্র তাদের কথা ও ছন্দে সাধারণের অন্যরকম এক অভিঘাতের জন্ম দিয়েছিল। যার ফলে কৃষক, শ্রমিক থেকে শুরু করে সাধারণ কোন গৃহস্থ বধু সর্বোচ্চটুকু দিয়ে সম্পৃক্ত হয়েছিল জয় বাংলার সংগ্রামে।

কবিতা ও কবিগানগুলোতে মূলত যেসব বিষয় উঠে এসেছে, সেগুলো হচ্ছে–

- প্রভু বন্দনা
- পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনীর ২৩ বছরের শাসন শোষণ
- পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া
- সত্তরের নির্বাচন
- বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ, স্বাধীনতার ঘোষণা
- ২৫ মার্চের গণহত্যা
- শরণার্থী আগমন ও আশ্রয়
- ভারতে প্রতিক্রিয়া
- সাধারণের প্রতি শরণার্থী সেবায় এগিয়ে আসার আহবান
- রাজ্য ও কেন্দ্রিয় সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি
- মুজিবের মুক্তির দাবি
- মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা

গোহাটির বিখ্যাত স্টার সার্কাস একাত্তরের মে মাসে এক সপ্তাহের বাণিজ্যিক সফরে হাইলাকান্দি আসেন। কালাছড়াঘাট ময়দানে তাদের সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনী চলে। ৮ মে ১৯৭১ স্টার সার্কাস বাংলাদেশের শরণার্থীদের বিনা টিকেটে সার্কাস দেখার সুযোগ করে দেন। বিজয় রাজখোয়ার জিফ জাম্প, বি সইকার ভারত্তোলন কিংবা শ্রীমতি চন্দ্রলেখার সুনিপুণ সাইকেল চালানো শরণার্থীদের আনন্দের উপলক্ষ এনে দেয়।[১০৫]

৬ ও ৭ জুন পূর্ববঙ্গ ত্রাণ কমিটির উদ্যোগে হাইলাকান্দি টাউনহলে গীতি নকশা ও সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে ২৫ জন শরণার্থী শিল্পী অংশ নেন। বাংলাদেশ বেতারের ও টেলিভিশন শিল্পী সুজেয় শ্যাম, হিমাংশু বিশ্বাস, অনিতা সিনহা, শংকর সরকার, মুনমুন সোম, রিনি দেব, ঝিনি দেব, শিবু ভট্টাচার্য, কবিরসহ অনেকেই এতে অংশ নেন। পরের দিন *পূর্ব্বায়ন* পত্রিকা এই অনুষ্ঠান নিয়ে লিখছেন, ‘বহুদিন পর একটি পরিচ্ছন্ন এবং হৃদয়স্পর্শী অনুষ্ঠান উপভোগ করে এলাম। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পটভূমিকায় রচিত ‘জয় বাংলা’ গীতি নকশা যেমন সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতায় উত্তীর্ণ তেমনি দর্শক মননে বেদনা ও আশার আলোকে দোলা দিতে সমর্থ হয়েছে। সহায় সম্বলহীন অনিশ্চিত জীবনে পা বাড়িয়েও শিল্পী সত্ত্বার মৃত্যুঞ্জয়ী প্রয়াস হিংসার উমত্ত পৃথিবীতে নবজীবনের আলোক সম্পাত করে যেতে

পারে– এ অনুষ্ঠান তাই প্রমাণ করেছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে পূর্ববঙ্গ ত্রাণ কমিটি শরণার্থী জীবনে আশার সঞ্চারে সমর্থ হয়েছেন।'[১০৬]

হাইলাকান্দির নাট্যানুরাগীদের প্রচেষ্টায় শরণার্থী সহায়তা তহবিল গঠনের লক্ষে *রক্তে রাঙ্গা জয় বাংলা* নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়। পাশাপাশি শরণার্থীদের মনোবল বৃদ্ধি ও তাদের বিনোদনের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য স্থানীয় লক্ষীনগর শরণার্থী ক্যাম্পে নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়।[১০৭]

শিলচরের প্রভাতী সাংস্কৃতিক সংঘ শরণার্থীদের হারানো মনোবল ফিরিয়ে আনতে শরণার্থী শিবিরগুলোতে বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করে। পাথারকান্দি, সোনাক্ষিরা ও লাতু ক্যাম্পে মঞ্চস্থ করা হয় শরণার্থী শিল্পীদের দিয়ে সিরাজউদ্দৌলা নাটক।[১০৮]

রেডক্রস ও অন্যান্য বেসরকারি সহায়তা সংগঠনের উদ্যোগে ক্যাম্পগুলোতে ফুটবল, ভলিবল ম্যাচের আয়োজন করা হত। শরণার্থী একাদশের সাথে আয়োজন করা হত স্থানীয় দলগুলোর ফুটবল ম্যাচ।

একাত্তরে করিমগঞ্জে শরণার্থী ক্যাম্পে আশ্রিত সুখেন্দু সেন লিখেছেন সেই সময়ের স্মৃতি, 'বিকেলে জয়বাংলা একাদশ বনাম করিমগঞ্জ একাদশের ফুটবল খেলা। আমার শিলচর চলে যাওয়ার কথা, কিন্তু যেতে দিলেন না। বললেন– খেলা শেষে তোকে নিয়ে অনেক জায়গায় ঘুরতে যাবো। আমারও খেলা দেখার আগ্রহ। না খেললেও সুনামগঞ্জের মানুষ মাত্রেই ফুটবল অনুরক্ত। আমারও একই অবস্থা। আজাদী মোহামেডানের খেলা মিস করিনি কোনদিন। হিরাদার সাথে বেশ আগেই মাঠে উপস্থিত হয়েছি। সিলেটের ক'জন পুরানো সতীর্থের টানাটানি ও আমার আগ্রহে হিরাদা জয়বাংলা দলভুক্ত হলেন। এ নিয়ে করিমগঞ্জ সমর্থকেরা কিছুটা ক্ষুব্ধ। সুনামগঞ্জের এ-টিম ফিল্ডের মতোই করিমগঞ্জের মাঠ। চারদিক ঘিরে প্রচুর দর্শক, এরই মাঝে দু'দলে বিভক্ত হয়ে আছে। একদিকে জয়বাংলা অন্য দিকে করিমগঞ্জ বলে চিৎকার। জয়বাংলা ধ্বনির একটা আবেগ ও সতেজতা রয়েছে। অপরদিকে করিমগঞ্জ করিমগঞ্জ তেমন লাগসই হচ্ছে না। আর তাই জয়বাংলার সমর্থকই বেশি বলে মনে হয়। আসলে করিমগঞ্জ শহরে জয়বাংলার লোকের অভাব নেই। চারদিকে গিজগিজ করছে ওপার থেকে আসা লোকজন। আমার কাছাকাছি সবাই জয়বাংলার সমর্থক। হিরাদা'র শার্ট প্যান্ট ঘড়ি আমার কাছে গচ্ছিত। সজোরে চেঁচিয়ে যাচ্ছি। প্রথম গোলটি আমাদের হজম করতে হলো। মনটা খারাপ হয়ে গেলেও গলার জোড় বেড়ে গেছে। দারুণ উত্তেজনা। হিরা দা'র পায়ে বল গেলে ক্ষুব্ধ করিমগঞ্জ সমর্থকেরা 'লাবড়া' 'লাবড়া' বলে দুয়োঁ ধ্বনি দেয়। একজনকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলাম। খেলার মাঠে অনেকেরই অনেক নাম, হিরাদা'র ব্যাঙ্গাত্মক নাম এটি। আমরা গলা ফাটাচ্ছি জয়বাংলা বলে। আকাশ বাতাস তোলপাড় করে তোলছে জয়বাংলা। মাঠ

ছাড়িয়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে সারা শহরেই ছড়িয়ে পড়েছে, হইতো নদীর ওপারে পাঞ্জাবীর বাংকারেও। গগন বিদারী চিৎকার আর হর্ষধ্বনির মধ্যে দিয়ে একসময় গোল পরিশোধ হলো। উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠে হাতে রাখা বস্তুগুলি শূন্যে ছুঁড়ে দিলাম। ভাগ্যিস মানিব্যাগটা পকেটে আর দু'হাতে দুটে ঘড়ি পরেছিলাম। ভারি প্যান্ট কোন রকম হাতে ফিরে এলেও হালকা হাওয়াই শার্ট হাওয়ায় ভাসতে গিয়ে উল্লসিত দর্শকদের উদ্বাহু নৃত্যের খপ্পরে পরে একবার এদিক আরেকবার ওদিকে শূন্যে ছুটাছুটি করে অবশেষে ভূমিতে পতিত হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে শতপদে দলিত হলো। অনেক কষ্টে যেটি উদ্ধার করা গেল, সেটি আর শার্ট নয়, শার্টের ছিন্নভিন্ন লাশ। হাতে নেওয়ার মতো নয়।'[১০৯]

উদ্বাস্তু জীবনে এই ফুটবল ম্যাচটা একজন শরণার্থীকে কতটা অনুপ্রণিত করেছে সুখেন্দু সেনের অভিব্যাক্তিতে তা স্পষ্ট হয়েছে। হাইলাকান্দিতে শরণার্থী একাদশের সাথে স্থানীয় নবারুণ ক্লাবের একটি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। শিলচরেও একাত্তরে আয়োজন করা হয়েছিল ফুটবল ম্যাচের। এছাড়া শরণার্থী ক্যাম্পের নারী ও শিশুদের জন্য লুডু, কেরাম ও অন্যান্য অভ্যন্তরীণ খেলাধুলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[১১০]

ক্যাম্পগুলোতে চালু করা হয়েছিল বিশেষ স্কুল, বিশেষ করে যাতে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণে বিঘ্ন না ঘটে সেজন্য বরাকের সাধারণ জনগণ খুব সচেতন ছিল। সুখেন্দু সেনের স্মৃতিচারণে ওঠে এসেছে স্কুল ভবনে উদ্বাস্তুদের আশ্রয়, প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ, অন্যদিকে রবাকের শিক্ষার্থীদের স্কুল কার্যক্রম বিঘ্ন হওয়ার বর্ণনা।

স্কুলের গেটে এখন হোমগার্ডের পাহারা। মাঠজুড়ে তিন ইটের সারিসারি চুলায় রান্নাবান্নার ব্যস্ততা দেখে বুঝা যায়, রেশন জুটছে নিয়মিত। চারপাশে উদোম গায়ে পুরুষ, স্বল্পবাসের নারী, উলঙ্গ শিমু চুলায় চাপানো হাড়িতে চোখ রেখে খাবারের অপেক্ষায় বসে থাকে। জ্বালানী কাঠের সংকট। দূরের টিলা, বন থেকে সংগ্রহ করে আনতে খেটে খাওয়া মানুষের তেমন অসুবিধা নেই। স্কুলের ভিতর থেকে একদিন 'অ'তে অজগর 'আ'তে আম আর নামতা পড়ার সুর ভেসে এলো। দেশে কারোরই পাঠশালায় যাওয়ার সুযোগ হয়নি। স্কুলও হয়তো দেখেনি কেউ। ভাগ্য বিপর্যয়ে একেবারে হাই স্কুলেই যখন ঠাই হয়েছে তখন আর বিদ্যা বঞ্চিত থাকা যায় না। চতুর্থমান পাশ দেয়া মধ্যবয়সী এক মহিলা বারজন ছাত্র নিয়ে নিয়ে বর্ণমালা আর নামতার পাঠ দিচ্ছেন। বইয়ের সংখ্যা অনুযায়ী ছাত্র। এক ঘন্টা করে দুই শিফটে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। শ্রেণী একটাই, প্রথম ভাগ। একই শ্রেণীর ছাত্র হলেও বয়স ৫ থেকে ১৬। আরেকটু বেশি বয়সের দু'জন ছাত্রী আমাদের দেখে স্কুল ছেড়ে পালালো। বয়স্ক বেশ কয়েকজনেরও নাকি পড়ার আগ্রহ জেগেছে। আমাদের সেই লাইব্রেরী থেকে বারটি বর্ণমালার বই দেয়া হয়েছিল ক'দিন

আগে। স্কুলবাসীর আচরণে বিদ্যানুরাগের কোন লক্ষণ পূর্বে দৃষ্ট হয় নাই। মনে হয়েছিল বইগুলি বুঝি জলেই গেল। মাঠের কাজ, ঘাটের কাজ, ক্ষেতের কাজ না থাকায় এমন অলস অবসর কাটানোর জন্য বর্ণমালা আর নামতা শিক্ষা ছাড়া আপাতত আর কিছু সামনে নেই। আরো কয়েকটি বইয়ের ব্যবস্থা করে দেয়া হলো।

অপর পক্ষে বিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্রদের লেখপড়া বন্ধ হয়ে আছে দু'মাস ধরে। শরণার্থীদের দখলে থাকায় অনেক স্কুল কলেজই বন্ধ। তবে এমন অবস্থা অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য চলতে পারে না। যুদ্ধ কবে শেষ হবে আর জয় বাংলা মুক্ত হবে তার কি কোন নিশ্চয়তা আছে। তাই বিভিন্ন স্থানে স্কুল কলেজ খালি করে শরণার্থীদের অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার কাজ শুরু হয়ে গেছে। করিমগঞ্জের বিরজা সুন্দরী স্কুল, বিপিন পাল স্কুল, ভিকমচান্দ স্কুলের শরণার্থীদের জায়গা দেয়া হয়েছে শহর থেকে দূরে নবনির্মিত সোনাক্ষিরা, দাশগ্রাম, আলীপুর শিবিরে। কাছাড় জেলা জুড়ে আরো অনেক শিবির। কোনটি টিলার উপরে, কোনটি সমতলের উন্মুক্ত প্রান্তরে। বাঁশের খুটি তেরপালের ছাউনী দিয়ে সারিসারি ব্যারাক। চন্দ্রনাথপুর, চরগোলা, কাঠলীছড়া, লক্ষীনগর, শিলকুড়ি শরণার্থী ক্যাম্প। উদারবন্ধ নয়ারাম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শরণার্থীদের ঠাঁই হবে হয়তো এর কোন একটিতে। এক আশ্রয় ছেড়ে আবার ছুটবে নূতন আশ্রয়ের খুঁজে। আবার নূতন করে সংসার পাতবে নূতন কোন ঠিকানায়।[১১১]

রেডক্রসের উদ্যোগে শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। এছাড়াও বেশ কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবিরা শরণার্থী শিশুদের জন্য স্কুলিং কার্যক্রম শুরু করে। জুলাই মাসে শিলচরের স্কুলগুলো চালু হওয়ার পর অনেক শরণার্থী শিক্ষার্থী এসব স্কুলে ক্লাস করেন।

চ. বঙ্গবন্ধুর মুক্তি

একাত্তরে করিমগঞ্জের এংলার বাজারে মুজিবের মুক্তি চেয়ে বিশাল সভার আয়োজন করা হয়েছিল। শওকত আলী লস্করের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মুজিবের মুক্তি চেয়ে বক্তারা তীব্র ভাষায় বক্তব্য দেন। সভায় একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবটি হচ্ছে, শেখ মুজিবুর রহমানকে দীর্ঘদিন বন্দী রেখে বর্তমানে গোপন বিচারের নামে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। এতে ইসলামের মহান আদর্শকে সম্পূর্ণভাবে বলি দেওয়া হয়েছে। কোন কোন বৃহৎশক্তি এই নিধনযজ্ঞে ইন্ধন জোগাচ্ছে এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। রাষ্ট্রসংঘের এ ব্যাপারে উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ না করায় আতঙ্কের সৃষ্টি হচ্ছে। অনতিবিলম্বে শেখ মুজিবকে মুক্তি দানের জন্য ভারত সরকারকে সর্ব প্রকারের চাপ সৃষ্টি করার জন্য দাবি জানানো হয়।[১১২]

মুজিবের মুক্তি চেয়ে আচিমগঞ্জের পনের জন গৃহবধু একাত্তরে রোজা রেখেছিলেন। তথ্যটি পায় করিমগঞ্জ কলেজের অধ্যাপক কামাল উদ্দিনের কাছে।[১১৩] অনেক অনুসন্ধানের পর তাদের একজনের সন্ধান পায় করিমগঞ্জ শহরে। অধ্যাপক কামাল নিয়ে গেলেন সেই বৃদ্ধ মহিলা কাছে। আমার আবেগি প্রশ্ন, বঙ্গবন্ধুর জন্য রোজা রাখতে গেলেন কেন? একাত্তরে আচিমগঞ্জের নিতান্তই সাধারণ এই কৃষকবধু আসমা খাতুন যা বললেন তাঁর মমার্থ, আগত শরণার্থী মহিলাদের কাছে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগিদের নানা ধরণের অত্যাচারের বর্ণনা শুনে খুব মর্মাহত হয়ে পড়েছিলাম। আমার বাড়িতে আশ্রয় নেয়া এক সিলেটি পরিবারের নারীদের উপর রাজাকারদের নির্যাতনের বিবরণে নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম। সেই শরণার্থী পরিবারের ষোড়শী কন্যা সবসময় বলত, তারা ঘুরে দাঁড়াবে, আবার ফিরে যাবে নিজেদের বাড়িতে। শেখ মুজিব ঠিকই স্বাধীন করবে বাংলা। মেয়েটির কথায় আমার বিশ্বাস জন্মেছিল। তাইতো আমাদের পাড়ার ১৫ জন মহিলা জয় বাংলার নেতার মুক্তি চেয়ে রোজা রেখেছিলাম। আল্লাহর দরবারে হাত তুলেছিলাম মুজিব যেন মুক্ত হয়।[১১৪]

আসমা খাতুনদের মতো এইসব সাধারণের সম্পৃক্ততায়, উষ্ণতা আর ভালোবাসায় একাত্তরে বরাক উপত্যকায় শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে মিছিল-স্লোগানে মুখরিত হয়েছিল। করিমগঞ্জ হাই মাদ্রাসার ছাত্ররা মুজিবের মুক্তির দাবিতে একাত্তরে মিছিল বের করেছিল।[১১৫] শিলচর শহরের কালীবাড়ি ঘাটের মন্দিরে বিশেষ বন্দনার আয়োজন হয়েছিল ২২ এপ্রিল ১৯৭১।[১১৬] মুজিব আর জয় বাংলা একাত্তরে এই উপত্যকায় একাত্ম হয়েছিল। নিলামবাজারে বানানো হয়েছিল মুজিবের প্রতিকৃতি।

মুজিবের মুক্তির দাবিতে একাত্তরে নিলামবাজারে, রাতাবাড়িতে, শিলচর কলেজ মাঠে জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। বের হয়েছিল বিশাল মিছিল।

৮ আগস্ট হাইলাকান্দি শহরে ছাত্র ও যুব সমাজের উদ্যেগে মুজিব মুক্তি দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষে স্থানীয় টাউন হলে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন হাইলাকান্দি বার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক হাচন রাজা লস্কর। সভার শুরুতে বাংলাদেশের কয়েকজন শিল্পী ‘আমার সোনার বাংলা’ গানটি পরিবেশন করেন। সভায় বাংলাদেশের শিবু ভট্টাচার্য ও লিয়াকত হোসেন বক্তৃতা করেন। তারা মুজিবের মুক্তির জন্য আর্ন্তজাতিক চাপ সৃষ্টির দাবি জানান। মুজিবের মুক্তির জন্য ভারতের জনগণকে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানান। সভায় দীনেশ চন্দ্র সিংহ, আবিদ রাজা বড়ভুইয়া, মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী, অধ্যাপক বিজিৎ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক অসিত ভট্টাচার্য ও সুনীল চক্রবর্তী বক্তৃতা করেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে মুজিবের মুক্তির জন্য ভারত সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। [১১৭]

৭. স্বাস্থ্যসেবা

একাত্তরে শরণার্থী ও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাস্থ্যসেবায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখেন বরাকের স্বাস্থ্যকর্মীরা। বরাকের স্বাস্থ্যসেবাটা মূলত গড়ে ওঠেছিল সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়, সরকারি হাসপাতালগুলোকে কেন্দ্র করে। সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার, নার্সসহ সকল স্বাস্থ্যকর্মী তাদের সমস্ত সামর্থ্য নিয়ে সম্পৃক্ত হয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে। সরকারকে ডাক্তার, নার্স ও ওষুধপত্র দিয়ে সহায়তা করেছে বেশ কয়েকটি বেসরকারি সংগঠন। এর মধ্যে রেডক্রসের মতো আন্তর্জাতিক সংগঠন যেমন ছিল, তেমনি ছিল ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের মতো জাতীয় প্রতিষ্ঠান কিংবা স্থানীয় রাজ্যভিত্তিক সংগঠন বরাক পিপলস রিলিফ কমিটি। স্বাস্থ্যসেবায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন স্থানীয় সিনিয়র চিকিৎসকরা। নিয়মিত ১২-১৬ ঘন্টা করে এরা সেবা দিয়েছেন। যখন প্রয়োজন হয়েছে ছুটে গেছেন সীমান্তে কিংবা ট্রানজিট শরণার্থী ক্যাম্পে। নার্সরাও অনন্য ভূমিকা রেখেছিলেন, ছুটে বেরিয়েছেন হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে কখনোবা বিভিন্ন ক্যাম্পে। এছাড়া স্থানীয় পল্লী চিকিৎসক, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স, মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী ও রেডক্রসসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের অনেকেই সেই সময় সম্পৃক্ত হয়েছিলেন এই স্বাস্থ্যসেবায়।

শিলচর মেডিকেল কলেজ ও করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতাল, হাইলাকান্দি জেলা হাসপাতালের পাশাপাশি সরকারি অন্যান্য হাসপাতালগুলো, চিকিৎসকরা, নার্সরা একাত্তরে জড়িয়ে পড়েছিল অন্যরকম এক জনযুদ্ধে। অসীম মমতা দিয়ে সেই চরম দুর্দিনে সেবার এক অকৃত্রিম বন্ধন গড়ে তুলেছিলেন বরাকের চিকিৎসাকর্মীরা। পালাতে গিয়ে অনেক শরণার্থী হয়েছে বুলেটবিদ্ধ, অনেকেই নানাভাবে আহত, তাদের সর্বোচ্চ সেবা দিয়েছে বরাক। বিপুল সংখ্যক আহত গুলিবিদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাকে সহায়তা দেয়ার পাশাপাশি অবরুদ্ধ বাংলাদেশে প্রেরণ করেছে চিকিৎসা সরঞ্জাম ।

রোগীদের মধ্যে মূলত ছিল গুলিবিদ্ধ আহত মুক্তিযোদ্ধা। যারা সীমান্তবর্তী সেক্টরগুলোতে যুদ্ধ করতে গিয়ে আহত হয়েছেন কিংবা আহত শরণার্থী যারা পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার শিকার হয়েছেন। আর স্থানীয় সীমান্তবর্তী বরাকবাসী যারা পাকবাহিনীর শেলিংয়ে আহত হয়েছেন কিংবা গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। এর বাইরে বিপুল সংখ্যক শরণার্থী যারা কলেরাসহ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বরাকে সরকারি ও বেসরকারি ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, প্যারামেডিকেল স্টাফ ও নার্সসহ শতাধিক প্রশিক্ষিত চিকিৎসা কর্মী শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সেবায় নিয়োজিত ছিল। পাশাপাশি

অপ্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সেবায় কাজ করেছেন। তাদের মধ্যে বড় একটি অংশ ছিল স্থানীয় স্কুল, কলেজগুলোর ছাত্র-ছাত্রী, যারা মূলত নার্সিং, ঔষধ সংগ্রহ, বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সাথে যোগাযোগ এসব কাজ করতেন।

এছাড়া রেডক্রসের আলাদা একটি স্বেচ্ছাসেবক চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী টিম ছিল, যারা নিয়মিত বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে স্বাস্থ্যসেবা দিয়েছে। একাত্তরে বরাকের হাসপাতালগুলোতে একদিকে ছিল শরণার্থীদের ভীড়, অন্যদিকে ছিল যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা।

শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি পাকিস্তানি গোলার আঘাতে বরাকের অনেক বেসামরিক নাগরিক আহত হয়েছেন, প্রাণ হারিয়েছেন অনেকেই। তাদেরও সর্বোচ্চ সেবা দিয়েছে চিকিৎসাকর্মীরা। বহু ঘর-বাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। শত শত মানুষ বাঁচার তাগিদে গ্রাম থেকে গ্রামে পালিয়ে বেড়িয়েছেন, থেকেছেন নিজ দেশে পরবাসী হয়ে। অব্যাহত শরণার্থী চাপ ও সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে পাকিস্তানি বাহিনীর ক্রমাগত শেলিং এর ফলে সীমান্ত অঞ্চলের বরাকবাসীরা একসময় উদ্বাস্তু হতে শুরু করে ।

একদিকে আশ্রয় অন্যদিকে বিপুল সংখ্যক আহত মুক্তিযোদ্ধা, আহত স্থানীয় লোক বরাকের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে দাঁড় করিয়ে দেয় কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। সেই প্রতিকূল সময়ে বরাকের হাসপাতাল, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও উল্লেখযোগ্য চিকিৎসাকর্মীদের সংগ্রাম নিচে তুলে ধরা হল।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সরকারিভাবে নানাবিধ সাহায্য সহযোগিতা করা হয়েছে। বিশেষ করে স্বাস্থ্যসেবায় সরকারি সহযোগিতা ও রেডক্রসের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। কিন্তু এর পরও সাধারণ নাগরিকরা এর সাথে নানাভাবে সম্পৃক্ত হয়েছিল। নাগরিক সম্পৃক্ততা ছাড়া বিপুল এই শরণার্থী স্রোতের স্বাস্থ্যসেবা দেয়া দুরুহ হয়ে পড়ত। বরাকের নাগরিক সম্পৃক্ততার সেই বিষয়টি তুলে ধরেছেন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক অতীন দাশ, 'সাধারণের সহায়তা ছাড়া বরাকে লক্ষাধিক শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়া সম্ভব হত না, মূলত সাধারণ জনগণের চাপেই সরকার সীমান্ত শিথিল করেন, আশ্রয়ের পথ খুলে দেন।' বিশেষ করে বেসরকারি পর্যায়ে সাধারণ জনগণ সম্পৃক্ত হয়ে যেভাবে শরণার্থীদের চিকিৎসা ও সেবা দিয়েছে তা অভূতপূর্ব।[১১৮]

বরাকের সাধারণ নাগরিকরা শুধুমাত্র যে শরণার্থীদের সেবা দিয়েছে তা নয়। যখন প্রয়োজন হয়েছে ছুটে গিয়েছে অবরুদ্ধ বাংলাদেশে। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সংগ্রহ করেছেন প্রয়োজনীয় ঔষধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম। কখনো বা অবরুদ্ধ বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসায় জীবন

বাজি রেখে ছুটে গিয়েছেন কোন ডাক্তার। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে বরাকের কয়েকজন মেডিকেল কলেজ শিক্ষার্থীর তেমনি এক যাত্রার বর্ণনা তুলে ধরেছেন অতীন দাশ।

পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক ক্রেক ডাউনের দু'দিনের মধ্যেই সিলেট শহরের একটি তরুণ দল শিলচর এসে পৌঁছে যায়। আমি তখন ওয়াটার ওয়ার্কস রোডের ওয়াজিদ মঞ্জিলে থাকি। হঠাৎ দুপুরে একদল তরুণ এসে আমার রুমে হাজির। পরিচিতের মধ্যে লক্ষীনারায়ণ রায়, শিলচর মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। সে-ই পরিচয় করিয়ে দিল ডা: নিতাই দাস ও ডা: রামেন্দু হোম চৌধুরীর সঙ্গে। তাঁরা তখন মেডিক্যাল কলেজে ইন্টার্নি। নিতাই বললেন– সঙ্গের এই তরুণরা সিলেট থেকে এসেছে। খান সেনাদের আক্রমণে আহতদের চিকিৎসা এবং ঔষধপত্রের খুব অভাব। এখান থেকে ঔষধ এবং ডাক্তার নিয়ে ওরা যেতে চায়। নিতাই এবং রামেন্দু সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেছেন। লক্ষীনারায়ণের মতো সিনিয়র ছাত্ররাও যাবে। আমাকেও তাঁদের সঙ্গে যেতে হবে। আমার তো আপত্তির কোন কারণ নেই। এ সব ব্যাপারে তো একপায়ে খাড়া। পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে এসেও ওখানকার সঙ্গে আমার যোগাযোগ রয়েছে, পূর্ব বাংলায় প্রকাশিত বইপত্র আমার মারফত পাওয়া যায়, ওখানে ছাত্র আন্দোলন করেছি– এসব মোটামুটি জানা ছিল তদানীন্তন শিলচরে। তাই নিতাই দাসরা আমার ওখানে ছুটে এসেছেন। এ ছাড়া, সিলেট থেকে যারা এসেছিল তারাও নিয়ে এসেছিল আমার রেফারেন্স। সেই তরুণদের মধ্যে দু'জন পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ সংসদের সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। একজন ইবনে আজিজ লামা, অন্যজন ইমরান হোসেন চৌধুরী। লামা পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ ছেড়ে জাতীয় পার্টির সিলেট জেলা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

নিতাই দাসরা ঔষধপত্র সংগ্রহ করে গাড়ি নিয়েই এসেছিলেন, আমরা তাই সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রা করি, আমাদের কেয়ারটেকার কাম রান্নার লোক সিদ্দিককে বলে যাই– 'ব্যারিস্টার সাহেবকে বলবে আমি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে চলে গেছি।'

সুতারকান্দিতেই গাড়ি রেখে দিতে হল। আমরা ধানক্ষেতের মাঝ দিয়ে হেঁটে চলেছি। কোথাও বা মোটর সড়ক ধরে চলেছি, আতঙ্ক খান সেনা বা তার অনুচররা না ধরে ফেলে। এভাবেই সম্ভবত চুড়খাই পর্যন্ত পৌঁছেছিলাম। এরপর খবর পাওয়া গেল খান সেনারা এগিয়ে আসছে, গোলাপগঞ্জ পর্যন্ত নাকি শেলিংও হয়ে গেছে। চা এবং বনরুটি খেয়ে অনেক রাতে আমরা করিমগঞ্জ ফিরে এসেছিলাম।[১১৭]

বাংলাদেশ ত্রাণ তহবিল, পূর্ববঙ্গ ত্রাণ তহবিল, শিলচর মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, কাছাড়সহ বেশ কয়েকটি সংগঠন অবরুদ্ধ বাংলাদেশের রণাঙ্গণের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য জীবন রক্ষাকারী নানা ঔষধ,

চিকিৎসা সরঞ্জাম প্রেরণ করেছেন। বিশেষ করে রেডক্রসের উদ্যোগে সুতারকান্দি ও করিমগঞ্জ সীমান্ত হয়ে বেশ কয়েকবার চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ করেছেন।[১২০]

আহত অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে এনে করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি ও শিলচরে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে গুলিবিদ্ধ বিপুল সংখ্যক আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন শিলচর মেডিকেল কলেজ। শিলচর মেডিকেল কলেজের তৎকালীন রেজিস্টার বইয়ে এমন অনেক মুক্তিযোদ্ধাদের বিবরণ পাওয়া যায়। উন্নত চিকিৎসার জন্য শিলচর থেকে অনেককেই কলকাতা, গোহাটি ও বোম্বে প্রেরণেরও বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়।[১২১]

কাছাড়ে গঠিত স্বাধীন বাংলাদেশ সহায়তা সমিতির পক্ষ থেকে সিআরইউ এর সহায়তায় অবরুদ্ধ বাংলাদেশের ভেতরে ঔষধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়। বীরেন্দ্র মিত্রের গাড়িতে করে এপ্রিলের শেষে ৫ জনের একটি দল সুতারকান্দি হয়ে বিয়ানীবাজারে যায়। এবং মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে জীপ ভর্তি চিকিৎসা সরঞ্জাম ও ঔষধপত্র তারা তুলে দেন। এই দলে ছিলেন তারাপদ ভট্টাচার্য, দিলীপ কুমার দে, পলু বিশ্বাস, পুর্ণেন্দুদেব পুরকায়স্থ এবং সিআরইউ নেতা হরিপ্রসাদ পাল।

বেসরকারি পর্যায়ে ঔষধপত্র সংগ্রহের জন্যে কিছু কিছু চিকিৎসক এগিয়ে আসেন। সুনীলকুমার দত্তরায়কে কেন্দ্র করে ‘অরুণোদয় প্রেস’ হয়ে ওঠে এর কার্যালয়। জন স্মিলের মালিক সাধন মুখার্জি একটি ফ্রিজ এনে দেন ঔষধপত্র রাখার জন্যে।[১২২]

এছাড়া অনেকেই অরুণোদয় এসে ঔষধ দিয়ে যান। মিলন লস্কর সুনীল দত্তরায়কে একশত টাকা দেন শরণার্থীদের ঔষধ ও প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার জন্য।

মে মাসের শুরু থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন রাজ্যে কলেরা মহামারি আকার ধারণ করে। বিপুল সংখ্যক শরণার্থী এই মহামারীতে আক্রান্ত হয়। একসময় মেঘালয়ের বালাট ও মাইলাম ক্যাম্পে ছড়িয়ে পড়ে। মে মাসের মাঝামাঝি এর প্রকোপে পড়ে বরাক উপত্যকা। ২৪ মে ১৯৭১ পর্যন্ত অবিভক্ত কাছাড় জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের এক আদেশে দেখা যায়, কলেরায় আক্রান্ত হয়ে হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ ও শিলচরে বেশ কয়েকজন মারা যায়। যার প্রেক্ষিতে কাছাড় জেলায় কলেরাকে মহামারী হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[১২৩]

২৬ মে সাপ্তাহিক *পূর্ব্বায়নের* এক সংবাদে দেখা যায় হাইলাকান্দি শহরে ৪ জন এবং গ্রামাঞ্চলে ১০ লোক কলেরায় মারা যায়।[১২৪] কলেরার প্রকোপ কমাতে জেলার স্বাস্থ্য বিভাগ ইনজেকশন দিতে শুরু করে। রেডক্রসের সহায়তায় জেলায় বিপুল সংখ্যক কলেরার ইনজেকশন সরবরাহ করা হয়। শুরুতে কলেরার প্রকোপ শিলচরে কম ছিল। মূলত করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি ছিল সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত। পূর্ববঙ্গ সাহায্য

কমিটি কলেরায় মৃত্যু কমাতে স্বাস্থ্যকর্মীদের সহায়তায় বিশেষ মেডিকেল টিম গঠন করেন। প্রচন্ড গরমে সেই সময় কাছাড় জেলায় পানির সংকট দেখা দেয়। শুরু হয় বিশুদ্ধ পানির সংকট। সরকারি আদেশ জারি করে স্থানীয় ও শরণার্থীদের পুকুরের পানি পান না করার নির্দেশ দেয়া হয়। কলেরার ইনজেকশন দেওয়ার জন্য স্থানীয় নার্স, স্বাস্থ্য সহকারী ও গ্রামীণ ডাক্তারদের সমন্বয়ে বিশেষ টিম গঠন করা হয়। কলেরায় সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় শিশু ও বয়স্ক লোকজন। কলেরায় আক্রান্ত ব্যাক্তির মৃতদেহ না পুড়িয়ে কবর দেওয়ার জন্য জারি করা হয় বিশেষ সরকারি আদেশ।[১২৫]

হাইলাকান্দি শহরে কলেরা প্রতিরোধে স্থানীয় নিবেদিতা সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তারা কলেরায় আক্রান্ত শরণার্থীদের মত ছোঁয়াচে রোগীকেও পরিচর্যা করে মানবতার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

এছাড়া পূর্ববঙ্গ ত্রাণ কমিটির শতাধিক স্বেচ্ছাসেবী রাতদিন রোগীদের সেবায় কাজ করেছেন। হাইলাকান্দি সরকারি হাসপাতালের শতশত কলেরা রোগীকে বিশুদ্ধ পানি, ইনজেকশন ও খাবার সরবরাহ করেছে ত্রাণ কমিটির সদস্যরা।

১৬ জুন ১৯৭১ এর *পূর্ব্বায়নের* তথ্য মতে এই সময় পর্যন্ত হাইলাকান্দিতে আশ্রয় নিয়েছে ১২,০০০ শরণার্থী। নিবেদিতা সমিতি, পূর্ববঙ্গ ত্রাণ কমিটি ও রেডক্রসের সহায়তার পরও কলেরা নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাচ্ছে হাইলাকান্দির প্রশাসন। মাত্র ২ জন চিকিৎসক দিয়ে দুরুহ হয়ে পড়েছিল তা বলাই বাহুল্য। হাইলাকান্দিতে সরকারিভাবে ঔষধপত্রেরও ছিল বেশ অপ্রতুল।[১২৬]

তবে প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে চা-বাগানে চা শ্রমিকদের জন্য যে হাসপাতাল গুলো ছিল সেখানে বিপুল সংখ্যক শরণার্থীকে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়েছে। নালাছড়া, নালামখ, বর্ণারপুর, পাগলাছড়ার মতো প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে সরকারিভাবে কোন স্বাস্থ্য সহায়তা ছিল না।

লক্ষীনগর শরণার্থী ক্যাম্প স্থাপনের পর হাইলাকান্দির শরণার্থী ব্যবস্থপনায় মোটামুটি শৃঙ্খলা আসে, বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নেয়া শরণার্থীরা ক্যাম্পে ফিরতে শুরু করে। মহামারীর প্রভাবও এইসাথে কমতে থাকে।

শিলচরের শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতেও জুন মাসে ভয়াবহ কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। সরকারি হাসপাতাল ও রেডক্রসের পাশাপাশি বেসরকারি ডাক্তার, স্বাস্থ্য সহকারি, নার্স ও স্বেচ্ছাসেবকরা এইসময় দুর্গত লোকের পাশে এসে দাঁড়ায়। পৌর প্রশাসন বিশেষ নির্দেশনাবলি জারি করেন। তবে শিলচর, হাইলাকান্দির অবস্থা স্বাভাবিক থাকলেও করিমগঞ্জে কলেরা মহামারি আকার ধারণ করে। বর্ষা ঘনিয়ে

এলে শরণার্থী শিবিরের দুর্ভোগ আরো বেড়ে যায়। কলেরা, আমাশয়, রক্ত আমাশয়, গ্যাস্টোএনটাইটিকে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর খবর বাড়তে শুরু করে। ছড়ায় আতঙ্ক।[১২৭]

২২ ডিসেম্বর সাপ্তাহিক *অরুণোদয়* পত্রিকায় পত্রিকার এক রিপোর্ট বলা হচ্ছে উদরাময়ে শিলচরে ২৮ জন, করিমগঞ্জে ৩৮০ জন ও হাইলাকান্দিতে ৫২ জন শরণার্থী মারা যায়।[১২৮] করিমগঞ্জ মহকুমা প্রশাসক কলেরা মহামারি ঠেকাতে বিশেষ নির্দেশাবলি জারি করেন।

করিমগঞ্জ মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক আকারে উদরাময় পীড়া দেখা দেওয়ায় নিম্ন লিখিত ব্যবস্থাবলী অবশ্য গ্রহণ করিতে জনসাধারণকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

১. প্রত্যেক ব্যক্তিকে কলেরা প্রতিষেধক ইনজেকশন অবশ্যই নিতে হইবে।

২. আহার্য্যবস্তু মাছি হইতে রক্ষা করিবেন।

৩. অপকৃত ও অধিকপক্ক আহার্য্য বর্জন করা।

৪. পানীয় জল ফুটাইয়া ব্যবহার করা।

৫. নটায়া খালের জল যে কোন প্রকার ব্যবহারের জন্য বর্জন করা।

৬. খোলা জায়গায় রাখা মিষ্টিদ্রব্য, গুড়, চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করিবেন না।

উপরোক্ত পরামর্শবলী অবশ্য পালনীয়।[১২৯]

করিমগঞ্জ বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি ও ত্রাণ কমিটি কলেরায় মৃত ব্যক্তিদের সৎকারে আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন। করিমগঞ্জ কলেজের শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে কাছাড়ের কয়েকজন মেডিকেল ছাত্র কলেরার প্রতিষেধক দেওয়ার জন্য কলেজ চত্বরে একটি অস্থায়ী চিকিৎসা ক্যাম্প খুলেন।[১৩০] ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের কাছাড় শাখা ও করিমগঞ্জ রেডক্রস সোসাইটি এখানে প্রতিষেধক ও স্বাস্থ্যকর্মী সরবরাহ করেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ডাক্তার সুজিত চৌধুরী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি শরণার্থী ট্রানজিট ক্যাম্পগুলোতে আগত শরণার্থীদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিতেন।[১৩১]

তবে মুক্তিযুদ্ধে বরাকের স্বাস্থ্যসেবায় সবচেয়ে বেশি ভূমিকা ডা: নলীনাক্ষ চৌধুরীর। মূলত তিনি রেডক্রিসেন্টের দায়িত্ব পালনেও সাধ্যের সর্বোচ্চটুকু নিয়ে শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সেবায় আত্মনিয়োজিত ছিল। বিভিন্ন ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে তিনি স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবা তদারকি করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটির স্থানীয় প্রতিনিধি হসেবে তাঁর অনন্য ভূমিকার জন্য বাংলাদেশ সরকার তাকে মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা প্রদান করেছেন।

ডাঃ এইচ. কে. দাশ বিশ্বাস, এস. পি. নাথ, ডাঃ মনিজেন্দ্র শ্যাম, ডাঃ বি. ভট্টাচার্য শরণার্থী স্বাস্থ্যসেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।[১৩২] বিশেষ করে ডাঃ মনিজেন্দ্র শ্যামের কথা বলতে হয়। একাত্তরের নয় মাস বিভিন্ন বাড়ি বাড়ি গিয়ে আশ্রয় লাভকারী শরণার্থীদের তিনি সহায়তা করেছেন। বিনা ফিতে রোগী দেখেছেন।[১৩৩]

ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন এর কাছাড় শাখার একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন শ্রী শ্যাম। বিশেষ করে একাত্তরে শিলচরে ভয়াবহ রকমের চোখ ওঠা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। ডাঃ মনিজেন্দ্র শ্যাম তখন এই রোগের চিকিৎসায় শিলচরের বিভিন্ন গ্রাম, মহল্লা ঘুরে বেড়ান। কলেরার প্রকোপ রোধেও বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন ডাঃ মনিজেন্দ্র শ্যামের নেতৃত্বে একদল চিকিৎসক ও মেডিকেল ছাত্র।

একাত্তরে শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ডাক্তার শ্রী নবারুণ দুরকায়স্থ, সুজিত ভট্টাচার্য, সুজিত ভট্টাচার্য (২), বিজন দে গুরুত্বপূণ ভূমিকা রাখেন।

বিশেষ করে স্কিন স্পেশালিস্ট সুজিত ভট্টাচার্য আগত শরণার্থীদের বিভিন্ন চর্মরোগের চিকিৎসা দিয়েছেন। হাইলাকান্দি, বদরপুর, করিমগঞ্জ, মাসিপুর, শিলচরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে তিনি চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন। মেডিসিনের ডাঃ নাবারুণ দুরকায়স্থ প্রতিদিন চলে যেতেন বিভিন্ন ক্যাম্পে।[১৩৪]

ডাঃ অরুণ রতন চৌধুরী পালন করেছিলেন তৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা। এছাড়া এসব ডাক্তারদের অনুরোধে কাছাড় মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যাসোসিয়েশন বিনামূল্যে প্রচুর ঔষধ দান করেছেন। শরণার্থী স্বাস্থ্যসেবায় কাছাড় মহিলা সমিতি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। বিশেষ করে ডাক্তার কল্যাণী মিশ্রের নেতৃত্বে সমিতি একটি স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করেন। যারা আগত শিশু ও মহিলা শরণার্থীদের স্বাস্থ্য সহায়তা দেন। গর্ভবতী মহিলাদের জন্য বিশেষ সেল চালু করেন।[১৩৫]

একাত্তরের এপ্রিলের শুরুতে শিলচরে নগরপিতা দ্বিজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে সভাপতি করে, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সদস্য তারাপদ ভট্টাচার্যকে সম্পাদক করে (উপাচার্য তপোধীর ভট্টাচার্যের বাবা) স্বাধীন বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি গঠন করা হয়। এই সহায়ক সমিতি অবিভক্ত কাছাড় জেলায় শরণার্থী ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্যসেবায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বিশেষ করে এই সমিতির সদস্য বীরেণ মিত্র ও তাঁর স্ত্রী অঞ্জলী লাহিড়ির ছোট বোন ডাঃ কল্যাণী মিত্র শরণার্থীদের চিকিৎসা সেবায় সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করেন।[১৩৬] একাত্তরে কাছাড়ে শরণার্থীদের স্বাস্থ্যসেবায় সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে রেডক্রস।

রেডক্রসের পরে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল এই সহায়ক সমিতি। সহায়ক সমিতি, কাছাড় মেজিকেল রিপ্রেজেন্টটিভ ইউনিয়ন সংক্ষেপে সিআরইউ এর সহায়তায় শরণার্থী ও রণাঙ্গণের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিপুল সংখ্যক ঔষধ সংগ্রহ করেন।

একাত্তরে বরাক উপত্যকায় স্বাস্থ্যসেবায় পথিকৃৎ এর ভূমিকা পালন করেছে শিলচর, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি রেডক্রস সোসাইটি। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বিপুল সংখ্যক শরণার্থীকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া, ট্রানজিট ক্যাম্পগুলো সচল রাখা, কলেরার প্রকোপ রোধ করা, শিশু ও বৃদ্ধদের পুষ্টিকর খাবার প্রদান ইত্যাদি নানাধিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে তারা কাজ করেছে।

করিমগঞ্জ ও শিলচর রেডক্রস সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে সুতারকান্দি, কুশিয়ারা নদীর তীরে করিমগঞ্জ কালীবাড়ি গেইট, লাতু, মহিশাসন, লক্ষীবাজার নাফাসাইন, সরিষা ও মোবারকপুরে শরণার্থী প্রবেশের পথে ৮টি অস্থায়ী শরণার্থী প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়। যেগুলোতে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থীদের পাশাপাশি আহত, গুলিবিদ্ধ অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে চিকিৎসা দেয়া হয়। এছাড়া করিমগঞ্জ রেডক্রস সোসাইটির উদ্যোগে আগত শরণার্থীদের জন্য ৭টি শিবিরে প্রামমিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়।[১৩৭]

শিবির বহির্ভূত শরণার্থীদের জন্য রেডক্রস মাতৃসদনে একটি চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত বিনামূল্যে এখানে সেবা দেয়া হয়।[১৩৮]

রেডক্রসের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ অমলেন্দু দাস প্রতিদিন শিবিরগুলো পরিদর্শন করে রোগীদের চিকিৎসা করতেন। এছাড়া করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় রেডক্রসের ভূমিকা ছিল। রেডক্রস এসব কর্মকান্ডে সাধারণ লোকজনকে সম্পৃক্ত করেছিলেন। বিশেষ করে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের দিয়ে তারা একটি ভ্রাম্যমাণ স্বেচ্ছাসেবক টিম গঠন করেছিল। একাত্তরে রেডক্রসের অধীনে শিলচরে ১৪টি, করিমগঞ্জে ২৭টি ও হাইলাকান্দিতে ২টি পৃথক স্বেচ্ছাসেবক টিম কাজ করেছিল। যারা সবাই ছিলেন অবৈতনিক।[১৩৯]

৫ নভেম্বর ১৯৭১ করিমগঞ্জ রেডক্রস সোসাইটির সম্পাদক অমলেন্দু দাস পত্রিকায় একটি বিবৃতি দেন, তাতে করিমগঞ্জ, রেডক্রস সোসাইটির কার্যক্রম উঠে আসে। তিনি বিবৃতিতে রেডক্রসের মাধ্যমে ৩৭,০০০ শরণার্থীকে চিকিৎসা সেবা দেয়ার কথা বলেন।[১৪০] পাশাপাশি এসব সেবাকর্মে স্থানীয়দের স্বেচ্ছাক্রমে যোগদানের জন্য ধন্যবাদ জানান। ৫২টি শিবিরে প্রথম চার মাস বিনামূল্যে দুগ্ধ ও ঔষধ বিতরণের কথা উল্লেখ করেন।

এছাড়া ব্যাক্তিগত পর্যায়ে অনেকেই স্বাস্থ্যসেবায় এগিয়ে এসেছিলেন। সুনীল রায় মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে শিলচরে কাজ করেছিলেন, তিনি লিখছেন, ‘আমরা প্রচুর ওষুধ সংগ্রহ করেছিলাম। শিলচরের প্রায় সব ডাক্তারই অর্থাৎ যার কাছেই আমরা গিয়েছি তিনিই প্রচুর ওষুধ দিয়েছেন। যেসব ওষুধ মুক্তিবাহিনীর দরকারে তা তাঁদের দেওয়া হয়েছিল, বাকিগুলো বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে দেওয়া হয়েছে। তিন-চার কার্টুন ওষুধ বালাট শরণার্থী শিবিরেও পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। সেই শিবিরে প্রায় তিন লক্ষ শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছিলেন।’[১৪১]

করিমগঞ্জের রাতাবাড়ি যুব সংঘ কিংবা শিলচরের বড়ভাইল গ্রামের আজাদ ক্লাব শরণার্থীদের জন্য বিভিন্ন ঔষধের দোকান, ডাক্তারদের কাছে গিয়ে ঔষধ ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ করেছিল।

শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দির হোমিও চিকিৎসকরা বিনামূল্যে আগত শরণার্থীদের সেবা দিয়েছেন। বিশেষ করা চর্ম রোগ, জয় বাংলা, উদরাময়ের চিকিৎসার জন্য তাদের দ্বারস্থ হয়েছিল অনেক শরণার্থী। করিমগঞ্জ হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক সংঘ বিনামূলে চিকিৎসা দেয়ার জন্য অক্টোবরে ফ্রি ক্যাম্প পরিচালনা করেন।[১৪২]

অস্বাভাবিক শরণার্থী আগমনের ফলে স্থানীয় ক্ষুদ্র হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা সেবা দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। ১৫ মে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কাছাড় সফরে আসলে তাকে হাসপাতালে ডাক্তার ও ঔষধ সরবরাহ বৃদ্ধি, মেডিকেল ভ্যান ও ভ্যাকসিনেশন বরাদ্দের আবেদেন জানিয়ে স্মারকলিপি দেয়া হয়।[১৪৩]

স্থানীয় চিকিৎসালয়ের চাপ কমানোর জন্য করিমগঞ্জ বাংলাদেশ ত্রাণ কমিটি ভারতীয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতিকে করিমগঞ্জে এক ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয় প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানান।[১৪৪] ডাঃ ত্রিগুণা সেনের বিশেষ তৎপরতায় শীঘ্রই এই ব্যবস্থা করা হবে বলে সহায়ক সমিতি জানান।

বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ পরবর্তীতে একটি এম্বুলেন্স ভ্যান করিমগঞ্জে প্রেরণ করেন।[১৪৫]

কর্ণেল দেবনাথ দাসের তৎপরতায় শিলচরে সিভিল ডিফেন্স নামক একটি সংস্থা গড়ে ওঠে। এই সংস্থা শিলচরের তরুণ-তরুণীদের প্রাথমিক চিকিৎসার ট্রেনিং দেন। ভিকমচাঁদ স্কুলের শিক্ষিকা অপর্ণা দের তত্ত্ববধানে কালিবাড়ির নাটমন্দিরে গড়ে ওঠে এই প্রশিক্ষণ ক্যাম্প। ডাক্তার ডি সাহা, তার স্ত্রী প্রভা সাহা, কন্যা রত্না সাহাও এই কার্যক্রমে সহায়তা করেন। এই প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে শতাধিক তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষিত করে শরণার্থী স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োগ করা হয়।[১৪৬]

বরাকের স্বাস্থ্যবিভাগ, সরকারি হাসপাতাল, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসক, নার্স, কম্পাউন্ডারসহ সকল স্বাস্থ্যকর্মী একাত্ম হয়েছিল বাংলাদেশের সেবায়। প্রতিবেশি যুদ্ধাক্রান্ত একটি রাষ্ট্রের জন্য এই এক অন্য

রকম সহমর্মিতা। এই সহমর্মিতা রণাঙ্গনের যোদ্ধাদের দিয়েছিল আত্মবিশ্বাস, শরণার্থীদের দিয়েছে সর্বোচ্চ সেবা। এতসবের মধ্যেও বরাকে প্রকাশিত একাত্তরের কয়েকটি পত্রিকায় শরণার্থী সেবায় চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের অবহেলার চিত্র পাওয়া যায়।

১৬ জুন সাপ্তাহিক *দৃষ্টিপাত* শিরোনাম করে,'শরণার্থী শিবিরে ডাক্তার ও ঔষধের অভাব', পত্রিকাটি ১৮ আগষ্ট ১৯৭১ সংবাদ শিরোনাম করে, 'কাছাড়ে ঔষধ দুমূল্য, ডাক্তার ও ঔষধ সংকট'। পূর্ব্বায়ন ১২ জুন শিরোনামে লিখে, 'ডাক্তারদের অবহেলায় শরণার্থী ক্যাম্পে ৪ শিশুর মৃত্যু'। এছাড়া *অরুণোদয়, পূর্ব্বায়নে* একাত্তরে চিকিৎসা সেবায় অবহেলা, ঔষধের মূল্যবৃদ্ধি, সরকারি হাসপাতালগুলোর অব্যবস্থাপনা নিয়ে অনেকগুলো সংবাদ পরিবেশিত হয়।[১৪৭]

কয়েকটি অভিযোগ সত্ত্বেও একাত্তরে বরাকের চিকিৎসাকর্মীদের যে সহযোগিতা সেটা মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অর্জন। বরাকের স্বাস্থ্যকর্মীদের অনবদ্য এই সহায়তা সেবা ও ত্যাগের ইতিহাসে ভাস্বর থাকবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে।

মূল্যায়ন

পূর্ববঙ্গে গণআন্দোলনের ঢেউ শুরু থেকেই বরাক উপত্যকায় আবেগ সঞ্চার করেছিল। এপ্রিলের শুরু থেকে যখন করিমগঞ্জের নানা সীমান্ত দিয়ে শত শত উদ্বাস্তু বরাকে প্রবেশ শুরু করল, এক অপার মায়ায় বরাকের সাধারণ জনগণ তাদের বুকে টেনে নিল। এই বুকে টেনে নেওয়ার ক্ষেত্রটি তৈরি করেছিল বরাকের সংবাদপত্র, সিভিল সোসাইটি। ২৪ মার্চ ১৯৭১ হাইলাকান্দির *পূর্ব্বায়ন* পত্রিকায় শুভ্রশঙ্কের একটি কবিতা ছাপা হয়, সেখানে তিনি উচ্চারণ করেন,

'এপারের হাসি কান্নার ঢেউ উঠে
ওপারের নদী হাওরে।
ওপারের দীর্ঘশ্বাস এপারের বাতাস
ভারী করে তোলে।
বাজানা নাচেনার ভান করে
বহুচেনা এপার ওপার।
বুক অভিমানে বয়ে চলে
গঙ্গা পদ্মার জলধারা।'

২৮ এপ্রিল ১৯৭১ সাপ্তাহিক *পূর্ব্বায়ন* তাদের সম্পাদকীতে উল্লেখ করেন, ‘এই সীমাহীন শরণার্থীদের খাদ্য জোগাইতে গিয়া আমরা সীমান্তবাসীরাও উদ্বাস্তুর পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইতেছি। খাদ্যবস্তুর দর আকাশচুম্বী হইতে হইতে এখন মহাকাশচুম্বী হইয়াছে। অসাধু ব্যবসায়ীরা এই সুযোগে নিজেদের পেট মোটা করিতেছে। স্বল্প ও সীমিত আয়ের জনসাধারণ অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতেছেন, দৈনন্দিন খরচ চালানেই কঠিন।’

বিপুল সংখ্যক শরণার্থী আগমন ও সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ার ফলে একাত্তরে কাছাড়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বেড়েছিল কয়েকগুণ। দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে কাছাড়ের জনজীবনে ভয়াবহ প্রভাব পড়ে। স্থানীয় অধিবাসীদের পাশাপাশি এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর জীবনে। বিশেষ করে সীমান্ত শহর করিমগঞ্জে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি ছিল সবচেয়ে বেশি। ছিল ভয়াবহ রকমের সরবরাহ ঘাটতি। *সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাতের* সম্পাদকীয় ‘আকাশচুম্বী মূল্য’ থেকে সেই সময়কার বাজারমূল্যের অস্থিরতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।[১৪৮]

‘সুযোগ পেলেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এ আমাদের কাছে নতুন নয়। জনসাধারণেরও তা অনেকটা গা সওয়া হয়ে গেছে। মানুষ যখন মৃত্যুর সাথে লড়তে থাকে ব্যবসায়ীদের হয় তখন পোয়াবারো। এই সময়টাতে প্রতিবারই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় বন্যার অজুহাতে। এবার এখনও বন্যা আসেনি সত্য তবে ব্যবসায়ীরা শরণার্থী বন্যার অজুহাত ধরে দ্রব্যমূল্য আকাশচুম্বী করে চলেছেন।

চিনির নিয়ন্ত্রণ মূল্য ছিল প্রতি কেজি ১.৭৬ পয়সা। সরকার সেই চিনির উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ তুলে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাজার দর হয়ে গেছে ২.২০ পয়সা। তারও বেশির ভাগ ভিজা চিনি। মার্চ এপ্রিল মাসে যে লবণ বিক্রী হত ২৮ পয়সা কেজি দরে তা এখন হচ্ছে ৪০ পয়সা কেজি। মসুর ডাল সেদিনও যা ছিল ১.২৫ আজ তা দাঁড়িয়েছে ১.৩৬ তে মুগ ডাল নামক একটা নকল বস্তুও বাজারে চালু আছে। যেহেতু এই সকল বস্তু বাইরে থেকে আনাতে হয় এবং মুষ্ঠিমেয় ব্যবসায়ী অর্থবলে তা নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন সেজন্য জনসাধারণ তথা সরকার বেকায়দায় পড়ে আছেন। নিত্য ব্যবহার্য প্রতিটি বস্তুরই মূল্য এভাবে অহেতুক বেড়ে গেছে।

ট্যাক্স বৃদ্ধির অজুহাতে রুটির দাম সেই যে বাড়ল ট্যাক্স উঠে যাওয়া সত্বেও সে দাম কমার আর সুযোগ এখনও হয়ে ওঠেনি। নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের এইত হচ্ছে নমুনা। তা’ছাড়া অন্যান্য জিনিষ পত্রেরও একই অবস্থা। সিমেন্টের নির্দ্ধারিত মূল্য ১০.৯৫ পয়সা, কিন্তু বাজারে তা নেই। ২৫ টাকা দর দিলে যত খুশী

পাওয়া যায়। সরকারি কোটার টিন ২১৫ টাকা বান্ডিল। একই টিনের বাজার দর ৩৫০ টাকা। সেদিনও যে রড বিক্রী হয়েছে ৪৫ টাকা দরে তাই বিক্রী হচ্ছে ৮০/৮৫ টাকা দরে।

জনসাধারণের পক্ষে এই সকল অন্যায় অবিচারের জন্য প্রতিকার পাওয়ার মত সাধ্য নেই। সরকারের হাতে তেমন কোন আইন নেই বলেই ব্যবসায়ীরা নিজেদের মত চলতে সাহস পাচ্ছেন। স্থানীয় প্রশাসনও তাদের সম্পর্কে বিশেষ কোন ব্যবস্থা নিতে পাচ্ছেন না। তথাপি আমরা অনুরোধ করব প্রয়োজনবোধে নতুন পাশ করা বি ডি আইনের প্রয়োগে হলেও এই দ্রব্যব্যবস্থার হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করতে হবে।

একাত্তরের মার্চে কাছাড়ের বাজারে যে চাল বিক্রি হয়েছে ৬০-৭০ পয়সায় জুন মাসে সেই চাল প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ১.৬০ পয়সায়। করিমগঞ্জের নিলামবাজার, পাথারকান্দি, লাতুতে চাল ২ টাকায় বিক্রির সংবাদ *অরুণোদয়ে* ১৮ জুন ১৯৭১ প্রকাশিত হয়। চিনি ও কেরোসিন বাজার থেকে প্রায় উধাও। চিনির এত দুর্মূল্য ইতিপূর্বে আর কখনো কাছাড়ের লোকজন দেখেনি। পাথারকান্দি ও দুল্লভছড়ায় চিনি প্রতিকেজি ৬ টাকায় বিক্রি হওয়ার সংবাদ ছেপেছে *যুগশক্তি*।[১৪৯]

কেরোসিন এর মূল্য একাত্তরের মার্চ মাসে ছিল ৫০ পয়সা লিটার। জুন মাসে সেই কেরোসিন ১.৫০ টাকা থেকে ২ টাকায় বিক্রি হতে শুরু করে।[১৫০] দ্রব্যমূল্য সাধারণের নাগালের বাইরে চলে গেলে কাছাড় জেলা প্রশাসন নিয়ন্ত্রণে বেশ কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করে। চিনি, লবণ, চাল এর নায্যমূলের দোকান খুলে। কিন্তু তাতে খুব বেশি পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়নি। দ্রব্যমূল্যের এই উর্ধ্বগতি সত্বেও কাছাড়ের সাধারণ মানুষ সাধ্যমত চাল, ডাল, লবণ, শুকনো খাবার ও ঔষধ কিনে পূর্ববঙ্গের রণাঙ্গণের যোদ্ধাদের জন্য পাঠিয়েছেন।

বিপুল সংখ্যক শরণার্থী শিশু আগমনের ফলে দেখা দিয়েছিল বেবিফুডের সংকট।[১৫১] সবকিছুই হাসিমুখে মেনে নিয়েছে বরাকের সাধারণ জনগণ। শরণার্থী শ্রমিকদের কারণে শ্রম বাজারে সংকট দেখা দিয়েছিল। স্থানীয় শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়েছিল। এসব নিয়ে স্থানীয়দের সাথে বিভেদ ছিল স্বাভাবিক বিষয়, কিন্তু অবাক করার বিষয় একাত্তরে এসব খুব স্বাভাবিক ভাবেই মেনে নিয়েছিল বরাকের সাধারণ মানুষ।

শরণার্থীদের আশ্রয় দিতে গিয়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অধিকাংশ স্কুল কলেজ, বিশেষ করে একাত্তরে করিমগঞ্জের অধিকাংশ স্কুল-কলেজ বন্ধ ছিল শরণার্থী আশ্রয়ের কারণে। এপ্রিল, মে এই দুই মাস শিলচরের স্কুল কলেজের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ ছিল।

করিমগঞ্জ জেলায় একাত্তরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা পেছানো হয়েছিল।[১৫২] শুরুর দিকে স্কুলগুলোই ছিল শরণার্থীদের প্রাথমিক আশ্রয়স্থল। সাধারণ মানুষজন স্বাভাবিকভাবেই এটাকে মেনে

নিয়েছিল। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা এই সময় শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেছে। বেশ কয়েকটি মাদ্রাসা ও কলেজ একাত্তরের নয়মাস জুড়ে বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের আশ্রয়স্থল ছিল। শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দির অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। জুনের গ্রীষ্মের ছুটির পর শিলচরের স্কুলগুলো খোলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কারণ ততদিনে সরকারিভাবে বেশ কয়েকটি শরণার্থী ক্যাম্প গড়ে ওঠেছিল। কিন্তু অব্যাহত শরণার্থী আগমনের ফলে সেটা সম্ভব হয়ে উঠেনি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রীষ্মের ছুটি নতুন করে ১৫ দিন বৃদ্ধি করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেওয়া হয় যাতে চা বাগানের নাচ ঘরগুলো শরণার্থীদের থাকার ব্যবস্থা করে স্কুল গুলোকে পুনরায় চালু করা যায়।[১৫৩] আগস্ট মাসে শিলচরের স্কুলগুলো খোলা সম্ভব হলেও করিমগঞ্জের অধিকাংশ স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা পুরোটা সময় বন্ধ ছিল। শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থীরা নিরবেই মেনে নিয়েছিল এই দুর্ভোগ।

শরণার্থীরা বয়ে এনেছিল বেশ কিছু ছোঁয়াছে রোগ। পুরো কাছাড়ে কলেরা মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। জয় বাংলা (চোখ ওঠা) রোগে বিপর্যস্ত হয়েছিল বরাকের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন। বিশেষ করে করিমগঞ্জের সাধারণ মানুষের জন্য এটা ছিল একটি উটকো ঝামেলা। তাদের সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হয়েছে একাত্তরে।

পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে এই ধরনের বৈপরীত্যে শরণার্থীদের সাথে স্থানীয়দের উত্তেজনা তৈরি হওয়াটা ছিল স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু একাত্তরে বরাকে জন্ম নিয়ে ভিন্ন এক সহমর্মিতা আর সহযোগিতার ইতিহাস। বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর চাপে করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, বদরপুর, আর শিলচরের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছিল। স্যানিটেশন, জল সরবরাহ, স্বাস্থ্য পরিসেবা, রেল সেবা মুখোমুখি হয়েছিল কঠিন সমস্যার। পাশাপাশি ছিল নাশকতা আর পাকিস্তানের গেলার ভয়। কিন্তু সবকিছুকে উপেক্ষা করে সাধারণ বরাকবাসী এক গভীর আত্মার বন্ধনে বুকে টেনে নিয়েছিল পূর্ববঙ্গ থেকে আসা লাখো উদ্বাস্তুকে।

কিন্তু কেন? মানবিকতা কি এর একমাত্র কারণ ছিল? নাকি ভাষার আবেগে আকুল হয়েছিল বরাক। লাতু, মহিষাসন থেকে শুরু করে শিলচর, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ, কালিগঞ্জ কিংবা আচিমগঞ্জ সাধারণ মানুষজন থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদ, প্রশাসক, বুদ্ধিজীবী জানতে চেয়েছিল একাত্তরে তাদের এই পাশে দাঁড়ানোর কারণ। নানা জনের উপস্থাপন ছিল ভিন্ন, কিন্তু সবাই এক উত্তরে স্থির। ফেলে আসা দেশের টান আর ভাষা একাত্তরে বরাকে জনযুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরি করেছিল।

একাত্তরে বরাকের কবি শুভ্রশঙ্কর তাই লিখেছেন–

‘তবু সন বার বার

সীমার এপারে ওপারে,

অবাধ ঘুরে ফিরে।

মুখর হই একই ভাষায়,

একই স্বপ্ন একই আশায়,

বাউল ভাটিয়ালী গেয়ে যায়।

এবার মুর্শিদাবাদে নয়,

বুড়ীগঙ্গার তীরে ঢাকায়;

শেষ ফয়সলা চলছে।

পলাশীর প্রায়শ্চিত্য

মিরজাফর জগৎ সেন

ইয়ার লতিফের পাপ,

হাজার বরকত ছালামের রক্তে ধূয়ে গেছে।

শেরে বাংলা শেখ মুজিব,

নব-মোহনলাল স্থিরমদন

ডাইনে বামে প্রতিক্ষা কঠোর।

এবার পলাশীর প্রান্তরে নয়,

সারা বাংলার পথে ও প্রান্তরে

জাতির চূড়ান্ত সংগ্রাম,

মুখের ভাষা বুকের রুধিরে

একাকার।

'জয়বাংলা' এপার ওপার।[১৫৪]

বরাকে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক অতীন দাশকে প্রশ্ন করেছিল, সেদিন কেন সবকিছু উজাড় করে দিয়েছিলেন? তিনি বলছিলেন, 'আমি তো পূর্ববঙ্গের লোক, শেকড়ের টান আমার রক্তে দ্রোহের আগুন জ্বালিয়েছিল।' [১৫৫] শিলচরের আরেকজন সংগঠক তারামনি চৌধুরী উত্তরে বলছিলেন, 'আমি শিলচরের

স্থায়ী বাসিন্দা ষোল পুরুষ ধরে, পূর্ববঙ্গের এই উদ্বাস্তুদের প্রতি আমার আবেগ কাজ করেছিল মানবিকতা থেকে।’[১৫৬]

সুতারকান্দি সীমান্তের কৃষক জলিল মিয়া বলছিলেন, ‘মাইয়্যাগুলা যেভাবে তাদের নির্যাতনের বিবরণ দিয়েছে তাতে কোন মানুষের পক্ষে পাকিস্তানকে সমর্থন করা সম্ভব নয়। তাইতো মুসলিম হওয়ার পরও আমরা পূর্ববঙ্গের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম।’[১৫৭]

হাইলাকান্দির নীতিশ ভট্টাচার্য একাত্তরে *পূর্ব্বায়নে* লিখেছিলেন, ‘এপারে করিমগঞ্জ, ওপারে জকিগঞ্জ মাঝখানে কুশিয়ারার শান্ত জলরাশি। একাত্তর আমাদের এপার-ওপারের ভেদাভেদ ভুলিয়ে একপারে এনে দাঁড় করিয়েছে। আমরা আজ জেগেছি, এই জাগরণ জয় বাংলার জন্য।’[১৫৮]

আসামের বাংলাভাষী কবি এনামুল হক একাত্তরে লিখেছেন–

‘আবার হত্যার ঢেউ বুড়ীগঙ্গা বন্দরে উঠেছে পাড় ভেঙ্গে
শহরের রাজপথে এনেছে প্লাবন এতদূরে নির্ব্বাসনে আছি
তবু এড়ানো গেলো না সে বহ্নির ক্রোধ
বহ্নি জ্বালিয়েছে আমারো হৃদয়।’ [১৫৯]

পূর্ববঙ্গ ছেড়ে আসা সাধারণ বরাকবাসীর আবেগ মূর্ত হয়েছে এনামুল হকের পঙক্তিতে। জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একাত্তরে জয় বাংলার জন্য পথে নেমেছিল বরাকের প্রায় সতের লক্ষ সাধারণ মানুষ। পূর্ববঙ্গের জন্য এই আবেগ, উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি একাত্তরে বরাককে মুখোমুখি হতে হয়েছিল পাকিস্তানি বাহিনীর হামলা ও তাদের সহযোগিদের চোরাগুপ্তা হামলা ও নাশকতার। পাকিস্তানি গোলার আঘাতে বরাকের অনেক বেসামরিক নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন। পঙ্গুত্ব বরণ করেছিলেন অনেকেই। বহু ঘরবাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। শতশত মানুষ বাঁচার তাগিদে গ্রাম থেকে গ্রামে পালিয়ে বেড়িয়েছেন, থেকেছেন নিজ দেশে পরবাসী হয়ে। সেই সময় পাকিস্তানি বাহিনীর বরাকের বেসরকারি নাগরিকদের ওপর হামলার কয়েকটি সংবাদ নিচে তুলে ধরা হল। যেগুলো ১৯৭১ সালে শিলচর, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দির স্থানীয় পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হয়েছিল।

করিমগঞ্জে অবিরত পাকিস্তানি গোলা বর্ষণ

ওপার থেকে মর্টার ও মেশিনগানের সাহায্যে করিমগঞ্জের দিকে পাকিস্তানি গোলাগুলি বর্ষণের ঘটনা অত্যাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ২৪ অক্টোবর সসকালে পাকিস্তানি সৈন্যরা করিমগঞ্জের লাতুর নিকটবর্তী দেওতলী ও মনতলী গ্রামে ৩ ইঞ্চি ব্যাসের মর্টার থেকে প্রচন্ড গুলিবর্ষণ করে। এতে একজন বৃদ্ধা আহত

হয় বলে জানা যায়। রবিবার রাত্রে শহরের নিকটবর্তী টিলাবাজার এলাকায় বহুক্ষণ কুশিয়ারা নদীর অপর তীরে পাকিস্তান থেকে মেশিনগানের গুলিবর্ষণের খবর পাওয়া যায়। কিন্তু কেহ হতাহত হয় নাই। ইতিপূর্বে আরও একদিন শহরের প্রান্ত সীমায়ও দুইটা পাক গুলি এসে পড়ে। ২২ অক্টোবর সকালে করিমগঞ্জ রেল ষ্টেশনে একটা রেল ইঞ্জিন ও অপর দুইটা চলন্ত গাড়ির উপর গোলাবর্ষণ করে, অবশ্য গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। গত এক সপ্তাহ যাবৎ বিভিন্ন স্থানে প্রত্যক দিনই পাক গুলি এসে পড়েছে।[১৬০]

২১ নভেম্বর ১৯৭১ সকালে জকিগঞ্জ থেকে পাক বাহিনীর গোলাবর্ষণে নিহত হয় ৬ জন। ২৬ নভেম্বর *যুগশক্তি* **'করিমগঞ্জ শহরে পাক গোলাবর্ষণে ছয় জনের মৃত্যু' শিরোনামে** লিখেন,

গত ২১ নভেম্বর প্রত্যুষে জকিগঞ্জ থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বিনা প্ররোচনায় করিমগঞ্জ বাজার ও শহরের উপর মর্টার, লাইট মেশিনগান ও রাইফেল থেকে প্রচন্ড গোলাগুলি বর্ষণ করে। দাসপট্টি ও হাদারগ্রামে দু'টি বালিকা, একজন পুরুষ ও একজন মহিলা গোলার আঘাতে নিহত হন। আহতদের মধ্যে দু'টি শিশু পরে মারা যায়। শহরের অন্যান্য অংশেও গোলা ও গুলি বর্ষিত হয়। আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী প্রচন্ড পাল্টা আক্রমণ করে পাক বাহিনীকে স্তব্ধ করে দেয়।

চল্লিশ হাজার অধিবাসী অধ্যুষিত এই শহরের জনসাধারণ প্রচন্ড সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে এই আক্রমণের মোকাবিলা করেন। উভয় তরফের গোলাগুলি বর্ষণের প্রচন্ড শব্দে যখন কান পাতার উপায় ছিল না, তখনও শহরের কোথাও কোনরূপ বিশৃঙ্খলা বা হৈ-হল্লা সৃষ্টি হয় নি। স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ও প্রচার বিভাগও সময়োচিত তৎপরতা এবং যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে শহরবাসীর মনোবল অটুট রাখতে পর্যাপ্ত সাহায্য করেছেন। শহরে অসামরিক প্রশাসন সম্পূর্ণ সচল আছে, এই ধারণা জনসাধারণের মনে আস্থার ভাব সঞ্চার করে। ঐদিন সকাল ছ'টা থেকে দুপুর বারোটা এবং বিকাল চারটা থেকে পর দিন ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কার্ফ্যু জারী করা হয়। পরে কার্ফ্যুর সময়সীমা আরো শিথিল করা হয় এবং এখন শহরে নদীর তীরবর্তী এলাকা ব্যতীত অন্য সমস্ত এলাকায় কার্ফ্যু তুলে নেওয়া হয়েছে। শিলচর থেকে সহকারী জলা শাসক শ্রীতপনলাল বরুয়া ২১ নভেম্বর সকালবেলা করিমগঞ্জ আসেন এবং স্থানীয় এম. এল. এ. ও বিধানসভার ডেপুটি স্পীকার শ্রীরথীন্দ্রনাথ সেন সহ বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন।

শহরে বর্তমান কড়া ব্ল্যাক আউট ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ চালু আছে। কলেজ, অফিস, আদালত একদিনের জন্যও বন্ধ হয়নি। যে সমস্ত বিদ্যালয়ে পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল, সেগুলোর পরীক্ষাগহণও সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে চলছে।

১০ আগষ্ট বাংলাদেশের লাতু-সাবাজপুর এলাকায় পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে মুক্তি ফৌজের যখন প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলছিল, তখন পাকিস্তানি সৈন্যগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত একটা গোলা ভারতীয় গ্রাম লাতুর একটি বাড়িতে পড়ে। ফলে পঙ্কজিনী দেবী নামে ৫৫ বৎসরের একজন মহিলা ঘটনাস্থলেই নিহত হন এবং ঐ একই বাড়ির শ্রীললিত চক্রবর্তী, শ্রীবিজন চক্রবর্তী, শ্রীমতী সুনীতি দেবী ও শ্রীমতী চারু চক্রবর্তী গুরুতরভাবে আহত হন। মুক্তিফৌজ দৃঢ়তার সঙ্গে এই আক্রমণের মোকাবিলা করেন এবং মর্টার দিয়ে পাল্টা আক্রমণ চালান। তীব্র আক্রমণের ফলে সাবাজপুর পাক ঘাঁটিটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ঐ আক্রমণে ৫০ জন পাক সৈন্যকে খতম করে দেওয়া হয় এবং ৬৫ জন পাক সৈন্য গুরুতর আহত হয়। মুক্তিফৌজের ৭ জনও গুরুতর আহত হন। এখন তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। সীমান্তবর্তী ভারতীয় গ্রামে পাক বাহিনীর এই অতর্কিত গোলাবর্ষণের ফলে গ্রামবাসীর মধ্যে দারুণ আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।[১৬১]

২৪ শে মে দুপরে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী করিমগঞ্জ শহরের অদূরবর্তী সুতারকান্দি-জারাপাতা সীমান্ত এলাকায় গুলি করতে করতে ভারতীয় এলাকার এক মাইল ভিতরে অনুপ্রবেশ করে। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর দুইজন এবং পাঁচজন গ্রামবাসী পাকিস্তানি বাহিনীর এক আকস্মিক হামলায় নিহত হন। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর চারজন এবং এবং ছয়জন গ্রামবাসী আহত হয়। তাহা ছাড়া পাক সৈন্য কর্তৃক দুই জন গ্রামবাসীকে অপহরণের সংবাদ পাওয়া যায়। সীমান্তরক্ষী বাহিনী অপ্রস্তুত অবস্থায় প্রথমে কোন সক্ষম প্রতিরোধ তৈরি করিতে ব্যর্থ হন। ফলে কয়েক ঘন্টার জন্য সুতারকান্দি চেক-পোষ্টসহ ভারতীয় সীমান্ত এলাকার কিছু অংশ পাকিস্তানিদের হাতে আসে। এই সময় তাহারা জারাপাতা ও সুতারকান্দির কয়েকটি ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। পরে আসাম পুলিশ ব্যাটেলিয়ানের একটি দল পাল্টা আক্রমণ করে ভারতীয় এলাকা ছেড়ে যেতে পাক সৈন্যদের বাধ্য করে।

করিমগঞ্জ বাংলাদেশ ত্রাণ কমিটির যুগ্ম সম্পাদক শ্রীভুপেন্দ্রকুমার সিনহা, প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও আসামের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তার বার্তাযোগে এই ঘটনার বিবরন জানিয়ে অবিলম্বে করিমগঞ্জের শহর, বাজার ও গ্রাম এলাকার নিরাপত্তা বিধানের যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানানো হয়। তার বার্তায় বলা হয় যে, কুশিয়ারার অপর তীরে জকিগঞ্জ পাক বাহিনীর আক্রমণাত্মক প্রস্তুতির পরিপ্রেক্ষিতে করিমগঞ্জের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইয়াছে। সীমান্তের অধিবাসীদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে এবং সীমান্তবর্তী গ্রাম ছাড়িয়া নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে অনেকেই অন্যত্র চলিয়া যাইতেছেন।[১৬২]

১৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক ৯.৩০ মিনিটের সময় পরাহুরিয়া গাঁও সভার সভাপতি মোঃ নুরুল হক চৌধুরীর বাড়িতে পাক সেনাদের গুলিতে আলেকজান বিবি নামক একজন মহিলা প্রাণ হারান।

ঐ বাড়ির দক্ষিণ দিকের পাকা গৃহটিতে গুলি পড়ায় ঐ গৃহটি নষ্ট হয়ে যায়। কয়েকটি গবাদি পশুও গোলাবর্ষণে প্রাণ হারায়। পুরাহুরিয়া গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী এই অতর্কিত গোলাবর্ষণে আতঙ্কিত হয়ে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন বলে জানা যায়।

১৭ সেপ্টেম্বর সকালে মহিষাসনে পাক সৈন্য কর্তৃক গোলাবর্ষণের সময় স্থানীয় মহকুমা পুলিশ অফিসার শ্রী জি. সি. তামুলী যখন জীপ থেকে নামছিলেন, তখন তাঁর গায়ে আঘাত লাগে। [১৬৩]

১ ডিসেম্বর থেকে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাক গোলাবর্ষণে ভারতের সীমান্তবর্তী গ্রামসমূহে আটজন ভারতীয় নাগরিক নিহত এবং আটজন আহত হয়েছেন। ১ ডিসেম্বর অতর্কিত পাক গোলাবর্ষণে লক্ষীবাজার গ্রামের আবদুল জলিল (২৫), পাণিঘাটের বিলাল উদ্দিন (১০), দেওতলীর খুরশীদ আলী (৬০), উত্তর লাফশাইলের আবদুল কাদির ও ছেরুলভাগের সমির আলী নিহত হন। ৫ ডিসেম্বর সুতারকান্দিতে অতর্কিত পাক গোলাবর্ষণে আবদুল রহমান (১৮), চালিন্দির মহেন্দ্র দাস (৪৫) এবং বসন্ত দাসের (৩০) মৃত্যু ঘটে। ঐদিন বসন্ত দাসের স্ত্রী নিবাসী দাস (১৬) এবং একই পরিবারের বীণা দাস (১২), সুমতি দাস (৪৪) ও সাথী দাস (১৩) গুরুতররূপে আহত হন। ৬ ডিসেম্বর ব্রাহ্মণগুল গ্রামের প্রমোদিনীবালা নাথ এবং ৭ ডিসেম্বর পাকড়িয়া গ্রামের আমিলা বিবি (৯), হাওয়ারীন্নেসা (৩৫) ও জমির আলী (৭০) পাক গোলাবর্ষণে গুরুতর আহত হন।[১৬৪]

ক্রমাগত পাকিস্তানি হামলার মুখে বরাকে পত্রিকা প্রকাশ দুরুহ হয়ে পড়ে । সংক্ষিপ্ত আকারে পত্রিকা প্রকাশের কৈফিয়ত দেন যুগশক্তি। [১৬৫]

বিজ্ঞপ্তি

করিমগঞ্জ শহরের পাকিস্তানি গোলাবর্ষণ এবং শহরে কার্ফ্যু জারী করার জন্যে ছাপাখানার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়ায় এ সংখ্যা 'যুগশক্তি' সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা হল। –কর্মাধ্যক্ষ, যুগশক্তি

সীমান্তে পাকিস্তানি বাহিনীর অব্যাহত আক্রমণ আবার অন্যদিকে বরাকে নাশকতা ও অন্তর্ঘাতীমূলক কার্যকলাপ সমানে চলেছিল একাত্তরে। এসব নাশকতার সাথে জড়িতদের অধিকাংশই শরণার্থীর বেশে বাংলাদেশ থেকে আসা রাজাকার, দালাল। পাশাপাশি স্থানীয় কিছু সহযোগী তারা জুটিয়েছিল। পাকিস্তানপ্রেমী এই সব স্থানীয় ও ছদ্মবেশি শরণার্থীরা একাত্তরে বরাকে রেলসেবাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। ঘটিয়েছিল বেশ কিছু ভয়াবহ নশকতা।

১৫ সেপ্টেম্বর রাত্রি সোয়া এগারটায় করিমগঞ্জ রেল ষ্টেশন থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে ধর্ম্মনগরগামী একটি যাত্রীবাহী ট্রেনের চাকার নীচে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্লাস্টিক বোমার বিস্ফোরণের ফলে লেন্স নায়ক জগদীশ চাঁদের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এবং আরো ১৭ জন গুরুতর আহত হয়। [১৬৬]

ট্রেনটির ছয়টি কামরা লাইনচ্যুত হয় এবং দুইটি কামরা বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ইঞ্জিনের পিছনেই একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরার নিচে এই বিস্ফোরণটি ঘটে। কামরাটির পাটাতনের বেশ কিছু অংশ উড়ে যায়। কামরাটিতে মোট যাত্রী সংখ্যা ছিল ৭০। মৃত ব্যক্তির নাম জানা যায়নি। গুরুতর আহতদের মধ্যে আছেন মিয়ারাম, মাল বাহাদুর তামাং এবং শোভাচান্দ। এই বিস্ফোরণের ফলে রেল লাইনের নীচে প্রায় ৪ ফুট গভীর ও ৫ ফুট বিস্তৃত একটি খাদ সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত ৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রায় ষোল ঘন্টা এই লাইনে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে লাইনটিকে সারিয়ে ফেলেন।[১৬৭]

২৬ জুলাই সোমবার বিকাল বেলা ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চল লাতু গাঁও সভার অন্তর্গত গনুক গ্রামের আছাদ উদ্দিনের (করিমগঞ্জ কলেজের ছাত্র) বাড়িতে একটি বোমা বিস্ফোরণে ঘরের চাল উড়িয়া যায়, আছাদ উদ্দিনের দুই ভাইসহ ৫ জন ঘটনাস্থলে মারা যান। ৫ জন আহত অবস্থায় করিম করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে ভর্তি হয়। তন্মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় অস্ত্রোপাচারের জন্য তাহাকে শিলচর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এই বিস্ফোরণের ঘটনায় এতদঞ্চলে গভীর বিস্ময়ের সঞ্চার হইয়াছে। গন্ধক, কুরিখালা, হাড়িঘাট. কেওতলা এই চারটা গ্রাম সম্পূর্ণভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকা। গন্ধক গ্রাম ভারত সীমান্তে অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকা। ইহার পশ্চিমে ধানক্ষেতের মাঠ ও ও বাংলাদেশ। গন্ধক গ্রাম সবদিক হইতেই সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।[১৬৮]

সাধারণের পাশাপাশি ভারতীয় সেনা বাহিনী ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনীরকেও মুখোমুখি হতে হয় শক্ত প্রতিরোধের। মুক্তিযুদ্ধের অংশ না হয়েও ভিন্ন একটি দেশের একটি সীমান্তবর্তী জেলা জড়িয়ে পড়ে মুক্তির সংগ্রামে। পাকিস্তানি আক্রমণ থেকে বরাক রক্ষায় প্রাণ দেন তিন ভারতীয় সেনা মেজর চমন লাল, ভকত সিংহগুরু ও দীন নাথ।[১৬৯]

তিন জোয়ান প্রাণ দিয়ে শহর রক্ষা করে গেলেন

গত ২১ শে নভেম্বর পাক সেনারা যখন করিমগঞ্জ শহর এলাকা আক্রমণ করে বসে তখন তিনজন ভারতীয় জোয়ান তাদের প্রাণের বিনিময়ে শহরটিকে রক্ষা করে যান। পাকসেনারা শহরকে লক্ষ্য করে যখন কামানের গোলা ছোঁড়তে থাকে তখন ডাকবাংলোর সামনে দাঁড়িয়ে মেজর চমন লাল, সাব-ইন্সপেক্টর

ভকত সিংহগুরু, গার্ডম্যান দীন নাথ পাকসেনাদের সমুচিত প্রত্যুত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন। পাক মেশিনগানের গুলি তিনজনকেই গুলি বিদ্ধ করে দিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তিনজনকেই প্রাণ হারাতে হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শহরটা রক্ষা পায়।

হাঁটুতে গুলি লেগে অজস্র ধারায় রক্ত ঝরতে থাকলেও মেজর চমনলালকে ক্ষান্ত করে কার সাধ্য? গুলি করতে করতে এক সময় তাঁর প্রাণ বায়ু বেরিয়ে যায়। ঐদিনই মেজর চমনলালের ছোটভাই এর বিয়ে ছিল। এবং তিনি ঘটনার কিছুক্ষণ পূর্বে শুভেচ্ছা জানিয়ে ছোটভাইকে তারবার্ত্তা প্রেরণ করেন।

নারীশক্তি সঙ্ঘ ও ইয়ুথকোরের উদ্যোগে ডাকবাংলোর সামনেই এই তিন বীর শহীদের উদ্দেশ্যে একটা শহীদ বেদী তৈরি করা হয়েছে। শতশত করিমগঞ্জবাসী রোজ সেখানে উপস্থিত হয়ে এই বার শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে যাচ্ছেন।

সীমান্তপারের সাধারণ মানুষজন আতঙ্কে অস্থিরতায় দিশেহারা হয়। সকল সরকারি অফিস বন্ধ হয়ে যায়। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রেল কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। সীমান্তে জারি করা হয় সান্ধ্য আইন।[১৭০]

কাছাড় সীমান্তে সান্ধ্য আইন

সীমান্ত জুড়িয়া যে সান্ধ্যে আইন জারী করা হইয়াছিল। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তাহা আরও দুই মাস বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

সম্ভাব্য বিমান আক্রমনের ভয়ে শহর নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়। সিভিল ডিফেন্সের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করা হয়। বিমান আক্রমনে করণীয় সম্পর্কে সাধারণকে সজাগ রাখতে সরকার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়।[১৭১]

বিমান আক্রমণের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য ব্যবস্থা আপনি গ্রহণ করিয়াছেন কি?

১. বিপদসূচক সাইরেন সঙ্কেত শুনিলে যথারীতি নয়মসমূহ পালন করুন।
২. প্রত্যেক বাড়িতে ট্রেঞ্চ খনন করুর এবং অন্যান্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
৩. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখুন।
৪. নাশকতামূলক কার্য্যনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে সর্বদা সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন ও প্রয়োজনবোধে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

৫. মিথ্যা গুজবে কান দিবেন না, ভীত হইবেন না ও মনোবল অক্ষুন্ন রাখুন।

৬. প্রয়োজনে কন্ট্রোলরুম টেলিফোন নং ৪৪ করিমগঞ্জ যোগাযোগ করুন।

অবস্থা পর্যবেক্ষণে একাধিকবার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবনরাম, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মইনুল হক চৌধুরী, ত্রিগুনা সেন সীমান্ত পরিদর্শন করেন। সাধারণ লোকজনকে অভয় দেন। পাকিস্তানি বাহিনী সুতারকান্দি সীমান্ত থেকে এক কিলোমিটার ভেতরে এসে আক্রমণ শুরু করে।

এতসব অস্থিরতার মধ্যে, যুদ্ধের মধ্যে ভিন্ন একটি দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সমর্থন ইতিহাসে বিরল। বরাকের সাধারণ মানুষ নিভৃতে সামলিয়েছে একাত্তরে সেই বিক্ষুব্ধ সময়। শিলচর শহরের মধুরবন্দ কবরস্থানে একাত্তরে সমাহিত করা হয়েছিল তিন অজানা শহীদকে। সেলিনা হোসেনের ‘নির্ভয় করো হে’ বরাক উপত্যকা বিষয়ক প্রবন্ধে এ বিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায়। আগস্টের শুরুতে এই তিনজনকে রণাঙ্গন থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় শিলচর সিভিল হাসপাতালে আনা হয়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তারা মারা যান। তাদের জানাজায় প্রচুর সাধারণ লোক সমবেত হয়েছিল।[১৭২]

বরাক উপত্যকায় মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় একাত্তর সম্পৃক্ত যাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি তাদের অনেকের সুস্পষ্ট দাবি, বরাকের স্থানীয় মুসলমানরা একাত্তরে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিরোধিতা করেছিল। শরণার্থী ত্রাণে কিংবা সহায়তায় স্থানীয় মুসলমানদের কোন ধরনের সম্পৃক্ততা ছিল না, এটা অনেকেই উল্লেখ করেছেন। একাত্তরে বরাক অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক অতীন দাস, নীতিশ ভট্টাচার্য, নীশিত রঞ্জন দেসহ অনেকেই বলেছেন, সহায়তা করাতো দূরের কথা, স্থানীয় মুসলমানরা বরাকে একাত্তরে অস্থিরতা সৃষ্টিতে ইন্ধন দিয়েছেন। একাত্তরে বরাকে ধারাবাহিক নাশকতার ঘটনা, রেলে বিশৃঙ্খলা, বোমা ফাটানো তাদের কথার সত্যতা তুলে ধরে। বরাকের বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরোধিতার মুখে কীভাবে তিন লক্ষাধিক শরণার্থী এখানে আশ্রয় পেল, এমন প্রশ্ন রেখেছিলাম অনেকের কাছে। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী করিমগঞ্জতো পুরোটাই মুসলিম অধ্যুষিত, তাহলে করিমগঞ্জে একাত্তরে কীভাবে শরণার্থী ক্যাম্পের পাশাপাশি প্রত্যেকটি বাড়িতে পূর্ববঙ্গের লোক আশ্রয় পেয়েছিল। করিমগঞ্জ কলেজের ইতিহাস বিভাগের সদ্য প্রয়াত অধ্যাপক কামাল উদ্দিন এর কাছে জানতে চেয়েছিলাম এই সব অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর। অনেক মুসলমানদের বিরোধিতার কথা তিনি স্বীকার করে বলছিলেন, ‘একাত্তর বরাকের ইতিহাসে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। একাত্তরের আগে এখানকার মুসলমানরা পাকা বাড়ি, পাকা টয়লেট তৈরি করেননি। তারা ভাবত যে কোন সময় তারা পাকিস্তানের সাথে সংযুক্ত কিংবা তারা মুসলিমপ্রধান পূর্ববঙ্গে

স্থায়ী হবে। ভারতে অনেকেই তাদের অবস্থান নিয়ে শঙ্কিত ছিল, অনেকেই অসন্তুষ্ট ছিল। একাত্তর এই শঙ্কিত ও অসন্তুষ্ট বরাকের মুসলিম জনগণের সামনে একটি শিক্ষা নিয়ে উপস্থিত হয়। শঙ্কিত বরাকবাসী উপলব্ধি করেন, শংকার মধ্যেই তাকে বরাকে স্থায়ী হতে হবে, আর যাদের পাকিস্তানের প্রতি মোহ ছিল, সেসব অসন্তুষ্ট বরাকবাসী বুঝতে পারেন, ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান আসলে ন্যায্যতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। তাই শুরুর দিকে মুসলমানদের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ না থাকলেও একসময় বরাকের অধিকাংশ মুসলমান পূর্ববঙ্গের পাশে এসে দাঁড়ায়।[১৭৩]

ইমাদ উদ্দিন বুলবুল কিংবা করিমগঞ্জের সিনিয়র সাংবাদিক মুজিব স্বদেশী, একাত্তরে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানো তারামনি চৌধুরী, মুজাম্মিল আলীসহ বরাকের অনেকের সাথে কথা বলে আমার মনে হয়েছে, মুসলমানদের ঢালাও সমালোচনার সত্যিকার ভিত্তি নেই। একাত্তরে বরাক থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর পাতায় পাতায় মুসলমান দোকানদার, ব্যবসায়ী, গৃহস্থের সহায়তার সংবাদ। মুসলিমপ্রধান অঞ্চলগুলোতে বাংলাদেশের সমর্থনে মিছিল, মিটিং ও সহায়ক সমিতি গঠন মূলত একাত্তরে বরাকের হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে পূর্ববঙ্গের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। প্রান্তিক বেশ কিছু মুসলিম শুরুতে দ্বিধান্বিত ছিল, কিন্তু একসময় তারা প্রকৃত সত্য বুঝতে পেরে বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়ান। ছদ্মবেশী শরণার্থীরা মূলত কিছু গোঁড়া মুসলিমদের সহায়তায় একাত্তরে বরাকে নাশকতা চালিয়েছিল।

তথ্য নির্দেশিকা

১. তরুণ দাস, 'প্রসঙ্গ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-কিছু স্মৃতি কিছু কথা', *দৈনিক যুগশঙ্খ*, শিলচর, ১৯ নভেম্বর ২০১৩

২. সাক্ষাৎকার, অতীন দাশ (মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, প্রখ্যাত সাংবাদিক), শিলচর, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

৩. গণেশ দে, 'স্বীকৃতি বিলম্বিত কেন?' *সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত*, করিমগঞ্জ, ১৯ মে ১৯৭১

৪. প্রাগুক্ত

৫. ইমাদ উদ্দিন বুলবুল, ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বরাকবাসীর অবদান’, (আজমল হোসেন মজুমদার সম্পা., *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বরাক উপত্যাকার অবদান*), শিলচর, ২০১৩, পৃ. ৩৩

৬. সাক্ষাৎকার, অধ্যাপক দিলীপ দাশ (শিলচর বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির অন্যতম সদস্য ও শিক্ষক নেতা), শিলচর, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

৭. পরিতোষ পাল চৌধুরী, ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধঃ কিছু জানা-অজানা তথ্য’, (*বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বরাক উপত্যাকার অবদান*), পৃ. ২৫

৮. *সাপ্তাহিক আজাদ*, শিলচর, ১৬ এপ্রিল ১৯৭১

৯. সাক্ষাৎকার, অধ্যাপক কামালুদ্দীন আহমেদ (সাবেক অধ্যাপক, করিমগঞ্জ সরকারি কলেজ ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক), করিমগঞ্জ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

১০. বাংলাদেশ ত্রাণ কমিটি, *করিমগঞ্জের ত্রাণ দাতাদের তালিকা*, কমিটির সম্পাদক ভূপেন্দ্রকুমার সিংহের বড় ছেলে মানস কুমার সিনহার সৌজন্যে প্রাপ্ত, বিবি- পরিশিষ্ট-১

১১. আবদুর রহমান, ‘একাত্তরে করিমগঞ্জে’, স্মরণিকা ১৯৯২, সবুজ সংঘ ক্লাব, মৌলভীবাজার , সিলেট

১২. *সাপ্তাহিক অরুণোদয়*, শিলচর, ২৬ এপ্রিল ১৯৭১

১৩. *সাপ্তাহিক পূর্ব্বায়ন, হাইলাকান্দি*, ১৪ এপ্রিল ১৯৭১

১৪. *সাপ্তাহিক যুগশক্তি*, করিমগঞ্জ, ১৬ এপ্রিল ১৯৭১

১৫. *প্রচারপত্রটি* ইমাদ উদ্দিন বুলবুল কর্তৃক আজাদ প্রেস শিলচর-১ থেকে প্রকাশিত, ইমাদ উদ্দিন বুলবুলের সৌজন্যে এটি সংগৃহীত

১৬. অতীন দাশ, ‘বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে কাছাড় ও বরাকের যোগদান’, (আজমল হোসেন মজুমদার সম্পা.), পৃ. ১০

১৭. ইমাদ উদ্দিন বুলবুল, ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বরাকবাসীর অবদান’, (আজমল হোসেন মজুমদার সম্পা.), পৃ. ৩১

১৮. সাক্ষাৎকার, কামালুদ্দীন আহমেদ

১৯. মনোজ অধিকারি, ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল দিনগুলোতে’, সমকাল, বর্ষ ১, সংখ্যা ১, করিমগঞ্জ, পৃ. ১৬

২০. পরিতোষ পাল চৌধুরী, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধঃ কিছু জানা-অজানা তথ্য, পৃ. ২৫*

২১. *সাপ্তাহিক আজাদ*, শিলচর, ২৭ আগস্ট ১৯৭১

২২. সাক্ষাৎকার, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, হাইলাকান্দি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

২৩. *সাপ্তাহিক যুগশক্তি*, ১৮জুন ১৯৭১

২৪. সাক্ষাৎকার, অজিত দাশ (রাজ্য বিদ্যুৎ পরিষদের সাবেক কর্মচারি), শিলচর, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

২৫. *সাপ্তাহিক পূর্ব্বায়ন*, ৫ মে ১৯৭১

২৬. *সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত*, ২৪ জুলাই ১৯৭১

২৭. *সাপ্তাহিক যুগশক্তি*, ০৬ আগস্ট ১৯৭১

২৮. প্রাগুক্ত

২৯. সাক্ষাৎকার, অজিত দাশ

৩০. *সাপ্তাহিক যুগশক্তি*, ১১জুন ১৯৭১

৩১. *সাপ্তাহিক যুগশক্তি*, ১৮ জুন ১৯৭১

৩২. প্রাগুক্ত

৩৩. *সাপ্তাহিক যুগশক্তি*, ৮ অক্টোবর ১৯৭১

৩৪. *সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত*, ১৯ মে ১৯৭১

৩৫. *সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত*, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১

৩৬. *সাপ্তাহিক যুগশক্তি*, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১

৩৭. *সাপ্তাহিক যুগশক্তি*, ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭১

৩৮. সাক্ষাৎকার, দিলীপ দাশ

৩৯. *সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত*, ১৯ মে ১৯৭১

৪০. *সাপ্তাহিক পূর্ব্বায়ন*, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

৪১. *সাপ্তাহিক যুগশক্তি*, ২৩ অক্টোবর ১৯৭১

৪২. *সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত*, ১৯ নভেম্বর ১৯৭১

৪৩. *দৈনিক* যুগান্তর, কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ১৯৭১

৪৪. *সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত*, ১৬ জুন ১৯৭১

৪৫. অতীন দাশ, পৃ. ১৪

৪৬. *সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত*, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

৪৭. সাক্ষাৎকার, রেণুকা পাল, লাতু, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

৪৮. সাক্ষাৎকার, মোহন মিয়া, করিমগঞ্জ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

৪৯. *সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত*, ১৪ এপ্রিল ১৯৭১

৫০. সাপ্তাহিক *পূর্ব্বায়ন*, ৩১ মার্চ ১৯৭১

৫১. প্রাগুক্ত

৫২. *সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত*, ৩১ মার্চ ১৯৭১

৫৩. *সাপ্তাহিক যুগশক্তি* ২ এপ্রিল ১৯৭১

৫৪. প্রাগুক্ত

পূর্ববঙ্গের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে করিমগঞ্জে হরতাল ও জনসভা

গত ২৮ মার্চ রবিবার করিমগঞ্জ জেলা যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে স্থানীয় হাই মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় পূর্ববঙ্গের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন জানানো হয়। শ্রীনলিনীকান্ত দাস উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। শ্রীসুরেশচন্দ দেব এম. পি, শ্রীনৃপতি চৌধুরী, শ্রী আবদুল রউফ চৌধুরী, শ্রী আবদুল বাছিত চৌধুরী, শ্রীসতু রায় প্রভৃতি বক্তারা পূর্ববঙ্গের জঙ্গী শাসকদের বর্বরতার তীব্র নিন্দা করেন এবং শেখ মুজিবুরের নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আন্তরিক সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। ২৯ মার্চ করিমগঞ্জে সর্বাত্মক হরতাল সাফল্যের সহিত পালিত হয়। ঐদিন বিকালে ছাত্র ফেডারেশন, কলেজ ইউনিয়ন প্রভৃতির উদ্যোগে আয়োজিত এক সভায়ও পূর্ববঙ্গের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানানো হয়। স্থানীয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টুডেন্টস সোসাইটি এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামীদের প্রতি তাহাদের আন্তরিক সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছেন।

৫৫. *সাপ্তাহিক অরুণোদয়*, ৩০ মার্চ ১৯৭১

৫৬. *সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত*, ১৪ এপ্রিল ১৯৭১

৫৭. প্রাগুক্ত

৫৮. *সাপ্তাহিক যুগশক্তি*, ৩১ মার্চ ১৯৭১

৫৯. *সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত*, ৩১ মার্চ ১৯৭১

৬০. প্রাগুক্ত

৬১. *সাপ্তাহিক পূর্ব্বায়ন, ২৮ এপ্রিল* ১৯৭১

৬২. *সাপ্তাহিক অরুণোদয়, ৬ এপ্রিল* ১৯৭১

৬৩. *সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত*, ৩১ মার্চ ১৯৭১

৬৪. *দৈনিক গতি, শিলচর, ২৯ এপ্রিল* ১৯৭১

৬৫. *সাপ্তাহিক যুগশক্তি*, ৩০ জুন ১৯৭১

৬৬. *সাপ্তাহিক যুগশক্তি*, ২৩ এপ্রিল ১৯৭১

৬৭. *সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত*, ১৪ এপ্রিল ১৯৭১

৬৮. প্রাগুক্ত

৬৯. প্রাগুক্ত

৭০. *সাপ্তাহিক যুগশক্তি*, ৩১ মার্চ ১৯৭১

৭১. *সাপ্তাহিক যুগশক্তি*, ৬ অক্টোবর ১৯৭১

৭২. সাপ্তাহিক যুগশক্তি, ২৩ এপ্রিল ১৯৭১

৭৩. *দৈনিক গতি, শিলচর, ২৯ এপ্রিল* ১৯৭১

৭৪. সাপ্তাহিক যুগশক্তি, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

৭৫. *সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত*, ১৩ মে ১৯৭১

৭৬. সাপ্তাহিক অরুণোদয়, ৩০ মার্চ ১৯৭১

৭৭. সাপ্তাহিক অরুণোদয়, ২৪ জুন ১৯৭১

৭৮. আবদুস সাত্তার (সম্পা.), *করিমগঞ্জ কলেজ স্মরণিকা*, ১৯৭৬, করিমগঞ্জ, পৃ ৪৮

৭৯. *সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত*, ২৫ জুন ১৯৭১

৮০. *প্রাগুক্ত*

৮১. *সাপ্তাহিক যুগশক্তি*, ১৮ নভেম্বর ১৯৭১

৮২. *সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত*, ১৪ এপ্রিল ১৯৭১

৮৩. *সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত*, ২৬ জুন ১৯৭১

৮৪. সাক্ষাৎকার, তরুণ দাস, করিমগঞ্জ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

৮৫. সাক্ষাৎকার, রাধারমন, মহিষাসন, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

৮৬. *সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত*, ৭ এপ্রিল ১৯৭১

৮৭. অতীন দাশ, পৃ. ১২

৮৮. সাক্ষাৎকার, মানস সিনহা (*দৃষ্টিপাত* পত্রিকার সম্পাদক ভুপেন্দ্র কুমার সিংহের ছেলে), ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

৮৯. অতীন দাশ, পৃ. ১২

৯০. প্রাগুক্ত

৯১. তরুণ দাস, প্রসঙ্গ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-কিছু স্মৃতি, কিছু কথা

৯২. সাক্ষাৎকার, আবদুল বাসিত, সুতারকান্দি, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

৯৩. *সাপ্তাহিক যুগশক্তি*, ১৯ মে ১৯৭১

৯৪. *সাপ্তাহিক যুগশক্তি*, ১৯নভেম্বর ১৯৭১

৯৫. সাক্ষাৎকার, অনিমা দত্ত (নিবেদিতা সংঘের একজন সংগঠক), শিলচর, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

৯৬. সাক্ষাৎকার, সত্য নারায়ন, *(একাত্তরের একজন কবিয়াল)*, মহিষাসন, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

৯৭. রাইমোহন দেব নাথ, *জয় বাংলার হত্যাকাণ্ডের কবিতা*, কাছাড়, ১৯৭১

৯৮. দিগেন্দ্র কুমার দাস, *মুক্তি সংগ্রামে জয় বাংলার কবিতা*, বাংলাদেশ ত্রাণ কমিটি, উদারবন্দ, ১৯৭১

৯৯. মোঃ আবু বক্কর, *বিংশ শতাব্দীর এজিদ ইয়াহিয়া খান ও ভূট্টর বর্বরতায় লক্ষ লক্ষ শহীদের কবিগান*, টাউন প্রেস, শিলচর, ১৯৭১

১০০. প্রাগুক্ত, পৃ .৪

১০১. অতুল চন্দ্র দাস, *জয় বাংলার কবিতা*, মিনার্ভা প্রেস, করিমগঞ্জ, ১৯৭১

১০২. শেখ জমির আলী, *বাংলাদেশের কবিতা*, আল আমিন ইলেকট্রিক প্রিন্টিং প্রেস, সিলেট, ১৯৭১

১০৩. অশ্বিনী সম্পর্কে আমি বিস্তারিত জানতে পারি অধ্যাপক অমলেন্দু দের কাছে

১০৪. সাক্ষাৎকার, অধ্যাপক অমলেন্দু দে, শিলচর, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

১০৫. *সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত*, ১৩ মে ১৯৭১

১০৬. সাপ্তাহিক *পূর্ব্বায়ন, ৮জুন ১৯৭১*

১০৭. সাপ্তাহিক *পূর্ব্বায়ন, ১৫ জুন ১৯৭১*

১০৮. *সাপ্তাহিক অরুণোদয়*, ২৬ আগস্ট ১৯৭১

১০৯. সুখেন্দু সেন, *শরণার্থী'*৭১, সময়, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৬১-৬২

১১০. সাক্ষাৎকার, নীতিশ ভট্টাচার্য, হাইলাকান্দি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

১১১. সুখেন্দু সেন, 'ঝরা পাতার পাণ্ডুলিপি', *দৈনিক সুনামগঞ্জের খবর*, সিলেট, ২৫ মার্চ ২০১৬

১১২. *সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত*, ৮ আগস্ট ১৯৭১

১১৩. সাক্ষাৎকার, কামাল উদ্দিন আহমেদ

১১৪. সাক্ষাৎকার, আসমা খাতুন, শিলচর, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

১১৫. *সাপ্তাহিক আজাদ*, ২৩ জুলাই ১৯৭১

১১৬. প্রাগুক্ত

১১৭. সাপ্তাহিক *পূর্ব্বায়ন, ১০ আগস্ট ১৯৭১*

১১৮. *দৈনিক যুগশঙ্খ*, শিলচর, ০৭ মার্চ ২০০১

১১৯. অতীন দাশ, পৃ. ১০-১১

১২০. সাক্ষাৎকার, নিশীত রঞ্জন দাশ, হাইলাকান্দি, ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

১২১. সাক্ষাৎকার, মণিজেন্দ্র শ্যাম, শিলচর, ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

১২২. অতীন দাশ, পৃ. ১৩

১২৩. *সাপ্তাহিক আজাদ*, শিলচর, ২৪ মে ১৯৭১

১২৪.   সাপ্তাহিক *পূর্ব্বায়ন, হাইলাকান্দি,* ২৬ মে ১৯৭১

১২৫.   প্রাগুক্ত

১২৬.   সাপ্তাহিক *পূর্ব্বায়ন*, হাইলাকান্দি, ১৬ জুন ১৯৭১

১২৭.   সুখেন্দু সেন, *ঝরাপাতার পাণ্ডুলিপি*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৭, পৃ ১১৫

১২৮.   *সাপ্তাহিক অরুণোদয়*, শিলচর, ২২ ডিসেম্বর ১৯৭১

১২৯.   *সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত*, করিমগঞ্জ, ০৫ মে ১৯৭১

১৩০.   সাক্ষাৎকার, কামালুদ্দীন আহমেদ

১৩১.   সাক্ষাৎকার, রহমান ফিরোজ, লাতু, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

১৩২.   সাপ্তাহিক *পূর্ব্বায়ন, হাইলাকান্দি,* ১৮ আগস্ট ১৯৭১

১৩৩.   সাক্ষাৎকার, মণিজেন্দ্র শ্যাম

১৩৪.   প্রাগুক্ত

১৩৫.   প্রাগুক্ত

১৩৬.   প্রাগুক্ত

১৩৭.   *সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত*, করিমগঞ্জ, ১৬ এপ্রিল ১৯৭১

১৩৮.   প্রাগুক্ত

১৩৯.   *সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত*, করিমগঞ্জ, ৫ নভেম্বর ১৯৭১

১৪০.   সুনীল রায়, ''৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে বরাক উপত্যাকার অবদান', (*বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বরাক উপত্যাকার অবদান*), পৃ. ৪৯

১৪১.   প্রাগুক্ত

১৪২.   সাক্ষাৎকার, আবদুর রহমান, বদরপুর, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

১৪৩.   *সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত*, করিমগঞ্জ, ১৯ মে ১৯৭১

১৪৪.   *সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত*, করিমগঞ্জ, ৭ জুলাই ১৯৭১

১৪৫.   প্রাগুক্ত

১৪৬.   মৃন্ময় রায়, পটভূমি, বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, ২৭তম *অধিবেশন স্মরণিকা*, শিলচর, ভারত, পৃ-৬১

১৪৭.   বিবি: করিমগঞ্জ, শিলচর ও হাইলাকান্দি থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলো

১৪৮.   সাপ্তাহিক *পূর্ব্বায়ন*, ২৮ এপ্রিল ১৯৭১

১৪৯.   *সাপ্তাহিক যুগশক্তি*, ১০ জুন ১৯৭১

১৫০. *অরুণোদয়*, ১৭ জুন ১৯৭১

১৫১. বেবিফুডের সংকট নিয়ে একাধিক পত্রিকা সেসময় সংবাদ করেন

১৫২. সাক্ষাৎকার, দিলীপ দাশ

১৫৩. *সাপ্তাহিক যুগশক্তি*, ৬ অক্টোবর ১৯৭১

১৫৪. শুভ্রশঙ্কর, 'পলাশীর প্রান্তরে নয়, বুড়িগঙ্গার তীরে ঢাকায়', পূব্বায়ন, ২৪ মার্চ ১৯৭১

১৫৫. সাক্ষাৎকার, অতীন দাশ

১৫৬. সাক্ষাৎকার, তারামনি চৌধুরী

১৫৭. সাক্ষাৎকার, জলিল মিয়া

১৫৮. সাপ্তাহিক *পূর্ব্বায়ন*, ২৩ জুন ১৯৭১

১৫৯. সাপ্তাহিক *পূর্ব্বায়ন*, ২৮ জুলাই ১৯৭১

১৬০. সাপ্তাহিক যুগশক্তি, ২৭ অক্টোবর ১৯৭১

১৬১. *সাপ্তাহিক যুগশক্তি*, ১৩ আগস্ট ১৯৭১

১৬২. *সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত, ২৮ মে ১৯৭১*

১৬৩. সাপ্তাহিক যুগশক্তি, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

১৬৪. *সাপ্তাহিক যুগশক্তি*, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১

১৬৫. *সাপ্তাহিক যুগশক্তি*, ২৬ নভেম্বর ১৯৭১

১৬৬. *সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত*, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

১৬৭. *সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত*, ১৪ আগস্ট ১৯৭১

১৬৮. *সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত*, ২৮ জুলাই ১৯৭১

১৬৯. *দৈনিক যুগান্তর*, কলকাতা, ৩ নভেম্বর ১৯৭১

১৭০. প্রাগুক্ত

১৭১. *সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত*, ৩ নভেম্বর ১৯৭১

১৭২. সাক্ষাৎকার, ইমাদ উদ্দিন বুলবুল

১৭৩. সাক্ষাৎকার, কামালুদ্দীন আহমেদ

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধে মেঘালয়ের সাধারণ মানুষ

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের বিশস্ত ও অকৃত্রিম বন্ধুতে পরিণত হয়েছিল মেঘালয়।[১] একদিকে আশ্রয় দিয়েছে বিপুল শরণার্থীকে, অন্যদিকে একাত্তরের মেঘালয় পরিণত হয়েছিল মুক্তিফৌজের প্রশিক্ষণের অন্যতম কেন্দ্রে। সীমান্তবর্তী এই মনোরম রাজ্যটি বহুমুখী সম্পৃক্ততায় একাত্তরে বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। সীমান্তবর্তী অন্য রাজ্যগুলোর মতো মেঘালয়ের সাধারণ নাগরিকরাও সম্পৃক্ত হয়েছিল এই প্রক্রিয়ায়। একাত্তরে বৃহত্তর সিলেট ও ময়মনসিংহের উত্তর দিকের মানুষ জীবন বাঁচাতে আশ্রয় নেন মেঘালয়ের পাহাড়গুলোতে। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে গড়ে ওঠে শরণার্থী ক্যাম্প।[২] বাংলাদেশকে ঘিরে রাখা ভারতের অন্য প্রদেশগুলো থেকে কিছুটা ভিন্ন মেঘালয়। এটা খাসিয়াদের রাজ্য, যার সঙ্গে বাঙালিদের ভাষা ও আচরণগত ফারাক অনেক। এরপরও উদ্বাস্তু শরণার্থীদের জন্য সহমর্মিতার হাত বাড়িয়েছিল স্থানীয় খাসিয়ারা। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা কিংবা আসামের বরাক উপত্যকায় নাগরিক সহায়তার প্রকৃতি বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাঙালি হওয়ার কারণে শরণার্থীরা সাধারণের সহমর্মিতা পাচ্ছে। মুখের ভাষা ও পূর্ববঙ্গের স্মৃতিতে মানুষ উদ্বেলিত হচ্ছে, কিন্তু মাঠপর্যায়ের গবেষণায় আমার সেই সাধারণীকরণের সরল সমীকরণে বাধা হয়ে দাঁড়ায় মেঘালয়। মেঘালয়ের বাঙালিরা, যারা মূলত ৪৭ এর দেশভাগের পর সিলেট থেকে মেঘালয়ে এসেছে তারা যেমন শরণার্থীদের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে, অনুরুপভাবে স্থানীয় বিপুল সংখ্যক আবাঙালিরাও হাত বাড়িয়ে ছিল সহমর্মিতার।[৩]

একাত্তরে শিলং এ অক্সফাম জিবির এক সুইডিশ কর্মকর্তা শরণার্থী সহায়তায় কাজ করতেন। তার টিমে একাত্তরে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছিলেন স্থানীয় তরুণ অমর সিংহ। বলছিলেন সেই অস্থির

সময়ের কথা। 'শুধু বাঙালিরা নয়, অনেক আবাঙালি ভারতীয়রাও সাহায্য করেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে, শীতের সময় বাঙালি-অবাঙালি সবাই মিলে শীতের পোশাক, কম্বল দিয়ে শরণার্থীদের সহায়তা করেছিল, ট্রাক ভর্তি করে সেইসব মালামাল আমি নিয়ে যেতাম ক্যাম্পে।'[৪] মেঘালয়ের বালাট ও ডাউকি একাত্তরে পরিণত হয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একটি অন্যতম কেন্দ্রে। এই দুটি সীমান্ত দিয়ে হাজার হাজার শরণার্থী প্রবেশ করেছিল এপ্রিলের শুরু থেকে। একাত্তরে বাংলাদেশের সমর্থনে মিছিল, মিটিং এ মুখর ছিল মেঘালয়। বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবিতে, শরণার্থীদের সহায়তায় শিলং, ডাউকি, বালাটে পালন করা হয়েছে বনধ, অবরোধ, অনশন।

১ এপ্রিল ১৯৭১ বাংলাদেশে পাকিস্তানি গণহত্যা ও বর্বরতার প্রতিবাদে শিলংয়ের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী রাজধানীতে শোভাযাত্রা বের করেন।[৫] শোভাযাত্রাটি রাজধানীর প্রধান সড়কগুলো প্রদিক্ষিণ শেষে আসাম বিধান সভার সামনে এক প্রতিবাদী সমাবেশে সমবেত হয়। প্রায় এক ঘণ্টা চলে এই প্রতিবাদি সমাবেশ। সেই সময় বিধানসভার অধিবেশন চলছিল। অধিবেশনে অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির অনুরোধ জানানো হয় ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে। পাশাপাশি বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধে ভারতের সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশ প্রবেশের অনুরোধ জানানো হয়।

পুলিশ বাজারে এপ্রিলের মাঝামাঝি এক ছাত্র সমাবেশে ঘাতক ভুট্টোর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।[৬] মেঘালয়ে আগত শরণার্থীদের সহায়তা ও সাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২৬ জুন ১৯৭১ শিলং কলেজে বাংলাদেশ বিষয়ক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মেঘালয় বিধানসভার স্পীকার রাধন সিং লিংডো। বাংলাদেশের নেতা আবদুল মোনতাকিম চৌধুরী, ব্যারিস্টার এম.এন. এ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে শরণার্থী যুবক মাত্রই সামরিক শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও সীমাবদ্ধ সুযোগ সুবিধার জন্য তাদের প্রত্যেককে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ শিবিরগুলোতে পাঠানো যাচ্ছে না। তবে ক্রমশই তারা এই প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠছেন। শরণার্থীদের সমস্যার প্রতি তিনি মেঘালয়বাসীর সহানুভূতি প্রার্থনা করেন এবং স্মরণ করিয়ে দেন যে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে সব শরণার্থীরাই স্বদেশে ফিরে যাবেন। বাংলাদেশের অপর নেতা রৌনক চৌধুরী বলেন যে বিভিন্ন রণাঙ্গনে নিজ শক্তি অটুক রেখে হানাদারদের নিপাত করার কৌশল খুব ফলপ্রসূ হচ্ছে।[৭]

সভায় বাংলাদেশের শরণার্থীদের পাশে দাঁড়ানোর অনুরোধ জানানো হয়। তরুণ ও ছাত্রসমাজের প্রতি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ক্যাম্পে দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জানানো হয়। সভাপতি লংডো বলেন যে, কেবল

মাত্র বাংলাদেশের জনসাধারণের স্বার্থেই এখন কোন রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব নয়। এই সংগ্রামকে পাকিস্তানি কায়েমী স্বার্থের নিরবিচ্ছিন্ন শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে অভিহিত করে লিংডো বলেন যে, বাংলাদেশের সংগ্রামের এই মূল তাৎপর্যকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র বাঙালি জাতীয়তাবাদকে অত্যধিক গুরুত্ব দিলে ভারতের অন্যত্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সভাশেষে বাংলাদেশের শরণার্থীদের সহায়তায় অর্থ সংগ্রহ করা হয়। মোট ১৬৫ টাকা নগদ অর্থ সংগৃহীত হয়।[৮] প্রতিদিন মাথায় পুঁটলি নিয়ে দলে দলে নারী-পুরুষ আসছে অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, নেই বাসস্থান। ভুগছে কলেরাসহ নানা অসুখে। 'এসব দেখে আমি আর থাকতে পারলাম না। মানুষের এত কষ্টে, ছোট ছেলেমেয়ে রেখে প্রতিদিন ছুটতাম শরণার্থী শিবিরের দিকে। ইচ্ছা ছিল, যদি একটু সহযোগিতা তাঁদের করা যায়।'[৯] একাত্তরের স্মৃতিচারণ করে কথাগুলো বলছিলেন অঞ্জলি লাহিড়ী। একাত্তরে মেঘালয় রাজ্যে শরণার্থী সহায়তায় যার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। অঞ্জলি লাহিড়ীকে নিয়ে শাহীন আখতার লিখছেন, 'একাত্তরের প্রতিটি স্মৃতিকথায়, যেখানে মেঘালয় সীমান্তের কথা আছে, অঞ্জলি লাহিড়ী সেখানে এসে যান অবিচ্ছেদ্যভাবে।'[১০]

শরণার্থীদের জন্য তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। শিলংয়ের এই মহিয়সী নারী পাহাড়ের পাদদেশে সেলা, আমলারেং, পান্তুং, ডাউকি, ওয়ারেংকা, বালাট, বড়ছড়া ঘুরে বেড়িয়েছেন। শরণার্থীর শোকে-দুঃখে একাত্ম হয়েছিলেন। নিজ চেষ্টায় সংগ্রহ করেছেন ত্রাণসামগ্রী, কাপড়চোপড় ও চিকিৎসা সরঞ্জাম। যোগাযোগ করেছেন রেডক্রস, অক্সফামের সাথে। এসেছেন মাইলাম। দেখেছেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো মানুষের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে। মানবতার এমন বিপর্যয় আগে কখনো দেখেননি। জীর্ণ শীর্ণ বিপুল উদ্বাস্তু এক নরক থেকে প্রাণ নিয়ে বেঁচে এসে পড়েছেন আরেক নরকে। রাকেশ তালুকদারকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরেছেন এক ব্যারাক থেকে আরেক ব্যারাকে। এক মুসলিম বৃদ্ধ হাউমাউ করে কাঁদছেন। কালকে বউ গেছে, বড় দু'টা পোলা, নাতি-নাতনিও গেছে, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন-ওই বড় নাতনি আমিনা। আজ থেকে অসুস্থ, বমি। পরমা সুন্দরী কিশোরী একমাথা কালো দীর্ঘ চুল, টিকালো নাক, ডাগর দু'টি চোখ আর সে চোখে বাঁচার করুণ আর্তি। অঞ্জলি লাহিড়ীকে জড়িয়ে ধরে বললো– আমাকে বাঁচান মাসি মা। অজান্তেই মিসেস লাহিড়ীর চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। চোখের জল যদি স্যালাইনের মতো ব্যবহার করা যেত তাহলে তা দেয়া যেত অনেক অনেক। স্যালাইন ছিল না। মেয়েটিকে তাই আর বাঁচানো গেল না। হয়তো তার দেহটিও শিয়াল খুবলে খেয়েছে, ডাগর দুটি চোখ শকুন উপড়ে ফেলেছে।

কতো সহস্র আমিনা, নাসিমা, বাসন্তী, চারুলতা, মালতীরা অকালে জীবনটা দিয়ে গেল এই বালুচরে। এখানেই কি শেষ– স্বাধীনতা তো আরো দূরে।

ছাতকের উত্তরে চেরাপুঞ্জি পাহাড়ের পাদদেশে সেলা নদীর তীরে আরেকটি শরণার্থী শিবির 'সেলা'। সিলেট, ছাতক, জগন্নাথপুর, বিশ্বনাথ অঞ্চলের লোকজন জড়ো হয়েছে। আছে ময়মনসিংহ, কুমিল্লার লোক। বিপদের মধ্যে কে কোন দিকে দিয়ে এসে ঠাঁই নিয়েছে তার ঠিক নেই। একই কাতারে সামিল শিক্ষক, আমলা, উকিল, কেরানি, ব্যবসায়ী, কৃষক, মৎসজীবী। রোগগ্রস্ত, শোকগ্রস্ত মানুষের ভিড় একাকার হয়ে মিশে আছে। ক্যাম্পে ক্যাম্পে অভিন্ন চিত্র। সেলা নদীর বালুচরে সারি সারি ব্যারাক। কলেরা, আমাশয়, জয়বাংলা রোগও আছে। নদীতে ভাসে শিশুর লাশ। মানুষের কাতরানি আর কান্নার শব্দ সেলার বাতাস ভারী হয়ে আছে। কয়েক হাজার শরণার্থীর বাস। একদা যারা সুখী সচ্ছল জীবন কাটাতো, গোলাভরা ধান আর পুকুরভরা মাছের দেশের সেইসব মানুষ এখন ভাতের জন্য, রেশনের জন্য পেটের ক্ষিধে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে আছে; রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে। বিত্তশালী আর হীনদরিদ্র সবাই এখানে শরণার্থী।

সেই স্মৃতি লিখছেন অঞ্জলী নিজেই, 'ঘুমন্ত সেলা আবার জেগে ওঠে। জেগে ওঠে বিগত শতাব্দীর রণক্লান্ত সেলা। মর্টার আর সেলের শব্দে, বারুদের গন্ধে তার ঘুম ভেঙে যায়। এবারকার নায়ক ডেভিড স্কট আর তিরতসিং নয়। আজকের নায়ক একদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ঘাতক রাজশক্তি, অন্যদিকে বাংলাদেশের সমগ্র মুক্তিকামী জনসাধারণ।'[১১]

সেলা নদীর চরার ওপর পিঁপড়ার সারির মতো গজিয়ে উঠেছে ব্যারাকের সারি। উলুখাগড়ার বন। গ্রানাইট পাথারের ছড়ানো বোল্ডার, তপ্ত বালুচরের ওপর পূর্ববাংলার অগণিত শরণার্থী মানুষ মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিয়েছে। কিন্তু সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো উত্তাল জনস্রোত। মাথায় ছোট ছোট পুটলি, কাঁধে-পিঠে বাঁধা বুভুক্ষু বাচ্চার দল নিয়ে নিত্য চলেছে ওদের আনাগোনা। ইতিমধ্যে বিশ হাজার মানুষ এসে গেছে। আরো আসছে। চারটা বাঁশের খুঁটির ওপর ছেঁড়া পলিথিনের টুকরো বেঁধে গড়ে তুলেছে আস্তানা। একনাগাড়ে চলেছে বৃষ্টি, ছেঁড়া পলিথিনের ফুটো দিয়ে জলে-কাদায় ভরে গেছে মাথা গোঁজার জায়গাগুলো। খিদেয়, বৃষ্টিতে, কলেরায় মানুষগুলো যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে। চোখগুলো পাথরের মতো নিষ্প্রভ, মুখে আতঙ্কের ছাপ। খালি পেটের কাপড় তুলে তুলে দেখাচ্ছে, অনেকদিন সেখানে একটা দানাও পড়েনি। মানুষকে মানুষই কেমন জন্তুর স্তরে নামিয়ে দিতে পারে। চারদিকে কলেরা, আমাশয় আর পচা মাংসের উৎকট গন্ধ। দাহ করার খড়ি ফুরিয়ে গেছে। শকুন ঘুরছে মরা মানুষের শবের ওপর, বালির তলা থেকে

টেনে টেনে কুকুরে-শকুনে খুবলে খাচ্ছে মানুষের মাংস। সেলার নীল জলে যে রুপোলি মাছগুলো এতোদিন আপন মনে খেলে বেড়াতো তারা অদৃশ্য হয়েছে, জলে ভাসছে শিশুর শবদেহ।[১২]

শুধু সেলা নয়, বালাট, মাইলাম, ডাউকি, আমলারেং-মেঘালয়ের সীমান্তের জনমানবহীন রুক্ষ প্রান্তরে ব্যাঙের ছাতার মতো সর্বত্র গজিয়ে উঠেছে এমনি অসংখ্য শরণার্থী শিবির। মানুষ হারিয়ে ফেলেছে আপন পরিজনকে, স্বামী-পুত্র এক শিবিরে, স্ত্রী-কন্যা অন্য কোথাও, কেউ কারো খোঁজ পায় না। ৭০ বছরের এক নিবেদিত প্রাণ সংগ্রামী পুরুষ হেমেন্দ্র দাশ পুরকায়স্থ এই শিবিরের শরণার্থীদের দেখাশোনা করছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। তরুণ-যুবাদের উদ্বুদ্ধ করছেন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে। আবার ভিতরের খবরও সংগ্রহ করে আনছেন। আর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি অপত্য স্নেহে মায়ের মতো একজন মহিলা প্রীতিরানী দাশ পুরকায়স্থ।[১৩] যুদ্ধযাত্রার আগে ছেলেরা তাদের স্নেহময়ী মাসিমার কাছে আসতো দোয়া-আর্শীবাদ নেয়ার জন্য। যাবার বেলা সন্তান বাৎসল্যে তাদের মুখে কিছু খাবার তুলে দিয়ে ছলছল চোখে আর্শীবাদ করেন, আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠে। ছেলেটি আবার ফিরে আসবে তো?

অঞ্জলি লাহিড়ী কয়েকবার এসেছেন সেলা। প্রীতিরানী দাশ পুরকায়স্থ তাকে নিয়ে দেখিয়েছেন শরণার্থীদের করুণ অবস্থা। অস্থি-চর্মসার, হাড় জিরজিরে শিশু। কলেরা-আমাশয়ে আক্রান্ত বুড়ো, যন্ত্রণাকাতরতার এক দুর্বিষহ পরিস্থিতি।

১৬-১৭ বছরের একটি মেয়ে, প্রায় উলঙ্গ, শতছিন্ন কাপড়ের টুকরো পরে বসে আছে। অঞ্জলি লাহিড়ীকে দেখে প্রথমেই বললো-দিদি একটা শাড়ি দেবেন? মাথায় জট পড়ে গেছে। লজ্জা লজ্জা মুখ করে বললো–দু'সপ্তাহ স্নান করিনি। পরনে শাড়ি নেই। নদীতে যাই কেমন করে। সঙ্গে থাকা নিজের ব্যবহারের একটি পুরনো শাড়ি মেয়েটির দিকে বাড়িয়ে দেন। ঘুরছেন মুক্তিফৌজের শিবিরে শিবিরে। ঔষধপত্র বিস্কুট সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন। মুক্তাঞ্চল ঘুরে দেখেছেন। গেছেন বাংকারেও। সঙ্গে থাকা খাবার ভাগ করে খেয়েছেন। কেমন একাত্ম হয়ে গিয়েছেন বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের সাথে।

প্রীতিরানী দাশ পুরকায়স্থ শরণার্থী মহিলাদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন মহিলা মুক্তিফৌজ সহায়ক সমিতি। সভানেত্রী হিসেবে তিনি কাজ পরিচালনা ও তদারকি করতেন। সহ-সভাপতি গীতারানী দাস, সম্পাদক নিবেদিতা দাস। তাদের চেষ্টায় একটি প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে ওঠে। সুধা কর, প্রমিলা দাস, শক্তিদেবী, মঞ্জু দেবী, সুমতি দেবী, গায়ত্রী তরফদার, বাসন্তী আচার্য্য ও রমা দাসসহ অনেক মহিলা এ সমিতিতে সম্পৃক্ত ছিলেন।[১৪] কেউ ডাক্তারদের পাশে দাঁড়িয়ে শরণার্থীদের সেবা-শুশ্রূষায় নিবেদিত। কেউ ধাত্রী প্রশিক্ষণ, নার্স প্রশিক্ষণ নিয়ে শিবিরে এবং মুক্তাঞ্চলে কাজ করছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা

কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হন কয়েকজন। কিছু দূরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বাঁশতলা যুদ্ধশিবির। চিকিৎসক ডাক্তার নূরুল ইসলাম। মহিলা মুক্তিফৌজ সহায়ক সমিতি প্রশিক্ষিত নার্সেরা প্রয়োজনে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের শুশ্রূষায়ও এগিয়ে আসেন।

হস্তশিল্প, সেলাই প্রশিক্ষণ দিয়ে মহিলাদের সাবলম্বী করে গড়ে তোলার উদ্যোগও নেয়া হয়। অঞ্জলি লাহিড়ী মহিলা মুক্তিফৌজ সহায়ক সমিতিকে নগদ অর্থ, ঔষধপত্র এবং হস্তশিল্পের জন্য প্লাস্টিকের সুতা ও অন্যান্য সরঞ্জাম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। উৎসাহ, পরামর্শ ও সমর্থন দিয়ে গেছেন সবসময়। সমিতি থেকে অনেক প্রচারপত্র বিলি করে জনমত সৃষ্টি এবং হতাশাগ্রস্ত মনে উদ্দীপনা সৃষ্টির চেষ্টাও চলে। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল এমএজি ওসমানী, মুজিবনগর সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এএইচএম কামরুজ্জামান এবং ৫নং সেক্টরের কমান্ডার মীর শওকত মহিলা মুক্তিফৌজ সহায়ক সমিতির কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। এই সমিতির সদস্যরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে শরণার্থীদের জন্য নতুন পুরাতন কাপড় সংগ্রহ করতেন। একাত্তরে মহিলা মুক্তিফৌজ সহায়ক সমিতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন রীতা দাশ। শিলংয়ে নিজ বাড়িতে বসে বলছিলেন, সে সব দিনের কথা। ‘একাত্তরে অঞ্জলি দির নেতৃত্বে আমরা ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরেছি, বালাট, মাইলামে দেখেছি মানুষের জীবন কি রকম দঃসহ হতে পারে। সেই অমানবিক স্মৃতি মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় আমাদের তাড়িত করেছে। সেই তাড়না থেকে আমরা চেষ্টা করেছি তাদের জন্য কিছু করার।’[১৫]

গারো ও খাসিয়া পাহাড়ের সঙ্গমস্থলে পাহাড়ের পাদদেশে মহেশখলা নদীর দুই পাড়ে এসে আশ্রয় নেয় ধর্মপাশা, মোহনগঞ্জ, বারহাট্টা, মদন, নেত্রকোনার হাজার হাজার শরণার্থী। অনেকে আসে জামালগঞ্জ থেকেও। সরকারি ব্যবস্থাপনায় শিবির গড়ে না উঠায় পরবর্তীতে অনেক শরণার্থী মাইলাম, মনাই, পানছড়ায় আশ্রয় নেয়। নিজস্ব উদ্যোগে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে কয়েক’শ পরিবারের কয়েক হাজার মানুষ এখানে অবস্থান করেছে। মধ্যনগর মুক্ত থাকায় সেখান থেকে শরণার্থীরা বাজার সওদা করে নিয়ে আসতো। এখানেও কলেরার প্রকোপ দেখা দিলে ডা. আখলাক হোসেন ও কম্পাউন্ডার হেমেন্দ্র সাহা চিকিৎসার দায়িত্ব নেন।

টেকেরঘাটে শরণার্থী শিবির ছিল না। যুদ্ধ শিবির ছিল। পূর্ব হতেই খনি প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এখানে থাকতেন। মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনের প্রয়োজনে আব্দুর জহুর এমপি, হোসেন বখত, তাহিরপুর থানার ওসি, হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক করুণা দে, ডা. হারিছ উদ্দিনসহ আরো কয়েকজন পরিবার নিয়ে এখানে

অবস্থান নিয়েছিলেন।[১৬] পাকিস্তানি সেনারা তাহিরপুর দখল করে নিলে তারা এখান থেকে সরে গিয়ে ভারত সীমান্তের অভ্যন্তরে বড়ছড়ায় আশ্রয় নেন।

দুর্গাপুরের অনেক গারো পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল গারো হিলে। তাদের ছেলেমেয়েরা আত্মীয়-স্বজনের কাছে থেকে নোঙ্গরপাড়া মিশন স্কুলে পড়তে যেত। স্কুল শুরুর আগে ভারতের জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। বাংলাদেশের ছাত্রদের আবদার তারাও নিজেদের জাতীয় সংগীত গাইবে। এমন আবদারে প্রমাদ গুনলেন স্কুল কৃর্তপক্ষ। অনেক চেষ্টা তদবির করে অনুমতি মিলল। ভারতীয় জাতীয় সংগীতের পর, ছাত্ররা গাইতে পারবে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। খুশিতে টগবগ করে উঠলো কচি শিশুদের মন। গারো হিল ডিসট্রিক্টের গারোরা বাংলা উচ্চারণ জানে না। এতে দমে গেলে চলবে কেন। গারো ভাষায় অনুবাদ করে তারা গাইলো–আঙনি সোনার বাংলা, আঙনি নাঙনা খাসায়া...।[১৭]

হাওরের হাওয়ায় হাওয়ায় বারুদের ঘ্রাণ। ১১টি সেক্টরে মুজিবনগর সরকার কর্তৃক সামরিক কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়ায় গতি পায় যুদ্ধ তৎপরতা। ৫ নং সেক্টরের অধীনে বালাট, সেলা, ভোলাগঞ্জ, টেকেরঘাট সাব সেক্টরে যোগ দিয়েছেন সাবসেক্টর কমান্ডররা। নুতনভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি। যদিও ভারী অস্ত্র-শস্ত্রের অভাবে প্রথাগত যুদ্ধ এড়িয়ে আচমকা আক্রমণ করে ফিরে আসার কৌশল নেয়া হয়েছে তবু মুক্তির মন্ত্রে উজ্জীবিত মুক্তিফৌজ বেপরোয়া আক্রমণ ব্যতিব্যস্ত করে তোলে পাকসেনাদের। কোথাও কোথাও পাঞ্জাবিদের হটিয়ে দখলও নিয়ে নেয়।

বালাট সাবসেক্টর থেকে ঝটিকা আক্রমণ করে বেড়িগাঁওয়ের ঘাঁটি থেকে পাকসেনাদের হটিয়ে দেয়া হয়। অন্য এক অপারেশনে সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়কের আহসানমারা ফেরি উড়িয়ে দেয় মুক্তিবাহিনী। আহসানমারায় মাইন দিয়ে পাকসেনাদের একটি পর্যবেক্ষণ জিপ ধ্বংস করে। সৈয়দপুর নলুয়া যুদ্ধে শহীদ হন সুনামগঞ্জ কলেজের ছাত্র গিয়াস উদ্দিন।

বড় কোনো অপারেশনের আগে শরণার্থী শিবিরের স্বেচ্ছাকর্মীরা অস্ত্রশস্ত্র, গুলির বাক্স মাথায় করে রাতের বেলা পৌঁছে দিত শনির বাজার, লালপানি, ডলুরা পেরিয়ে নারায়ণতলায় অবস্থিত ঘাঁটিতে, কোনাদিন চিনাকান্দি সীমান্তে। যুদ্ধ শিবিরের গোপন বার্তা পেয়ে সুধীর রঞ্জন ভদ্র স্বেচ্ছাসেবী সংগ্রহ করতেন। অরুণ দে, বিজু পুরকায়স্থ, রথীন্দ্র ধর, মঈন খাঁ, মনু দে, কাবুল, পিনু ভট্টাচার্য্য, কানু বর্ধন সহ ৩০-৪০ জন সামরিক সরঞ্জাম বহনের স্বেচ্ছাকর্মী ছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ নেপু সরকারও স্বপ্রণোদিত হয়ে যোগ দিয়েছেন এমন কাজে।[১৮] অনেক সময় মুক্তিযোদ্ধা শিবির থেকে রাতের বেলা নারায়ণতলার অগ্রবর্তী

ঘাঁটিতে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাবার ভর্তি বড় সসপেন মাথায় করে পৌঁছে দিত স্বেচ্ছাসেবকরা।

সেলা সেক্টরে গেরিলা আক্রমণে শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটিয়ে টেংরাটিলা গ্যাস পাইপলাইনের ব্যাপক ক্ষতি করা হয়। ক্যাপ্টেন হেলালের নেতৃত্বে মহব্বতপুরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ একপর্যায়ে হাতাহাতি যুদ্ধে পরিণত হয়। এ যুদ্ধে ৯ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন এবং একজনকে ধরে নিয়ে যায় পাকসেনারা। মহকুমার গুরুত্বপূর্ণ থানা ছাতকে প্রথম থেকেই পাকিস্তানিদের শক্ত অবস্থান ছিল। ছাতক দখলের জন্য বিশাল মুক্তিবাহিনীর দুর্ধর্ষ অভিযানে পাঁচদিনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে শতাধিক পাকসেনা নিহত এবং আহত হন। ছাতকের উত্তরপাড়ে সিমেন্ট ফ্যাক্টরি দখল করে নেয় মুক্তিবাহিনী। দূর্বীণ টিলা, হায়দার টিলা, পেপার টিলায় পাকবাহিনীর সুরক্ষিত বাংকার থেকে উদ্ধার করা হয় শতাধিক নির্যাতিতা কন্যা, জায়া, জননী।

টেকেরঘাট সেক্টরে এক দুর্ধর্ষ অভিযান চালিয়ে জামালগঞ্জ-সাচনাবাজরের দখল নেয় মুক্তিবাহিনী। অসম সাহসী বীর যোদ্ধা কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজের ছাত্রনেতা সিরাজুল ইসলাম এ যুদ্ধে শহীদ হন। গোলকপুর বাজার নদীঘাট থেকে ১৬টি মালবোঝাই কার্গো দখল করে টেকেরঘাটে নিয়ে আসে মুক্তিবাহিনী।[১৯] চারশ লোকের প্রায় দেড় মাস সময় লাগে এর মালমাল খালাস করতে। জগৎজ্যোতি দাসের দাস কোম্পানি হাওরাঞ্চলে একের পর এক সফল অভিযান চালায়। যুদ্ধ জয়ের সংবাদে শরণার্থী শিবিরে উচ্ছ্বাস, কোন দুঃসংবাদে বিষাদের ছায়া। যুদ্ধের উত্তাপ হাওরপাড়ে, হাওরজুড়ে, সারা দেশব্যাপী। শরণার্থীদের সহায়তার পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও ট্রেনিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল মেঘালয়ের সাধারণ মানুষরা। একাত্তরে মেঘালয়ের তুরা, ডাউকিতে গড়ে উঠেছিল বড় ২টি প্রশিক্ষণ শিবির। মেঘালয়ের সাধারণ লোকজন সেসব প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণার্থীদের সহায়তা ও সেবায় সম্পৃক্ত করেছিল নিজেদের। গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের দিতেন যুদ্ধ করার প্রেরণা।

এছাড়া মেঘালয়ের জোয়াই মহকুমার জুরাইন এলাকায় মফিয়েট নামক স্থানেও গড়ে উঠেছিল প্রশিক্ষণ ক্যাম্প।[২০] সেখানেও স্থানীয় গ্রামবাসীরা নানাভাবে সহায়তা করতেন। যদিও এটি খাসিয়া অধ্যুষিত ছিল, এখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর গুর্খা রেজিমেন্টের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ দেয়া হত। প্রাথমিকভাবে ভারতে ছয়জন জ্যাকপট কমান্ডারের অধীনে যে ছয়টি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প গড়ে উঠেছিল তার একটি মেঘালয়ের তুরা। পাশাপাশি এ–ওয়ান সেক্টরের অধীনে ঝারিনপুর (মেঘালয়) গড়ে উঠেছিল আরেকটি ক্যাম্প, তুরা থেকে প্রতিমাসে ১০০০ ঝারিনপুর থেকে বের হত ৫০০ প্রশিক্ষিত যোদ্ধা।[২১] তাদের সহায়তা, অস্ত্র ও

গোলাবারুদ বহন, মনোবল বৃদ্ধি ইত্যাদি বিবিধ উপায়ে তাদের সাথে সম্পৃক্ত হতেন স্থানীয় তৃণমূল লোকজন।

অঞ্জলি লাহিড়ীর স্বামী নীরেন লাহিড়ীও নীরবে সহায়তা করেছেন শরণার্থীদের। তিনি তখন মেঘালয়ের এ্যাডভোকেট জেনারেল। অঞ্জলি লাহিড়ীর সাথে কাজ করেছেন আশরাফি বেগম। আশরাফি ছিলেন আহমদ হোসেন ও আফজাল হোসেনের বোন। মূলত বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুরানো কাপড়, শীতবস্ত্র কিংবা নগদ অর্থ সংগ্রহ করতেন তিনি। অঞ্জলির সাথে ঘুরেছেন অনেকগুলো শরণার্থী ক্যাম্পে। জোছনা বিশ্বাস ছিলেন অঞ্জলির আরেকজন সহকর্মী। আশরাফি বেগমের মতো তিনিও বাড়ি বাড়ি গিয়ে ত্রাণ সংগ্রহ করতেন, বিভিন্ন ঔষধের দোকানে গিয়ে সংগ্রহ করতেন ঔষধ। অঞ্জলি বলছিলেন, 'আমি, আশরাফি ও জোছনা মিলে কলেরা ও রক্ত আমাশয় আর শরণার্থীদের মধ্যে দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।' [২২]

ভয়াবহ কলেরা মহামারী, সাথে জয় বাংলা নামক চোখওঠা রোগের তান্ডব। মেঘালয়ের আদিবাসিরা ভীত শরণার্থীদের এসব রোগে। মহামারি ছড়ানোর শঙ্কায় শিলং এ শরণার্থীদের প্রবেশ নিষেধ। বিদেশি দাতা সংস্থার সদস্য, চিকিৎসক সবাই সর্বোচ্চ সর্তক যাতে নিজেরা আক্রান্ত না হয়। কিন্তু অঞ্জলি কিংবা সাধারণ মেঘালয়বাসীরা কিভাবে নিয়েছিল সে সময়, সে প্রতিকূলতা।

'এমনিতে আমার টিবি, কলেরা, কুষ্ঠতে ভয়। এরকম একটি পরিস্থিতে মানুষ নিজের কথা ভাবে না। মানুষের একটা পরিবর্তন ঘটে যায়। যেমন– জয় বাংলা চোখের রোগ বলতে গেলে তখন পুরো ক্যাম্পে। চোখের দিকে তাকালেই হয়ে যায়। এরা তো দিন রাত আমার মুখের ওপর কথা বলতো। আমার তো হয়নি। মনের ওপর ডিপেন্ড করে।'[২৩]

'আজ আমি যা বললাম, এখন সব শুনে মনে হবে সব কিছু কত সহজ ও সরল ছিল। কিন্তু সে সব দিনগুলো এরকম ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস ভয়াবহ এক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে কেটেছে আমাদের, তখন আমরা ভবিনি যে এই নয় মাসেই সব শেষ হবে।'[২৪] ২০১৭ সালের ১৭ মার্চ আগরতলার রামঠাকুর কলেজের এক সেমিনারে শিলং এর মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক আহমেদ হোসাইন বলছিলেন একাত্তরের সেই অস্থির সময়ের কথা।

গোড়ায় গোড়ায় যখন বাংলাদেশ যুদ্ধ আরম্ভ হল অগনিত মানুষ এপারে এসে আশ্রয় নিল। শুরুতে আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ ছিল তাদের আশ্রয় দেওয়া ও রিলিফ দেওয়া। আমাদের পরিবারের একটা শিক্ষা ছিল– 'কারোর জন্য ভাল কিছু করা।' এই কারোর জন্য ভাল করার তাগিদে কোন কিছু না ভেবে আমাদের পরিবার নেমে পড়েছিল একাত্তরে। বয়স কম ছিল সে সময় সারাদিন রাত যখন খাটনি করেছি।

এই রিলিফ কাজ করতে গিয়ে কিছু ঘটনা মনকে বেশ নাড়া দিয়েছিল। সে সময় রিলিফ ক্যাম্পে শরণার্থীদের ভিড়ে তিল ধারণেরও জায়গা ছিল না। রিলিফ এর গাড়ি পৌঁছুলেই সকলেই ঝাঁপিয়ে পড়ত। প্রচন্ড ভীড় তার মধ্যেই দেখতাম তিন চারটি পরিবার চুপচাপ নিজেদের জায়গায় বসে আছে। খোঁজ নিয়ে পরে জানলাম তারা অবস্থাপন্ন ঘরের মানুষ। এখন একেবারে নিঃস্ব। এইভাবে রিলিফ নিতে লজ্জা বোধ করতেন। আমরা পরে তাদের জন্য আলাদা রিলিফ নিয়ে যেতাম। যখন তাদের সঙ্গে জানাশোনা হল, শিলং এর কোথাও থাকার জন্য বহু অনুরোধ করেছিলেন। একটা ব্যবস্থাও করেছিলাম কিন্তু সরকারের কড়া আইন ছিল ব্লাড রিলেশন ছাড়া কাউকে ক্যাম্প থেকে আনা যাবে না। তখন মাঝে মধ্যে নিজের গাড়ি নিয়ে ক্যাম্পে যেতাম। ফেরার সময় গাড়িটা এমনভাবে চেক করত যে মনে হবে আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করছি। ঐ তিন-চারটি পরিবারকে শিলং না আনার বেদনাটা এখনও ভুলতে পারিনি।

একাত্তরে বাংলাদেশের শরণার্থীদের সহায়তায় শিলং এ গঠিত হয়েছিল 'বাংলাদেশ সংগ্রাম সমিতি'। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে শিলংয়ের অপেরা হলে একটি বড় জনসভা অনুষ্ঠিত হয় যা থেকে বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়। এই সভার প্রস্তাবে পাকিস্তানি গণহত্যার নিন্দা জানিয়ে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়। সভা থেকে মি. পি আর কালিয়াকে সভাপতি করে আশুতোষ ভট্টাচার্যকে সাধারণ সম্পাদক করে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।[২৫] আহমদ হোসেন ও আফজাল হোসেন বলছিলেন সেই স্মৃতি, 'খুব আশ্চর্যের বিষয় আমাদের পরিবারের কাউকে ঐ সমিতিতে ডাকা হল না। আমাদের পরিবার এমন একটা পরিবার যে শিলং এ যে কোন অনুষ্ঠানই হোক না কেন–তা সাংস্কৃতিক, নাটক, গান বাজনা, খেলাধূলা, পূজা পার্বণ সবকিছুতেই আমরা সর্বোতভাবে জড়িত থাকি। আমরা সকলে খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। বিশেষ করে আমার বাবা আওলাদ হোসেন। আমার বাবা খুবই সামাজিক ছিলেন। শিলং এ এমন কোন লোক নেই-আওলাদ যাকে এক ডাকে চেনে না।'[২৬]

সংগ্রাম কমিটি তথা বাংলাদেশ সহায়ক সমিতিতে এই পরিবারকে রাখা না হলেও একাত্তরে এই পরিবারের তিনজন সদস্য আহমদ হোসেন, আফজাল হোসেন ও তাদের বোন আশরাফি বেগম একাত্তরে কাজ করে গেছেন শরণার্থী সহায়তায়। সেই সহায়তার কথা বলছিলেন আশরাফি বেগম, 'পুরোন জামা কাপড় সংগ্রহ করে রিলিফ ক্যাম্প-এ পাঠাতে হবে। অঞ্জলিদিকে আমরা খুকুদি বলে ডাকতাম। আমাদের পারিবারিক বন্ধু–আত্মীয়ের মত। অঞ্জলিদি'র ঠাকুরদা হচ্ছেন সুন্দরী মোহন দাস, বাবা-শ্রী প্রেমানন্দা দাস মা ছিলেন শ্রীমতি সুবর্ণ প্রভা দাস, জেল গালর্স হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। স্বামী হচ্ছেন শ্রী নিরেন লাহিড়ি এডভোকেট- পরে মেঘালয়ের এডভোকেট জেনারেল হয়েছিলেন। যাই হোক আমরা পুরোন

কাপড় বাড়ি বাড়ি থেকে যোগাড় করে আমাদের বাড়িতে রাখতাম এবং পরে ক্যাম্প এ পাঠাতাম এবং কখনও কখনও আমরাও নিয়ে যেতাম। *অমৃতবাজারের* সাংবাদিক ছিলেন নীলকমল দত্ত। আমাদের বাড়িতে প্রায় রোজই আসতেন। পারিবারিক বন্ধু ছিলেন। উনিও রিলিফ কাজে যুক্ত ছিলেন।'[২৭]

একাত্তরে মেঘালয়ে লুসাই হিলের কমিশনারের স্ত্রী মিসেস সত্যিলন দাসের অবদান ছিল মনে রাখার মতো। রীতিমতো বাঙ্গালীদের মতই শাড়ী পড়তেন ও মাথায় সিঁদুর দিতেন। আরেকটা বড় গুণ ছিল পরিস্কার সিলেটী বলতে পারতেম। আমাদের এই ছোট রিলিফ কাজ চলাকালীন একদিন উনি বাড়িতে এলেন এবং বলেন যে উনি বেশ কিছু রিলিফ মেটিরিয়াল জোগাড় করেছেন এবং সেগুলো রিলিফ ক্যাম্প এ পাঠাতে চান। তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আমরা অরগানাইজ করে রিলিফ মেটারিয়াল গুলো ডাওকি ও বালাট ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিই। বিদেশি ট্রাক এ সমস্ত রিলিফ মেটারিয়াল আসত। আর যত গুলো ট্রাক আসত আমাদের বাড়ির ক্যাম্প এ থাকত। ট্রাক এর মালপত্র কখনও শিলং এ খোলা হত না। ক্যাম্প এ গিয়ে খোলা হত। ট্রাক এর সঙ্গে কখনও আমি, কখনও আমার ভাই আফজাল হোসাইন, কখনও কমিশনারের ছেলে কার্তিক দাস বা আমাদের বাড়ির কেই না কেউ সঙ্গে থাকত। ট্রাক এ নানা রকম জিনিসপত্র থাকত কম্বল, দুধ, বিস্কুট, রেডি মিক্স খাবার, বড় বড় চকলেট ইত্যাদি। এই ভাবে আমাদের রিলিফ কাজ চলতে থাকল। একটা কথা এখানে বলে রাখি আমাদের কোন অরগানাইজেশন বা সমিতি ইত্যাদি কিছুই ছিল না। আমাদের বাড়ি, কমিশনারের পরিবার তথা তার স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে কার্তিক ও তমা, খুকুদি অর্থ্যৎ অঞ্জলি লাহিড়ী, নিরিন লাহিড়ী, নীলকমল দা এবং আরও কয়েক জন তাদের নাম এখন মনে পড়ছে না– সবাই মিলে কাজ করেছি।'[২৮]

আমি একজন ফটোগ্রাফার। কিন্তু কখনো ওভাবে আমার একাত্তরে ছবি তোলা হয়ে উঠেনি। 'ক্যাম্প এর প্রথম ভিজিট এ মনে আছে রিলিফ দিতে দিতে সমস্ত দিনটাই কেটে গেছে। তারপর এমনও হয়েছে মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখতে দেখতে ক্যামেরা খুলতে ইচ্ছে করত না।'[২৯] ইতিমধ্যে নীলকামাল দা কয়েকজন বাংলাদেশী ভদ্রলোকদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। তাদের মধ্যে কায়েস চৌধুরী, মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী (দু'জনে মাসতু ভাই ছিলেন), জিয়াউর রহমান, ক্যাপ্টেন আনোয়ার, হুমায়ন রশিদ, রওনাক চৌধুরী, তারপর আরও অনেকের সাথে আলাপ হয়েছিল। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাতেই আমার বাড়িতে জোর আড্ডা বসত। পরবর্তী কালে আলাপ ক্রমশই ঘণীভূত হল। তারপর থেকেই আমার বাড়িতে গুরুত্বপূর্ণ মিটিংগুলো হতে আরম্ভ হল। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আসতেন–তাদের সকলের নাম মনে নেই। তবে জনাব মিজানুর রহমানকে আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। আমার বাড়িতে পর পর দু'দিন

একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং করেছিলেন। আর একজন শিলং এ এসেছিলেন আমার আত্নীয় জনাব আলতাফ হোসেন চৌধুরী। ন্যাপ এর নেতা ছিলেন পরবর্তীকালে বাংলাদেশের মন্ত্রী হয়েছিলেন। এখন আর বেঁচে নেই। সে সময় বাংলাদেশ থেকে বহুজন এসেছিলেন এবং আলাপও হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে কেউ কোন যোগাযোগ রাখেন নি। তবে একজনের কথা আমার অনেকদিন মনে থাকবে তিনি হচ্ছেন ক্যাপ্টেন আনোয়ার। আমার সঙ্গে খুব হৃদ্যতা ছিল। সে সময় যখন আমার বাড়িতে আসতেন তখন ঝড়ের মত এসে হৈ চৈ করে চলে যেতেন। মুক্তিযুদ্ধের পর একবার কি দু'বার শিলং এসেছিলেন তারপর আর কোন খোঁজ খবর পাইনি।

সে সময় শিলং এ যতজন বাংলাদেশী ছিলেন প্রায় সকলের সঙ্গেই পরিবার ছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সেই বছরে একটা ঈদ ছিল। সেই উপলক্ষে যত বাংলাদেশী শিলং-এ ছিলেন সকলকে নিয়ে একটা গেট টুগেদার করি। শিলং এ একটা বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক অফিস খোলার কথা হল । আমাকে বলা হল একটা বাড়ির খোঁজ খবর রাখতে। আমি তখনকার দিনের মহিলা ক্যাম্পের জন্য একটা বাড়ির ব্যবস্থা করে দিই, যেটাতে ঘটা করে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের উদ্বোধন হল। বহুদিন হয়ে গেল কোন মাসে বা দিনে নেওয়া হয়েছিল তা মনে নেই। এর মধ্যে বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন নেতা শিলং এসেছিলেন। মতিয়া চৌধুরী শিলংয়ের সেন্ট্রাল স্টেট লাইব্রেরী ক্যাম্পে বক্তৃতা করেছিলেন। বহুলোক সমবেত হয়েছিল সেই সভায়।

এই সবের মধ্যেও রিলিফের কাজ আর মাঝে মধ্যে যুদ্ধে সবারই যাওয়া আসা চলছিল। এর মাঝে একদিন রাত ১২ টায় মি. নীলকমল দত্ত ফোন করলেন। বললেন–'বড় সাহেব' নীলকমলদা আমাকে ঐ নামেই ডাকতেম একটা কাজ করতে হবে, পারবেন। বললাম বলুন। 'একজন মুক্তিযোদ্ধা মারা গেছে তাকে মাটি দিতে হবে। কোথায় পাঠাতে হবে বলে দাও'।[৩০] আমি উত্তর দিলাম, কাল সকালে ১১টায় পুলিশ বাজার মসজিদে পাঠিয়ে দিন। আমরা সব ব্যবস্থা করে নেব। পরদিন মসজিদেই ছিলাম মৃতদেহ যখন এল দেখে ভীষণ কষ্ট হল। ভেবে ছিলাম মুক্তিযোদ্ধাদের একজন হাট্টাকাট্টা জোয়ান পুরুষ হবে। কিন্তু যাকে আনা হয়েছে সে একজন ছিপছিপে কিশোর। বুকে গুলি লেগেছে, ব্যান্ডেজ করা ছিল তবুও চুইয়ে রক্ত বের হচ্ছে। আমাদের বৃদ্ধ হাফেজ সাহেব নিজে হাতে গোসল দিলেন। অন্যরাও তাকে সাহায্য করেন। জোহর বাদ ৩/৪ দিন পর আরেকজনকে মাটি দেওয়া হল। শেষ দিকে একদিন এ ৫/৬ জনকে দাফন করা হয়েছে। তখন মিলিটারী হসপিটাল থেকেই খবর আসত এবং ডেডবডি আমাদের নিয়ে

আসতে হত। সমস্ত খরচ আমরাই বহন করতাম। তখনকার দিনে মাটি দিতে খরচ হত ১১০ টাকা। এই ভাবে আমরা ৫১ জন শহীদকে মাটি দিয়ে ছিলাম। সবার মৃত্যুই হয়েছিল গুলি লেগে।

এখানে একটা কথা না বলে পারছি না, সে যত তিক্তই হোক না কেন আমাকে বলতেই হবে। শিলং এ সে সময় যতজন বাংলাদেশী এসেছিলেন সকলে কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না। অনেকে কিন্তু নিরাপদে থাকার জন্য এসেছিলেন। এই যে ৫১ জন শহীদকে মাটি দেওয়া হল– কোন বাংলাদেশী কাজ তো দূরের কথা কোনদিন এই জানাজাগুলোর সাথেও যাননি। আজ আমি ও আমার ভাই আফজাল হোসাইন যদি ক্যাপ্টেন সাজ্জাদকে না বলতাম তাহলে চিরদিনের জন্য অজানা রয়ে যেত যে ৫১ জন শহীদও দেশের জন্য রক্ত দিয়ে গিয়েছিল।[৩১]

যুদ্ধ যখন আরম্ভ হয় তখন ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না আমরা কি করব এবং কতদূর কি করব? যার জন্য– যখন শহীদের মাটি দেওয়া হচ্ছিল তখন তাদের নাম বা কোন সেক্টরের যুদ্ধে আহত হয়েছে–সেটাও সাহস করে জিজ্ঞাসা করতে পারতাম না। একটা দ্বিধা রয়ে যেত। প্রত্যেকবার মাটি দিয়ে আসার পর কেবল মনে হত কোথায় বাড়ি ঘর। কাদের এই ছেলে কেউই জানাল না। মা-বাবাও জানল না। এক অজানা জায়গাতে মাটি হল, এখনও আমি আফসোস করি এই শহীদের ছবি কেন তুললাম না তখন অবশ্য ছবি তোলার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না। এখন চার দশক পর মনে হচ্ছে ছবি বোধহয় তোলা উচিত ছিল।

মেঘালয়ের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বহু ট্রেনিং ক্যাম্প ছিল। পূর্ব খাসি হিলস এর মধ্যে ২টা ক্যাম্প ছিল। আমি ক্যাম্পগুলোতে বহুবার গিয়েছি। এই ক্যাম্পগুলোতে রিলিফ চালান, মেশিন গান চালান গামবেল কি ভাবে ছুড়তে হয়, ছাড়াও আরও অনেক কিছু শেখান হত। ৬০/৭০ জন ছেলে ছিল, জায়গাটা ছিল চারদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। ট্রেইনার জানাল আজকের পর এদের রণাঙ্গনে পাঠানো হবে।

মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে সব সময় আপ টু ডে অস্ত্র ছিল না। যা অস্ত্র ছিল তাও কোন কোন দিন বিকল হয়ে যেত। আশেপাশের ফ্রন্টগুলোতে গিয়ে অস্ত্র মেরামত করতেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আমার রণাঙ্গনে এ যাওয়াটা বাড়ির লোকদের জানা ছিল না। বাড়ির লোকরা ভাবত আমি রিলিফ ক্যাম্প এই যাচ্ছি। তখন বয়স কম ছিল, ওয়ার জোন কি রকম হয় দেখার কৌতূহল ছিল এবং সেই সঙ্গে ভাল ছবি তুলব এই আকাঙ্খাই ছিল। একদিনের এক ঘটনায় ভীষণ ভেঙ্গে পড়ি। এক মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। নাম ছিল জালালউদ্দিন। শিলং এ তার খুব যাতায়াত ছিল আমার সঙ্গে খুব ভাল পরিচয় ছিল। সিলেট সেক্টর এ গেছি, সময়টা দুপুর ও বিকেলের মাঝা মাঝি ছিল। সেখানে জালালউদ্দিনের সাথে দেখা হল। অন্যান্য

মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে বাঙ্কারে কথাবার্তা চলছিল মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যেই ঠিক হল একটা গ্রুপ কিছু এগিয়ে গিয়ে প্রথমে আক্রমণ করবে তারপর অন্যরা ফলো করবে। সেইমত ৭/৮ জনের একটা গ্রুপ রওনা হল। সেই গ্রুপ এ জালালউদ্দিনও ছিল। আমরা বাঙ্কারে বসে অপেক্ষা করছিলাম। আধ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট হবে কায়েস ভাই হারুন ভাই আর আমি ফিরব ফিরব করছি। হঠাৎ দেখি চারজন লোক একটা ডেডবডি কাঁধে করে আনছে। কাছে আসতে দেখলাম এটা জালালের মৃতদেহ, দেখে এত কষ্ট হয়েছিল সে বলার নয়, আধ ঘন্টা আগে সে ছিল সে এখন আর নেই মৃত্যুকে এত কাছ থেকে আগে কখনও দেখিনি। আজ ৪৬ বছর হয়ে গেল সেই ঘটনা এখনও ভুলিনি।

আমপাতি মেঘালয়ের একটি গ্রাম। ১৯৭১ সালে এটি হয়ে উঠেছিল মিনি বাংলাদেশ।[৩২] পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নির্যাতন থেকে বাঁচতে ময়মনসিংহ, শেরপুর, জামালপুর ও নেত্রকোনার বহু মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে আশ্রয় নেয় ভারতের মেঘালয় রাজ্যে। ওপারের বাসিন্দাদের বেশির ভাগ ছিল গারো, খাসিয়া ও জৈন্তিয়া। তাদের অনেকে আবার পাকিস্তানি জমানায় এপার থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের ভয়, বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের জায়গা দিলে তারা আর ফিরে যাবে না। স্থায়ী হয়ে যাবে। অন্যদিকে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া শরণার্থীরাও ছিল নিরুপায়। ফিরে গেলে পাকিস্তানি সেনারা মেরে ফেলবে। দুপক্ষের মধ্যে এ নিয়ে বাদানুবাদ চলছিল। খবর পেয়ে এগিয়ে এলেন রওশন আরা বেগম সাংমা নামের মহীয়সী এক নারী। তিনি ওই অঞ্চলের ভূস্বামী বিজয় সাংমার স্ত্রী। সবাই তাঁকে মান্য করে। তিনি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নেতাদের ডেকে বললেন, কেউ আশ্রয় না দিলে শরণার্থীরা আমার জমিতে থাকবে। দনু নদের পাড়ে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে তাঁর জমি। সেদিন থেকে আমপাতি হয়ে যায় বাংলাদেশের শরণার্থীদের নিরাপদ আশ্রয়। কয়েক মাসের মধ্যে শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৫ হাজার। রওশন আরা তাদের শুধু থাকার জায়গা দেননি, খাবারের ব্যবস্থাও করেন। প্রতিদিন ভোরে ছয় বছরের শিশুপুত্রকে নিয়ে তিনি শরণার্থীদের শিবিরে যেতেন। তাঁর সঙ্গে থাকত বিশাল বিশাল পাতিল-ডেকচিতে ভরা রান্না করা খাবার। তাঁর বাড়ির লোকজন শরণার্থীদের মধ্যে সেই খাবার পরিবেশন করতেন। *দুঃসময়ের বন্ধু* প্রামাণ্যচিত্রটি তৈরি করতে গিয়ে ভারতের অনেক সাধারণ লোককে খুঁজে বের করেছেন শাহরিয়ার কবির। রাজনীতিবিদ, লেখক, সংগীতশিল্পী, অভিনয়শিল্পী থেকে শুরু করে একাত্তরের সমরনায়কদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তিনি। প্রামাণ্যচিত্রটি তৈরির জন্য ভারতের ত্রিপুরা, মেঘালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খান্ড, নতুন দিল্লী, মহারাষ্ট্রে দীর্ঘদিন ঘুরে বেড়িয়েছেন শাহরিয়ার কবির। তিনি বলেন, ‘মুক্তিযুদ্ধে বহু বিষয় এখনো অজানা, অজ্ঞাত রয়ে গেছে। যেমন আমাকে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী মুকুল

সাংমা বললেন, তাঁর বাবা-মায়ের কথা । যুদ্ধ শুরুর পর তাদের গ্রাম যখন শরণার্থীতে ভরে গেল, কেউ গাছতলায়, কেউ রাস্তার উপর আশ্রয় নিতে শুরু করল, অনেকের থাকার জায়গা ছিল না। ভারত সরকার তখনও শরণার্থীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়নি। তখন মুকুল শর্মা'র মা তাদের জমিতে শরণার্থীদের জন্য ছাউনি তৈরি করে দিলেন। তাঁর মা নিজে রান্না করে শরণার্থীদের খাওয়াতেন। এমনকি তারা যাতে বিড়ম্বিত বোধ না করেন, সেজন্য সাংমা পরিবার তাদের সঙ্গে একত্রে খেতেন।'[৩৩] রওশন আরা নিজেও ছেলেকে নিয়ে তাদের সঙ্গে খাবার খেতেন। গল্প করতেন। শরণার্থীদের কার কী অসুবিধা, খোঁজ নিতেন। সাধ্যমতো প্রতিকার করতেন। তারপর বাড়ি ফিরে যেতেন। রওশন আরার বাড়ির দরজা সব সময় শরণার্থীদের জন্য খোলা ছিল। কেউ অসুখ-বিসুখে পড়লে তাঁর কাছে ছুটে যেত। এভাবে কিছুদিনের মধ্যে রওশন আরা সাংমা হয়ে ওঠেন শরণার্থীদের আপনজন। তারা তাঁকে মা-জি বলে ডাকত। স্থানীয় বাসিন্দারা যখন দেখলেন, শরণার্থীরা কোনো ঝামেলা করছে না, তখন তাঁরাও সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিলেন। স্থানীয় বাসিন্দা ও শরণার্থীদের মধ্যে গড়ে ওঠে সখ্য।

সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সাহায্য আসা শুরু হলে গ্রামবাসীর দায় কিছুটা কমে যায়। এরপরও সাংমা শরণার্থীদের খোঁজখবর নিতেন। এভাবে কয়েক মাস চলে যায়। জুন মাসে হঠাৎ শরণার্থী শিবিরে কলেরা ছড়িয়ে পড়ে মহামারি আকারে। রওশন আরা সাংমা তখন নিজের সব কাজ ফেলে অসুস্থ রোগীদের সেবা করেন। চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। গ্রামের বাসিন্দা ও স্বেচ্ছাসেবকদের সেবা-শুশ্রূষার কাজে লাগান। এসব সত্ত্বেও মহামারিতে শরণার্থী শিবিরের সাড়ে তিন হাজার লোক মারা যায়, যাদের একটি বড় অংশ ছিল শিশু। সমাজকর্মীরা ৮০০ জনের নাম উদ্ধার করতে পেরেছেন। বাকিদের নাম-ঠিকানা পাওয়া যায়নি। রওশন আরা শরণার্থীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে মৃতের সংখ্যা আরও অনেক বেশি হতো। বাংলাদেশের বিজয়ের পর যখন শরণার্থীরা দেশে ফিরে আসে, এই মহীয়সী নারী ও গ্রামবাসী তাদের অশ্রুসিক্ত হয়ে বিদায় দেন। রক্ত ও অশ্রুতে মেশা মুক্তিযুদ্ধের এই মানবিক গল্প তাঁর লেখায় তুলে ধরেন মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষক লে. কর্নেল সাজ্জাদ আলী জহির বীর প্রতীক।

'বাঁচতে আইয়া মইলাম'(বাঁচতে এসে মরলাম) মাইলাম শরণার্থী শিবিরের শরণার্থীদের মুখে মুখে একাত্তরে এই সুর ছিল।[৩৪] মেঘালয়ে অবস্থিত মাইলাম ও বালাট শরণার্থী শিবির দুইটা একাত্তরে মৃত্যু শিবিরে পরিণত হয়েছে। মাত্র ২৫ হাজার শরণার্থীর জন্য মাইলাম ক্যাম্পটিকে তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু এতে প্রায় জোর করেই ৪৩ হাজার শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়া হয়। এতেই শরণার্থীদের দুর্দশা চরমে পৌঁছে। এই চরম অবস্থার মধ্যেই আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত

দেড় লক্ষেরও অধিক নতুন শরণার্থী এই শিবিরে এসে উপস্থিত হয় এবং প্রতিদিন গড়ে ২০০০ শরণার্থীর আগমন অব্যাহত থাকে। খাসিয়া-জৈন্তা পাহাড় ও সিলেট সীমান্তের দুর্গম স্থানে অবস্থিত এই দুইটা শিবিরে ইচ্ছা থাকলেও সরকারের পক্ষে রাতারাতি শিবির নির্মাণ সম্ভব হয়ে উঠে নি। শিলং থেকে একটা ছোট কাঁচা রাস্তা এই সকল শিবির পর্যন্ত চলে গেছে। এই সকল শিবিরে সবরকমের সাহায্য ৬০ মাইল দূরবর্তী শিলং শহর থেকেই পাঠাতে হয়। কিন্তু বর্ষার শুরু থেকে এই কাঁচা রাস্তাটিতে ভারী গাড়ি চলা দুরূহ ব্যাপার হয়ে পড়ে। এতে সরবরাহ ব্যবস্থা প্রায় বন্ধ হওয়ার জোগাড়। এ ছাড়া মেঘালয় সরকারের যানবাহনের অসুবিধা তো ছিলই। প্রথম থেকেই মেঘালয় সরকার ১১টা ট্রাকের সাহায্যে এসব ক্যাম্পে ত্রাণ কার্যক্রম চালায়। শেষ পর্যান্ত মাত্র ৪০টি গাড়ির জন্য কর্তৃপক্ষ জোর দিলেন, ততক্ষণে সব রাস্তা অচল হয়ে উঠেছে। অবস্থা খুব খারাপ হলে ২৬ সেপ্টেম্বর হতে বিমান থেকে ত্রাণ নিক্ষেপন শুরু করা হয়। তাও রোজ মাত্র ৬০ টনের অতিরিক্ত নিক্ষেপ করা সম্ভব হয়ে উঠছিল না। অখণ্ড মাইলাম ও বালাট শিবিরে রোজকার চাহিদা হচ্ছে কম করেও ১২০০ কুইন্টেল। জিপে করে কিছু কিছু বহন করা হচ্ছে বটে কিন্তু তাও ৮ কুইন্টেলের বেশি একটা জিপে নেয়া সম্ভব হয়নি।[৩৫]

রোজই শরণার্থীরা আসছে কিন্তু পরিমিত শিবির তৈরি হচ্ছে না এই সুযোগ জমির মালিকরা কিছু সংখ্যক দুষ্ট প্রকৃতির শরণার্থী দালালের সাহয্যে হাত মিলিয়ে অস্বাভাবিক মূল্যে বাসস্থানের জন্য জমির মৌখিক বন্দোবস্ত দিতে শুরু করেন। স্থানীয় পার্বত্য অধিবাসীরা প্রকাশ্যে খুব বিরুদ্ধাচারণ না করলেও সক্রিয় ভাবে কোন সহযোগিতায় এগিয়ে আসছে না এমন সংবাদ দেখা যায় *দৃষ্টিপাত* পত্রিকায়।[৩৬]

রোজই কলেরা এবং পেটের অসুখে ৭০ থেকে ৮০ জন লোক প্রাণ হারিয়েছে। বাংলাদেশের ৮ জন ডাক্তারসহ মাত্র ১২ জন ডাক্তার ১০ জন কম্পাউন্ডার ও ৮ জন নার্স কাজ করেছে এই ক্যাম্পগুলোতে। প্রয়োজনের তুলনায় এটা অতি নগন্য। প্রতি হাজার জন শরণার্থীর জন্য একজন করে মেথর নিয়োগ করা হয়েছে। বালাট ক্যাম্পে তিন কিলোমিটার দূরে একটি পাহাড়ী ঝরণা থেকে পাইপ দিয়ে পানীয় জল আনা হয়। সে ঝরণাটিও শুকিয়ে যায়। মাইলাম শিবিরে মাত্র ১৪টি টিউবওয়েল দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে ১২টিই নষ্ট।[৩৭] যে ২টি এখনও চালু আছে তাও নষ্ট হওয়ার পথে।

এ ছাড়া কন্ট্রাক্টর, সরকারি কর্মচারী এবং কিছু সংখ্যক শরণার্থীর দুষ্কৃতকারীতার জন্যও শরণার্থীদের দুর্দশা চরমে উঠেছে। সেলাইন এবং অন্যান্য ঔষধ পত্রাদি কালোবাজারে বিক্রীর অপরাধে একজন শরণার্থী ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এক বোতল সেলাইন ৪০০ টাকা পর্য্যন্ত দামে বিক্রী হচ্ছে। কিছু সংখ্যক শরণার্থীদের কাছে সেলাইন ও ঔষধপত্রাদি মজুত রাখা অবস্থায় পাওয়া গেছে।

এই সকল শিবিরের উদ্বাস্তুদেরকে কাছাড় এবং অন্যান্য স্থানে অবিলম্বে স্থানান্তরিত করার জন্য বাংলাদেশ ত্রাণ কমিটির তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রীর নিকট দাবী জানান হয়েছে।[৩৮] এই স্থানান্তরিতকরণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে মোটর গাড়ির ব্যবস্থা করা, যথেষ্ট পরিমাণে ডাক্তার ও ঔষধ-পত্রাদির ব্যবস্থা করার জন্যও এই দাবীতে উল্লেখ করা হয়।

একাত্তরে সীমান্তবর্তী মেঘালয় নানাভাবে সম্পৃক্ত হয়েছিল মুক্তিসংগ্রামে। এপ্রিলের শুরু থেকে পশ্চিম গারো হিল, দক্ষিণ গারো হিল, পূর্ব খাসিয়া পাহাড় ও জৈন্তা পাহাড় দিয়ে হাজার হাজার লোক প্রবেশ করেছে মেঘালয়ে। বিশেষ করে বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম, জামালপুর, শেরপুর. নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ ও সিলেট অঞ্চলের লোকদের কাছে পালানোর অন্যতম জায়গা ছিল মেঘালয়। পাহাড় বেষ্টিত পশ্চিম গারো হিলের যার মূল শহর তুরা একাত্তরে ভারতীয় সহায়তার মূল কেন্দ্র ছিল। অন্যদিকে পূর্ব খাসিয়া পাহাড়ের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মেঘালয়ের শিলং। শুরুর দিকে বিপুল শরণার্থীদের আশ্রয়ের পুরো দায়িত্বটাই নিজেদের কাঁধে তুলে নেন মেঘালয়ের জনগণ। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ ও মেঘালয়ের মধ্যে ১০৮ টি সীমান্ত ফাঁড়ি ছিল। যুদ্ধের ভয়াবহতা বাড়লে এসব সীমান্ত ফাঁড়ি খুলে দেয়া হয়। এগুলো দিয়ে বিপুল শরণার্থী মানুষ ভারতে প্রবেশ শুরু করে। দৈনিক প্রায় ১৬০০ লোক মেঘালয়ে প্রবেশ করে। ক্যাম্প ও আত্মীয় স্বজনের বাসা মিলে প্রায় পাঁচ লক্ষ শরণার্থী এখানে আশ্রয় পায়। একাত্তরে বালাটের অধিবাসী ছিল মাত্র ৪০০০, সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল প্রায় ৫০,০০০ শরণার্থী। ফলে সৃষ্ট হয় মানবিক বিপর্যের।[৩৯] শিলং থেকে ৬৯ মাইল দুর্গমপথে বালাট যেতে হয় । কিছুটা রাজনৈতিক কারণ ও কিছুটা সংক্রমিত রোগের ভয়ে বালাট থেকে শরণার্থী এমনকি স্থানীয়দেরও শিলং যেতে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এ নিয়ে শুরু হয় উত্তেজনা মেঘালয় পরিণত হয় গুজবের শহরে, স্থানীয় অবাঙালিদের সাথে শরণার্থীদের দুরত্ব বাড়তে থাকে। একাত্তরে মেঘালয়ের সহায়তার ধরণটা ভিন্ন ছিল নানা কারণে। প্রথমত, পূর্ববঙ্গ থেকে শরণার্থীদের আগমনটা ভালো চোখে দেখছিল না স্থানীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ খাসিয়ারা এমনকি গারোরাও। দ্বিতীয়ত, তারা বয়ে আনছিল ভয়াবহ সংক্রামক কলেরা। ফলে কলেরার ভয়ে মেঘালয়ের বাঙালি ছাড়া বাকীরা তাদের আশ্রয় দিতে চাচ্ছিল না। তৃতীয়ত, আরেকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ শরণার্থীরা অনেকেই প্রাণভূমি থেকে নির্বিচারে জ্বালানির জন্য গাছ কেটে ফেলছিলেন। যেটা সহজে মানতে পারছিল না স্থানীয় মেঘালয়বাসী ও প্রশাসন, চতুর্থত, আগত শরণার্থীরা প্রবেশ করেছে বিভিন্ন পাহাড় দিয়ে। কিন্তু বসবাসের জন্য বেঁচে নিয়েছিল সমতল ভূমি। কিংবা হাওর, নদীর পাড়।

'... মেঘালয়ের পাহাড়ের মধ্যে ক্যাম্প করলে পানির সমস্যা হতো। এ জন্য ক্যাম্পগুলো করা হয়েছিল হাওরের পাড়ে, নদীর চরায়, যাতে পানির সমস্যা না হয়।'[৪০]

একাত্তরে সিলেটের আজমীরগঞ্জ, নবিগঞ্জ, বানিয়াচড় দিরাই, সাল্লা অঞ্চল হয়ে বিপুল শরণার্থী এসেছিল বালাটে। বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদও এই অঞ্চল দিয়ে বালাটে এসেছিলেন। স্থানীয়দের সহায়তা ছাড়া, সাহায্য ছাড়া বালাটে শরণার্থীদের তখন বেঁচে থাকা অসম্ভব ছিল। তবে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা কিংবা বরাকের মত এখানে শরণার্থী সহায়তা স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না।

ইন্দিরা গান্ধী জুনে মেঘালয়, আসাম সফরে গেলে আসামের রাজ্যসভার সদস্য মহীতোষ পুরকায়স্থের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল তার সাথে সাক্ষাৎ করে মেঘালয়ে শরণার্থীদের দুরাবস্থার কথা তুলে ধরেন। ইন্দিরা গান্ধী তাদেরকে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কে. সি পন্থের সাথে সাক্ষাৎ করতে বলেন। অভিযোগ করা হয় দুর্গম ও বিপজ্জনক সীমান্ত এলাকায় শিবির তৈরি করে শরণার্থীদের রাখা হয়েছে, যেখান থেকে বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে কোনরূপ যোগাযোগ রাখাই অসম্ভব। নিকটতম আত্মীয় স্বজদের সঙ্গেও শরণার্থীদের সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হচ্ছে না। মেঘালয়ের ভিতরে কোন শরণার্থীকে আত্মীয়ের বাড়িতে থাকতে দেওয়া হচ্ছে না, এমন কি মেঘালয়ের বাইরে আত্মীয়ের কাছে চলে যেতে ইচ্ছুকদেরও শিবির ছাড়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। শিলং শহরে কোন বাড়িতে বাংলাদেশ থেকে আগত কেউ আছেন কিনা তা যাচাই করার জন্য বাড়ি বাড়ি খুঁজে দেখা হচ্ছে। পার্বত্য যুবকদের নিয়ে একটি আধা সরকারি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে তাদের উপর এই সমস্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শিবিরগুলির ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল এবং সহানুভূতিশূন্য, রেশন ইত্যাদিও নিয়মিত দেওয়া হচ্ছে না। শিবিরগুলিতে কলেরা ও অন্যান্য রোগের মড়ক দেখা দিয়েছে, কিন্তু চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই নেই। বাইরের চিকিৎসকদের সাহায্য গ্রহণের অনুমতিও দেওয়া হয় না। ফলে ব্যাপক হারে মৃত্যু ঘটছে, কিন্তু মৃতদেহ সৎকারের কাঠ সংগ্রহ পর্যন্ত মৃতের আত্মীয়দের করতে দেওয়া হচ্ছে না।

এই প্রেক্ষিতে বিপুল সংখ্যক শরণার্থীকে আসামের বিভিন্ন ক্যাম্পে সরিয়ে নেয়া হয়। মাইলামের অবস্থা তখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে। গল্লাপাতার ছাউনি আর বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরি হচ্ছে একের পর এক ব্যারাক। এক একটি ব্যারাকে দশটি করে ঘর, দশ পরিবারের জন্য। ঘরের অর্ধেকজুড়ে বাঁশের মাচা। রেশন দিয়ে কুলানো যাচ্ছে না। লোকজন আসছে বরাদ্দের দ্বিগুণ। আরো দুটি শরণার্থী ক্যাম্প রয়েছে পাহাড়ের গায়ে মোনাই এবং পানছাড়াতে। মূলত বালাট থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হতো এই ক্যাম্পগুলো। তাই বালাট শিবিরের পরিচিতি থাকলেও মেঘালয়ের সবচেয়ে বড় এবং বিভীষিকাময় মাইলামের নাম বাইরে তেমন

পরিচিতি পায়নি। বালাটের নামেই ছিল এর পরিচয়। পাহাড়ের পাদদেশে থেকে বিস্তীর্ণ বালুচরে তিন সাড়ে তিন মাইল জায়গাজুড়ে কয়েক হাজার ব্যারাক, কয়েক লক্ষ শরণার্থী। প্রতিদিনই আসছে হাজার হাজার ছিন্নমূল মানুষ। না খেয়ে রয়েছে কয়েকদিন। পথশ্রান্ত ক্ষুধার্ত এই মানুষেরা তাৎক্ষণিকভাবেই পাচ্ছে না আশ্রয়। মিলছে না রেশন। লঙ্গরখানায় দিনরাত খিচুড়ি রান্না করে চলছে অগণিত অভুক্তের খাওয়ার ব্যবস্থা। তদারকি করছেন আলতাফ উদ্দিন আহমদ, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিজে অভুক্ত থেকেই। সহযোগিতা করছেন হরমোহন তালুকদার, হুমায়ুন কবির চৌধুরী, ইসলাম উদ্দিন, নেহেরু, গোলাম মোস্তফা, ব্রজেন্দ্র কুমার দাস, শামসুল আলম, চাঁন মিয়া, বিবেকান্দ সমাজপতি, ছাদির মিয়া, অমরচাঁন দাস, অর্জনু নাগ এবং আরো কয়েকজন। রয়েছে শতাধিক স্বেচ্ছাকর্মী। পরবর্তী একসময় ব্রজেন্দ্র কুমার দাস, বিবেকান্দ সমাজপতিসহ কয়েকজন রিলিফক্যাম্প ছেড়ে যুদ্ধক্যাম্পে যোগ দেন। মাইলামে কলেরা ছড়িয়ে পড়ছে মহামারি আকারে। ১৭টি ব্লকে বিভক্ত করে ১৭টি মেডিকেল টিম কাজ করছে। এতো ডাক্তার কোথায়। দিরাইয়ের ডা. সতীশচন্দ্র দাসরায়, সুনাগঞ্জের ডা. সতীশ দাস, কম্পাউন্ডার সুরেন্দ্র দাসসহ আরো কয়েকজন কম্পাউন্ডার, মেডিকেল ছাত্র, গ্রাম্য ডাক্তার চিকিৎসা দিচ্ছেন।[৪১] ভারতীয় মেডিকেল বোর্ড থেকেও পর্যায়ক্রমে পাঠানো হয় মেডিকেল টিম। প্রতিদিন মরছে শত শত রোগী। সৎকারের ব্যবস্থা নেই, বালুচরে পুঁতে রাখা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাও খালি জায়গা পাওয়া যায় না। বালু সরালেই উঠে আসে অন্য মৃতদেহ। তাই কোনোভাবে রেখে আসা, একটির উপরেই আরেকটি। শিয়াল, কুকুর টেনে বের করে খাচ্ছে। রাতের বেলা নিয়ে আসছে মৃতদেহের হাত, পা, মাথা ব্যারাকের ভেতর। সকালে দরজা খুলেই পাওয়া যায় ছড়িয়ে-ছটিয়ে পড়ে থাকা দেহাবশেষ। পাহাড়ি ছড়ায় ভাসছে মৃতদেহ। কলেরার প্রকোপ যখন বাড়তির দিকে একেক দিনের মৃতের সংখ্যা তিনশো ছড়িয়ে যায়। জয়বাংলা চোখের রোগ, চর্মরোগও হানা দিচ্ছে। কলেরা আছে বালাট, লালাপানি, পানছড়া, মুনাইয়ে, গোমাঘাটের অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে। আক্রান্ত হয় মুক্তিযোদ্ধা শিবিরও। বালাট ক্যাম্পে মশালঘাটের অমর ভট্টাচার্য্য কলেরায় মারা যাওয়ার পরদিন মেয়ে অর্চনা, এরপরের দিন ছেলে পঙ্কজ। অমলা ভট্টাচার্য্য বিধাব হয়ে এক মেয়ে নিয়ে বেঁচে রইলেন। পানছাড়া ক্যাম্পের গোপিকা গোস্বামীর সৎকার করে ব্যারাকে ফিরে আসতে না আসতেই দেখা গেল বিবাহযোগ্য কন্যাটিও বেঁচে রইলেন। মুনাই ক্যাম্পে বিমল দাসের পাঁচজনের পরিবারের কেউ বেঁচে রইলো না। লালপানিতে বীণা দাস, তাঁর স্ত্রী ও এক কন্যা মারা গেলে দুইটি অনাথ শিশু পড়ে রইলো ক্যাম্পে। আর মাইলামে কতো পরিবার যে নিঃশেষে হয়ে গেছে তার কোনো হিসাব নেই। স্বাধীনতা কী জিনিস তা বুঝার জন্য বেঁচে নেই পরিবারের কেউই।

কোনো পরিবারে বেঁচে আছে কেবল একজন। এমন সংখ্যাও অনেক। বস্তুত মাইলামে আশ্রয়গ্রহণকারীদের মাঝে এমন কোনো পরিবার খুঁজে পাওয়া যাবে না যে পরিবারের কেউ না কেউ কলেরা-আমাশয়-অপুষ্টি বা অন্য কোনোভাবে মারা যায়নি। আগুনও লাগে কয়েকবার। পুড়ে যায় ব্যারাকের পর ব্যারাক। কলেরা কাবু করতে পারেনি মরছে আগুনে পুড়ে। রাকেশ তালুকদার শরণার্থীদের জন্য কাজ করছেন দিনরাত। রেশনে অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছেন এদিক-সেদিক। রাত-বিরাতে নদী পেরিয়ে ছুটে এসেছেন বালাটে। শিবির থেকে যুবকদের অনুপ্রাণিত করে মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণ করছেন। মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটলো আগুনে পুড়ে। মাইলাম শিবিরের কয়েকজন তরুণ যারা অসহায় পরিবার-পরিজনের মুখ চেয়ে ক্যাম্পে অবস্থান করছিল, এমন মৃত্যুর বিভীষিকায় ক্ষুব্ধ হৃদয়ে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে যোগ দিল যুদ্ধে। অসহায়ভাবে না মরে যুদ্ধে গিয়ে লড়াই করে মরাও ভালো।

এমন বিভীষিকার মাঝেও মাইলামের আকাশে সূর্য উঠে, রোদের আলোয় চিকচিক করে বালু। মায়াময় চাঁদের জোছনার প্লাবন পাহাড়ের গায়ে। বৃষ্টির ধারা বহে পৃথিবীর অন্য জায়গার মতোই। কিন্তু ব্যতিক্রম কেবল মৃত্যুর মিছিল, তা আর থামে না। বিয়ের গাও হয়। রাধারমণের ধামাইলের সুর ছড়ায় বিবর্ণ মাইলামের বাতাসে।[৪২] বৃন্দাবনের শ্যাম ধেনু চরায়, কদমতলায় বংশী বাজায়। একাত্তরে মাইলামের শ্যাম যুদ্ধেও যায়। শরণার্থী শিবিরের চারণ কবি নতুন গান রচে, হাওরপাড়ের কন্যারা ধামাইল গায়, 'বন্ধে আমার যুদ্ধে গেছে, কোনদিন আইবো ফিরিয়া/ ফুল তুলিয়া গাঁথি মালা, গেল যে সই শুকাইয়া।'[৪৩]

কোথায় বাগান কোথায় ফুল, মাইলামের ধুধু বালুচর যে মানুষের মাথার খুলি হাঁড়গোড় আর কঙ্কালের বাগান সাজিয়ে রেখেছে। খোল-করতাল নিয়ে রাতে কীর্তনের ধ্বনি পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ে জীবনের আকুতি নিয়ে বেঁচে থাকার অস্তিত্ব জানান দেয়।

বালাটে অবস্থানকারী সাংস্কৃতিক কর্মীরা গান গেয়ে মৃত্যুর বিভীষিকাময় প্রান্তরেও প্রাণের স্পন্দন জাগায়। শরণার্থীর হতাশ মনে আশার সঞ্চার, উজ্জীবিত হয় মুক্তিযোদ্ধারা। দেওয়ান মহসীন রাজার সক্রিয় উদ্যোগে রামকানাই দাস, গোপাল দত্ত, ফটিক চন্দ, বজু দাস, আব্দুর রহিম, কাজল দাস, মনোরঞ্জন চন্দ, রানা দাস, মৃণাল তালুকদার, বালাট-মাইলাম, পানছড়া, মুনাই প্রভৃতি ক্যাম্পে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করে প্রাণশক্তি যুগিয়েছেন।

বালাটের শরণার্থীরা দুর্গাপূজাও করে। আয়োজনে আড়ম্বর নেই। ঢাকও বাজে না। প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদনে কেবল প্রার্থনা–'মাগো, অসুরমুক্ত করে দাও জন্মভূমি। আমরা যেন ঘরে ফিরতে পারি।'[৪৪]

রেশনের চাল, ডাল, তেল, আলু দিচ্ছে সরকার। রেশন সরবরাহকারী ঠিকদার নেলসন ভাসান এন্ড কোম্পানি ১ কেন্দ্রের মাধ্যমে রেশন বিতরণ করেও হিমশিম খাচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে নিম্নমানের ভোজ্য তেল, ডাল সরবরাহের। ভেজাল তেল নাকি পেটের পীড়ার আরেক কারণ। জ্বালানীর ব্যবস্থা নিজেদের। বালুচরে লাকড়ি পাবে কোথায়। তাই পর্বত অভিযান। পাহাড়ের গাছ কেটে নিয়ে আসছে শরণার্থীরা। খাসিয়াদের প্রয়োজনীয় গাছও কাটছে। এ নিয়ে বিরোধ। সংঘর্ষও হয়। দলবেঁধে লোকজন পাহাড় যায়। বিরল বসতির পাহাড়ি বস্তিতে খাসিয়ারা সংখ্যায় অনেক কম। সামনাসামনি হয় না। দূর থেকে তীর ছুঁড়ে। শরণার্থীর সংখ্যাধিক্যে খাসিয়ারা প্রথমে হতভম্ব, পরে শঙ্কিত, অস্তিত্ব সংকটে ভীত। শেষ পর্যন্ত তাদের নিজভূম পাহাড়টি কিনা দখল করে নেয় বাঙালিরা। বালাট বাজারে খাসিয়াদের সভা হয়। বক্তৃতার ভাষা বুঝা না গেলেও জমায়েত যে ক্ষুব্ধ তা বুঝা যায়। বাঙালিরা ‘কামালিয়া’ (কলেরা) নিয়ে এসেছে, কাঁঠাল-কমলার বাগান ধ্বংস করে দিচ্ছে, পাহাড়ের গাছ কেটে সাফ করে নিচ্ছে এ তারা সহ্য করবে না। এর প্রতিকার অবশ্যই দরকার। সভা শেষে বিকেলে ফিরে যাওয়ার পথে বালাটে ক্যাম্পের ঘরের সামনে শরণার্থীদের কয়েকটি ছোট ছোট দোকান মাড়িয়ে যায়। দোকান বলতে কেউ কয়টি কলা, কমলা কয়টি বিস্কুটের প্যাকেট, বিড়ি-সিগারেট নিয়ে বসে। পরিবারের অনেক চাহিদাই কেবল রেশনে পূর্ণ হয় না। তাই বাড়তি কিছু আয়ের আশায় এমন ব্যবসার পত্তন হয়েছে বেশ কিছু। খাসিয়ারা যতই বিক্ষুব্ধ হোক বাঙালি সংখ্যাধিক্যের কাছে তা কখনো পাত্তা পায় না। তারাও নিরুপায়। তাই সহ্য করে নেয়। এক সময় বালাট বাজারে আসাও কমে যায়। মাতৃতান্ত্রিক খাসিয়া সমাজে নারীদেরই প্রাধান্য। খাসিয়া তরুণীরাই বাজারে বেশি আসতো। এখন আর তেমন দেখা যায় না।

শরণার্থী জীবন কোথাও আয়েশী নয়। দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করেই মানুষ শরণার্থী হয়ে ভিন্ন দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরায় বিপুল শরণার্থী সমাগত। তাদেরও দুর্গতির অন্ত নেই। মরছে রোগে-শোকে। তবে সেখানকার স্থানীয় মানুষ জাতিগত ও ভাষাগত টানে এগিয়ে এসে সহানুভূতি জানিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়েও খাদ্য-ত্রাণ, ঔষধপত্র দিয়ে সহযোগিতা করেছে। সাহস যুগিয়েছে, ভরসা দিয়েছে, একাত্ম হয়েছে শরণার্থীর শোকে-দুখে। বাঙালির এই মুক্তি সংগ্রামকে নিজেদের বলেই ভেবেছে। কলকাতা, আগরতলার প্রতি দৃষ্টি ছিল বহির্বিশ্বের। বিদেশি সাংবাদিক, পর্যবেক্ষক, সাহায্য সংস্থা, সামাজিক সংগঠন, রাজনৈতিক দল, ভারতীয় মন্ত্রী, মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রী, প্রতিনিধি, নেতা, পদস্থ কর্মকর্তাদের আনাগোনা ছিল সর্বত্র। প্রচার মাধ্যমেও ঠাঁই পেয়েছে পশ্চিবঙ্গ , ত্রিপুরার শিবিরগুলো। সে তুলনায় খাসিয়া-জৈন্তা এবং গারো পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত শরণার্থী শিবিরগুলো

ছিল বিচ্ছিন্ন। স্থানীয় অধিবাসীরা ঠাঁই দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু ভাষা-সংস্কৃতি ও জীবনাচারের পার্থক্যের জন্য এরা কাছাকাছি আসেনি। বরং দূরে সরে গেছে। বিদ্বেষও পোষণ করেছে। বালাট অঞ্চলে স্থানীয় খাসিয়াদের সংখ্যা তিন-চার হাজারের বেশি নয়। অথচ এখানকার কয়েকটি শিবির মিলিয়ে শরণার্থী এসে জড়ো হয়েছে পাঁচ লক্ষের উপর। মুষ্টিমেয় স্থানীয় অধিবাসীদের করার আর কী আছে। সবার আগে যে জিনিসটি বেশি প্রয়োজন সেই সহানুভূতি এবং ভরসার জায়গাটি এখানে ছিল অনুপস্থিত। পাহাড়ের আড়ালেই পরে রইলো এই বিপন্ন মানবগোষ্ঠী।

ভারতের কেন্দ্রীয় ত্রাণমন্ত্রী আর. কে. খাদিলকার একবার এসেছিলেন বালাটে। লোকসভার সদস্য আরএসপি নেতা সমর গুহ, আসামের অর্থমন্ত্রীও এসেছেন। শরণার্থী কর্মসূচির কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী পিএন লুথরা, বেচারার মাথা খারাপ হওয়ার উপক্রম। তার ভাষায়, 'আমাদের চেষ্টা সত্ত্বেও পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে। দশদিনের কর্মসূচির প্রণয়ণ কর হয়, তিনিদিন পরই দেখা যায় শরণার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেছে।'[৪৫] বাস্তবিক অর্থেই সেনাবাহিনীর এই সাবেক কর্মকর্তা এখন একটি ছোটখাটো দেশের দেখভালের দায়িত্ব নিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন। এর মাঝেও ত্রাণবাহী ট্রাক গায়েব হয়ে যায়। ঠিকমতো পৌঁছে না। মাথা ঠিক থাকে কী করে? তিনি এসেছেন বালাট। মহামারিতে প্রতিদিন শত শত লোক মারা যাচ্ছে। বাঁচানোর কোনো উপায় নেই, ঔষধপত্র খাবার সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে এমন খবরে সরেজমিনে দেখতেই তার ছুটে আসা। বালাটের কাগজপত্র রিপোর্ট দেখলেন। এমন ঘটনাতো সব শিবিরেই ঘটছে। খারাপ যোগাযোগ এবং কাছাকাছি শহর না থাকায় বিপর্যয়টা একটু বেশি হচ্ছে। চোখের সামনে ভালো কাপড়-চোপড় পরিহিত লোকজন ঘোরাঘুরি করছে। বিভ্রান্তিকর রিপোর্ট প্রেরণের জন্য কর্মকর্তাদের ওপর চড়াও হলেন। প্রকৃতপক্ষে বালাট শিবিরের পরিস্থিতি মাইলামের চেয়ে ভালো ছিল। এখানে সুনাগঞ্জ শহর এবং আশেপাশের লোকজনই বেশি। এগিয়ে এলেন আব্দুল হাই, যিনি এ অঞ্চলের যুদ্ধের খবরাখবর আকাশবাণীসহ অন্যান্য মাধ্যমে প্রেরণ করে থাকেন। সঙ্গে ধূর্জটি কুমার বসু। বুঝাবার চেষ্টা করলেন। পাহাড়ি নদীর পশ্চিমপাড়ে মাইলাম এবং পূর্বপাড়ে বালাট ক্যাম্প। বালাট শিবির প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়ে এর বর্ধিত অংশ মাইলাম এখন বালাটের চেয়ে কয়েকগুণ বড় হয়ে গেছে। চার লক্ষের মতো শরণার্থী। মাইলামসহ বালাট শরণার্থী শিবির অনেক ক্ষেত্রে কেবল বালাট নামেই পরিচিত। বালাট-মাইলাম পরিচয় বিভ্রান্তিকর অবসান ঘটালো। অবশেষে মাইলাম ঘুরে দেখে পরিস্থিতির ভয়াবহতা আঁচ করতে পেরেছিলেন লুথরা। কপালে ভাঁজও পড়েছিল। বিমানে করে খাদ্য প্রেরণের ব্যবস্থা হলো। দিন কতক ১৫-২০ বার বিমান এসে খাদ্য ফেলে যেত। সঙ্গে ঔষধপত্র স্যালাইন। কয়েকটি মেডিকেল টিমও

আসে। পাহাড়ি রাস্তা বর্ষায় ধ্বস নেমে বন্ধ হয়ে গেছে। তাই সরবরাহ বন্ধ। রাস্তা সারিয়ে ট্রাক চলাচলের উপযোগী করার অপেক্ষা করলে না খেয়ে মরতো আরো কয়েক হাজার মানুষ।

একাত্তরের ১২ জুন শিলং এর পুলিশ বাজারের সামনে শিলং কলেজসহ মেঘালয়ের কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা সমবেত হয়েছিল মুজিবের মুক্তির দাবীতে।[৪৬] মুজিবের জন্য বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করেছিল স্থানীয় চার্চ। ইয়াহিয়া কুশপুত্তলিকা দাহ করে প্রতিবাদ জানান মেঘালয়ের ছাত্র সমাজ।

'দি শিলং টাইমস্'-এর খবরে বলা হয়ঃ As they were speaking from the top to the loudspeaker van which provided the improvised platform, a huge procession of student and young men and women passed by and it converged into the Central Library grounds wherefrom it started its parade of streets of the metropolis chanting invigorating slogans. Mr. Ripple Kyndiah addressed the processionists briefly.

আয়োজন করা হয় একটি প্রতিবাদ সভার। দাবি জানানো হয় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের। সভায় নিম্নোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়ঃ The students of Shillong condemns with bitterest words possible the mass killings of the unarmed and innocent brothers and sisters of Swadhin Bangladesh by the occupation army of Pak Military Regiment. The Students of Shillong demands immediate action by the Govt. of India, all other Governments and the U.N.O. to safeguard the glorious struggle for Democracy and to extend all sorts of help.-The students of Shillong demands immediate recognition of the Independence of Bangladesh by the Govt. of India and the UNO.-The students of Shillong pledges all out support of the students community of Shillong behind the freedom fighters and extend the determination of the students to go to any service that can be arranged by all concerned. – The students of Shillong call upon entire student's community of the World and public in general to come forward and mobilize extending concrete help to the precious movement in Swadhin Bangladesh.[৪৭]

গারো হিলস স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশকে স্বীকৃতির দাবিতে আয়োজন করে প্রতিবাদ সমাবেশ।[৪৮] সবকিছু মিলিয়ে মেঘালয় একাত্তরে পরিণত হয়েছিল বিপুল শরণার্থীর শেষ আশ্রয়স্থলে। মেঘালয়ের প্রশাসনের পাশাপাশি জাতি-উপজাতি নির্বিশেষে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল বাংলাদেশের। একদিকে তারা বিপুল শরণার্থীকে দিয়েছে আশ্রয় ভালোবাসা, আহার। অন্যদিকে রণাঙ্গনের মুক্তিফৌজের ট্রেনিং এর অন্যতম কেন্দ্র ছিল এটি।

তথ্য নির্দেশিকা

১. বিচারপতি ওবায়দুল হাসান, শরণার্থীজীবনের স্মৃতি টানে, *কালের কণ্ঠ*, ঢাকা, ২৫ ডিসেম্বর ২০১৬

২. ইকরাম-উদ-দৌলা, তোরা, তেলডালা থেকে মুজিব, *বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম*, ০৩ ডিসেম্বর ২০১৬

৩. মেঘালয়ের মোট জনসংখ্যা সর্বশেষ আদমশুমারী অনুযায়ী ২৯,৬৪,০০৭ জন, মোট জনসংখ্যায়

খাশি : ৪৫%

গারো : ২৭.৫ %

বাঙালি : ১৮%

নেপালি: ৮.২৬ %

কচ : ২.৮ %

জৈন্তিয়া : ২.৫ %

হাজং : ১.৮ %

শেখ : ০.৩ %

অন্যান্য: ৪.৪ %

৪. মাজেদুল নয়ন, শরণার্থী ক্যাম্পের স্বেচ্ছাসেবক অমর সিংহ, *বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম*, ০৩ ডিসেম্বর ২০১৬

৫. *দৈনিক যুগান্তর*, কলকাতা, ২ এপ্রিল ১৯৭১

৬. *The Shilong Times*, Shilong, 16th April 971

৭. *দৈনিক যুগান্তর*, ৯ জুলাই ১৯৭১

৮. প্রাগুক্ত

৯. প্রণব বল, অঞ্জলির স্মৃতির পাতা থেকে, *প্রথম আলো*, ঢাকা, ৬ ডিসেম্বর ২০১২

১০. অঞ্জলি লাহিড়ী, *স্মৃতি ও কথা* ১৯৭১ (শাহীন আখতার সম্পাদিত), আইন ও সালিশ কেন্দ্র(আসক), ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৭

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

১২. সুখেন্দু সেন, *ঝরাপাতার পাণ্ডুলিপি শরণার্থী'৭১*, সময়, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১৮৯

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

১৪. প্রাগুক্ত

১৫. সাক্ষাৎকার, রীতা দাশ, শিলং, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

১৬. সুখেন্দু সেন, পৃ. ১৯৪

১৭. আসাদুজ্জামান আসাদ, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও শরণার্থী শিবির*, আগামী, ২০১৫, পৃ ১৩০

১৮. সুখেন্দু সেন, পৃ. ১৮৯

১৯. সুখেন্দু সেন, পৃ. ১৯৬

২০. মাজেদুল নয়ন, হরিদাসের বাড়ি হয়ে মাইল্লাম, ‘ভারত কত দূর?’, *বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম*, ০৪ ডিসেম্বর ২০১৬

২১. প্রাগুক্ত

২২. সাক্ষাৎকার, অঞ্জলি লাহিড়ী, চট্টগ্রাম, ৬ ডিসেম্বর ২০১২

২৩. অঞ্জলি লাহিড়ী, পৃ. ৫৩

২৪. ২০১৭ সালের ১৭ মার্চ আগরতলার রামঠাকুর কলেজ আয়োজন করে *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও পূবাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের ভূমিকা* শীর্ষক এক সেমিনার, সেই সেমিনারে আমার সুপারভাইজার অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, অধ্যাপক মেসবাহ কামাল ও আমি বাংলাদেশ থেকে যোগ দিয়েছিলাম। সেমিনারে শিলং-এর মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক আহমেদ হোসাইন উপস্থিত ছিলেন।

২৫. হারুণ হাবীব, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত তথ্য ও দলিল আসাম মেঘালয়*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮, পৃ ১৭৩

২৬. আহমেদ হোসাইন, মুক্তিযুদ্ধে মেঘালয়, (অপ্রকাশিত প্রবন্ধ, আমার অনুরোধে নিজেদের পরিবারের সেই অভিজ্ঞতা লিখেছেন)

২৭. সাক্ষাৎকার, আশরাফি বেগম, কলকাতা, ১২ জানুয়ারি ২০১৬

২৮. আহমেদ হোসাইন, *মুক্তিযুদ্ধে মেঘালয়*

২৯. সাক্ষাৎকার, আহমেদ হোসাইন ও আফজাল হোসেন, শিলং, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

৩০. প্রাগুক্ত

৩১. প্রাগুক্ত

৩২. সোহরাব হাসান, নিষ্ঠুর মহামারি ও মমতাময়ী রওশন, প্রথম আলো, ১২ মার্চ ২০১৮

৩৩. আরাফাতুল ইসলাম, রুপালি পর্দায় একাত্তরের দুঃসময়ের বন্ধুদের কথা, ১২ ডিসেম্বর ২০১১ www.dw.com/bn

৩৪. *সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত*, করিমগঞ্জ, ৬ আগস্ট ১৯৭১

৩৫. প্রাগুক্ত

৩৬. *দৃষ্টিপাত*, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

৩৭. প্রাগুক্ত

৩৮. *The Shilong Times*, 15th August 971

৩৯. *দৃষ্টিপাত*, ৩০ জুন ১৯৭১

৪০. অঞ্জলি লাহিড়ী, পৃ. ১০

৪১. সুখেন্দু সেন, পৃ. ১৯০-১৯১

৪২. প্রাগুক্ত

৪৩. চৌধুরী শহীদ কাদের, *মুক্তিযুদ্ধে বরাকের কবিতা ও কবিগান*, গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৭, পৃ ৩৮

৪৪. সুখেন্দু সেন, পৃ. ১৮৯

৪৫. সুখেন্দু সেন, পৃ. ১৯১

৪৬. হারুণ হাবীব, পৃ. ১৭৪

৪৭. *The Shilong Times*, 12th June 971

৪৮. সাক্ষাৎকার, রীতা দাশ

সপ্তম অধ্যায়

পরিশেষ

মুক্তিযুদ্ধ কিংবা স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস কখনো সরলরৈখিক হয় না। এর অসংখ্য বয়ান থাকে। বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখা, বিভিন্ন স্বার্থের দিক থেকে দেখা, বিভিন্ন অভিন্ন অভিজ্ঞতার আলোকে সংগ্রামকে দেখার কারণে ভিন্নতা দেখা যাওয়া খুব স্বাভাবিক বিষয়। একাত্তরে ভারতের ভূমিকাকে গত সাড়ে চার দশকে সেই রকম নানাবিধ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জন্ম নিয়েছে একাধিক ন্যারেটিভের। আবার এই সবের মধ্যে সাধারণ একটি বয়ানও বের করা যায়। অবিতর্কিত মূলধারার বয়ান। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সম্পৃক্ততা নিয়ে নানা বিতর্কের, তত্ত্বের জন্ম হয়েছে। এর সবটাই আবার ইতিহাসের বিতর্ক নয়, অনেকটাই পলিটিসাইজড ইতিহাসের বিতর্ক, যেটাকে কুতর্কও বলা যায়।

এই পলিটিসাইজড ইতিহাসের ধারণাটি আমাদের মনে জন্ম দিয়েছে সাতচল্লিশের দেশভাগ। একাত্তরে যারা শরণার্থী হয়ে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, প্রত্যক্ষ করেছিলেন এসব অঞ্চলের সাধারণের সহমর্মিতা। তারা অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে ভারতের বহুমাত্রিক ভূমিকার মর্ম বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু অল্প কিছুদিন পর তারা সেই সহযোগিতা-সহমর্মিতা ভুলে, এসবের পেছনে ভিন্ন একটি ন্যারেটিভ (সবার ক্ষেত্রে বলছি না, অধিকাংশের ক্ষেত্রে) দাঁড় করানোর চেষ্টা দেখেছি। তাহলে এটা কি মনের শঠতা, সংকীর্ণতা। বিষয়টিকে আমাদের জাতীয়তাবাদী মনের সীমাবদ্ধতা বলে মনে করি। একাত্তরে যে জাতীয়তাবাদের আবেগে ভারতের সীমান্তরাজ্যের সাধারণ মানুষ দেশভাগের ক্ষোভ আর বিদ্বেষ ভুলে বুকে টেনে নিয়েছিল বাঙালিদের। সেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ অল্প সময়ের ব্যবধানে আবার চাপা পড়ে যায়। মনোজগতে সাতচল্লিশ স্পষ্ট হয়ে উঠে। সাতচল্লিশ আর একাত্তর আপাত দৃষ্টিতে সাংঘর্ষিক। দুটো ভিন্ন সত্ত্বা মনোজগতে একসাথে বসবাস করতে পারে না। মনোজগতে যখনই একাত্তরের চেয়ে সাতচল্লিশের দ্বিজাতিতত্ত্বের জাতীয়তাবাদ প্রকট হয়, তখনি মুক্তিসংগ্রামের ভিন্ন ন্যারেটিভ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে।

ভারতের সীমান্তরাজ্যের সাধারণের সহায়তার পেছনে নানা কারণ খুঁজতে মন উৎসুক হয়। সাতচল্লিশকে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করায়। শুরু হয় ইতিহাসের অন্ধকার গলিতে পথ চলা। আমরা বাঙালি, বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টির আগেও আমরা বাঙালি ছিলাম। এরপরও আমরা বাঙালি আছি। এটা আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়, প্রকৃতি প্রদত্ত। অপরিবর্তনীয়ও বটে। অন্যদিকে এই ভূ-খণ্ডের জনগোষ্ঠীর একটি রাজনৈতিক পরিচয় রয়েছে। যে পরিচয়ের ভিত্তি রচিত হয়েছিল ষাটের দশকের উত্তাল-অস্থির সময়ে ভাষা আন্দোলন, সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ছয়দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান। এই আন্দোলন-সংগ্রাম সে রাজনৈতিক পরিচয়কে শক্ত ভিত্তি দিয়েছে। একাত্তর সেই রাজনৈতিক পরিচয়ের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। বাহাত্তরের সংবিধান আমাদের সেই রাজনৈতিক পরিচয়ের আইনি ভিত্তি দিয়েছে। এই দুই ধরণের জাতীয়তাবাদী চিন্তার মধ্যে অনৈক্য লক্ষণীয়।

একাত্তরে ভারতের সহায়তার দুটি বড় ধারা লক্ষণীয়। একটি হচ্ছে এলিট ইতিহাসের ধারা। অপরটি হচ্ছে নন-এলিট ইতিহাসের ধারা। স্পষ্টভাবে বলা যায় এলিট ইতিহাসের ধারাটি নিয়ন্ত্রণ করেছে রাষ্ট্র। আর নন-এলিট ইতিহাসকে অগ্রসরমান করেছে সাধারণ মানুষ।[১]

একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম প্রতিবেশি ভারতে ৪টি সীমান্ত রাজ্যে (পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও মেঘালয়) একটি বহুত্ববাদী চরিত্র ধারণ করেছিল। এই বহুত্ববাদী চরিত্রের কারণে অবরুদ্ধ বাংলাদেশের ন্যায় সীমান্তবর্তী এই রাজ্যেগুলোতেও মুক্তিযুদ্ধ জনযুদ্ধের রুপ নিয়েছিল। কিন্তু জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের আধিপত্যের দাপটে একাত্তরে ভারতের সহায়তা উচ্চকোটির সম্পদে পরিণত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদানের কথা বলতে গেলে রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল, প্রশাসন এমন শাসক কিংবা সমষ্টিগতভাবে শাসকগোষ্ঠীর অবদানের মধ্যে আমরা সীমাবদ্ধ করে ফেলি। প্রান্তজনের স্বর, প্রান্তজনের চেতনা মুক্তিযুদ্ধের এই ইতিহাসিক বয়ানে একবারেই অনুপস্থিত। অথচ সীমান্ত রাজ্যগুলোর পথে-প্রান্তরে ঘুরে, প্রচলিত ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে, সমসাময়িক দলিল-পত্রের নিরিখে অভিসন্দর্ভে তুলে ধরেছি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে সাধারণ মানুষের ভালোবাসায় পূর্ণতা পেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ এসব রাজ্যগুলোর জনগণের ইতিহাস। কিন্তু বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের চাপে জনগণের এই ইতিহাস, প্রান্তজনের এই চেতনা, প্রান্তজনের অংশীদারিত্ব অনালোচিত থেকেছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে।

মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় মুর্শিদাবাদের লালগোলা, জলাঙ্গী, কাহাঁড়পাড়া, বনগাঁ, নদীয়া থেকে শুরু করে আমি কাঁটাতার ধরে ইতিহাসকে খুঁজে বের করা চেষ্টা করেছি। সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়ের সীমান্তবর্তী এলাকা, একাত্তরের শরণার্থী উপদ্রুত এলাকাগুলো ঘুরে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ

করেছি। খুঁজে পেয়েছি নন-এলিট ইতিহাসের সূত্র। একাত্তর সীমান্তরাজ্যেগুলোর সাধারণ মানুষের অসাধারণ সহমর্মিতা আর সহযোগিতা আখ্যান।

এই সীমান্ত রাজ্যগুলোর সাধারণের অষ্টপ্রহর একাত্তরে কেটেছে শরণার্থীদের সহায়তায়। রাষ্ট্র সহযোগিতা করেছে সন্দেহ নেই। তবে সেই সহযোগিতা সবখানে, সবসময় সমান ছিল না। সাধারণ লোকজন কখনো ত্রাণ সংগ্রহে, কখনো ক্যাম্পে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছে। মিছিল-মিটিং এ যোগ দিয়েছে, অবরোধ অনশনে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সহায়তা দেওয়ার জন্য ভারতকে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার জন্য বের হয়েছে বিশাল মিছিল, আয়োজন করা হয়েছে প্রতিবাদ সমাবেশের। ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারের কাছে বিশাল চাপ, একদিকে বিশাল শরণার্থী প্রবাহ চাপ, তৃণমূলের আবেগময় দাবির কাছে উপেক্ষিত ভারত রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক অবস্থান। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের সিভিল সোসাইটি রাজপথে নামলেন বাংলাদেশের সহায়তায়। একদিকে সহায়ক সমিতি গঠন, ত্রাণ উত্তোলন, মুজিবের মুক্তি, জয় বাংলার স্বাধীনতার সংগ্রামে একাত্মতা জানানো, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য হরতাল, মিছিল, মিটিং সবমিলিয়ে একাত্তরে এসব ্রাজ্যে জন্ম নিয়েছেল ভিন্ন এক মুক্তিযুদ্ধের। জনযুদ্ধে সাধারণ গৃহবধূ থেকে শুরু করে ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষক থেকে শুরু করে পুরোহিত পাশে দাঁড়ালো প্রায় এককোটি শরণার্থীর। দেশভাগের স্মৃতি, ভাষা, মানবিকতায় আকুল হলেন চারটি রাজ্যের প্রায় সাড়ে ছয়কোটি ভারতীয়। এই এক অন্যরকম টান, অন্য রকম ভালোবাসা।

চারটি রাজ্যের সাড়ে ছয় কোটি তৃণমূলের চাপ সামলানোর সক্ষমতা তখন ক্ষমতাসীন ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের ছিল না। পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত পশ্চিমবঙ্গের সেই সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। সেই ভিন্ন পরিস্থিতিতে খুব একটা উচ্চকণ্ঠে না হলেও রব উঠেছিল, 'ইন্দিরা ইয়াহিয়া এক হ্যায়'। নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনে মোহিত পশ্চিমবঙ্গের তরুণ-যুবাদের স্বপ্নাতুর চোখ। সবমিলিয়ে একটি অস্থির-উত্তাল সময়।

ক্ষমতাসীন ইন্দিরা গান্ধী ও কংগ্রেস সেই সময়টাকে ধরতে পেরেছিলেন। তৃণমূলের চাপে বাধ্য হয়ে বাংলাদেশের পক্ষে চালাতে শুরু করলেন আন্তর্জাতিক প্রচারণা। বর্হিবিশ্বে তুলে ধরণের নিজের চাপের কথা। অন্তিমে জনগণের দাবির প্রতি একাত্মতা জানিয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ করলেন বাংলাদেশের রণাঙ্গনে, বাংলাদেশকে দিলেন স্বীকৃতি। ষাটের দশক একটি বহুল আলোচিত ঐতিহাসিক কালপর্ব। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ সাল। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই কালপর্বকে আমরা ধরতে পারি ১৯৫৮-

১৯৭১। এটা এই ভূ-খণ্ডের একটি ঐতিহাসিক সময়। পাশাপাশি প্রতিবেশি ভারতেও এই কালপর্ব বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। চালর্স ডিকেন্সের, 'এ টেল টু সিটিজ'-এর ভাষায় সেই ষাটের দশককে বর্ণনা করা যায়, 'সেটা শ্রেষ্ঠ সময়, সেটা নিকৃষ্ট সময়, সেটা বিচক্ষতার যুগ, সেটা বোকামির যুগ, সেটা বিশ্বাসের যুগ, সেটা অবিশ্বাসের যুগ, সেটা আলোর খুঁত। সেটা আশার বসন্ত, সেটা নৈরাজ্যের শীত, আমাদের সবকিছু ছিল, কিছুই ছিল না, সকলেই আমরা সোজা স্বর্গের দিকে যাচ্ছি। সোজা আমরা উল্টো দিকে হাটছি–সেই পথ এ পর্যন্ত আজকের পর্বের মতোই, যেখানে শোরগোল তোলা কর্তৃপক্ষের কেউ কেউ ভালোর জন্যই হোক বা মন্দের জন্যই হোক, চরমতম মাত্রার তুলনার দাবিদার।'

ষাটের দশক বিশ্ব ইতিহাসে ও একটি বিশেষ অবস্থান রেখেছিল। অন্যদিকে সত্তরের দশককে চিহ্নিত করা হয়েছিল মুক্তির দশক নামে। বিশেষ করে ভারতের ইতিহাসে এই দশক বয়ে এনেছিল সত্যিকার মুক্তির বার্তা। ষাটের দশকে ভারতবর্ষে নকশাল আন্দোলন যে উত্তাল রোমান্সকর সময়ের জন্ম দিয়েছিল। একাত্তর প্রভাবিত হয়েছিল সেই রোমান্স দ্বারা, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের কথা বলতে হয়। এই রোমান্সে কিংবা মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে বড় অবদান পশ্চিমবঙ্গের। সত্তরের দশকের সূচনাটা পশ্চিমবঙ্গসহ পুরো উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভিন্ন এক রোমান্সের জন্ম দিয়েছিল অর্ধদশক ধরে রাজনৈতিক সংঘাত, কৃষক বিদ্রোহ জন্ম দিয়েছিল আদর্শিক নানা ধ্যান-ধারণার। যদিও অনেকে সেই সময়টাকে স্মৃতিতে ধরেছিলেন ভিন্নভাবে। 'স্বাধীনতা উত্তরকালে পশ্চিমবঙ্গের সমাজ জীবনে এত বড় বিপন্নতা আর কখনো আসেনি। গোটা পশ্চিমবঙ্গ পরিণত হয়েছিল এক ভয়াবহ রণক্ষেত্রে। পথে ঘাটে পড়ে থাকছে গুলিবিদ্ধ অথবা গলকাটা মানুষের অসংখ্য মৃতদেহ।'[২]

অভিসন্দর্ভে মাঠপর্যায়ের গবেষণায় প্রাপ্ত প্রাথমিক উৎসগুলোর ভিত্তিতে স্পষ্ট করতে চেয়েছি একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ও মেঘালয়ের সাধারণ জনগণ ভারত সরকারকে বাংলাদেশ ইস্যুতে হস্তক্ষেপে বাধ্য করেছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে ভারত যে নানা ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তার প্রেক্ষিতে ভারতের ভূমিকার বিষয়টি আবর্তিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত শরণার্থী সমস্যা, আন্তর্জাতিক জনমত, মুজিবের বিচার, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান কিংবা রণাঙ্গনে সহায়তা এই সব ক্ষেত্রেই ভারত সরকারের অবস্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিচুতলার একটি চাপ ছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিচুতলার স্তরে যে ঐক্যের মনোভাব গড়ে উঠেছিল তা বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারত সরকারের অবস্থান গ্রহণের ক্ষেত্রে একটা নির্ণায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল। মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের সাধারণ মানুষের প্রায় পাঁচ শতাধিক সাক্ষাৎকার আমি গ্রহণ করেছি। সাক্ষাৎকারগুলোতে নানা বিষয়ে

মতদ্বৈততা লক্ষণীয়, কিন্তু সবাই নিঃস্বার্থে শরণার্থীদের সহায়তা করেছে এই বিষয়টি স্পষ্ট। বিশেষ করে পশ্চিবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামের বরাকে হরতাল, বনধ, মিছিল আর প্রতিবাদি সমাবেশে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারের ওপর বাংলাদেশকে সহায়তার প্রশ্নে, স্বীকৃতির প্রশ্নে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। এসব রাজ্যে সেইসময় রাজনৈতিকভাবে বামফ্রন্ট বেশ শক্তিশালি ছিল। পশ্চিমবঙ্গে একাত্তরের শুরুতে বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট কংগ্রেসের চেয়ে বেশি আসন পেয়ে সরকার গঠন করতে না পারার একটি ক্ষোভও দানা বেঁধেছিল। কিছুটা আদর্শিক। কিছুটা ক্ষমতাসীন সরকারের উপর চাপ প্রয়োগের অংশ হিসেবে বাম সংগঠনগুলো বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোর সাধারণ মানুষের বাংলাদেশের প্রতি যে সহমর্মিতা সেটাকে বেগবান করেছে।

নিঃসন্দেহে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসামের বরাক উপত্যকায় রাজনৈতিক বৃত্তের বাইরের সাধারণ জনতার হৃদয়ে অভিঘাত হেনেছিল মুক্তিযুদ্ধ। এপ্রিলের শুরু থেকে এই সাধারণ জনগণ বাংলাদেশের শরণার্থীদের আশ্রয় দিতে শুরু করে। গঠন করেন সহায়ক সমিতি, মেডিকেল ক্যাম্প। পথে পথে ঘুরে সংগ্রহ করেছে ত্রাণ-নগদ অর্থ, সাধারণ নাগরিকদের এই যে সম্পৃক্ততা বাম রাজনৈতিক দলগুলো তাদের বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের ব্যানারে এসব কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই সংগঠনগুলো সাধারণকে একত্রীকরণের উদ্যোগ নেয়। যেমন-রণাঙ্গনের আহত যোদ্ধাদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে রক্তের প্রয়োজন। সাধারণ অনেকেই রক্ত দিতে চায়, ৬ ফেব্রুয়ারি কমিটি কিংবা যুব কংগ্রেস রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা কিংবা আসামের সাধারণ লোকজন তাতে রক্ত দিচ্ছে। অর্থাৎ উদ্যোগটি রাজনৈতিক ব্যানারে কিন্তু সহায়তাকারীরা সাধারণ নাগরিক। অনেকের হয়তো রাজনৈতিক পরিচয় ছিল, কিন্তু স্পষ্ট করে বলা যায় সহায়তার ধরণটি রাজনৈতিক ছিল না, ছিল মানবিক।

একদিকে খুলনা, সাতক্ষীরা, যশোর কিংবা সিলেট অন্যদিকে মসলন্দপুর, বসিরহাট, কুচবিহার কিংবা বর্ধমান- দেশভাগের জোয়ার মানুষকে একপাড় থেকে অন্য পারে এনে ফেলেছে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে কিন্তু স্মৃতিকে কি এত সহজেই উপড়ে ফেলা যায়? রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক সমীকরণের সাথে কি আবেগ আর আত্মার সমীকরণ মিশতে পারে।[৩]

মিশতে পারে না বলেই একাত্তরে সীমাহীন এক আবেগের, উচ্ছ্বাসের জন্ম হয়েছিল ভারতের সীমান্ত রাজ্যগুলোতে। সেই আবেগ আর উচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়ে ছিল দেশহীন হওয়ার স্মৃতি, ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল বিতাড়নকারীদের মুখ। সব কিছুকে ছাপিয়ে স্বাধীনতা মুক্তি আর মানবিকতার স্বপ্নে বিভোর হয়েছিল দুই পাড়ের বাঙালী কিংবা বাংলাভাষী জনগণ। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের ইতিহাস ভারতের সীমান্তরাজ্যের

সাধারণ মানুষের তিতিক্ষার ইতিহাস। এই যুদ্ধ নিছক বাংলাদেশ পাকিস্তান কিংবা ভারতের সামরিক লড়াই ছিল না। সবাইকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেছিল সর্বাত্মক জনযুদ্ধ।[৪]

একাত্তরে ভারতের তৃণমূলের সহযোগিতা স্বরুপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মোহাম্মদ সেলিম লিখছেন, 'ভারতের সাধারণ জনগণ কোন স্বার্থ চিন্তায় নয়, বরং নিপীড়িত বাঙালি জাতির পাশে মানবতা বোধে তাড়িত হয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।'[৫] আর এই মানবতাবোধটি সাধারণের মধ্যে কীভাবে সঞ্চারিত হল অধ্যাপক সেলিম সেটিও স্পষ্ট করেছেন, 'অবরুদ্ধ বাংলাদেশ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নির্মম অত্যাচার-নির্যাতনের বিপরীতে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সংগ্রামের আদর্শিক আবেদন।'

রাষ্ট্রের ইতিহাস এবং জনগণের ইতিহাস একাত্তরে ভিন্ন ছিল। একটি বৃহৎ প্রতিবেশি রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের বহুবিধ সমীকরণ একাত্তরে কাজ করেছিল। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে সম্পৃক্ত হওয়ার পেছনে ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস, নানাবিধ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়, স্নায়ুদ্ধকালীন বৈশ্বিক রাজনীতি বিবিধ বিষয় নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, হচ্ছে কিংবা ভবিষ্যৎ সময় নির্ধারিত হবে ইতিহাসের সেই গতিপথ। আমার অভিসন্দর্ভ সেই বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন ভারতের বাংলাদেশ সীমান্তের চারটি রাজ্যের নাগরিকদের ইতিহাস, জনমানুষের ইতিহাস। একাত্তর এসব রাজ্যের ভিন্ন এক আবেগ, অপ্রতিরোধ্য ভালোবাসার এক মানবিক ইতিহাস। যে মানবিক ইতিহাস একাত্তরে প্রায় এক কোটি উদ্বাস্তু আশ্রয় পেয়েছিল আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও পশ্চিমবঙ্গে। অন্যদিকে এরাই আবার ত্রাণ সরবরাহ করেছে অবরুদ্ধ বাংলাদেশের রণাঙ্গনের যোদ্ধাদের জন্য, মিছিল, মিটিং, বনধ, অনশন আর প্রতিবাদের উচ্চকিত সুরে এসব রাজ্যের রাজ্য সরকার ও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়েছে শরণার্থীদের সহায়তায়, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে। একাত্তরে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের সমর্থনে যে বিপুল আন্তর্জাতিক জনমত তার ক্ষেত্র তৈরি করেছিল এই চারটি রাজ্যের সাধারণ জনগণ। সবকিছু মিলিয়ে সীমান্ত রাজ্যগুলোর সাধারণ জনগণ একাত্ম হয়ে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছিল। এই পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রটি সুস্পষ্টভাবে তৈরি করেছিল মানবিকতা। পাশাপাশি বাঙালিত্বের টান, মুখের ভাষা, দীর্ঘ দিন একসাথে থাকার স্মৃতি, দেশভাগ, ধর্মসহ নানাবিধ উপাদান মিলে মিশে একাকার হয়েছিল এসব জনপদে। ভিন্ন দেশের এক মুক্তিযুদ্ধে এসব জনপদের সাড়ে ছয়কোটি তৃণমূল জনগণ আশ্রয়, ভালোবাসা আর সহায়তার এক অনন্য মানবিকতায় স্বপ্ন সারথি হয়েছিল।

তথ্য নির্দেশিকা

১. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *ইতিহাস নির্মাণের ধারা*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১৮ (প্রথম সুবর্ণ প্রকাশ), পৃ. ৭

২. অমলকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাঙালি রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, এ মুখার্জি এন্ড কোং, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৮১

৩. অভিজিৎ বঙ্গোপাধ্যায়, 'অমর মিত্রের মনে দেশভাগঃ উত্তর প্রজন্মের চোখে বিচ্ছিন্নতা, স্মৃতি ও স্বপ্ন', *International Journal of institution and social science securities*, vo.111, Issue-V, 2017

৪. সেলিনা হোসেন, 'উপন্যাস নয় ইতিহাস', *প্রথম আলো*, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫

৫. মোহাম্মদ সেলিম, *বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক ১৯৭১-১৯৮১*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৪৩

গ্রন্থপঞ্জি

নথিপত্র

Sheelendra k. Singh and others (ed.), *Bangladesh Documents* (vol. 1 & 2), New Delhi, Ministry of External Affairs, Government of India (Bangladesh Edition, 1999

হাসান হাফিজুর রহমান(সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র(১৫ খণ্ড)*, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ঢাকা, ১৯৭৮-১৯৮৫ (পনেরটি খণ্ড একসাথে পিডিএফ পাওয়া যাবে এই লিংকে http://www.liberationwarbangladesh.org/2014/06/blog-post_1121.html)*

Richard and Helen Exley (Edited), *The Testimony of Sixty on the Crisis in Bengal*, Oxfam, 1971

Lok Sabha Proceedings, Lok Sabha Scretariat, New Delhi, India, 1971

Rajya Sabha Proceedings, Rajya Sabha Scretariat, New Delhi, India, 1971

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কার্যবিবরণী , পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার, জানুয়ারি ১৯৭১ থেকে ডিসেম্বর ১৯৭১

Tripura Legislative Assembly Proceedings Series, Vol 11, New Delhi, India, 1971

International Review of the Red Cross, September 1971, No-124, The Judge Advocate General's Library, U.S. Army

International Review of the Red Cross, October 1971, No-125, The Judge Advocate General's Library, U.S. Army

Plight of Bengali Refugee during Bangladesh War 1971 in Rotary Club Documents, *The Rotarian (Official Documents of Rotary Club)*, October 1971 to June 1972

রাজ্যভিত্তিক জনসংখ্যার খতিয়ান, ভারত সরকার, কলকাতা, ১৯৭১

Economic Survey, Mizoram 2012-13, Planning & Programme Implementation, Department Government of Mizoram, 2013

List of States with Population, Sex Ratio and Literacy Census 2011, *Census2011.co.in,* Retrieved 2012-11-09

Report of the Commissioner for Linguistic Minorities: 47th report (July 2008 to June 2010), Commissioner for Linguistic Minorities, Ministry of Minority Affairs, Government of India

Area, Population, Decemial Growth Rate and Density for 2001 and 2011, at a glance for West Bengal and the districts: provisional population totals paper 1 of 2011: West Bengal, Office of the Registrar General & Census Commissioner, India, 26th March 2001 (http://www.indiabudget.gov.in/es2006-07/chapt2007/tab97.pdf)

The State Economy, *Indian States Economy and Business: West Bengal*, India Brand Equity Foundation, Confederation of Indian Industry, 1971

Provisional Population Results – *Census of India 2001*, Office of the Registrar General & Census Commissioner, India, 26th march 2001

Distribution of the 22 Scheduled Languages, *Census of India*, Registrar General & Census Commissioner, India, 2001, Retrieved 4 January 2014

District Census 2011, Census2011.co.in

Census Population *(Pdf), Census of India, Ministry of Finance India*, Archived *(Pdf) from the original on 19 December 2008,* Retrieved 18 December 2008

Provisional population totals at a glance figure: 2011 – Tripura, Register General & Census Commissioner, India, Archived *from the original on 20 January 2012* and Retrieved 20 April 2012

ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, *বার্ষিক প্রতিবেদন*, পশ্চিমবঙ্গ শাখা, ১৯৭১-১৯৭২

বাংলাদেশ সংগ্রাম সহায়ক সমিতি, *কার্যবিবরণী*, কলকাতা, ১৯৭১

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির রিপোর্ট, ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হাসপাতাল, *পেশেন্ট রেজিস্টার বুক*, আগরতলা, ১৯৭১

গোবিন্দ বল্লভ মেমোরিয়াল হাসপাতাল, *ভিজিটরস বুক*, আগরতলা, ১৯৭১

ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, *বার্ষিক প্রতিবেদন*, পশ্চিমবঙ্গ শাখা, ১৯৭১-১৯৭২

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, *কার্যবিবরণী*, পশ্চিমবঙ্গ, ১৮.০২.১৯৬৮- ৩০.০৬.১৯৭২

মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০২- ২০১৮

গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সিরিজে এই পর্যন্ত ২৫টি গ্রন্থ বের হয়েছে

প্রথম খণ্ড- মুক্তিযুদ্ধের কার্টুন

দ্বিতীয় খণ্ড-*দি ফ্রন্টিয়ার*

তৃতীয় খণ্ড- অবরুদ্ধ বাংলাদেশ ও মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সংকলন

চতুর্থ খণ্ড- অবরুদ্ধ বাংলাদেশ ও মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সংকলন

পঞ্চম খণ্ড-অবরুদ্ধ বাংলাদেশ ও মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সংকলন

ষষ্ঠ খণ্ড- *দৈনিক আনন্দবাজার*

সপ্তম খণ্ড- *দৈনিক আনন্দবাজার*

অষ্টম খণ্ড- *দৈনিক আনন্দবাজার*

নবম খণ্ড- অবরুদ্ধ বাংলাদেশ ও মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সংকলন

দশম খণ্ড- অবরুদ্ধ বাংলাদেশ ও মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সংকলন

একাদশ খণ্ড- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে প্রকাশিত পত্রিকা

দ্বাদশ খণ্ড- *হিন্দুস্তান স্যাণ্ডার্ড*

ত্রয়োদশ খণ্ড- *দৈনিক কালান্তর*

চতুদর্শ খণ্ড- *দৈনিক কালান্তর*

পঞ্চদশ খণ্ড- *দৈনিক কালান্তর*

ষোড়শ খণ্ড- *দৈনিক কালান্তর*

সপ্তদশ খণ্ড-*দৈনিক কালান্তর*

অষ্টদশ খণ্ড- *দৈনিক কালান্তর*

উনবিংশ খণ্ড- *পরিচয়, দেশ ও অন্যান্য সাময়িক পত্র*

বিংশ খণ্ড- *পরিচয়, দেশ ও অন্যান্য সাময়িক পত্র*

একাবংশ খণ্ড- *সাপ্তাহিক দর্পণ*, *দৈনিক কালান্তর*

দ্বাবিংশ খণ্ড- ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত পত্রিকা

ত্রয়োবিংশ খণ্ড- *সাপ্তাহিক সপ্তাহ*

চতুর্বিংশ খণ্ড- *দৈনিক যুগান্তর*

পঞ্চবিংশ খণ্ড- *দৈনিক যুগান্তর*

বাংলাদেশ ত্রাণ কমিটি, *করিমগঞ্জের ত্রাণ দাতাদের তালিকা*, আসাম (কমিটির সম্পাদক ভূপেন্দ্রকুমার সিংহের বড় ছেলে মানস কুমার সিনহার সৌজন্যে প্রাপ্ত)

ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা, *কার্যবিবরণী*, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, *প্রতিবেদন*, ১৯৭৬, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার

Gandhi, India and Bangladesh: Selected Speeches and Statements, Orient Longman, New Delhi, 1972

রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র (১৯৭১) মুক্তিযুদ্ধ পর্ব ২য়*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১২

জগলুল আলম, *মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের দলিল*, অবসর, ঢাকা, ২০১৪

পত্র-পত্রিকা

অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত পত্রিকাগুলো দুইভাগে তুলে ধরেছি। একাত্তরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রকাশিত দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো প্রাথমিক উৎস ও বাকীগুলোকে দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে তুলে ধরেছি।

প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত পত্রিকাঃ

The Statesman, Calcutta, 1971

Daily Amritabazar, Calcutta, 1971

Hindustan Standard, Calcutta, 1971

The Age, Melbourne, 1971

The Shilong Times, Shilong, 1971

Life, New York, 1971

New York Times, New York, 1971

The Times of India, New Delhi, 1971

Hindustan Times, New Delhi, 1971

Indian Express, New Delhi, 1971

দৈনিক বসুমতি, কলকাতা, ১৯৭১

দৈনিক যুগশঙ্খ, শিলচর, ১৯৭১

দৈনিক কালান্তর, কলকাতা, ১৯৭১

দৈনিক যুগান্তর, কলকাতা, ১৯৭১

দৈনিক আনন্দবাজার, কলকাতা, ১৯৭১

দৈনিক সংবাদ, আগরতলা, ১৯৭১

দৈনিক গতি, শিলচর, ১৯৭১

দৈনিক গণশক্তি, কলকাতা, ১৯৭১

দৈনিক জাগরণ, আগরতলা, ১৯৭১

দেশের ডাক, আগরতলা, ১৯৭১

সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত, শিলচর, ১৯৭১

সাপ্তাহিক অরুণোদয়, শিলচর, ১৯৭১

সাপ্তাহিক আজাদ, শিলচর, ১৯৭১

সাপ্তাহিক পূর্ব্বায়ন, হাইলাকান্দি, ১৯৭১

সাপ্তাহিক যুগশক্তি, করিমগঞ্জ, ১৯৭১

সাপ্তাহিক সমাচার, আগরতলা, ১৯৭১

সাপ্তাহিক সপ্তাহ, কলকাতা, ১৯৭১

সাপ্তাহিক গণসংহতি, আগরতলা, ১৯৭১

সাপ্তাহিক ত্রিপুরা, আগরতলা, ১৯৭১

সাপ্তাহিক নীলাচল(অহমিয়া পত্রিকা), গোয়াহাটি, ১৯৭১

দৈনিক পুর্বদেশ, ঢাকা, ১৯৭১

দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত পত্রিকা:

দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ১৯৯৯, ২০০১, ২০০৭, ২০০৯-২০১৮

দৈনিক সমকাল, ঢাকা, ২০০৯

দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ঢাকা, ২০১৪

দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ২০১০-২০১৮

দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, ১৯৯৯-২০১৮

দৈনিক ভোরের কাগজ, ঢাকা, ১৯৯৭-২০১৮

দৈনিক কালের কণ্ঠ, ঢাকা, ২০১৬-২০১৮

দৈনিক আজাদী, চট্টগ্রাম, ১৯৯১-২০১৮

Daily Star, Dhaka, 2012-2018

Daily Bangladesh Post, Dhaka, 2018

দৈনিক সুনামগঞ্জের খবর, সিলেট, ২০১৭

লিফলেট, পোস্টার, হ্যান্ডবিল

করিমগঞ্জ বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির লিফলেট, ইমাদ উদ্দিন বুলবুল কতৃক আজাদ প্রেস শিলচর-১ থেকে প্রকাশিত, ইমাদ উদ্দিন বুলবুলের সৌজন্যে এটি সংগৃহীত

পি. সি. চন্দ্র এন্ড সন্স জুয়েলার্সের পক্ষ থেকে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে ১ এপ্রিল *যুগান্তর* ও *আনন্দবাজারে* বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞাপনটির লিফলেট

বাংলাদেশের সহায়তার জন্য আয়োজিত লটারির টিকেট, লিফলেট

শিলচর ডিস্টিক্ট স্পোর্টর্স অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বিচিত্রানুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন, লিফলেট, টিকেট, যেখানে মান্না দে গান পরিবেশন করেছিলেন

ত্রিপুরার সাধারণ ছাত্রদের ডাকে আয়োজিত ধর্মঘটের হ্যান্ডবিল

বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির লিফলেট

বাংলাদেশ শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতির সভার চিঠি

বাংলাদেশের সহায়তায় অন্নদা শংকর রায়ের হাতে লেখা চিঠি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতির লিফলেট

আলোকচিত্র ও প্রামাণ্যচিত্র

আসামের রেডক্রসের চিকিৎসক নলীনাক্ষ চৌধুরীর ছেলে *দৈনিক যুগশঙ্খ* পত্রিকার নির্বাহি সম্পাদক নীলোৎপল চৌধুরী তার বাবার তোলা প্রায় শতাধিক দুস্পাপ্য ছবির একটি অ্যালবাম দেন। যেগুলো

একাত্তরের শরণার্থী ক্যাম্পের , ফিডিং প্রোগ্রামের, রেডক্রসের নানাবিধ কার্যক্রমের দুলর্ভ তথ্য পেতে সহায়ক।

মেঘালয়ের আহমেদ হোসেন এর কাছে একাত্তরের মেঘালয়ের ৬টি আলোকচিত্র পাওয়া গেছে।

যেগুলোতে সেই সময়ের মেঘালয়ের সম্পৃক্ততা বুঝা যায়।

গুয়াহাটির কমল রায়, নদীয়ার সৌমেন গুহরায় এর সৌজন্যে একাত্তরের সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততার চারটি ছবি পাওয়া গেছে।

ত্রিপুরার সাংবাদিক রবীন সেনগুপ্তের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে একাত্তরের দুর্লভ কিছু ভিডিও ফুটেজ ও আলোকচিত্র। ভিডিও ফুটেজগুলো আমার সুপারভাইজারের সহায়তা বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের সহায়তায় পরিস্ফুটন করা হয়েছে

বহরমপুরের ইপ্সিতা গুপ্তের দুলর্ভ কিছু আলোকচিত্র পেয়েছি তার ভাইপোর সৌজন্যে

শাহরিয়ার কবির, দু:সময়ের বন্ধু (প্রামান্যচিত্র), ঢাকা, ২০০৪

রাজু ভৌমিক, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরা (প্রামান্যচিত্র), আগরতলা, ২০১৬

সাক্ষাৎকার

মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বনগাঁ, বালুরঘাট থেকে করিমগঞ্জ, ধর্মনগর, মেলাঘাটে চায়ের দোকানে বসে বসে একাত্তরের সমসাময়িক লোকদের সাথে আড্ডা, গল্প, স্মৃতি কিংবা অভিজ্ঞতা। কারো বা জীবনের গল্প। বাবা, মা, ঠাকুরদার কাছে শোনা অভিজ্ঞতা। একটি স্মৃতির আর্কাইভ। সেই সব স্মৃতি, সেই সব অভিজ্ঞতা সাজিয়ে আমি ইতিহাসে প্রবেশ করেছি। স্মৃতি আর অভিজ্ঞতায় উঠে এসেছে ভিন্ন এক একাত্তর। সীমান্তপাঁড়ের একজন প্রান্তিক মানুষ কীভাবে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে 'মিথস্ক্রিয়ায়' পরিণত হয়ে ওঠেন, তার চিত্র তুলে ধরতে আমি সীমান্তবর্তী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ও মেঘালয়ে চার বছরের মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় প্রায় ৫০০ লোকের সাক্ষাৎকার গ্রহন করি। নিচে গৃহীত সেইসব সাক্ষাৎকারের মধ্যে যাদের সাক্ষাৎকার অভিসন্দর্ভে ব্যবহার করা হয়েছে তাদের নাম উল্লেখ করা হল।

দুলাল মহাজন, বিলোনিয়া, ২১ জুলাই ২০১৪

গুরুদাস রায়, ডা: , কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, ঢাকা, ২৭ মার্চ ২০১৮

মোহন মিয়া, করিমগঞ্জ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

যোগেশ মহাজন, সোনামুড়া, ১৯ জুলাই ২০১৪

রেণুকা পাল, লাতু, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

সৌমেন জমাতিয়া (একাত্তরে রাচী জেলায় রাজ্য সরকারের পরিসংখ্যান বিভাগে কর্মরত), কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর ২০১৬

গৌরাঙ্গ ঠাকুর, মেলাঘর, ২৩ জুলাই ২০১৪

সৌভিক সরকার (একাত্তরে বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র ও প্রত্যক্ষদর্শী), কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর ২০১৭

গৌতম দাস, সম্পাদক, দেশের কথা (বর্তমানে সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য), আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

সোমেন গুহরায় , পশ্চিম দিনাজপুর, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

হেমলতা ঘোষ, করিমগঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

জে. পি. সইকিয়া (মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা প্রাপ্ত), গোহাটি, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

অম্লাণ দত্ত, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ , ১৫ নভেম্বর ২০১৬

অধ্যাপক অমলেন্দু দে, শিলচর, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

অধ্যাপক কামালুদ্দীন আহমেদ (সাবেক অধ্যাপক, করিমগঞ্জ সরকারি কলেজ ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক), করিমগঞ্জ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

অধ্যাপক দিলীপ দাশ (শিলচর বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির অন্যতম সদস্য ও শিক্ষক নেতা), শিলচর, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

অঞ্জলি লাহিড়ী, চট্টগ্রাম, ৬ ডিসেম্বর ২০১২

অরবিন্দ দেব, গোয়াহাটি, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

আনোয়ার উদ্দীন মন্ডল, জলাঙ্গী, মুর্শিদাবাদ, ৮ মার্চ ২০১৬

আব্দুর রশিদ, কাহাড়পাড়া, মুর্শিদাবাদ, ৮ মার্চ ২০১৬

আউয়াল মিয়া, সোনামুড়া, ২০ জুলাই ২০১৪

আবদুর রউফ, জলাঙ্গী, মুর্শিদাবাদ, ৮ মার্চ ২০১৬,

আবদুর রহমান, বদরপুর, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

আবদুল বাসিত, সুতারকান্দি, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

আবদুল মতিন, করিমগঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

আশরাফি বেগম, কলকাতা, ১২ জানুয়ারি ২০১৬

আসমা খাতুন, শিলচর, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

আহমেদ হোসাইন ও আফজাল হোসেন, শিলং, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

আজমত আলী, করিমগঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

আনিস রহমান, আবু বক্কর, আমির শেখ, আনোয়ার উদ্দীন মন্ডল, জলাঙ্গী, মুর্শিদাবাদ, ৮ মার্চ ২০১৬

অনিমা দত্ত (নিবেদিতা সংঘের একজন সংগঠক), শিলচর, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

অমিয় দেব (মুজিবের মুক্তির দাবীতে যে সাইকেল র‍্যালি করেছিল এক্সপ্লোরাস ক্লাব, কলকাতা সেটিতে অংশ নিয়েছিলেন, বনগাঁ, ২২ আগস্ট ২০১৬

অরিজিৎ পুরকায়স্থ, কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৭

অজিত দাশ (রাজ্য বিদ্যুৎ পরিষদের সাবেক কর্মচারি), শিলচর, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

অতীন দাশ (বরাকের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, একাত্তরের সাড়া জাগানো সুরমার স্মৃতি কবিতার কবি, দিলওয়ার যাকে নিয়ে একাত্তরে লিখেছিলেন অতীন তোমাকে), শিলচর, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

নৃপেন্দ্র কুমার দাস, হাইলাকান্দি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

ইনদর আলী, করিমগঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

ইমাদ উদ্দিন বুলবুল, শিলচর, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

নীলোৎপল চৌধুরী(আসামের রেডক্রসের চিকিৎসক নলীনাক্ষ চৌধুরীর ছেলে, সাংবাদিক), দৈনিক যুগশঙ্খ কার্যালয়, শিলচর, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

নীলমনি দেববর্মা, আগরতলা, ২৮ জুলাই ২০১৪

নীতিশ ভট্টাচার্য, হাইলাকান্দি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

পূর্ণিমা দাশগুপ্ত, বহরমপুর, ৭ মার্চ ২০১৬

প্রদীপ চন্দ্র ভৌমিক, সম্পাদক , দৈনিক সংবাদ, আগরতলা, ২৮ জুলাই ২০১৪

প্রমথেশ মুখার্জী, বহরমপুর, ৭ মার্চ ২০১৬

উৎপলা মিশ্র (একাত্তর সালে রেডক্রসে কর্মরত), কলকাতা, ১৬ মার্চ ২০১৬

বাশার মুন্সী, জলাঙ্গী, মুর্শিদাবাদ, ৮ মার্চ ২০১৬

বীরেন্দ্র চন্দ্র দেব, করিমগঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

মৃন্ময়ী বোস (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতির সংগঠক), কলকাতা, ১৮ নভেম্বর ২০১৬

মৃণাল কান্তি ভৌমিক, আগরতলা, ২৭ জুলাই ২০১৪

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, হাইলাকান্দি, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

এমরাণ উদ্দীন, করিমগঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

মছন আলী, করিমগঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

মানস সিনহা (দৃষ্টিপাত পত্রিকার সম্পাদক ভুপেন্দ্র কুমার সিংহের ছেলে), করিমগঞ্জ, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

মজিদ আলী, করিমগঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

মণিজেন্দ্র শ্যাম, শিলচর, ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

মুজাম্মিল আলী লস্কর, ব্যারিস্টার (মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা প্রাপ্ত), শিলচর, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

যতীন বালা, ধর্মনগর, ০৬ আগষ্ট ২০১৫

রমেন্দ্র বিশ্বাস, নদীয়া, ২৩ মার্চ ২০১৬

রমেশ চন্দ্র নমঃশূদ্র, শিলচর, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

রবীন সেনগুপ্ত , আগরতলা, ২৬ মে ২০১৫

শুভল রুদ্র, মেলাঘর, ২৪ জুলাই ২০১৪

রহমান ফিরোজ, লাতু, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

রহমত উল্লাহ্, বালুরঘাট, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

রাধারমন, মহিষাসন, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

রামকুমার চট্টোপাধ্যয়, পশ্চিম দিনাজপুর , ২২ মার্চ ২০১৬

রীতা দাশ, শিলং, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

রণজিৎ দাস, সাব্রুম, ১০ জানুয়ারি ২০১৫

শ্যামলী গুপ্ত, কমরেড, গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি (সদ্য প্রয়াত), কলকাতা, ২০ জুন ২০১৪

কল্পনা বালা , বনগাঁ, ১৮ আগস্ট ২০১৬

করবী দেববর্মা, আগরতলা, ২৯ জুলাই ২০১৪

কল্যাণব্রত চক্রবর্তী, আগরতলা, ২৬ জুলাই ২০১৪

শচীন রায় (সভাপতি, রংপুর জেলা সম্মিলনী), কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

শামসুল হক (মুর্শিদাবাদের জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য), মুর্শিদাবাদ, ৬ মার্চ ২০১৬

শাহরিয়ার কবির, ঢাকা, ২৮ জানুয়ারি ২০১৬

সুবোধ পাল, করিমগঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

সত্য নারায়ন, (একাত্তরের একজন কবিয়াল), মহিষাসন, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

হরিপদ দাস, , বদরপুর , ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

ছমিরণ বিবি, সোনামুড়া, ২০ জুলাই ২০১৪

জামাল হোসেন (গেরিলা যোদ্ধা), চট্টগ্রাম, ২২ মার্চ ২০১৬

জলিল মিয়া, সুতারকান্দি, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

জসিম আলী, সুতারকান্দি, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

দিলীপ দাশ, করিমগঞ্জ, ৬ মার্চ, ২০১৭

দিলীপ দাস, নদীয়া , ১৯ মার্চ ২০১৬

নিরোদ রঞ্জন নাথ, গোহাটি, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

নিশীত রঞ্জন দাশ, হাইলাকান্দি, ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

নিত্যানন্দ বন্দোপাধ্যায়, জলাঙ্গী, মুর্শিদাবাদ, ৮ মার্চ ২০১৬

বি. আর. চ্যাটার্জি, ক্যাপ্টেন, আগরতলা, ২৭ মার্চ ২০১৪

বিধান চন্দ্র রায় (একাত্তরে কলকাতায় স্বাস্থ্যসেবায় সম্পৃক্ত চিকিৎসক), কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ২০১৭

বিভু কুমারী দেবী (ত্রিপুরার মহারাণী, সাবেক মন্ত্রী), কলকাতা, ১৭ নভেম্বর ২০১৬

বিমলেন্দু ভট্টাচার্য, ডাঃ , কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বিমান বসু, কলকাতা, ২০ জুন ২০১৪

বিকচ চৌধুরী, সাংবাদিক, আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বিষ্ণু দে, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

মিহির দেব, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি ২০১৪

রিক্তা সেন, উদয়পুর, ২ জানুয়ারি ২০১৫

ত্রিলকেশ সেন, বনগাঁ, ১৬ আগস্ট ২০১৬

শিপ্রা সরকার, আগরতলা, ২৩ জুলাই ২০১৪

তরুণ দাস, করিমগঞ্জ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

তরুণ স্যানাল, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি ২০১৬ (২৮ আগস্ট ২০১৭, মুক্তিযুদ্ধের অকৃত্রিম বন্ধু তরুণ স্যানাল প্রয়াত হন)

তারামনি চৌধুরী, শিলচর, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

স্মরণিকা

আমাদের ঈপ্সিতাদি, শ্রদ্ধাঞ্জলি (ঈপ্সিতা গুপ্ত স্মৃতি স্মারক পত্রিকা), বহরমপুর ছন্দনীড় কল্যাণ সমিতি, ২০১০

চির চেনার খোঁজে, ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী উৎসব স্মরণিকা, আগরতলা, ৯-১১ ফেব্রুয়ারি ২০১১

শতবর্ষ পূর্তি উৎসব স্মরণিকা, বি কে ইনস্টিটিউট, বিলোনিয়া, ১৯৯৫

স্মরণিকা, কৃষ্ণনগর কলেজ ছাত্র সংসদ, নদীয়া, ১৯৭৮

স্মরণিকা, নবারুণ ক্লাবের সূবর্ণ জয়ন্তী, কৃষ্ণনগর, ২০০৭

স্মরণিকা, কলকাতা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদ, কলকাতা, ১৯৭৬

মুহাম্মদ সামাদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ উৎসব স্মরণিকা*, আগরতলা, ১১-১৩ জানুয়ারি ২০০১

বোধজং স্কুল, *স্কুল স্মরণিকা*, আগরতলা, ১৯৯৬

স্মরণিকা, *মুক্তিযুদ্ধ উৎসব আগরতলা*, ১১-১৩ জানুয়ারি ২০০১

সাব্রুম নাট্য সংসদ, *স্মরণিকা: প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর*, সাব্রুম, ২০০৭

কামাল লোহানী, *ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী উৎসব স্মরণিকা*, ঢাকা, ৩-৫ মে ২০০২

সমীরণ বৈদ্য ও জীবন শীল (সম্পাদিত), *৬ ডিসেম্বর সংহতি মেলা স্মরণিকা*, দক্ষিণ ত্রিপুরা, ২০১১

শ্যামল চৌধুরী (সম্পাদিত), *স্মরণ' ৭১*(স্মরণিকা বাংলাদেশের বিজয় দিবস ও ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী উৎসব উদযাপন, ২০১৪), বিলোনিয়া, ২০১৪

আবদুস সাত্তার সম্পাদিত, *করিমগঞ্জ কলেজ স্মরণিকা*, ১৯৭৬, করিমগঞ্জ

স্মরণিকা ১৯৯২, সবুজ সংঘ ক্লাব, মৌলভীবাজার , সিলেট

স্মরণিকা, কৃষ্ণনগর কলেজ ছাত্র সংসদ, নদীয়া, ১৯৭৮

স্মরণিকা, বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, ২৭তম অধিবেশন স্মরণিকা, শিলচর, ভারত

English Books

Chandra Prabodh, *Blood bath in Bangladesh*, New Delhi, 1971

David Loshak, *Pakistan Crisis*, McGraw-Hill Book Company, New York, 1971

A Qayyum Khan, *Bittersweet Victory: A Freedom Fighter's tale*, The University Press Ltd., Dhaka, 2016

A. S. M. Shamsul Arefin, *Bangladesh Documents 1971*, Somoy, Dhaka, 2015

Ali Mehrunnisa (ed.), *Readings in Pakistan Foreign Policy 1971-1988*, Oxford University Press, Karachi, 2001

Amita Malik, *The Year of the Vulture*, Orient Longmans, New Delhi, 1972

Archer K Blood, The Cruel Birth of Bangladesh, The University Press Ltd., Dhaka, 2017(4th edi.)

Arun Bhattacharjee, *Dateline Mujibnagar*, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., *Delhi, 1973*

Ayoob and Subrahmanyam, *The Liberation war*, New Delhi, 1972

Barua Gunaviram, *Assam Buranji or A History of Assam*, Publication Board of *Assam*, Guwahati, 2008 (4th edition),

Md Abdul Wadud Bhuiyan, *The Emergence of Bangladesh and Role of the Awami league*, New Delhi, 1982

Basant Chatterjee, *Inside Bangladesh Today*, S. Chand & Co., New Delhi, 1973

R. K. Chatterjee, *India's Land Borders*, New Delhi, 1978

Pran Chopra,, *Indian's Second Libration*, The MIT Press, Massachusetts, 1974

G. W. Choudhury, *The Last Days of United Pakistan*, C Hurst & Co., London, 1974

Kabir Chowdhury and other (edited), *A nation is Born*, Calcutta University, Calautta, 1974

D. K. Palit, *The Lightning Campaign: Indo-Pakistan War 1971*, Thompson Press, Delhi, 1972

David Christiana, *Arsenic Mitigation in West Bengal, India: New Hope for Millions*, Southwest Hydrology, 2007

M. S. Deora, *India and the Freedom struggle of Bangladesh*, New Delhi, 1995

J.N. Dixit, *India Pakistan in War and Peace*, Book today, New Delhi, 2002

J. N. Dixit, *Liberation and beyond*, Indo-Bangladesh Relations, Dhaka second impression, 2001

E. H. Carr, *What Is History?* Cambridge University Press, London, 1961

Faruq Aziz Khan, *Spring 1971*, Agamee, Dhaka, 1993

Herbert Feldman, *From Crisis to Crisis:* Pakistan 1962-1969, London Oxford University Press, 1972

Fred A. Snodermann (ed), *The Theory and Patience of International Relations*, Fifth Edition Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall Inc, 1978

Gary J Bass, *The Blood Telegram: India's Secret War in East Pakistan*, Random House, New Delhi, 2016

Georges Childs Kohn, *Encyclopedia of plague and pestilence: From Ancient Times to the Present*, Infobase Publishing, New York, 2007

Gupta, JyotiSen, *History of Freedom Movement in Bangladesh* , NayaPrakash Calcutta, 1974

Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh*, The University Press Ltd., Dhaka, 2015

Hem Barua, Assamese Literature, National Book Trust, New Delhi, 1965

Henry Wallace, *The century of the common man*, Winrock International Archived from the original on 29-09-2007

Indor Malhotra, *Indira Gandi: A personal and Political Biography,* Hodder & Stoughton, London, 1989

J. N. Dixit, *Liberation and Beyond, Indo-Bangladesh Relations, Dhaka, 2001*

Kathryn Jacques, Bangladesh , *India and Pakistan International relations and regional tensions in south Asia*, Macmullam Press Ltd. Great Britain, 2000

Jaynta Kumar Ray, *MuntassirMamoon, Essays on Politics and Governance*, Maulana Abdul Kalam Azad Institute of Asian Studies, Towards Freedom Kolkatta

K. M. Shehabuddin, *Three and Back Again-A Diplomate's Tale*, UPL, Dhaka, 2006

Kamruddin Ahmad, A Socio-Political History of Bengal & Birth of Bangladesh, Inside Library, Dhaka, 1975

T.N. Kaul, *Reminiscences (Discreet and Indiscreet) memories,* New Delhi, 1982

T.N. Kaul, A Diplomat's Diary (1947-199), Macmillon, New Delhi, 2000

Khadim Hussain Raja, A Stranger in my own country: East Pakistan, (1969-1971), The University Press Ltd., Dhaka, 2012

Ayub Khan, *Friend not Masters: A Political Auto biography,* New Oxford University Press, 1967

JFR Jacob, Lt. Gen., *Surrender at Dacca: Birth of a Nation,* The University Press Limited, Dhaka, 1997

Sukhwant Singh, Maj. Gen., *India's Wars Since Independence:The Liberation of Bangladesh*, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., *Delhi, 1980*

Marcus Franda, *Bangladesh The First Decade*, New Delhi, 1982

Md. Abdul Wadud Bhuyiyan, *Emergence of Bangladesh and Role of Awami Leaque,* New Delhi, 1982

Nasreen Khundker, *An orange glow in shy: 1971*, The University Press Ltd., Dhaka, 2012

Niaz Zaman, *Rising From the Ashes: Women's Narratives of 1971*, The University Press Ltd., Dhaka, 2014

Peter Jackson, *The Delhi Sultanate: A Political and Military History*, Cambridge University Press, London, 2003

Quazi Nooruzzaman, *A Sector Commander remembers Bangladesh Liberation war 1971*, The University Press Ltd., Dhaka, 2011

Rabindranath Trivedi (Edited*), International Relations of Bangladesh and Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman*, Vol. 1, Parma, Dhaka, 1999

Rajani Palme Dutt, *Problems of Contemporary History*, Lawrence and Wishart, London, 1963

Rehman Sobhan, *Untranquil Recollections: The Years of Fulfilment*, Sage, New Delhi, 2015

Richard Sisson, Leo Rose, *War and Secession: Pakistan, India, and the Creation of Bangladesh*, University of California Press, Los Angles, 1991

Roger Osborne, *Civilization: A new History of the western world,* Jonathan cape ltd, 2006

Rounaq Jahan, *Pakistan: Failure in national integration*, The University Press Ltd, Dhaka, 2015

S. S. Tunga, *Bengali and other Related Dialects of South Assam,* Mittali, Delhi, 1995

Safar Ali Akonda, *Language Movement the Making of Bangladesh*, The Univercity Press Ltd., Dhaka, 2017

Salam Azad, *Contribution of Assam in the Liberation War of Bangladesh*, Synergy Books, 2016

Salam Azad, *Contribution of Tripura in Liberation war of Bangladesh,* Bookwell, Delhi, 2014

Sarmila Bose, *Dead Reckoning: Memories of the 1971 Bangladesh War*, C. Hurst & Co, London, 2011

Saroj Kumar Barman, *Reminiscence of the past*, Kasturi Barman, Silchar, 1995

Siddiq Salik, *Witness to Surrender*, The University Press Limited, Dhaka, 1997 (first published in 1977 by Oxford University Press, Karachi)

Srinath Raghavan, *1971*: *A Global History of the Creation of Bangladesh, Harvard University Press, London, 2013*

Stephen M. Gill, *Discovery of Bangladesh*, Venton Publications, Virginia, 1974

Sukhendu Debbarma, Origin and growth of Christianity in Tripura: with special reference to the New Zealand Baptist Missionary Society, 1938–1988, Indus, New Delhi, 1996

Talukder Maniruzzaman, *The Bangladesh Revolution & Aftermath,* Bangladesh Book International, Dhaka, 1980

William Cooke Taylor, A Popular History of British India, J. Madden, London, 1842

Wright, Denis, *India Pakistan Relations (1962-1969),* Sterling publishers, New Delhi, 1989

বাংলা গ্রন্থ

অঞ্জলি লাহিড়ী, *স্মৃতি ও কথা ১৯৭১*(শাহীন আখতার সম্পাদিত), আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), ঢাকা, ১৯৯৯

অন্নদা শঙ্কর রায়, *বাংলাদেশ*, কলকাতা, ১৩৮৬

অনু ইসলাম (ভুমিকা), *জয় বাংলা (পত্রিকা) ১১ মে ১৯৭১- ২৪ শে ডিসেম্বর ১৯৭১*, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০১৫

অপূর্ব শর্মা ও অনন্য, *মুক্তিযোদ্ধা জগৎজ্যোতি*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪

অমর সাহা, *কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিতে: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯

অমলকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাঙালি রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, এ মুখার্জি এন্ড কোং, কলকাতা, ১৯৯৯

অচ্যুতচরণ চৌধুরী, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত*, পূর্বাংশ, কলকাতা, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ

অজয় দাশগুপ্ত, *একাত্তরের যাত্রী*, আগামী, ঢাকা, ২০০০

অজয় দাশগুপ্ত, *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৫

অজিত মোহন গুপ্ত, *বাংলাদেশ ৭১*, কলকাতা, ১৯৭২

অতুল চন্দ্র দাস, *জয় বাংলার কবিতা*, মিনার্ভা প্রেস, করিমগঞ্জ, ১৯৭১

আনোয়ার উল আলম শহীদ, *একাত্তর আমার শ্রেষ্ঠ সময়*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩

আনোয়ার শাহিদ খান, ভাষান্তর: হাসান মাহমুদ, *অজানা একাত্তর রক্তাক্ত পদ্মা*, সুবর্ণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩

আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৩

আনোয়ারা সৈয়দা হক, *অবরুদ্ধ*, মাওলা বাদ্রাস, ঢাকা, ২০০৮

আব্দুল মান্নান চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধ প্রাসঙ্গিক কথা*, আগামী, ঢাকা, ২০১৫

আব্দুল মান্নান খান, *১৯৭১ এক সাধারন লোকের কাহিনী*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০০

আবদুর রহমান ভূইয়া, *এক মুক্তিসেনার আত্মকথন*, আফজাল, ঢাকা, ২০১০

আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস: সুলতানি আমল*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩

আবদুশ শাকুর, *বাঙালির মুক্তির গান*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৪

আবু ওসমান চৌধুরী (সম্পাদিত*), এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম*, সেবা, ঢাকা, ১৯৯১

আবু কায়সার, *রক্তঝরা একাত্তর*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪

আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি:, ঢাকা, ২০১২

আবুল আজাদ, *মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরার সংবাদপত্রের ভূমিকা*, রাইটার্স ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০০৪

আবুল মাল আবদুল মুহিত, *স্মৃতি অম্লান ১৯৭১*, আগামী, ঢাকা, ২০১২

আবুল মাল আবদুল মুহিত, *বাংলাদেশ: জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২

আবুল মাল আবদুল মুহিত, *মুক্তিযুদ্ধের রচনা সমগ্র*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৭

আবুল হাসনাত (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধের কবিতা*, অবসর, ঢাকা, ২০১৫

আশফাক হোসেন, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ইন্দিরা গান্ধী*, সুবর্ণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭

আকবর হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধে আমি ও আমার বাহিনী*, নন্দিত, ঢাকা, ২০০৮

আখতার আহমেদ, *বার বার ফিরে যাই*, সেন্টার ফর বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০১৭

আসফ-উজ-জামান, *মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতি, কলকাতা, ১৯৭১

আসাদুজ্জামান আসাদ, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও শরণার্থী শিবির*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫

আহমেদ রেজা, *স্মৃতিচারণ*, শব্দশৈলী, ঢাকা, ২০০৯

আহমদ আলী মুন্সী, *রক্তাক্ত ক্যানভাস*, মহুয়া, ঢাকা, ২০১১

আহমদ রফিক, *একাত্তরের পাকবর্বরতার সংবাদভাষ্য*, সময়, ঢাকা, ২০১০

আহমদ ছফা, *অলাতচক্র*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১২

আহসানুল কবির রিটন, *যুদ্ধদিনের আশ্রয়*, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০১২

আজমল হোসেন মজুমদার (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বরাক উপত্যাকার অবদান*, শিলচর, ২০১৩

আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৭

আনিসুজ্জামান, *মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর*, আগামী, ঢাকা, ২০১৩

আরিফ রহমান, *ত্রিশ লক্ষ শহীদ বাহুল্য না বাস্তবতা*, নান্দনিক, ঢাকা, ২০১৫

আলি হায়দার লস্কর, *বরাক উপত্যাকা ও ইসলাম*, হযরত শাহজালাল পাবলিকেশন্স, হাইলাকান্দি, ২০১৬

আশিস কুমার চক্রবর্তী অনূদিত (মূল সালাম আজাদ), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান*, এনবিটি, নয়াদিল্লী, ২০১৪

মৈত্রেয়ী দেবী, *এতো রক্ত কেন?*, কলকাতা, ১৯৮৩

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *ইসলামী বিশ্ব ও বাংলাদেশ*, ডানা, ঢাকা, ১৯৮৫

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৭

সৈয়দ আমীরুজ্জামান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ একজন সৈনিকের স্মৃতিকথা*, পড়ুয়া প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬

সৈয়দ আমীরুজ্জামান, *রামগড়ের ডায়েরী*, পড়ুয়া প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১

দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়, *খুলনা, একত্তরঃ আমার মুক্তিযুদ্ধ*, বেঙ্গল পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১৭

দেবব্রত ভট্টাচার্য, বাসব দাসগুপ্ত, বিকাশ সরকার (সম্পাদিত), *অশ্রু হল বারুদ*, সিপিএম, কলকাতা, ১৯৭১

নেসার আহমেদ (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধ ও চারু মজুমদার*, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০১১

ফেরদৌস কামাল উদ্দিন মাহমুদ, *একাত্তর কেন্দ্রবিন্দু মেলাঘর*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৩

ফোরকান বেগম, সাইফ মুহাম্মদ আশরাফ আল সাদী ও অন্যান্য, *স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে নারী*, নারায়ণগঞ্জ, ১৯৯৮

বেবী মওদুদ(সম্পাদিত), *শহীদ বুদ্ধিজীবী মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর একাত্তরের ডায়েরী*, আগামী, ঢাকা, ২০১৬

বেলাল মোহাম্মদ, *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র*, অনুপম, ঢাকা, ২০১৫

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ এবংপাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্র*, ঢাকা, ১৯৯৩

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *ইতিহাস নির্মাণের ধারা*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১৮(প্রথম সুবর্ণ প্রকাশ)

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *জার্ণাল ৭১*, সময় প্রকাশ, ঢাকা, ২০০২

মেসবাহউদ্দিন মুনতাসীর (অনূদিত), রিচার্ড কে টেইলর, *অবরোধ*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭

মো. তৌফিক-ই-এলাহী, লেঃ কর্ণেল, *মাইনর টাইগার্স ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৩

মো. আব্দুস সালাম, মেজর কর্ণেল, *একাত্তরের একজন মুক্তিযোদ্ধা*, সেন্টার ফর বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০১৭

মো. জয়নাল আবেদীন, *মুক্তিযুদ্ধের ডায়েরী*, ঘাসফুল নদী, ঢাকা, ২০০৮

মো. মিজানুর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধ ও ভারতের শরণার্থী ক্যাম্পের স্মৃতি*, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯

মো. সিদ্দিকুর রহমান স্বপন, *বাংলাদেশের গণআন্দোলন স্লোগান প্ল্যাকার্ড ও পোস্টার*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১৬

মোরশেদ শফিউল হাসান, *প্রসঙ্গ মুক্তিযুদ্ধ*, অনুপম, ঢাকা, ২০১৬

মোল্লা আমীর হোসেন, *হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশ ত্যাগ (১৯৪৭-৭১): খুলনা*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১৮

মোহাম্মদ আবুবকর, *একাত্তরের ডায়েরী*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩

মোহাম্মদ এমদাদুল হক, *আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কথা*, ঢাকা, ১৯৯৭

মোহাম্মদ এমদাদুল হক, *একাত্তরের মুক্তাঞ্চল তেতুলিয়ার ইতিহাস ও দলিলপত্র*, জনপ্রিয়, ঢাকা, ২০১৫

মোঃ আবু বক্কর, *বিংশ শতাব্দীর এজিদ ইয়াহিয়া খান ও ভূট্টর বর্বরতায় লক্ষ লক্ষ শহীদের কবিগান*, টাউন প্রেস, শিলচর, ১৯৭১

রেহমান সোবহান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৮

শেখ আবদুল জলিল, *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও বাম প্রগতিশীল শক্তি*, ঢাকা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০

শেখ জমির আলী, *বাংলাদেশের কবিতা*, আল আমিন ইলেকট্রিক প্রিন্টিং প্রেস, সিলেট, ১৯৭১

খোন্দকার মো. নূরুন্নবী, *ঢাকা স্টেডিয়াম থেকে সেক্টর আট*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১২

সেমন্তী ঘোষ (সম্পাদিত), *দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্দতা*, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৪ (চতুর্থ সংস্করণ)

গৌতম ভদ্র, ইমানও নিশান উনিশ শতকে বাংলার'কৃষক চৈতন্যের এক অধ্যায় (আ.১৮০০-১৮৫০), সূবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৯৪

গোলাম মুস্তাফা (সম্পাদিত), *ফেনী -বিলোনিয়া রণাঙ্গনের এক প্রান্তর*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১২

গোলাম মুরশিদ, *মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর একটি নির্দলীয় ইতিহাস*, প্রথমা, ঢাকা, ২০১৩

সোহরাব হোসেন, *মুজিব-ভুট্টো-মুক্তিযুদ্ধ*, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১০

সোহরাব হাসান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের ভূমিকা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৭

সেলিনা হোসেন, *একাত্তরের ঢাকা*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০১৪

সেলিম রেজা(সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান*, অনুপম, ঢাকা, ২০১৭

হেনা দাস, *স্মৃতিময়' ৭১*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২

হোসেন শওকত, *একজন মুক্তিযোদ্ধা*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১১

হোসেন তওফিক ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১*, আগামী, ঢাকা, ২০০৪

চৌধুরী শহীদ কাদের, *মুক্তিযুদ্ধে বরাকের কবিতা ও কবিগান*, গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ২০১৭

চৌধুরী শহীদ কাদের, *মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরা: শরণার্থী, সংবাদপত্র ও সাধারণ মানুষ*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৬

জে এফ আর জেকব, *সারেন্ডার অ্যাট ঢাকা একটি জাতির জন্ম*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি:, ঢাকা, ২০১৬

ধীরাজ কুমার নাথ, *শরণার্থী শিবির ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা*, অনন্যা প্রকাশনী , ঢাকা, ২০১৭

ইদরিস আলম *(নাসিরুদ্দিন চৌধুরী সম্পাদিত), আমরা তখন যুদ্ধে*, প্রজ্ঞালোক, ঢাকা, ২০১৩

নাসিরুদ্দিন চৌধুরী (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম*, চট্টগ্রাম, ২০১৫

নীল কমল বিশ্বাস, *যুদ্ধে যুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা, ১৯৯৮

নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩ (চতুর্থ সংস্করণ)

নুরুজ্জামান ভূঁইয়া খোকন, *মায়ের কথায় মুক্তিযুদ্ধে*, চারুলিপি, ঢাকা, ২০১৫

নুরুন নাহার বেগম, *স্মৃতিতে ১৯৭১*, আগামী, ঢাকা, ১৯৯২

নুরুল আলম, *স্মৃতিময় একাত্তর*, সুলেখা, ঢাকা, ২০১৪

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *বঙ্গ পরিচয়*, ১ম খণ্ড, ওরিয়েন্টাল প্রেস, কলকাতা, ১৩৪০

পান্না কায়সার, *আমি ও আমার মুক্তিযুদ্ধ*, আগামী, ঢাকা, ২০০৯

পান্না কায়সার, *মুক্তিযুদ্ধের কথকতা*, চারুলিপি, ঢাকা, ২০১২

ফজলুল বারী, *একাত্তরের আগরতলা*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯৭

ফজলুল বারী, *একাত্তরের কলকাতা*, আগামী প্রকাশনী , ঢাকা, ১৯৯৩

ফকির আলমগীর (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধে বিদেশী বন্ধুরা*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৫

ফকির আলমগীর , *গণসঙ্গীত ও মুক্তিযুদ্ধ*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১০

বাসন্তী গুহঠাকুরতা, *একাত্তরের স্মৃতি*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা, ২০১৭

বাঙলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম সহায়ক সমিতি, *বাঙলাদেশ*, মুক্তধারা, কলকাতা, ১৯৭১

বীরেন সোম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শিল্পী সমাজ*, চন্দ্রাবতী, ঢাকা, ২০১৫

বুলবুল মহালনবীশ, *মুক্তিযুদ্ধের পূর্বপ্রস্তুতি ও স্মৃতি'৭১, ইত্যাদি*, ২০০৬

এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান এবং এস আর মীর্জা, *মুক্তিযুদ্ধে 'পূর্বাপার' কথোপকথন*, প্রথমা, ঢাকা, ২০১৬

এ আর মল্লিক, *আমার জীবন কথা ও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম*, আগামী, ঢাকা, ২০০৭

এ. এস. এম. সামছুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান*, সময়, ঢাকা, ২০১২

এ.টি.এম শামসুদ্দীন (সংকলিত ও অনুদিত), *পাকিস্তান যখন ভাঙলো*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা, ২০০৯

এই. এইচ. এম. বজলুর রহমান, *একাত্তরের ডায়েরি*, সময়, ঢাকা, ২০১০

মইনুল হাসান চৌধুরী, *এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০০

এইচ. টি. ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১*, আগামী, ঢাকা, ২০১০

মঈদুল হাসান (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধে কসবা : অংশগ্রহনকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা, ১৯৯৯

মঈদুল হাসান, *উপধারা একাত্তর মার্চ-এপ্রিল*, প্রথমা, ঢাকা, ২০১৭

মঈদুল হাসান, *মূলধারা' ৭১*, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯২(২য় সংস্করণ)

এম আর আখতার মুকুল এবং ড. মাহমুদা খানম রেবা, *একাত্তরের বর্ণমালা*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫

এম আর আখতার মুকুল, *কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৪

এম আর আখতার মুকুল, *আমি বিজয় দেখেছি*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৪

এম আর আখতার মুকুল, *চরমপত্র*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১০

এম এ ওহাব খান, *একাত্তরের জীবন*, সেন্টার ফর বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০১৫

মামুন সিদ্দিকী, *মুক্তিযুদ্ধের অজানা ভাষ্য*, সুবর্ণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭

মাহবুব কামাল (সম্পাদিত), *বিদেশী সাংবাদিকের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৬

মাহমুদ হাসান, *দিনপঞ্জি একাত্তর*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৩

মাহাম্মদ লুৎফুল হক ও রাশেদুর রহমান(সম্পাদিত), *রাজশাহী ১৯৭১ অংশগ্রহনকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান*, প্রথমা, ঢাকা, ২০১২

মানিক সরকার, *অতীত দিনের স্মৃতি*, জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, আগরতলা, ২০১৪

মহিউদ্দীন আহমেদ, *আওয়ামী লীগ যুদ্ধদিনের কথা ১৯৭১*, প্রথমা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭

মহিউদ্দীন আহমেদ, *এই দেশে একদিন যুদ্ধ হয়েছিল*, প্রথমা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৮

মতিউর রহমান (সম্পাদিত), *একাত্তরের বীরযোদ্ধা খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধদের বীরত্ব গাথা : ১ম ও ২য় খণ্ড*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৩

মতিউর রহমান (সম্পাদিত), *সম্মুখযুদ্ধ ১৯৭১ মুক্তিযোদ্ধাদের কলমে*, প্রথমা, ঢাকা, ২০১৬

মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন*, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬(২য় সংস্করণ)

মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত), *একাত্তরের বিজয় গাঁথা*, আগামী, ঢাকা, ২০০৬

মুনতাসীর মামুন ও হাসিনা আহমেদ (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধ পঞ্জি : ১ম-৬ষ্ঠ*, বাংলাদেশ চর্চা, ঢাকা, ২০১৩

মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায়, *বাংলাদেশ সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম (১৯৪৭-৯০)*, সময়, ঢাকা, ২০১৪

মুনতাসীর মামুন, *১৯৭১: অবরুদ্ধ দেশে প্রতিরোধ*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৭

মুনতাসীর মামুন, *ইয়াহিয়া খান ও মুক্তিযুদ্ধ*, সময় প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮

মুনতাসীর মামুন, *ইতিহাসের খেরোখাতা*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৬

মুনতাসীর মামুন, *বঙ্গবন্ধু কীভাবে আমাদের স্বাধীনতা এনেছিলেন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৩

মুনতাসীর মামুন, *বাংলাদেশের বাঙালি মানস রাষ্ট্র গঠণ ও আধুনিকতা*, সময়, ঢাকা, ২০০৭

মুনতাসীর মামুন, *বীরাঙ্গনা' ১৯৭১*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১৩

মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৩

মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধের ১৩ নম্বর সেক্টর*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১২

মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস: অন্যভাবে দেখা*, সময় প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮

মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধের ছিন্ন দলিলপত্র*, অনন্যা, ঢাকা, ২০২১

মুনতাসীর মামুন, *কবির অনশন ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, সময় প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪

মুনতাসীর মামুন, *বিজয়ী হয়েও যা পারিনি*, সময়, ঢাকা, ২০১২

মুহাম্মদ লুৎফুল হক(সম্পাদিত), *দিনাজপুর ১৯৭১ অংশগ্রহনকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান*, প্রথমা, ঢাকা, ২০১৩

মুহাম্মদ হাবিবুর রহামন, *স্বাধীনতার দায়ভার*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৩

মুজিবুর রহমান (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধে বাংলার কথা*, রাজশাহী, ২০১৫

যতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতির পক্ষে, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, মুক্তধারা, কলকাতা, ১৯৭১

রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস প্রসঙ্গ*, কাকলী, ঢাকা, ২০১৬

রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *একাত্তরের দশমাস*, কাকলী, ঢাকা, ১৯৯৭

রবীন সেনগুপ্ত, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরা কিছু স্মৃতি কিছু কথা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩

রবীন সেনগুপ্ত, *চিত্র-সাংবাদিকের ক্যামেরায় মুক্তিযুদ্ধ*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬

রশীদ হায়দার (সম্পাদিত), *স্মৃতি'১৯৭১ : ১ম-৮ম খণ্ড*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৭

রংগলাল সেন, দুলাল ভৌমিক এবং তুহিন রায়(সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি:, ঢাকা, ২০০৯

রাবেয়া খাতুন, *একাত্তরের নয়মাস*, আগামী, ঢাকা, ২০১৪

রাশেদুর রহমান, *কুমিল্লা ১৯৭১ অংশগ্রহনকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান*, প্রথমা, ঢাকা, ২০১২

রাহেলা বেগম, *একাত্তরের ভয়ংকর দিনগুলি*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১১

রাইমোহন দেব নাথ, *জয় বাংলার হত্যাকাণ্ডের কবিতা*, কাছাড়, ১৯৭১

রাহুল রায় (সম্পাদিত), *পশ্চিম থেকে পূর্ববঙ্গ : দেশবদলের স্মৃতি*, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৫

রফিকুল ইসলাম (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধের দু'শো রণাঙ্গন*, অনন্যা, ঢাকা, ১৯৯৮

রফিকুল ইসলাম , *বিদ্রোহী মার্চ ১৯৭১*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১০

রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশের গেরিলাযুদ্ধ*, কাকলী, ঢাকা, ২০১৪

রফিকুল ইসলাম, *একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে*, বাঁধন, ঢাকা, ২০১১

রফিকুল ইসলাম, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট রিরোধী শক্তি ও বৃহৎ শক্তির প্রতিক্রিয়া*, কাকলী, ঢাকা, ২০১২

রফিকুল ইসলাম, *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে,* অনন্যা, ঢাকা, ২০১০

শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী, *একাত্তর*, আগামী, ঢাকা, ২০০৯

শ্যামসুন্দর সিকদার, *একাত্তরের জীবন ও যুদ্ধ*, চারুলিপি, ঢাকা, ২০১৪

শওকত ওসমান , *১৯৭১ স্মৃতিখণ্ড মুজিবনগর*, সময়, ঢাকা, ২০০৯

শওকত ওসমান, *উত্তরপর্ব মুজিবনগর*, সময়, ঢাকা, ২০০৯

শওকত ওসমান, *কালরাত্রি খণ্ডচিত্র*, সময় প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৪

কল্যাণব্রত চক্রবর্তী(সম্পাদিত), *এপারে একাত্তর,* অক্ষর, আগরতলা, ১৯৯৭

কাদের সিদ্দিকী, *স্বাধীনতা' ৭১*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৭

কাদের সিদ্দিকী, *স্মৃতিময় দিনগুলি*, চিত্রা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭

কামরুল হাসান ভূইয়া, *স্বাধীনতা: সম্মুখ সময়ের যোদ্ধাদের অভিজ্ঞতা ১ম-৭ম খণ্ড*, সেন্টার ফর বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার স্টাডিজ, ঢাকা, ২০১৩

কামরুল হাসান ভূইয়া, *শ্রেষ্ঠ সময়ের কথা*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৪

শামসুল আলম সাঈদ, *একাত্তরের জীবন যুদ্ধ* , আগামী, ঢাকা, ১৯৯৪

শামসুল হুদা চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর*, ঢাকা, ১৯৮৫

কামাল লোহানী, *রাজনীতি মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীন বাংলা বেতারের ভূমিকা*, ঢাকা, ২০১২

কামাল হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধ কেন অনিবার্য ছিল*, প্রথমা, ঢাকা, ২০১৭

কামালুদ্দীন আহমেদ, *করিমগঞ্জের ইতিহাস*, নতুন দিগন্ত, শিলচর, ২০১৩

শাহরিয়ার কবির (সম্পাদিত), *সেক্টর কমান্ডাররা বলছেন মুক্তিযুদ্ধের স্বরণীয় ঘটনা*, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১০

শাহরিয়ার কবির, *শেখ মুজিব ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা*, সময়, ঢাকা, ২০১১

শাহরিয়ার কবির, *বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক: বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা,* অনন্যা, ঢাকা, ২০১৩

শাহরিয়ার কবির, *মুক্তিযুদ্ধে ভারত ও মিত্রদের অবদান* , একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটি, ঢাকা, ২০০৬

কাজী ফজলুর রহমান, *দিনলিপি একাত্তর,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০০

শান্তা সেন, *জন্ম ও জন্মান্তর*, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৫

শক্তি চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *সাংবাদিকের চোখে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ,* পড়ুয়া প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৮ (নতুন সংস্করণ)

কুতুব আজাদ সাহেদ মন্তাজ, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পত্রিকাপঞ্জি,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮

খন্দকার মো. নুরন্নবী, *ঢাকা স্টেডিয়াম থেকে সেক্টর আট*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১২

খালেদ মোশাররফ, *মুক্তিযুদ্ধে ২নং সেক্টর এবং কে ফোর্স*, প্রথমা, ঢাকা, ২০১৩

খালেদুর রহমান শাকিল (সম্পাদিত), *আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ,* অন্বেষা, ঢাকা, ২০১৩ বাসব

সরদার মাহমুদ হোসেন, *একাত্তরের বাংলাদেশ*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩

সরদার জহুরুল আনোয়ার, *একাত্তরের ডায়েরি*, সময়, ঢাকা, ২০১০

সাঈদ হাসান দারা, *মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১: একটি পূর্ব ঘোষিত গণহত্যার ঘটনাপঞ্জি*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫

সারওয়ার আলী, *পেরিয়ে এলাম অন্তবিহীন পথ,* মাখদুমা নার্গিস, ঢাকা, ২০১০

সালাউদ্দীন আহমদ, মোনায়েম সরকার, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস*, আগামী, ঢাকা, ২০১৩

সালাউদ্দীন আহমদ, *একাত্তরের চিঠি*, প্রথমা, ঢাকা, ২০১৭

সালাহউদ্দীন আহমদ, *বাঙালির সাধনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, সাহিত্য, ঢাকা, ২০১১

সা'দত হুসাইন, *মুক্তিযুদ্ধের দিন দিনান্ত*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১১

সানি মনোয়ার, *মুক্তিসময় ও কিছু স্মৃতি*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৬

সলিমুল্লাহ খান(সম্পাদিত), *বেহাত বিপ্লব ১৯৭১*, আগামী, ঢাকা, ২০১৭

সুখেন্দু সেন, *শরণার্থী ১৯৭১, সময়, ঢাকা, ২০১৭*

সুভাষ মুখোপাধ্যায়, *বাঙালির ইতিহাস*, কলকাতা, ১৯৬০

সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সিপিআইএম ও গণশক্তি*, মাওলা, ঢাকা, ২০০১

সুকুমার বিশ্বাস (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী অংশগ্রহনকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৭

সুকুমার বিশ্বাস(সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে আগরতলা ত্রিপুরা দলিলপত্র*, ইত্যাদি, ঢাকা, ২০০৭

সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশ মুক্তির লড়াই*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১২

সুকুমার বিশ্বাস,*বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ভূগোল-ইতিহাস*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭

সুফিয়া কামাল, *একাত্তরের ডায়েরী*, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬

সুফিয়া কামাল, *মুক্তিযুদ্ধ মুক্তির জয়*, সময় প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩

সুজিত চৌধুরী, *শ্রীহট্ট-কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস*, দিনকাল, শিলচর, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ

হারুন হাবীব সম্পাদিত, *প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে মুক্তিযুদ্ধ : নির্যাতন গণহত্যা প্রতিরোধ*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ২০১৬

হারুন হাবীব, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত: তথ্য ও দলিল ত্রিপুরা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৭

হারুন হাবীব, *মুক্তিযুদ্ধ ডেটলাইন আগরতলা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯২

হারুন হাবীব, *মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত প্রবন্ধ*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০০

হারুণ হাবীব, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত তথ্য ও দলিল আসাম মেঘালয়,* সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮

হারুণ হাবীব, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত তথ্য ও দলিল পশ্চিমবঙ্গ,* সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮

হারুণ হাবীব, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত তথ্য ও দলিল ত্রিপুরা,* সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮

হাসান ফেরদৌস, *১৯৭১ বন্ধুর মুখ শত্রুর ছায়া*, প্রথমা, ঢাকা, ২০১২

হাসান ফেরদৌস, *মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত বন্ধুরা*, প্রথমা, ঢাকা, ২০১৩

হাসান হাফিজুর রহমান(সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র(১৫ খণ্ড), তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৭৮-১৯৮৫*

হায়দার আলী খান, *মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি প্রবাসে আলোর গান*, প্রথমা, ঢাকা, ২০১৬

হাসিনা আহমেদ, *১৯৭১: মুক্তিযুদ্ধের পত্রপত্রিকা*, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৭

ছদ্‌রদদীন, *মুক্তিযুদ্ধ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে*, ইউপিএল, ১৯৮৩, ঢাকা

জয়া চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ হল, হিন্দু সাম্প্রদায়ীকতা ও দেশ-বিভাগ ১৯৩২-১৯৪৭*, ইউ পিএল, ঢাকা, ২০০৩

জাফর ইমাম, *দাম দিয়ে কিনেছি এই বাংলা*, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০১৬

ঝর্ণা বসু এবং মফিদুল হক (সম্পাদিত), *অবরুদ্ধ অশ্রুর দিন পারিবারিক স্মৃতিভাষ্য ১৯৭১*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২

হুমায়ন হাসান, *মুক্তিযুদ্ধের জলসীমায়*, সেন্টার ফর বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার স্টাডিজ, ঢাকা, ২০১১

দিগেন্দ্র কুমার দাস, *মুক্তি সংগ্রামে জয় বাংলার কবিতা*, বাংলাদেশ ত্রাণ কমিটি, উদারবন্দ, ১৯৭১

দিনু বিল্লাহ, *টয় হাউজ থেকে ১৯৭১ মৃত্যু ছায়াসঙ্গী*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২

দিলীপ চক্রবর্তী, *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ডায়েরী: একাত্তরের রাত-দিন*, সুবর্ণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৮

বি রমন, *র এর কাওবয়েরা, স্মৃতির সিড়িতে অবরোহন*, প্রতীতি প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৮

বিপ্রদাশ বড়ুয়া(সম্পাদিত), *স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র ও শব্দসৈনিক*, পার্ল, ঢাকা, ২০১২

বিমল প্রামানিক, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা*, পত্রলেখা, কলকাতা, ২০১০

বিমান বিহারী মজুমদার, *ভারতের শাসন পদ্ধতি*, কলিকাতা, ১৯৬৩

বিকচ চৌধুরী, *লক্ষ মুঠিতে ঝড়ের ঠিকানা*, ত্রিপুরা দর্পণ, আগরতলা, ২০০৩

মিজানুর রহমান খান, *১৯৭১ আমেরিকার গোপন দলিল*, সময়, ঢাকা, ২০১০

লিজি রহমান, *কিশোরীর চোখে মুক্তিযুদ্ধ*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৬

সিরু বাঙালী, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: বহির্বিশ্বে শত্রুমিত্র*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১১

সিরাজ উদদীন আহমেদ, *বাংলাদেশ গড়লো যারা*, কাকলি, ঢাকা, ২০১০

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *বাঙালীর জাতীয়তাবাদ*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৫

সিমিন হোসেন রিমি, *তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি(চার খণ্ড একত্রে)*, প্রতিভাস, ঢাকা, ২০১৭ (২য় সংস্করণ)

দ্বিজেন শর্মা, *আমার একাত্তর ও অন্যান্য*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪

তপন কুমার দে, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা*, কাকলী, ঢাকা, ২০১১

তপন চক্রবর্তী, *মুক্তিযুদ্ধের ধূসর স্মৃতি: মিজোরামের শরণার্থী*, অবসর, ঢাকা, ২০১৭

তাজুল মোহাম্মদ, *গৌরবের যুদ্ধ*, চারুলিপি, ঢাকা, ২০১১

তাজুল মোহাম্মদ, *১৯৭১ যুদ্ধদিনের স্মৃতি*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৩

তাজুল মোহাম্মদ, *প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্যে মুক্তিযুদ্ধ*, চারুলিপি, ঢাকা, ২০১৬

তাজুল মোহাম্মদ, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সন্ধানে*, চারুলিপি, ঢাকা, ২০১৪

ওয়েবসাইট

www.viswayan.com

www.wb.gov.in (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট)

www.meghalaya.gov.in (মেঘালয়রাজ্য সরকারের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট)

www.tripura.gov.in (ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট)

www.assam.gov.in (আসাম রাজ্য সরকারের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট)

www.mizoram.gov.in (মিজোরাম রাজ্য সরকারের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট)

www.mizorzm.nic.in

www.bengali.mapsofindia.com

www.thefreedictionary.com

www.collinsdictionary.com

www.britannica.com

www.bn.banglapedia.org

www.wikipedia.org

পিএইচডি অভিসন্দর্ভ

Major Kamrul Hasan, *India's Decisive intermission: Effectiveness of its Assistance during the Liberation war of Bangladesh 1971*, US Army Staff College

Nayanika Mookherjee, *A Lot of History: Sexual Violence, Public Memories and the Bangladesh Liberation War of 1971*, D. Phil thesis in Social Anthropology, SOAS, University of London, 2002

Chandra, Sunil, *Bilateralism in South Asia : A cash study of Indo-Bangladesh Relations,* Ph. D. thesis, New Delhi : Jawaharlal Nehru University, 1979

Singh Guruvinder, *Indian Diplomacy in Bangladesh 1971-1980*, M. Phil Thesis, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, 1981

P. S. Jayarmu., *Bangladesh Crisis: A story in crisis Management,* Ph. D. thesis, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, 1974

মোহাম্মদ সেলিম, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারতের রাজনৈতিক দল*, বাংলাদেশ চর্চা, ঢাকা, ২০০৪

মোহাম্মদ সেলিম, *বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক ১৯৭১-১৯৮১*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯

আশীষ কুমার দাস, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারত*, লাকী পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৬

স্মারক বক্তৃতা

শাহরিয়ার কবির, '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান এবং বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক, অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী স্মারক বক্তৃতা, কলকাতা, ১৮ জুন ২০১১

সংবাদ-সাময়িকপত্রে প্রকাশিত বাংলা প্রবন্ধ

তপন বন্দোপাধ্যায়, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতার ভূমিকা', *অন্য ক্যানভাস*, পশ্চিম মেদিনীপুর, এপ্রিল সংখ্যা, ২০০৪

সব্যসাচী গোস্বামী, ‘নকশালবাড়ি আন্দোলন ও বাংলা কবিতা’, মঙ্গলধ্বনি, কলকাতা, মে ২০১৫

সাব্বির হোসাইন, ‘মুক্তিযুদ্ধে সহোদর পশ্চিমবঙ্গ’, ২৬ মার্চ ২০১৭, (www.neonaloy.com)

অমিতাভ ভট্টশালী, ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কেন পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যে-সিনেমায় উপেক্ষিত’, *বিবিসি বাংলা*, কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৬

সুবোধ মুখার্জি, ‘একাত্তরে কলকাতার মুক্তিসংগ্রাম সহায়ক সমিতি’, একুশে সংকলন, *বোধন*, কলকাতা, ১৯৯৮

তরুণ স্যানাল, একাত্তরে কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা’, *দহন*, পূজা সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৯৭

আরাফাতুল ইসলাম, ‘রুপালি পর্দায় একাত্তরের দুঃসময়ের বন্ধুদের কথা’, ১২ ডিসেম্বর ২০১১ www.dw.com/bn

মোঃ জাকির হোসেন, ‘মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরার স্মৃতি’, *মুক্তিবার্তা*, ঢাকা, ১৯৯৭, ঢাকা

মৃণাল কান্তি ভৌমিক, ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সিভিল ডিফেন্স’, *দৈনিক সংবাদ*, আগরতলা, ২০০৯

মাজেদুল নয়ন, হরিদাসের বাড়ি হয়ে মাইল্লাম, ‘ভারত কত দূর?’, *বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম*, ০৪ ডিসেম্বর ২০১৬

ইকরাম-উদ-দৌলা, তোরা, ‘তেলডালা থেকে মুজিব’, *বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম*, ০৩ ডিসেম্বর ২০১৬

মাজেদুল নয়ন, ‘শরণার্থী ক্যাম্পের স্বেচ্ছাসেবক অমর সিংহ’, *বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম*, ০৩ ডিসেম্বর ২০১৬

মৃন্ময় রায়, পটভূমি’, বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, ২৭তম *অধিবেশন স্মরণিকা*, শিলচর, ভারত

মনোজ অধিকারি,‘ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল দিনগুলোতে’, *সমকাল*, বর্ষ ১, সংখ্যা ১, করিমগঞ্জ

মৃণাল কান্তি ভৌমিক, ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আমরা’, *সুভাষ*, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৯৯

রমেশ দাস, ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বোধজং স্কুল’, *স্কুল স্মরণিকা*, আগরতলা, ১৯৯৬

চৌধুরী শহীদ কাদের, ‘ভিন্ন এক জয়বাংলার গল্প’, *বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডটকম*, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৭

জাকারিয়া পিন্টু, ‘মুক্তিযদ্ধের প্রেরণা স্বাধীনবাংলা ফুটবল দল’, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৭, *News 24.com*

গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলা প্রবন্ধ

চৌধুরী শহীদ কাদের, 'মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরার চিকিৎসা কর্মীদের ভূমিকা', *প্রবন্ধ সংগ্রহ* ১, বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী, ঢাকা, ২০১৬

চৌধুরী শহীদ কাদের, 'মুক্তিযুদ্ধে বরাকের চিকিৎসা কর্মীদের ভূমিকা', *প্রবন্ধ সংগ্রহ* ৩, বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী, ঢাকা, ২০১৭

চৌধুরী শহীদ কাদের, 'মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরার তৃণমূল মানুষের ভূমিকা', *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, ঢাকা, ২০১৬

চৌধুরী শহীদ কাদের, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধঃ ত্রিপুরার সংবাদপত্র', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা ৯৫, ঢাকা, ২০১৫

সুরমা জাকারিয়া চৌধুরী, 'বাংলাদেশ-নেপাল সম্পর্কের ক্রমোন্নয়ন(১৯৭১-১৯৮১)', *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, ২৩-২৪, ১৪০২-১৪০৪

অভিজিৎ বঙ্গোপাধ্যায়, 'অমর মিত্রের মনে দেশভাগঃ উত্তর প্রজন্মের চোখে বিচ্ছিন্নতা, স্মৃতি ও স্বপ্ন', *International Journal of institution and social science securities*, vo.111, Issue-V, 2017

সংবাদ-সাময়িকপত্রে প্রকাশিত ইংরেজি প্রবন্ধ

'The Pakistani Refugee Disaster ', *Life*, New York, Vol. 70 No 23, 18 June 1971

'The Bengali Refugees: A surfeit of woe ', *New York Times*, 19 June 1971

'Max Beattie, Death reaps a Young harvest ', *Washington Daily News*, 14 September 1971

Mahadev Chakravarti, 'The Role of Tripura in the Liberation War of Bangladesh', *Souvenir 2nd International Conference*, Bangladesh Itihas Sammilani, Dhaka, 2014

গবেষণা পত্রিকায় ইংরেজি প্রবন্ধ

Daniel C. Park, ‘India’s Intermission in East Pakistan: A Humanization Intermission or an Act of National Interest?’, *Synergy, The Journal of Contemporary Asian studies,* vol. 155, 3 Feb 2016

Jaglul Haider, ‘A Revisit to the Indian Role in the Bangladesh Liberation War ’, *Sage: Journal of Asian and African studies,* Vol. 44, No.5, 2009

Navine Murshid, ‘India’s Role in Bangladesh’s war of independence: Humanitarianism or self- Interest?’ *Economic and Political Weekly,* Vol. 46, No. 52, December 24, 2011

N.S Journal, ‘Border Management: Dile of Guarding the India-Bangladesh Border ’, *Institute for Defense Studies and Analyses Journal,* (Idsa.in), India, Vol-28 Issue-1

D.D Pramanik, ‘Joy Bangla, An epidemic of conjunctivitis in India ’, *The Practitioner,* December Issue, 1971

Drong Andrio, ‘India’s role in the emergence of Bangladesh as an independent state ’, *Vestnik RUDN International relations*, 16 (4), 2016

Amit Ranjan, ‘Bangladesh Liberation War of 1971: Narratives, Impacts and the Actors ’, Sage, *India Quarterly: A Journal of International Affairs*, 2016

Joseph O'Mahoney, ‘Making the Real: Rhetorical Adduction and the Bangladesh Liberation War, International Organization ’, *Cambridge University Press,* Volume 71, Issue 2, spring 2017

Louise Harrington, ‘Women and Resistance in West Bengal and Bangladesh: 1967–1971 ’, (online- http://eprints.soas.ac.uk/13621/1/Harrington.pdf)

Amit Ranjan, ‘Bangladesh Liberation War of 1971: Narratives, Impacts and the Actors ’, *Sage Journals,* Vol 72, Issue 2, 2016

Ahmed Abdullah Jamal, ‘Mukti Bahini and The Liberation War of Bangladesh: A Review of Conflicting Views ’, *Asian Affairs*, Vol. 30, No. 4 : 5-17, October-December, 2008

Abu Saleh Md. Rafi, ‘The Recent Revolution on Celluloid: A Change in the Socio -Cultural Environment ’, *Bangladesh Journal of Environmental Science*, Vol 20, June 2011

J. Bakshi, ‘Soviet Attitude towards Bangladesh Liberation Movement: A Study in Content Analysis of Soviet Press ’, *The Indian Journal of Political Science*, Vol. 38 (02), 1977

M. Hossain, ‘Bangladesh War of Independence: A Moral Issue, Economic and *Political Weekly* ’, Vol. 44 (05), 2009

Onkar Marwah, ‘India’s Military Intervention in East Pakistan, 1971—1972 ’, *Modern Asian Studies*, 13 (04), 1979

Yasmin Saikia, ‘Beyond the Archive of Silence: Narratives of Violence of the 1971 LiberationWar of Bangladesh ’, *History Workshop Journal*, 58 (03), 2004

Chirantan Kumar, ‘Migration and Refugee Issue Between India and Bangladesh’, *Scholar’s Voice: A New Way of Thinking*, Centre for Defence Studies Research & Development, Vol. 1, No. 1, January 2009

Md. Iqthyer Uddin Zahed, ‘An Analysis of U.S, Policy in the Liberation War of Bangladesh’, *IOSR Journal of Humanities and Social Science 23*, no. 2, May-June 2013

M Rashiduzzaman, ‘Leadership, Organization, Strategies and Tactics of the Bangladesh Movement’, *Asian Survey*, Vol. 12, No. 3, March 1972

Tazeen M. Murshid, ‘State, Nation, and Identity: The Quest for Legitimacy in Bangladesh ’, *South Asia: Journal of South Asian Studies*, Vol. 20, Issue 2

C. Christine Fair, Clifford A. Grammich, Julie DaVanzo, Brian Nichiporuk, 'Demographics and Security: The Contrasting Cases of Pakistan and Bangladesh', *Journal of South Asian and Middle Eastern studies,* No. 4, summer 2005

Meherunnisa Ali, 'East Pakistan Crisis: Internatinal Reactions', *Pakistan Horizon,* Vol. XXIV, No, 2, Second Quarter, 1971

S.M. Burke, 'The Postwar Diplomacy of the Indo-Pakistani war of 1971', *Asian Survey*, Vol. 13, No.5, May 1973

K Sarwar Hasan, ' Political Background of the East Pakistan Crisis ', *Pakistan Horizon,* Vol. XXIV, No 2, Second Quarter, 1971

M.G Kabir, ' U.S. Policy and the Bangladesh Crisis of 1971 ', *BISS Journal*, 9 April 1988

Satish Kumar, 'The Evolution of India's policy Towards Bangladesh 1971', *Asian Survey* , Vol. 15, No 6, June 1975

Robert Laporte Jr., 'Pakistan in 1971: The Disintegration of a Nation', *Asian Survey*, Vol 12, No 2, Feb 1972

Talukder Maniruzzaman, ' Radical Politics and the Emergence of Bangladesh ', Paul R Brass and Marcus Franda (Ed.), *Radical Politics in South Asia,* Cambridge: The MIT Press, 1973

Rajan Menon, 'India and the Soviet Union: A new stage of Relation?', *Asian Survey*, Vol. 18, 1978

Padmaja Murthy, 'The Gujral Doctrine and Beyond', *Strategic Analysis,* Vol XXIII, No. 4, July 1999

M Rashiduzzaman, 'Bangladesh in 1977: Dilemma of the Military Rules', *Asian Survey*, 18: 2, February 1978

Muhammed A.Tayyeeb, ‘A Bangladesh: The Dilemma of Independence’, *Asian Affairs*, January –February, 1978

অপ্রকাশিত প্রবন্ধ

প্রমথেশ মুখার্জী, ‘বিপ্লবী জননেতা ত্রিদিব চৌধুরীর দৃষ্টিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম **১৯৭১**’, (মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় পরিচয়ের সূত্র ধরে বহরমপুর থেকে অপ্রকাশিত প্রবন্ধটি একটি চিঠিসহ পাঠিয়েছেন প্রমথেশ মুখার্জী)

আহমেদ হোসাইন, ‘মুক্তিযুদ্ধে মেঘালয়’, (আমার অনুরোধে নিজেদের পরিবারের একাত্তরের অভিজ্ঞতা লিখেছেন)

মৃণাল কান্তি ভৌমিক, ‘মুক্তিযুদ্ধে জি.বি. হাসপাতালের ভূমিকা’, আমার অনুরোধে লিখেছেন একাত্তরে জিবি হাসপাতালের স্মৃতি

পরিশিষ্ট-এক

আসামের বরাক উপত্যকার সাধারণ মানুষের সহায়তার একটি তালিকা

একাত্তরে বরাকের সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততা কতটা ছিল? সেটা খুব সহজে বোঝা যায় করিমগগঞ্জের বাংলাদেশ ত্রাণ কমিটির ত্রাণ দাতাদের তালিকা দেখলে। *হাজী দানেশ আলী এন্ড সন্স* করিমগঞ্জ শহরের সাধারণ এক মুদি দোকান একাত্তরে শরণার্থীদের জন্য ত্রাণ তহবিলে দান করছেন এক বস্তা আলু ও দুই বস্তা পিঁয়াজ, করিমগঞ্জ শহরের এক সাধারণ গৃহস্থ সূর্য কুমার দে ত্রাণ তহবিলে দান করলেন এক বস্তা লবণ। কেউ দিচ্ছেন লুঙ্গি, কেউবা দিয়াশলাই, চা পাতা, কাপড় থেকে কেরোসিন নিজের সাধ্যের সর্বোচ্চটুকু নিয়ে তৃণমূল এক হলেন জয় বাংলার জন্য। দুস্পাপ্য এই তালিকাটি পাওয়া গেছে ত্রাণ কমিটির সম্পাদক ও *দৃষ্টিপাত* পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন্দ্র কুমার সিনহার পুরানো ফাইলে। মুক্তিযুদ্ধের দুর্লভ এই ডকুমেন্টসটি পেতে সহায়তা করেছেন ভূপেন্দ্র কুমার সিনহার বড় ছেলে মানস কুমার সিনহা।

মাতৃভান্ডার– ১ বস্তা চাল

সারৌগী ট্রেডিং- ১ বস্তা চাল

মফিজ মিয়া- ১ বস্তা পিঁয়াজ

রফিক সওদাগর-১ টিন তৈল

আবদুল রকিব– ১ বস্তা আলু, ১ বস্তা পিঁয়াজ

হাজী দানেশ আলী এন্ড সন্স– ১ বস্তা আলু, ২ বস্তা পিঁয়াজ

মেসার্স শান্তি ট্রেডার্স- ২ বস্তা লবণ

মেসার্স সুবোধ পাল– ১০ টাকা

মেসার্স সৈব আলী– ১ বস্তা পিঁয়াজ

মেসার্স পি সি পি আর পি কে রায়– ২ বস্তা পিঁয়াজ

ললিত রায়– ১ বস্তা পিঁয়াজ

রাকেশ চন্দ্র রাসবিহারী দত্ত– ১০ টাকা

রসিদ আলী হাজী – ৪০ টাকা

রাম দত্ত সোপ ওয়ার্কস– ৫১ টাকা

আবদুল মান্নান– ৫ টাকা

গোপেন্দ্র চন্দ্র রায়– ১১ টাকা

প্রফুল্ল ঘোষ– ২৫ টাকা

পবিত্র মোহন বণিক– ৫১ টাকা

সুনীল চন্দ্র সাহা– ১২ টাকা

যদুলাল পাল- ২ বস্তা লবণ

মতিলাল পাল– ১ বস্তা লবণ

কমলা ভান্ডার- ২ বস্তা লবণ

ব্রজ গোপাল রায়– ১১ টাকা

মেসার্স মনমোহন নারায়ণ দাস– ১০১ টাকা

পরিতোষ চন্দ্র রায়– ১ বস্তা ডাল

শ্রীশ চন্দ্র দাস– ১০ টাকা

মেসার্স রাধা বিলাস সুরেশ চন্দ্র বণিক– ৫১ টাকা

প্রফুল্ল কুমার দাস– ২৫ টাকা

হাজী উলফৎ আলী–১৫ টাকা

সুধাংশু মোহন দেব– ১ বস্তা লবণ, ১ বস্তা পিঁয়াজ

দ্বিজেন্দ্র লাল দেব– ১ বস্তা লবণ

কৃষ্ণধন পাল– ১ বস্তা পিঁয়াজ

বিনোদ বিহারী দে – ৫ টাকা

পুলিন বিহারী দে– ১০ টাকা

বিশ্বেশ্বর দাস– ১ ড্রাম কেরোসিন

মেসার্স শিব সাগর মিশ্র– ১ বস্তা লবণ

সূর্য কুমার দে– ১ বস্তা লবণ

প্রভাত চন্দ্র রায়– ৫ টাকা,

হাজী সোনাহার আলী– ১ বস্তা আলু

সন্তোষ কুমার জৈন– ১ বস্তা পিঁয়াজ, ১ বস্তা লবণ, ১ বস্তা ডাইল, ১ টিন তৈল

হাজী ইয়াছিন আলী– ১ বস্তা আলু,

শ্রীবিপিন বিহারী রায়– ১ বস্তা লবণ

আবদুল খালিক, আয়ুব আলী– ১ বস্তা আলু, ১ বস্তা পিঁয়াজ

শিব নন্দন সিং– ১ বস্তা লবণ, ১ বস্তা ডাইল

নিশি কান্ত সন্তোষ দে– ১ টিন তৈল, ২ বস্তা লবণ,

জেঠমল– ১ টিন তৈল

মেসার্স জহির আলী– ২৫ টাকা

অদ্বৈত চরণ রায়– ১৫ টাকা

মহেন্দ্র ভান্ডার– ২৫ টাকা

সুনীল রায়– ১০ টাকা

আবদুল কাদের– ২ প্যাকেট লুঙ্গি

রমেশচন্দ্র বণিক– ৫ টাকা

শঙ্কর ট্রেডিং– ২৫ টাকা

ঠাকুর দাস গুরুপদ দাস– ২৫ টাকা

বিশ্বম্ভর বণিক– ৩৫ টাকা

মালক্ষী ভান্ডার– ২৫ টাকা

হরিপদ দাস– ২৫ টাকা

কানাই দাস– ১১ টাকা

মেসার্স মোহন দাস– ১৫ টাকা

শ্যাম ভান্ডার– ১০ টাকা

অমুল্য স্টোর্স ২৫ টাকা

রামকৃষ্ণ দাস এন্ড সন্স– ৫১ টাকা

গন্ধেশ্বরী ভান্ডার– ১০১ টাকা

মাড়োয়ারী এসোশিয়েশন– ৪০১ টাকা

নৃপেন্দ্র দাস– ২৫ টাকা

মনীন্দ্র কুমার বোস– ১৫ টাকা

মদন মোহন রায়– ৫ টাকা

মেসার্স কল্যাঠু ষ্টোর– ৫১ টাকা

বস্ত্র নিকেতন– ২৫ টাকা

লোকনাথ ট্রেডিং– ১ টিন তৈল, ১ বস্তা লবণ

প্রসন্নময়ী ভান্ডার– ১০ টাকা

বীরেন্দ্র কুমার দাস– ১১ টাকা

বিনোদ কুমার শর্মা– ১০ টাকা

বুধাই নেপাল চন্দ্র সাহা– ১ টিন তৈল, ১ বস্তা লবণ

দেব এন্ড কোং– ২৫ টাকা

আঃ রৌফ চৌ ও হাজী ইরশাদ আলী– ১ বস্তা পিঁয়াজ, ১ বস্তা লবণ

হরেন্দ্র চন্দ্র বণিক– ২ বস্তা লবণ

মহিম চন্দ্র দেব– ৫ টাকা

মেসার্স জে. সি. রায় ও জি. সি. রায়– ১ ড্রাম কেরোসিন

মেসার্স নিশিকান্ত মধুসূদন সেন– ১ টিন তৈল, বস্তা লবণ, ২ টিন বিস্কুট

আশুতোষ বণিক– ৫০ টাকা

মেসার্স সুরেখা এয়ার ট্রান্সপোর্ট– ১০১ টাকা

ভারতলক্ষী মিষ্টান্ন ভান্ডার– ৫ টাকা

মেসার্স এয়ার লিফট– ৫১ টাকা

এ. রাজ্জাক– ৫ টাকা

মন্তজির আলী– ২৫ টাকা

আ: বাছিত– ১০ টাকা

মগ্নময়ী মিষ্টান্ন ভান্ডার – ৫ টাকা

মঙ্গন উদ্দীন চৌধরী উকিল– ১০ টাকা

ইয়াকুব আলী চৌধুরী মাষ্টার– ৫ টাকা

হাজী ইছমাইল আলী– .৫০ পয়সা

আবদুর রহমান– ১ টাকা

ইছাক আলী– ১ টাকা

ওয়াজিদ আলী– ১ টাকা

আবদুল ওয়াজিদ আলী– ১ টাকা

কনু মিয়া– ১ টাকা

আবদুল ফাত্তাহ– ১ টাকা

মজিদ আলী– ১ টাকা

মকদ্দছ আলী– ৫ টাকা

ইলাই মিয়া– ১ টাকা

ছিপই মিয়া ও মুবই মিয়া– ১ টাকা

আবদুল মজিদ– ১ টাকা

ইছুব আলী– .৫০ পয়সা

আবদুর রউফ– ১ টাকা

হাজী আ: রহিম– ১ টাকা

লালচাঁদ, জগৎমল, গোলছান– ১ টিন তৈল ও ৫১ টাকার কাপড়

চাঁদমল, শ্রীখনচাঁদ– ২ টিন তৈল, ১ বস্তা চিনি ও ২০০ টাকার কাপড়

চুনীলাল, তনসুখ দাস, লালানী– ১ টিন তৈল ও ১০০ টাকার কাপড়

তুলসীরাম , তুলারাম জৈন– ১ টিন তৈল, ২ বস্তা লবণ

পাটুয়া ব্রাদার্স– ১ টিন তৈল, ১০০ টাকার কাপড়

জেঠমল, তারাচাঁদ বোথরা– ১ টিন তৈল

এস নাহাটা এন্ড সন্স– ১ টিন তৈল ও ৪ বস্তা লবণ

শেঠিয়া ব্রাদার্স– ২ টিন বিস্কুট

দানমল মুলচাঁদ– ২১ টাকার কাপড়

তুলারাম পুপুলিয়া– ১ পেটি চা

আনন্দমল ভ্রমরলাল বক্সী– ২১ টাকার কাপড়

নথমল হেমরান্ত– ৫০ কেজি ডাইল

কাইলাল তাঁতেড়– ৫০ টাকার কাপড়

কিস্তর চাঁদ বোথরা– ৩১ টাকার কাপড়

হীরালাল বংশীলাল– ২১ টাকার কাপড়

হীরালাল আনন্দমল– ৩১ টাকার কাপড়

জৈন ব্রাদার্স– ৫১ টাকার কাপড়

রামলাল পানমল– ২১ টাকার কাপড়

ঝুমরমল বোথরা– ১৮ ডজন মেচ

হুলাস চাঁদ মোতীলাল– ৫০ টাকার কাপড়

রতনলাল করণী- ৮১ টাকার কাপড়

খেওরচাঁদ গঙ্গ– ৫০ কেজি ডাইল

সুগন চাঁদ সাও– ৪১ টাকার কাপড়

কৈরো সিংহ– ২ টাকা

আচন মিয়া– ১ টাকা

নিছার আলী– ১ টাকা

রাজেন্দ্র ভট্টাচার্য– ১ টাকা

খলিলুর রহমান– ১ টাকা

ছনুহর আলী– ১ টাকা

ভূপেন্দ্র দাস– ১ টাকা

আকদ্দছ আলী– ১ টাকা

পাখী মিয়া– ১ টাকা

মহছিন আলী– ১ টাকা

আতর আলী– ১ টাকা

আছফর আলী– ১ টাকা

ইলাছুর রহমান– ১ টাকা

শশীন্দ্র মোহন নাথ– ১ টাকা

কামনী কান্ত রায়– ১ টাকা

বারীন্দ্র সেন– ১ টাকা

নিহার রঞ্জন দাস– ২ টাকা

যোগেন্দ্র নমঃশুদ্র- ১ টাকা

সতোন্দ্র কুমার দাস– ১ টাকা

মন্টুলাল দাস– ১ টাকা

তছব্বর আলী চৌধুরী– ১ টাকা

মনোরঞ্জন দাস, মনোরঞ্জন পাল– ৩ টাকা

রজনী কান্ত রায়– ১ টাকা

দেবেন্দ্র কুমার শর্মা– ১ টাকা

নিতাগোপাল চৌধুরী– ১ টাকা

মাহমুদ আলী– ১ টাকা

ছবির আলী– ১ টাকা

মজিব আল– ১ টাকা

দরবারী মিয়া– ১ টাকা

জলধর দাস– ১ টাকা

আজিজুর রহমান– ১ টাকা

হাজী মকদ্দছ আলী– ১ টাকা

তছব্বর আলী– ১ টাকা

হেমলতা ঘোষ– ১ টাকা

আছব আলী– ১ টাকা

আবদুল করিম– ১ টাকা

রিয়াছদ আলী– ১ টাকা

গোপেশ চন্দ্র ভৌমিক– ১ টাকা

সুরমান আলী– ১ টাকা

ধীরেন্দ্র লাল নমশূদ্র– ১ টাকা

প্রেমেন্দ্র লাল বিশ্বাস– ১ টাকা

দেবেন্দ্র চন্দ্র দাস– ১ টাকা

বীরেশ চন্দ্র নাথ– ১ টাকা

চরিত্র বালা দেবী– ১ টাকা

মনোরঞ্জন নাথ– ১ টাকা

সুনাতন দাস বৈষ্ণব– ১ টাকা

চরিত্র মোহন দে– ১ টাকা

অম্বিকা নমঃশূদ্র– ১ টাকা

আবদুল মুক্তাদির চৌধুরী উকিল– ৫০ টাকা

মন্তরুপ আলী মিয়া– ১০ টাকা

ছফির উদ্দীন আহমেদ– ২ টাকা
ফুলেশ্বও সিংহ– ২ টাকা
জগন্নাথ রায়– ১ টাকা
সেনাচাউবা রাজকুমার– ২ টাকা
এইচ. পি. সিংহ– ১ টাকা
নির্মল কুমার ঘোষ– ৫ টাকা
আ: আলিম উদ্দীন– ১ টাকা
সতীশ মালাকার– ১ টাকা
বীরেশ চন্দ্র দাস– ২ টাকা
আবদুল মত্তলিব– ১ টাকা
বিনয় ঘোষ– ১ টাকা
অতিকা রঞ্জন দে– ১ টাকা
অরবিন্দ দেব– ২ টাকা
বীরেন্দ্র নাথ– ১ টাকা
রুস্তম আলী– ১ টাকা
আকদ্দছ আলী– ১ টাকা
মনোরথ দাস– ২ টাকা
মোবারক আলী– ১ টাকা
নন্দ কুমার সিংহ– ১ টাকা
রাজেন্দ্র সূত্রধর– ১ টাকা
আরজিদ আলী– ১ টাকা
গোপাল সেনা– ১ টাকা
হাজী আবেদুর রহমান– ১ টাকা
গোপেন্দ্র নমঃশূদ্র– .৫০ পয়সা
বসারাত আলী– ১ টাকা
পৃথ্বীরঞ্জন নমঃশূদ্র– ১ টাকা

খগেন্দ্র কুমার নাথ বড়ভূইঞা– ১ টাকা
আ: নূও তালুকদার– ১ টাকা
তনুসেনা সিংহ– ১ টাকা
মো: মহবত আলী– ১০ টাকা
হাজী চনোহর আলী– ৫ টাকা
মো: মুদরিছ আলী– ২ টাকা
বসারাৎ আলী চৌধুরী– ৫ টাকা
তচওর আলী মিয়া– ৫ টাকা
মচন আলী– ৫ টাকা
আ: মতিন– ৫ টাকা
আজমত আলী– ৫ টাকা
হাজী ছন্দান আলী– ৫ টাকা
মছন আলী– ৩ টাকা
সুনাহর আলী– ৫ টাকা
আজমীর আলী– ৫ টাকা
জসিম আলী– ৩ টাকা
আনছার আলী– ৩ টাকা
আ: মুতালিব– ৩ টাকা
ছনুহর আলী– ৫ টাকা
ছিপত আলী– ৫ টাকা
সিকান্দর আলী– ৫ টাকা
মজন মিয়া– ৫ টাকা
এমরাণ উদ্দীন– ৫ টাকা
কুটি মিয়া– ৫ টাকা
মইন উদ্দীন– ৫ টাকা
মতি নাথ– ৫ টাকা

অক্ষয় চরণ নাথ– ৩ টাকা
কুটিচাঁন্দ নাথ– ৫ টাকা
গজা নাথ– ৫ টাকা
সরোঞ্জিত কুমার নাথ– ৫ টাকা
বঙ্কবিহারী নাথ– ৫ টাকা
নিরোদ রঞ্জন নাথ– ২ টাকা
ছিদ্দেক আলী তপাদার– ১ টাকা
নিরঞ্জন মোহন সেন– ৫ টাকা
শৈলেশ চন্দ্র দত্ত– ৩ টাকা
বীরেন্দ্র চন্দ্র দেব– ৩ টাকা
ছিদ্দেক আলী– ৫ টাকা
উপেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী– ২ টাকা
গোপেন্দ্র চক্রবর্তী– ২ টাকা
শুভেন্দু পাল– ৩ টাকা
আ: ছালাম– ৩ টাকা
মনোহর আলী– ৫ টাকা
ছিপত আলী– ১ টাকা
মইওব আলী– ১ টাকা
সকই মিয়া– ২ টাকা
মন্তাজ আলী– ১ টাকা
রচমান আলী– ১ টাকা
কুতুব আলী– ১ টাকা
বাবানী সিংহ– ১ টাকা
মুর্ছব্বর আলী– ১ টাকা
কুঞ্জবদন সিংহ– ২ টাকা
ছালেমা খাতুন– ১ টাকা

তজমুল আলী– ১ টাকা
মইদ উদ্দীন আহমদ– ৫ টাকা
মনোজির আলী– ৫ টাকা
অমূল্য রায়– ১০ টাকা
মনীন্দ্র চন্দ্র নাথ– ২ টাকা
ইলাছ আলী– ২ টাকা
যতীন্দ্র মোহন নাথ– .৫০ পয়সা
খগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ– ১ টাকা
রমেন্দ্র নাথ– .৫০ পয়সা
বুদ্ধিলাল নমঃশূদ্র– ১ টাকা
আবদুল মতিন– ১ টাকা
লাবণ্য নাথ– .৫০ পয়সা
হৃষীকেশ নাথ– ১ টাকা
যতীন্দ্র মোহন নমঃশূদ্র– ২ টাকা
পুলিশ বিহারী নাথ– ২ টাকা
গিরীশ চন্দ্র নাথ– ২ টাকা
শুখেন্দু চন্দ্র নাথ– ২ টাকা
ভক্তরাম নাথ– ২ টাকা
বারীন্দ্র চন্দ্র নাথ– ২ টাকা
ফয়জুর রহমান– ২ টাকা
প্রহলাদ চন্দ্র দাস– ২ টাকা
সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস– ২ টাকা
জিতেন্দ্র কুমার নমঃশূদ্র– ৫ টাকা
মনোমোহন নাথ– ২ টাকা
নরেশ চন্দ্র বিশ্বাস– ৫ টাকা
নৃপেন্দ্র কুমার নমঃশূদ্র– ১ টাকা

সুকেশ চন্দ্র রায়– ২ টাকা

সুরুজ আলী– ২ টাকা

নিশিকান্ত নাথ– ১ টাকা

অমূল্য কুমার দাস– ১ টাকা

ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস– ২ টাকা

সুধীর চন্দ্র নাথ– ২ টাকা

প্রমোদ রঞ্জন নাথ– ১ টাকা

নিশিকান্ত দাস– ১ টাকা

দিগেশ চন্দ্র নাথ– ১ টাকা

হরেন্দ্র চন্দ্র নাথ– ১ টাকা

নৃপেন্দ্র কুমার দাস– ১ টাকা

বিনোদ বিহারী দাস– ১ টাকা

রেণুকেশ নাথ– ১ টাকা

রকিব আলী– ১ টাকা

সুনামনি নমঃশূদ্র– ১ টাকা

প্রেমেন্দ্র কুমার নাথ– ১ টাকা

নগেশ আচার্য্য– ১ টাকা

সাদিক আলী– ১ টাকা

মকই মিয়া– ১ টাকা

ইনদর আলী– ১ টাকা

ভারত রাম দাস– ১ টাকা

সীতারাম নমঃশূদ্র– ১ টাকা

মনই মিয়া– ১ টাকা

রমেশ চন্দ্র নমঃশূদ্র– ১ টাকা

পরিশিষ্ট-দুই

মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা প্রাপ্ত ভারতীয়দের তীলকা

একাত্তরের কৃতিত্বপূর্ণ ও মানবিক অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার বেশ কয়েকজন ভারতীয় রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাধারণ মানুষজন ও প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা প্রদান করেছেন নিচে তাদের তালিকা তুলে ধরা হল।

ভারতীয় জনগণ

বৈদ্যনাথ মজুমদার, সমাজকর্মী

সৈয়দ আবুল মনসুর হাবিবুল্লাহ, রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবী

দশরথ দেব বর্ম, সাবেক মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা

দীপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, কথাসাহিত্যিক, সমাজসেবী ও সাংবাদিক

দুর্গা প্রাসাদ ধর, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা

স্বপন কুমার ভট্টাচার্য, সমাজসেবী ও কলামিস্ট

গুলজারিনাল নন্দা ভারতরত্ন, পদ্মবিভূষণ, সাবেক প্রধানমন্ত্রী

দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদ পাঠক, অল ইন্ডিয়া রেডিও ও দূরদর্শন

স্নেহাংশু কান্ত আচার্য, সমাজসেবী

চীমন সিং যাদব, মহাবীরচক্রীয় নৌবাহিনী

বেগম গৌরি আইয়ুব, অধ্যাপক ও সমাজসেবী

বেগম আশরাফী, অধ্যাপক ও সমাজসেবী

বেগম নার্গিস জাহাঙ্গীর (শাম্মি), অভিনেত্রী

বেগম রওশন আরা বেগম সাংমা, শিক্ষিকা ও সমাজসেবী, মেঘালয়

বেগম ওয়াহিদা রেহমান, চলচ্চিত্র অভিনেত্রী ও সমাজকর্মী, মাদ্রাজ

মেজর জেনারেল (অব.) গন্ধর্ব নাগরা, সাবেক সেনা কর্মকর্তা

মেজর জেনারেল অ্যান্থনি হ্যারল্ড এডওয়ার্ড মিশিগান মহাবীরচক্র, সেনা কর্মকর্তীয় সেনাবাহিনী

মেজর জেনারেল এস এস উবান, মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষক ও সংগঠকীয় সেনাবাহিনী

মেজর জেনারেল লাছমন সিং, কমান্ডার ২০ মাউন্টেন ডিভিশনীয় সেনাবাহিনী

মোহনলাল সাহা, সমাজসেবী, ব্যবসায়ী ও লেখক

লে. জেনারেল জে এফ আর জেকব, সাবেক চিফ অব স্টাফ, ইস্টার্ন কমান্ডীয় সেনাবাহিনী

লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা, সাবেক জিওসি-ইন-সি ইস্টার্ন কমান্ডীয় সেনাবাহিনী

লেফটেন্যান্ট জেনারেল সগত সিং পিভিএসএম, পদ্মভূষণ, ৪ কোরের অধিনায়কীয় সেনাবাহিনী

লেফটেন্যান্ট জেনারেল তপেশ্বর নারায়ণ রায়না মহাবীরচক্র, কমান্ডার ২ কোরীয় সেনাবাহিনী

লেফটেন্যান্ট কর্নেল কুলবন্ত সিং পান্নু মহাবীরচক্র, ২ প্যারা ব্যাটালিয়নের অধিনায়কীয় সেনাবাহিনী

লেডি রানু মুখার্জি, সমাজসেবী

গৌরী ঘোষ, সাংস্কৃতিক কর্মী

সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক

গৌরিপ্রসন্ন মজুমদার, গীতিকার, পশ্চিমবঙ্গ

গৌতম চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক ও রাজনীতিবিদ

সোমনাথ হোর, চিত্রশিল্পী

গোলক বিহারী মজুমদার, সাবেক বিএসএফ আঞ্চলিক প্রধান
গোবিন্দ বল্লভ পন্থ হাসপাতাল, আগরতলা, ত্রিপুরা
গোবিন্দ হালদার, সংগীত রচয়িতা
হেমন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়, সংগীতশিল্পী, গীতিকার ও সংগীত পরিচালক
জ্যোতি প্রসাদ সাইকা, সাংবাদিক, লেখক ও সাবেক সরকারি কর্মকর্তা
জ্যোতি বসু, সাবেক মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ
জেনারেল শঙ্কর রায় চৌধুরী পিভিএসএম, এডিসি, সাবেক সেনাবাহিনী স্টাফ প্রধান ও রাজনীতিবিদ
অশোক রায়, সাবেক সরকারি কর্মকর্তা
অন্নদা শঙ্কর রায়, কবি ও লেখক
অভীক সরকার, সাংবাদিক
অংশুমান রায়, সংগীতশিল্পী ও গীতিকার
আব্দুস সালাম বার-এট-ল, আইনজীবী ও সমাজসেবী
আই. কে. গুজরাল,সাবেক প্রধানমন্ত্রী
আনন্দজী ভিরজী শাহ, গীতিকার ও সংগীত পরিচালক
আফজাল হোসেন, সমাজসেবী
আবু বরকত আতাউর গনি খান চৌধুরী, সাবেক মন্ত্রী ও রাজনীতিবিদ
আবু সায়ীদ আইয়ুব, লেখক ও দার্শনিক
আবুল ফজল গোলাম ওসমানী, আইনজীবী ও সমাজসেবী
আকাশবাণী (অল ইন্ডিয়া রেডিও)
আহম্মদ হোসেন, আলোকচিত্রী ও সমাজসেবী
অনিল ভট্টাচার্য, সাংবাদিক
অনিল কুমার সরকার, অধ্যাপক
অমিয় তরফদার, আলোকচিত্রী
অজিত কুমার দাস, সাংবাদিক ও সমাজসেবী
ধীরাজ চৌধুরী, চিত্রশিল্পী
নৃপেন চক্রবর্তী, সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও ভারতীয় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা, ত্রিপুরা
নারায়ণ দেশাই, সমাজসেবী
নন্দিনী সৎপতি, সাবেক তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী
ইন্দিরা গান্ধী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী
ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি, পশ্চিমবঙ্গ শাখা
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কবি
নীরেন সেন গুপ্ত, চিত্রশিল্পী
নীহার রঞ্জন রায়, অধ্যাপক ও ইতিহাসবিদ
পূর্ণেন্দু কুমার বসু, অধ্যাপক
পূর্ণ অজিটক সাংমা, সাবেক স্পিকার, লোকসভা
পঙ্কজ সাহা, সাংবাদিক
ঈশ্বরী প্রাসাদ গুপ্তা, সাবেক মুখ্যসচিব, ত্রিপুরা সরকার,ভারত
পর্শনাথ চৌধুরী, সাংবাদিক
প্রফেসর বিধূ ভূষণ দত্ত, অধ্যাপক ও সমাজসেবী
প্রবোধ চন্দ্র, সাবেক মন্ত্রী ও লেখক

প্রীতিশ নন্দী পদ্মশ্রী, কবি, সাংবাদিক

প্রণবেশ সেন, সাংস্কৃতিক কর্মী

প্রণব রঞ্জন রায়, বুদ্ধিজীবী ও সমাজসেবী

পার্থ ঘোষ, সাংস্কৃতিক কর্মী

পান্নালাল দাশগুপ্ত, সাংবাদিক ও সমাজসেবী

ঈপ্সিতা গুপ্তা, মানবাধিকার কর্মী

পণ্ডিত রবি শংকররত্ন, বিশ্ব বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ

পবিত্র সরকার, শিক্ষবিদ

উপেন তরফদার, সাংস্কৃতিক কর্মী

উইং কমান্ডার স্বরূপ কৃষ্ণ কাউল মহাবীলচক্র, ৩৭ স্কোয়াড্রন অধিনায়কীয় বিমান বাহিনী

ফখরুদ্দিন আলী আহমেদ, সাবেক রাষ্ট্রপতি

উৎপলা মিশ্র, মানবাধিকার কর্মী

ব্যারিস্টার সুব্রত রায় চৌধুরী, আইনজীবী ও লেখক

বরুণ সেন গুপ্ত, সাংবাদিক

বাবু জগজীবন রাম, সাবেক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও উপ-প্রধানমন্ত্রী

বাসব সরকার, সাংবাদিক

ভূপেন দত্ত ভৌমিক, সাংবাদিক

ভূপেন হাজারিকা, পদ্মবিভূষণ, সংগীতজ্ঞ, কবি ও চলচ্চিত্র নির্মাতা

ভূপেশ গুপ্ত, সাবেক রাজ্যসভা সদস্য

ভাইস অ্যাডমিরাল স্বরাজ প্রকাশ মহাবীরচক্র, নৌ যুদ্ধজাহাজের অধিনায়কীয় নৌবাহিনী

ঋত্বিক ঘটক পদ্মশ্রী, চলচ্চিত্রকার ও লেখক

এ কে গোপালন, রাজনীতিবিদ

মৃন্ময় ভট্টাচার্য, অধ্যাপক

মৃন্ময়ী বসু , শিক্ষিকা ও সমাজসেবী

এন বি মুখার্জি, সমাজসেবী

মওলানা সাইদ আসাদ মাদানী, রাজনীতিবিদ ও ইসলামি চিন্তাবিদ

মকবুল ফিদা হুসেন পদ্মবিভূষণ, চিত্রশিল্পী ও রাজনীতিবিদ

মহারাণী বিভু কুমারী দেবী, সাবেক মন্ত্রী, ত্রিপুরা

মাদার তেঁরেসা, নোবেল বিজয়ী সমাজসেবী

মানস ঘোষ, সাংবাদিক

মান্না দে পদ্মভূষণ, পদ্মশ্রী, সংগীতশিল্পী

মাওলানা আবদুল লতিফ, সমাজসেবী

মানিক সরকার, সাবেক মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা

মুনসুর আলী, সাবেক উপমন্ত্রী, ত্রিপুরা

মুজাম্মিল আলী লস্কর, আইনজীবী ও সমাজসেবী

মুন্সি মোহাম্মদ ফজলে কাদের. কলকাতয় বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনের সাবেক কর্মচারী

রমেন মিত্র, রাজনীতিবিদ

রমেশ চন্দ্র ও বিশ্ব শান্তি পরিষদ

রবীন্দ্রমোহন চৌধুরী, সমাজসেবী

রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী, আইনজীবী

রঘু রাই পদ্মশ্রী, আলোকচিত্রী ও চিত্রসাংবাদিক

ওয়াহিদা রেহমান পদ্মভূষণ, পদ্মশ্রী, অভিনয় শিল্পী ও সমাজসেবী

রাখাল চন্দ্র রায় চৌধুরী, সমাজসেবী, শিক্ষক ও সাহিত্যিক

রবিন সেনগুপ্ত, সাংবাদিক ও আলোকচিত্রী

ক্যাপ্টেন (অব.) এম. এন. আর. সামান্ত মহাবীরচক্রীয় নৌবাহিনী

ক্যাপ্টেন উইলিয়ামসন এ সাংমা, সাবেক মুখ্যমন্ত্রী, মেঘালয়

শ্যামল চৌধুরী, সমাজসেবা

কৃপেশ রঞ্জন ঘোষ, সমাজকর্মী

কৃষ্ণ দেবনাথ, সাংবাদিক

কর্নেল (অব.) অশোক তারা বীরচক্রীয় সেনাবাহিনী

শরৎ চন্দ্র সিনহা, সাবেক মুখ্যমন্ত্রী, আসাম

কল্যাণজী ভিরজী শাহ, গীতিকার ও সংগীত পরিচালক

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতি

শশাঙ্ক এস ব্যানার্জী, সাবেক রাষ্ট্রদূত

শহীদ সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট শমসের সিং সামরা মহাবীরচক্র, ৮ গার্ড রেজিমেন্টীয় সেনাবাহিনী

শহীদ রাইফেলম্যান পাতিরাম গুরুং মহাবীরচক্র, ৫/১ গুর্খা রাইফেলসীয় সেনাবাহিনী

শহীদ ল্যান্স নায়েক অ্যালবার্ট এক্কা পরম বীরচক্র, ১৪ গার্ড রেজিমেন্টীয় সেনাবাহিনী

শহীদ সিপাহি আনসু প্রসাদ মহাবীরচক্র, ১০ মাহার রেজিমেন্টীয় সেনাবাহিনী

শ্রীমতি মৈত্রেয়ী দেবী, ঔপন্যাসিক, কবি ও সমাজকর্মী

শ্রীমতি রেণু চক্রবর্তী, রাজনীতিবিদ

শ্রীমতি অঞ্জলী লাহিড়ী, সমাজসেবী

শ্রীমতি অরুন্ধতী ঘোষ, রাষ্ট্রদূত ও দূটনীতিক

শ্রীমতি ইলা মিত্র, অধ্যাপক ও সমাজসেবী

নার্গিস দত্ত, চলচ্চিত্র অভিনেত্রী ও সমাজকর্মী

মীরা দে, অধ্যাপক

লতা মুঙ্গেশকর, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণরত্ন, বিশ্ব বিখ্যাত সংগীতশিল্পী

কল্পনা দত্ত জোশী, সমাজসেবী

নিবেদিতা নাগ, রাজনীতিবিদ

রিংকি রায় ভট্টাচার্য, লেখিকা ও সাংস্কৃতিক কর্মী

শচীন্দ্র লাল সিংহ,সাবেক মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা

কাইফি আজমী পদ্মশ্রী, কবি ও গীতিকার

শান্তিময় রায়, অধ্যাপক ও রাজনীতিবিদ

শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কবি

কবিতা বসু, মানবাধিকার কর্মী

শহিদ ক্যাপ্টেন মনমোহন সাগর দুগ্গাল, সেনা কর্মকর্তীয় সেনাবাহিনী

শহিদ সুবেদার মালকিয়াৎ সিং মহাবীরচক্র, ১৪ পাঞ্জাব রেজিমেন্টীয় সেনাবাহিনী

খগেন দাস, লোকসভা সদস্য ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতা

খসরু এফ রুস্তমজী, সাবেক বিএসএফ প্রধান

সন্দীপ দাস, সমাজকর্মী

সন্তোষ মুখার্জী, সাবেক সরকারি কর্মচারী ও সমাজসেবী, ত্রিপুরা

সন্তোষ কুমার ঘোষ, সাংবাদিক

সত্যেন্দ্রনাথ বসু পদ্মবিভূষণ, অধ্যাপক ও বিজ্ঞানী

সমর সেন, সাবেক রাষ্টদূত

সমর রঞ্জন সেন, অর্থনীতিবিদ

সরদার সরন সিং, সাবেক বিদেশমন্ত্রী

সলিল ঘোষ পদ্মশ্রী, সাংস্কৃতিক কর্মী ও সমাজসেবী

সলিল চৌধুরী, সংগীত পরিচালক

সুনীল দত্ত সরকারের সাবেক মন্ত্রী, চলচ্চিত্র অভিনেতা, পরিচালক ও প্রযোজক

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কবি, ঔপন্যাসিকও গীতিকার

সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কবি ও সাংস্কৃতিক কর্মী

সুরসম্রাট ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ, পদ্মবিভূষণ, বিশ্ব বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ

সুখদেব সিং সান্ধু, চিত্রপরিচালক ও আলোকচিত্রগ্রাহক

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত, সাংবাদিক

সুচিত্রা মিত্র পদ্মশ্রী, সংগীতশিল্পী

হাবুল ব্যানার্জী, সমাজসেবী

হরিনারায়ণ চক্রবর্তী, সমাজসেবী

হরিসাধন দাশগুপ্ত, চিত্র প্রযোজক

চন্দ্র রাজেশ্বর রাও, সাবেক সাধারণ সম্পাদক, কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া

চন্দ্রশেখর শ্যামল পদ্মশ্রী, পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মুখ্যসচিব

জগদীশ চন্দ্র দে, চিত্রশিল্পী

জগদীশ সি শর্মা সেনা মেডেল, সাবেক সেনা কর্মকর্তা ও রাষ্ট্রদূত

জয়প্রকাশ নারায়ণরত্ন, রাজনৈতিক নেতা

ড. অশোক মিত্র, রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদ

ড. ধ্রুবজ্যোতি লাহিড়ী, অধ্যাপক

ড. অর্জুন সেনগুপ্ত, অধ্যাপক

ড. আজগর আলী ইঞ্জিনিয়ার, সমাজসেবী ও লেখক

ড. অনিরুদ্ধ রায়, অধ্যাপক

ড. অমিয় কে চৌধুরী, অধ্যাপক

ড. পৃথ্বীন্দ্র মুখার্জি, গবেষক, শিক্ষবিদ ও সাংবাদিক, ফরাসি

ড. ফুলরেণু গুহ , শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী

ড. রথীন দত্ত, পদ্মশ্রী, সাবেক সার্জন সুপারিনটেনডেন্ট, জি বি হাসপাতাল, আগরতলা

ড. করণ সিং, সাবেক মন্ত্রী

ড. ত্রিগুণা সেন, সাবেক মন্ত্রী

দিলীপ মুখার্জী, রাজনীতিবিদ ও অধ্যাপক

দিলীপ চক্রবর্তী, অধ্যাপক ও লেখক

দিলীপ চক্রবর্তী, সাংবাদিক

নিখিল চক্রবর্তী, রাজনীতিবিদ

পি এন হাকসার, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব

পি সি সরকার, জুনিয়র, জাদুকর

প্রিয়দর্শন সেন শর্মা, অধ্যাপক

প্রিয়রঞ্জন দাশ মুন্সি, রাজনীতিবিদ ও মন্ত্রী

ফিল্ড মার্শাল এস এইচ এফ জে মানেকশ, পদ্মবিভূষণ, সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সাংবাদিক

ব্রিগেডিয়ার (অব.) কৈলাশ প্রসাদ পান্ডে মহাবীরচক্রীয় সেনাবাহিনী

ব্রিগেডিয়ার (অব.) সান্ত সিং মহাবীরচক্র বারীয় সেনাবাহিনী

বিনয় রায়, আলোকচিত্রগ্রাহক

বিশ্বজিৎ আর চ্যাটার্জি, অভিনেতা ও প্রযোজক

বিচারপতি সৈয়দ সা'দাত আবুল মাসুদ, পদ্মভূষণ, সাবেক বিচারপতি, কলকাতা হাইকোর্ট

বিজয় সিং নাহার, সাবেক উপ-মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

ভি কে কৃষ্ণা মেনন, রাজনীতিবিদ ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী

মিজ মার্গারেট রোজ মাওলং, সাবেক সরকারি কর্মকর্তা

মিহির দেব, অধ্যাপক ও লেখক

কিশোর পারেখ, সাংবাদিক ও আলোকচিত্রগ্রাহক

শিবনাথ ব্যানার্জী, রাজনীতিবিদ

সিদ্ধার্থ শংকর রায়, সাবেক মন্ত্রী

হিমাংশু মোহন চৌধুরী পদ্মশ্রী, সাবেক সরকারি কর্মকর্তা ও লেখক

হিরন্ময় কার্লেকার, সাংবাদিক

হিরণ্য কুমার ভট্টাচার্য, সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা ও মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষক ,ভারত

জিতেন্দ্র চন্দ্র পাল, সাংবাদিক

জিষ্ণু দে, অধ্যাপক

ডা. নলিনাক্ষ চৌধুরী, চিকিৎসক

ডা. রুপেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক, চিকিৎসক ও সমাজসেবী

ডা. শ্যামাপ্রসাদ মণ্ডল পদ্মশ্রী, চিকিৎসক

ডা. সুজিত দে, চিকিৎসক

ডা. জয়নাল আবেদীন, চিকিৎসক ও রাজনীতিবিদ

ডা. শিশির কুমার বসু, চিকিৎসক

তরুণ স্যানাল, সাংবাদিক ও অধ্যাপক

তারা শংকর বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মভূষণ, ঔপন্যাসিক ও রাজনীতিবিদ

পরিশিষ্ট-তিন

[শরণার্থী ও শরণার্থী শিবির সম্পর্কিত কিছু তথ্য]

২৫ মার্চ থেকে ১৫ডিসেম্বর, ১৯৭১ পর্যন্ত শরণার্থীদের আগমন-

ক্রমিক নং	প্রদেশ	মোট আগত শরণার্থী সংখ্যা
১	পশ্চিমবঙ্গ	৭৪,৯৩,৪৭৪
২	ত্রিপুরা	১৪,১৬,৪৯১
৩	মেঘালয়	৬,৬৭,৯৮৬
৪	আসাম	৩,১২,৭১৩
৫	বিহার	৮,৬৪১
		মোট- ৯৮,৯৯,৩০৫

প্রদেশভেদে শরণার্থীদের সংখ্যা ও অবস্থান (১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল পর্যন্ত গণনা অনুযায়ী)

ক্রমিক নং	প্রদেশের নাম	শিবিরের সংখ্যা	শিবিরে অবস্থানকারী শরণার্থী সংখ্যা	শিবিরের বাইরে অবস্থানকারী শরণার্থী সংখ্যা	মোট
১	পশ্চিমবঙ্গ	৪৯২	৪৮,৪৯,৭৮৬	২৩,৮৬,১৩০	৭২,৩৫,৯১৬
২	ত্রিপুরা	২৭৬	৮,৩৪,০৯৮	৫,৪৭,৫৫১	১৩,৮১,৬৪৯
৩	মেঘালয়	১৭	৫,৯১,৫২০	৭৬,৪৬৬	৬,৬৭,৯৮৬
৪	আসাম	২৮	২,৫৫,৬৪২	৯১,৯১৩	৩,৪৭,৫৫৫
৫	বিহার	৮	৩৬,৭৩২	-	৩৬,৭৩২
৬	মধ্য প্রদেশ	৩	২,১৯,২৯৮	-	২,১৯,২৯৮
৭	উত্তর প্রদেশ	১	১০,১৬৯	-	১০,১৬৬

	মোট	৮২৫	৬৭,৯৭,২৪৫	৩১,০২,০৬০	৯৮৯৯৩০৫

মাসভেদে আগত শরণার্থী সংখ্যা

ক্রমিক	মাস	গড় সংখ্যা অনুযায়ী দৈনিক আগত শরণার্থী সংখ্যা	প্রতি মাসে আগত শরণার্থী সংখ্যা (হাজারে)
১	এপ্রিল ১৯৭১ (১০ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত)	৫,৭০০	১,৯২,১০০
২	মে ১৯৭১	১০,২০৩	৩,১৫,৮০০
৩	জুন ১৯৭১	৬,৮০০	২,০৫,৬০০
৪	জুলাই ১৯৭১	২,৬০০	৭৯,৭০০
৫	অগাস্ট ১৯৭১	৩,৪০০	১,০৫,৫০০
৬	সেপ্টেম্বর ১৯৭১	৫৭	৮০,৪০০
৭	অক্টোবর ১৯৭১	১৪	৪২,৫০০
৮	নভেম্বর ১৯৭১	৮	২১,৭০০
৯	ফিরে যাওয়া		১৬,৬০০
		মোট-	৯,৮৯,৯০০

শরণার্থী শিবিরের তালিকা (এপ্রিল থেকে নভেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত)

ব্লক নং	জেলা	শিবিরের নাম	উল্লেখ নং
D4	উত্তর জেলা	আম্বাসা	১
D3		কামালপুর	২
E3		কুমারঘাট	৩
D3		মাইলস	৪

D3		৮৫ মাইলস	৫
E3		পদ্মাবিল	৬
E3		শ্রীনাথপুর	৭
E3		উপ্তাখালি	৮
D4	দক্ষিন জেলা	বাগাটা	৯
D4		চন্দ্রাপুর	১০
D4		ধজনগর	১১
D4		হরিনা	১২
D4		ঋশ্যমুখ	১৩
D4		কাঁকড়াবা	১৪
D4		কলাছড়া	১৫
D4		কাউয়ামারা	১৬
D4		মাইছেরা	১৭
D4		ফুলকুমারি	১৮
D4		রাজনগর	১৯
D4		শ্রীনগর	২০
D4	পশ্চিম জেলা	আমতলি	২১
D4		বড়জলা	২২
D4		ব্রজপুর	২৩
D4		ছেচুড়িয়া	২৪
D4		ধনপুর	২৫
D3		গান্ধীগ্রাম	২৬
D4		হাপানিয়া	২৭
D3		ইশানপুর	২৮
D3		খোয়াই	২৯
D4		মধুপুর	৩০
D4		মতিনগর	৩১
D4		মেলাগড়	৩২
D4		মোহনপুর	৩৩
D3		সিমনা	
D4		তেলিয়ামুরা	৩৩

আসাম

E3	চাচড়	চন্দ্রনাথপুর	৩৪

E3		চারগোলা	৩৫
E3		দশগ্রাম	-
E3		হরিনছেঁড়া	৩৬
E3		কাঁঠাল	-
E3		লক্ষ্মীনগর	৩৭
E3		সিলকুড়ি	৩৮
E3		সোনাক্ষীরা	৩৯
B2	গোয়ালপাড়া	বড়কোনা	৪০
C1		ফকিরগ্রাম	৪১
B2		মানকাচর	-
C2		নিদানপুর	৪২
C1		সারফানগুঁড়ি	৪৩
E5	মিজো	দেমাগিরি	-
E5		পাচাং	-
E5		রটল্যাং	-
E2	উত্তর চাচড় হিলস	হাফলং	৪৪
E1	নওগাং	হোজাই	৪৫
E1		নীলবাগান	৪৬
E1		সিদা বাড়ি	৪৭

পশ্চিমবঙ্গ

A5	চব্বিশ পরগনা	হাসনাবাদ	-
A5		তকি (২টি ক্যাম্প)	৪৮
A5		বশিরহাট (৫টি ক্যাম্প)	-
A5		স্বরূপনগর (৭টি ক্যাম্প)	৪৯
A5		বাদুরিয়া (৫টি ক্যাম্প)	৫০
A5		গোবরডাঙ্গা	৫১
A5		মসলন্দপূর	৫১
A5		কালুপুর (৪টি ক্যাম্প)	৫১
A5		মেদিয়া	৫১
A5		ইছাপুর	৫১
A5		সুনতিয়া	৫১
A5		বানিপূর	৫১
A5		পায়রাগাছি	৫১
A5		লক্ষ্মীপুর	৫১
A5		সাধনপুর	৫২

A5		সাহারা	৫২
A5		ব্যারাকপুর	-
A5		ডিগবাড়িয়া	৫৩
A5		দত্তপুকুর	৫৩
A5		কানাপুকুর	৫৩
A5		বারাসাত (৩টি ক্যাম্প)	-
A5		মামা ভাগিনা(২টি ক্যাম্প)	৫৪
A5		মারিঘাটা	৫৪
A4		বাগদাহা	৫৫
A4		হেলেঞ্চা	৫৫
A4		গনরাপোতা	৫৫
A5		সল্টলেক	৫৬
A5		নীলগঞ্জ	৫৬
A5		নিউ ব্যারাকপুর	৫৬
A5		দগাচিয়া	৫৭
A4	নদিয়া	করিমপুর	৫৮
A4		পলাশীপাড়া	৫৮
A4		বেতাই	৫৮
A4		নাজিরপুর	৫৮
A4		বনপুর	৫৯
A4		ছাপড়া	৫৯
A4		দমপুকুরিয়া	৫৯
A4		পূর্ণগঞ্জ	৫৯
A4		জাভা	৬০
A4		ভালুকা	৬০
A4		ভাদুরপুর	৬০
A4		মুরাগাছা	৬০
A4		দক্ষিণপাড়া	৬০
A5		কল্যানী (৭টি ক্যাম্প)	৬১
A4		শিকরপুর	৬২
A4		মাজদিয়া	৬৩
A4		ভজন ঘাট	৬৩
A4		আসান নগর	৬৩
A4		বাড়কুল্লা	৬৩
A4		উলাশি	৬৩
A4		রানাঘাট (২টি ক্যাম্প)	-
A4		শান্তিপুর	-

A3	মুর্শিদাবাদ	দৌলতাবাদ	৬৪
A3		কালাডাঙ্গা	৬৪
A3		বাড়ুই পাড়া	৬৫
A3		ছোঁয়া	৬৫
A3		হরিহর পাড়া	৬৫
A3		করিমনগর	৬৫
A3		নিশ্চিন্তপুর	৬৫
A3		রোকনপুর	৬৫
A3		শাহজাদপুর	৬৬
A4		আমতলা	৬৬
A4		যৌবনা	৬৬
A4		মধুপুর	৬৬
A4		নওডা	৬৬
A4		পতিকাবাড়ি	৬৬
A4		মগন পাড়া	৬৭
A3		ভাগিরথপুর	৬৮
A3		ভাটশালা	৬৮
A3		দমকাল	৬৮
A3		কাটাকোবরা	৬৮
A3		সাদিখানদেউর	৬৮
A3		সাহেব রামপুর	৬৮
A3		ছোঁয়া পাড়া	৬৯
A3		হুকাহুড়া	৬৯
A3		জলঙ্গি	৬৯
A3		কাজিপাড়া	৬৯
A3		নাটিয়াল	৬৯
A3		সাগর পাড়া	৬৯
A3		সাহেব নগর	৬৯
A3		অশোক কুঞ্জ, লালবাগ	৭০
A3		কলেজ কমার্স হোস্টেল জিয়াগঞ্জ	৭০
A3		দর্পনগর প্রাইমারি স্কুল	৭০
A3		নবাব বাহাদুর ইন্সটিটিউশন	৭৯
A3		লাল বোর্ডিং ,লালবাগ	৭০
A3		মুসলিম হোস্টেল, লালবাগ	৭০
A3		মিশন হাসপাতাল	৭০

		জিয়াগঞ্জ	
A3		কলেজ কমার্স হোস্টেল, জিয়াগঞ্জ	৭০
A3		সরকারি অবৈতনিক প্রাইমারি স্কুল নং ১, জিয়াগঞ্জ	৭০
A3		ঐ, নং ২, জিয়াগঞ্জ	৭০
A3		মহারাজ বাহাদুর হল জিয়াগঞ্জ	৭০
A3		দর্পনগর প্রাইমারি স্কুল	৭০
A3		দিলফারবাদ গঞ্জ স্কুল	৭০
A3		নাশিপুর রাজবতি	৭০
A3		নিশাদবাদ প্রাথমিক স্কুল, লালবাগ	৭০
A3		মুকুন্দবাগ জুনিয়র বেসিক স্কুল, লালবাগ	৭০
A3		শ্রিপাত কুমারপাড়া, জিয়াগঞ্জ	৭০
A3		মোহন্ত রামদাস আউলিয়া প্রাইমারি স্কুল, জিয়াগঞ্জ	৭০
A3		কুর্মিটোলা ক্যাম্প	৭০
A3		অশোককুঞ্জ, লালবাগ	৭০
A3		ম্যাকেঞ্জি হল, আজিমগঞ্জ	৭১
A3		পুরাতন ধর্মশালা, আজিমগঞ্জ	৭১
A3		নতুন ধর্মশালা, আজিমগঞ্জ	৭১
A3		নয়লক্ষ গার্ডেন, আজিমগঞ্জ	৭১
A3		ডন বস্কো ইন্সটিটিউট, আজিমগঞ্জ	৭১
A3		এম স্ত্রীমন্তুস গোডাউন, জিয়াগঞ্জ	৭১
A3		রাজা বিজয় সিং আস্তাবল, আজিমগঞ্জ	৭১
A3		দেবিপুর জিএসএফপি	৭১

		স্কুল	
A3		রাজা বিজয় সিং বিদ্যামন্দির হোস্টেল, আজিমগঞ্জ	৭১
A3		এম এন একাডেমি, লালগোলা	৭২
A3		লাহোর শেড, লাল গোলা	৭২
A3		স্কুল বোর্ডিং, লাল গোলা	৭২
A3		গেস্ট হাউস, লাল গোলা	৭২
A3		বেসিক স্কুল, লাল গোলা	৭২
A3		মাদ্রাসা, লাল গোলা	৭২
A3		গার্লস স্কুল, লাল গোলা	৭২
A3		মানিক চাক	৭২
A3		যুব অভ্যর্থনা কেন্দ্র, লাল গোলা	৭২
A3		রাণি নগর, গোয়াস	৭৩
A3		রাণি নগর	৭৩
A3		নবীপুর	৭৩
A3		কাতলা মারি	৭৩
A3		রাখালদাসপুর	৭৩
A3		শেখপাড়া	৭৩
A3		রামবাগ	৭৪
A3		হাবাসপুর প্রাইমারি স্কুল	৭৪
A3		বাগ ডাঙ্গা প্রাইমারি স্কুল	৭৪
A3		পাতামারি হনুমান্ত নগর	৭৪
A3		আখেরিগঞ্জ	৭৪
A3		খারিবোনা	৭৪
A3		নাশিপুর	৭৪
A3		ভগবানগোলা হাইস্কুল	৭৫
A3		কালুখালি মাদ্রাসা ও প্রাইমারি স্কুল	৭৫
A3		ভগবানগোলা প্রাইমারি স্কুল	৭৫
A3		আসানপুর প্রাইমারি স্কুল	৭৫
A3		দারারকান্দি প্রাইমারি স্কুল	৭৫
A3		রাম চন্দ্রমতি প্রাইমারি	৭৫

		স্কুল	
A3		ভগবানগোলা	৭৫
A3		ভুরকুন্ডা	৭৬
A3		সাহাপুর	৭৬
A3		মনিগ্রাম	৭৬
A2	মালদহ	বামনগোলা	৭৭
A2		পাকুয়াহাট	৭৭
A2		মাহেশুর	৭৭
A2		গোউলজই	৭৭
A2		পল ট্রান্সিট	৭৭
A2		পাকশাঘাট উমুক্ত ময়দান	৭৭
A2		গাজল	৭৭
A2		দহিল	৭৮
A2		হাতিমারি	৭৮
A2		কুতুবশহর এবং আদিনা	৭৮
A2		কচুয়াডাঙ্গা	৭৮
A2		একলাক্ষী	৭৮
A2		রাহুতারা মিশন	৭৯
A2		কেন্দ পুকুর	৭৯
A2		বুলবুল চন্ডি (২টি ক্যাম্প)	৭৯
A2		ঋষিপুর	৭৯
A2		শিঙ্গাবাদ (২টি ক্যাম্প)	৭৯
A2		আইহো	৭৯
A2		বাহুতেরা মিশন	৭৯
A2	মালদহ	হরিশচন্দ্রপুর	৭৯
A2		বিশাপুর	৮০
A2		কুশিদহ	৮০
A2		তুলসিহট্ট	৮০
A2		মসলদহ	৮০
A2		ব্রিঙ্গল	৮০
A2		বড়াই	৮০
A2		কনুয়া	৮০
A2		চন্ডিপুর	৮০
A3		গোলাপগঞ্জ	৮১
A3		কালিয়াচক	৮১
A3		মোথাবাড়ি	৮১

A3		বৈষ্ণবনগর	৮১
A3		পাগলাব্রিজ	৮১
A3		বঙ্গতলা	৮১
A3		গয়েশবাড়ি	৮১
A3		সুজাপুর	৮১
A2		কবিন্দপাড়া	৮২
A2		মালতিপুর	৮২
A2		খরবা	৮২
A2		কালিগ্রাম	৮২
A2		আশাপুর	৮২
A2		পাহারপুর	৮২
A2		নালাহার ছাত্রীমোহনি	৮২
A3		ডিইবি ডাক বাংলো	৮৩
A3		মাহাদিপুর	৮৩
A3		নঘরিয়া	৮৩
A3		রায়গ্রাম	৮৩
A3		মিল্কি	৮৩
A2		কালিন্দ্রি	৮৪
A2		মথুরাপুর	৮৪
A2		নাজিরপুর	৮৪
A2		বেচুতলা অথবা মানিকচক দিয়ারা	৮৪
A2		আড়িয়াডাঙ্গা	৮৪
A2		একবর্ণ	৮৪
A2		হরিপুর	৮৪
A2		পরাণপুর	৮৪
A2		রাতুয়া স্কুল	৮৪
A2		দেবিপুর	৮৪
A2		সামশি	৮৪
A2		বড়াল	৮৪
A2		ভালুকা	৮৪
A2		বাহাদো	৮৪
A2		ভগবানপুর	৮৪
A2		খাঁপুর	৮৪
A2	পশ্চিম দিনাজপুর	কালদিঘী গোডাউন	৮৫
A2		গঙ্গারামপুর হাই স্কুল	৮৫
A2		নয়া বাজার হাই স্কুল	৮৫
A2		শিববাতি স্টেশন জুনিয়র	৮৫

		হাই স্কুল	
A2		ছালুন হাই স্কুল	৮৫
A2		সর্বমঙ্গলা	৮৫
A2		সুকদেবপুর হাই স্কুল	৮৫
A2		ঠেঙ্গাপাড়া হাই স্কুল	৮৫
A2		নেহাম্বা জুনিয়র হাই স্কুল	৮৫
A2		বুলবাড়ি সেন্টার	৮৫
A2		জাহাঙ্গীরপুর জুনিয়র হাই স্কুল	৮৫
A2		রতনপুর ফ্রি প্রাইমারি স্কুল	৮৫
A2		তপন হাই স্কুল	৮৫
A2		দারালহাট হাই স্কুল	৮৫
A2		রামপুর হাই স্কুল	৮৫
A2		চকবলীগ্রাম বেসিক স্কুল	৮৫
A2		কারদাহা হাই স্কুল	৮৫
A2		ভিওর জালালিয়া হাই স্কুল	৮৫
A2		তিলম জুনিয়র হাই স্কুল	৮৫
A2		লস্করহাট পঞ্চায়েত অফিস	৮৫
A2		পতিরাম হাই স্কুল	৮৫
A2		নাজিরপুর অঞ্চল অফিস, ঝর্ণা	৮৫
A2		বড়কলি জুনিয়র হাই স্কুল	৮৫
A2		অমৃতখণ্ড অঞ্চল অফিস, কামার পাড়া	৮৫
A2		মালঞ্চ হাই স্কুল	৮৫
A2		জেএলপি বিদ্যাচক্র	৮৫
A2		খাদিমপুর গার্লস হাই স্কুল	৮৫
A2		চাক্কাশি হাই স্কুল	৮৫
A2		বাউল পরমেশ্বর হাই স্কুল	৮৫
A2		নদীপার এনসি হাই স্কুল	৮৫
A2		চিঙ্গিশপুর হাই স্কুল	৮৫
A2		বেলতলা পার্ক হাই স্কুল	৮৫

A2		খাশপুর হাই স্কুল	৮৫
A2		হিল্লি হাই স্কুল	৮৬
A2		ত্রিমোহনি রুরাল লাইব্রেরি	৮৬
A2		তেওর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ	৮৬
A2		মুরালিপুর জুনিয়র ব্যাসিক স্কুল	৮৬
A2		পাঞ্জুল অঞ্চল পঞ্চায়েত অফিস, রামকৃষ্ণপুর	৮৬
A2		ধলপাড়া ফ্রি প্রাইমারি স্কুল	৮৬
A2		মুরালিপুর ফ্রি প্রাইমারি স্কুল	৮৬
A1		দাসপাড়া	৮৭
A1		লাখিমপুর	৮৭
A1		ছোপড়া	৮৭
A1		পাতাগোরা	৮৭
A1		মতিকুন্ডা	৮৭
A1		ঠাকুরবাড়ি	৮৭
A1		রামগঞ্জ	৮৮
A1		গোয়ালপোখার	৮৮
A1		দারিভির	৮৮
A1		রশখোয়া	৮৮
A1		আতিয়াখড়ি	৮৮
A1		সুজালি	৮৮
A2		ফকিরগঞ্জ অভ্যর্থনা কেন্দ্র	৮৩
A2		জয়দেবপুর মাদ্রাসা অভ্যর্থনা কেন্দ্র	৮৯
A2		সাফানগর অভ্যর্থনা কেন্দ্র	৮৯
A2		কুমারগঞ্জ অভ্যর্থনা কেন্দ্র	৮৯
A2		গোপালগঞ্জ অভ্যর্থনা কেন্দ্র	৮৯
A2		রাধানগর অভ্যর্থনা কেন্দ্র	৮৯
A2		বতুন অভ্যর্থনা কেন্দ্র	৮৯
A2		ধর্মপুর অভ্যর্থনা কেন্দ্র	৮৯

A2		মালনি	৯০
A2		নাওদা	৯০
A2		ডালিমগাঁও	৯০
A2		মহারাজাহাট	৯০
A2		রামপুরা	৯০
A2		বংশীহারি	৯০
A1	দার্জিলিং	কান্তিভিলা	৯১
A1	জলপাইগুড়ি	সন্যাসীকথা	৯২
A1		অময়দিঘী	৯২
A1		জাতীয়কলি	৯২
A1		মনুয়া গাছ	৯২
A1		শক্তি (২টি ক্যাম্প)	৯২
A1		বেরুবাড়ি (২টি ক্যাম্প)	৯২
A1		পাটকাটা	৯২
A1		দ্রাঙ্গি	৯৩
A1		পানিজেহাটি	৯৩
A1		রঙ ধামালি	৯৩
A1		গুমিরা পাড়া	৯৩
A1		মানিকগঞ্জ	৯৩
A1		সারুল্লা ক্যাম্প	৯৩
A1		পলিটেকনিক	৯৩
A1		বলরামহাট	৯৩
A1		পানবাড়ি	৯৩
A1		বন্ধুনগর	৯৩
A1		জল্লেশ (২টি ক্যাম্প)	৯৩
A1		মাওয়াগাছ	৯৩
A1		ডাবগাছ	৯৩
A1		ডাঙ্কিমারি	৯৩
B1		হলদিবাড়ি	৯৪
B1		দেওয়ানগঞ্জ	৯৪
A1		ডুয়ারস সমবায় চাল কল ক্যাম্প	৯৫
A1		বশিলারগঙ্গা বাগজান	৯৫
A1		ডাঙ্গি	৯৬
B1		লক্ষ্মীকান্ত	৯৭
B1		রঙ্গতি	৯৭
B1		আগরাভাসা	৯৭
A1		মাতিয়ালি	৯৮

A1		বড়দিঘী	৯৮
B1	কুচবিহার	দেওয়ানহাঁট রেলওয়ে স্টেশন (২ টি ক্যাম্প)	৯৯
B1		মক্কাতি পুশ্নবঙ্গ	৯৯
B1		ধুনপুর	৯৯
B1		নাতুয়ারপার	৯৯
B1		রাজারহাট	৯৯
B1		মধুপুর	৯৯
B1		পুন্ডিবাড়ি গার্লস স্কুল (৬ টি ক্যাম্প)	৯৯
B1		পাতলাখাওয়া কমপ্লিট বেসিক স্কুল	৯৯
B1		কড়ালিরডাঙ্গা ক্যাম্প নং ১ ও ২	৯৯
B1		দীনেশ্বরী জুনিয়র হাই স্কুল	৯৯
B1		খারিজা কাকড়িবাড়ি	৯৯
A1		দেওয়ানগজ ট্রানজিট ক্যাম্প (গিরিমঠ)	১০০
A1		সুইডিশ মিশন ক্যাম্প	১০০
A1		হাওড়াডাঙ্গা ক্যাম্প	১০০
A1		হলদিবাড়ি জুট গোডাউন (২ টি ক্যাম্প)	১০০
A1		চ্যাংড়াবান্ধা হাই স্কুল (৫ টি ক্যাম্প)	১০০
A1		জামালদহ সমি পার্মানেন্ট (৩ টি ক্যাম্প)	১০০
A1		রাণিরহাট স্কুল	১০০
A1		ধাপড়াহাট স্কুল	১০০
A1		ডাঙারবাট স্কুল	১০০
B1		জলধোয়া	১০১
B1		জোরাই	১০১
B1		বকশির হাট	১০১
B1		দেওছড়ি	১০১
B1		বলরামপুর	১০১
B1		বালাভুত	১০১
B1		ঝাওকুঠি	১০১

B1		পাগলার হাট	১০২
B1		রাথের ডাঙ্গা (২টি ক্যাম্প)	১০২
B1		নগরলাল বাজার (২টি ক্যাম্প)	১০২
B1		বড় মরিচ (২টি ক্যাম্প)	১০২
B1		গোসাইর হাট	১০২
B1		ডাকালির হাট	১০২
B1		ডাকঘর	১০২
B1		খলিশামারি	১০২
B1		ছোট শালবাড়ী	১০২
B1		বাড়াউনিডাঙ্গা	১০২
B1		কাজীর দিঘি	১০২
B1		রাণির দিঘি	১০২
B1		ঘোগ্রাডাঙ্গা	১০২
B1		কৃষ্ণ কলোনি	১০২
B1		বসন্তবাবুর ডাঙ্গা	১০২
B1		সুয়ান ঘাট	১০২
B1		চান ঘাট	১০২
B1		নাকাতি	১০২
B1		কালীগঞ্জের ডাঙ্গা	১০২
B1		বাঘমারার দিঘী	১০২
B1		বামন ডাঙ্গা	১০২
B1		গোলেন ঘাটি (৩ টি ক্যাম্প)	১০২
B1		নগরলাল বাজার সুকান দিঘি	১০২
B1		দেওয়ান স্ট জয়দুয়ার (২টি ক্যাম্প)	১০২
B1		জাতামারি	১০২
B1		ছাতলা বাজার	১০২
B1		বড়মাসিয়া	১০২
B1		ভোগরাম গুড়ি	১০২
B1		অশোকবাড়ি	১০২
B1		অঙ্গরকাটা পরদেবী	১০২
B1		পাতা কুমারি	১০২
B1		ঘোকসার ডাঙ্গা	১০২
B1		বুড়ি হাট (২টি ক্যাম্প)	১০৩

B1		খলিশা গোসানি মারি	১০৩
B1		কালিগঞ্জ	১০৩
B1		বাসন্তির হাট (২টি ক্যাম্প)	১০৩
B1		বিনিতাগুড়ি	১০৩
B1		কিসামাতদা সাভাম (৩টি ক্যাম্প)	১০৩
B1		বড়ডাঙ্গা	১০৩
B1		নিগাম নগর (৩টি ক্যাম্প)	১০৩
B1		খরখরিয়া	১০৩
B1		বালিকা	১০৩
B1		পুটিমারি	১০৩
B1		ছাড়াবাড়ি	১০৩
B1		পেটলা	১০৩
B1		রসবাড়ির মঠ ‘এ’	১৩৩
B1		বর্ণচেনা	১০৩
B1		ছোটফলিমারি	১০৩
B1		জমাদারের বশ (৫টি ক্যাম্প)	১০৩
B1		সিতাই স্কুল (২টি ক্যাম্প)	১০৩
B1		কায়েতের বাড়ি	১০৩
B1		চামলা	১০৩
B1		আদাবাড়ি	১০৩
B1		বালাপুকুরি	১০৩
B1		ব্রক্ষাতাহোত্রা	১০৩
B1		বিজলি ছটকা	১০৩

মেঘালয়

C2	গারো পাহাড়	বাঘমারা	১০৪
C2		ডালু	১০৫
C2		চন্দাভুই	১০৬
C2		চিচেংপাড়া হাট	১০৬
C2		হালজাতি হাট	১০৭
C2		মাচাং পানি	১০৮

C2		আম্পাতি	১০৮
C2		চেবেনাং	১০৮
C2		মাইনেং	১০৯
C2		শিব বাড়ি	১০৯
C2		বিকোনা	১১০
B2		পরাকাসুয়া হাট	১১১
B2		কলাইপাড়া	১১২
B2		দোমাপাড়া	১১২
E2	খাসিয়া ও জৈন্তা পর্বত	পংতুং	১১৩
E2		মদন লাইন্তদ	১১৪
E2		মদন বৈতাহ	১১৫
E2		সৌলং	১১৬
E2		আমত্রং	১১৭
E2		দিএংরাই	১১৮
E2		আম্লারেম	১২৯
E2		আমলারেম	১২৯
E2		আমসহমালেং	১২০
C2		ডালট	১২১
C2		লাল পানি	১২১
D2		মউয়াছড়া	১২২
D9		পাঞ্চারিং	১২৩
D2		মুনাই	১২৪
E2		সিন্ডাই	১২৫
D2		শেল্লা	১২৬
D2		ইশামতি	১২৬
D2		মাইল্লাম	১২৭
D2		ওয়াহ্রেংকা	১২৮

সূত্র- *বাংলাদেশ ডকুমেন্টস*, বহির্বিশ্ব বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভারত, ১৯৭২